হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

# হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।

## প্রথম খণ্ড।

সম্পাদনা

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

## নিবেদন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাবলী এখন দুর্লভ, অথচ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁর রচনার বিষয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা পর্যায়, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ, সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়ন এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও লিপির ইতিহাস। শাস্ত্রীমশায়ের রচনাবলী মানবিকী বিদ্যার আকর স্বরূপ। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার নীতি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ বাংলায় পাঠ্য পুস্তক ও সহায়ক মূল গ্রন্থাদি প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নৈহাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা-কেন্দ্রের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় টীকা ও আনুষঙ্গিক তথ্য সহ চার খণ্ডে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল। দেশের বিদ্যানুরাগী মানুষ মাত্রেই এই রচনা-সংগ্রহ সাদরে গ্রহণ করবেন আশা করি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা-কেন্দ্রের পরিচালক সমিতির সদস্যবৃন্দ: শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীগোপালদাস রায়, শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার, শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীরাঘবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এবং শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় উপদেষ্টা রূপে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সম্পাদনার কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

কলকাতা
৬ ডিসেম্বর ১৯৮০

# বিষয়সূচি

# চিত্রসূচি

## কুঞ্চিকা

| | |
|---|---|
| কেঙ্গুর-তেঙ্গুর | *Catalogue of Indian (Buddhist) Texts in Tibetan Translation Kanjur & Tanjur*, Ed. Alaka Chattopadhyay, Calcutta, 1972. |
| চ-গী-প | চর্যাগীতি-পদাবলী, সুকুমার সেন, বর্ধমান, ১৯৫৬। |
| প্রা-বা-বা | প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন, কলকাতা ১৩৫৩। |
| ব-সং-অ-জী | বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী, প্রথম খণ্ড, শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৩৮৩। |
| বা-ই | বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, কলকাতা, ১৩৫৮। |
| বৌ-গা-দো | হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩৫৮। |
| শাস্ত্রী | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। |
| সং-সা-বা-দা | সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৬৯। |
| সা-প-প | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। |
| স্মারকগ্রন্থ | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ, সত্যজিৎ চৌধুরী-দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৭৮। |
| *BE* | *An Introduction To Buddhist Esoterism*, Benoytosh Bhattacharyya, Delhi, 1980. |
| *BLT* | *Buddhism & Lamaism of Tibet*, L. Austine Waddell, New Delhi, 1974. |
| *C-G-K* | *Caryāgītikoṣa*, Ed. P. C. Bagchi & Santi Bhiksu-Sastri, Visva-Bharati, 1956. |
| *H-B*-I | *The History of Bengal*, vol. I, Ed. R. C. Mazumdar, Dacca, 1963. |

*H-B*-II — *The History of Bengal*, vol. II, Ed. Jadu-Nath Sarkar, Dacca, 1972.

*HSL* — *A History of Sanskrit Literature*, S. N. Dasgupta, Calcutta, 1962.

*IA* — *Indian Antiquary*.

*IPSS* — *Indian Pandits in the Land of Snow*, Sarat Chandra Das, Calcutta, 1965.

*JASB* — *Journal of the Asiatic Society of Bengal*.

*JBORS* — *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*.

*ORC* — *Obscure Religious Cults*, S. B. Dasgupta, Calcutta, 1946.

*Shastri-Cat*. — *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal*.

*SM*-I — *Sādhanamālā*, vol. I, Ed. Benoytosh Bhattacharyya, Baroda, 1968.

*SM*-II — *Sādhanamālā*, vol. II, Ed. Benoytosh Bhattacharyya, Baroda, 1968.

*Tāranātha* — *History of Buddhism*, Tāranātha, Ed. Debiprasad Chattopadhyaya, Calcutta, 1980.

*2500 years* — *2500 years of Buddhism*, Ed. P. V. Bapat, New Delhi, 1976.

# প্রারম্ভ-বচন

শিক্ষিত বাঙালির কাছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নামটি অপরিচিত নয়। 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' পুথি আবিষ্কার ও প্রকাশের ফলে বাংলা তথা পূর্ব-ভারতীয় প্রান্তিক ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের পরিধি পাঁচ-সাতশো বছর পিছিয়ে গেছে। এই ঘটনাটুকুতে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়েছে।

কিন্তু এ পরিচয় বাইরের সাইনবোর্ডে লেখার মতো। স্বীয় মনীষার ও বৈদগ্ধ্যের কৃতিত্বের জন্যেও শাস্ত্রীমহাশয় বাঙালির কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন ও সুদীর্ঘকাল থাকবেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মনীষার ফল আমরা নানা রূপে ও রসে পেয়েছি। তিনি সরস অনুবাদ করেছেন, সরস গল্প ও কাহিনী লিখেছেন, সহজ সবল সরস রীতিতে ইতিহাস সাহিত্য ও ভারততত্ত্বের বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করেছেন। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির পক্ষে বহুমূল্য প্রচুর উপাদানও তিনি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করে গিয়েছেন। তা ছাড়া বাংলা ভাষার রীতি বিষয়েও তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি কিছু নূতন আলোকপাত করেছে। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে হরপ্রসাদের মনীষার এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট মনে করি। তার বেশি যিনি জানতে চাইবেন তাঁকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা-সংগ্রহ রূপ হ্রদে— যা আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী বন্ধন করতে উদ্যত হয়েছে— ডুব দিতে হবে। কিন্তু সে কাজে কতজন অগ্রসর হবেন তা জানি না। মাঝে মাঝে এক-আধ জন ডুবুরি মিললেও আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। গভীর পাণ্ডিত্য সকলকে টানতে পারে কিন্তু তা সাহস যোগায় দু-একটিকে।

ভারততত্ত্বের নানাবিষয়ে অনেক সম্ভাব্য গবেষণার সূত্র ছড়িয়ে আছে শাস্ত্রীমশায়ের রচনায়। তা খুঁজে নিয়ে যদি কোনো গবেষক পণ্ডিত শাস্ত্রীমশায়ের ক্ষেত্রে লেখনী কর্ষণ করেন তবে তাঁর শ্রম সফল হবে। মোটা ফসল পেতে পারেন তিনি এই আমি মনে করি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাবলী বকেয়া পাঁজি নয়। তাতে ডাকের বচন প্রায় আগাগোড়া ছড়িয়ে আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যক্তি-পরিচয় তাঁর পাণ্ডিত্য-বৈদগ্ধ্যের পরিচয়ের তুলনায় কম উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পণ্ডিতের বংশধর। তিনি নিজে খুব বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক বড়ো পণ্ডিতের তুলনায় তিনি অসামান্য ছিলেন। তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়েছিল টোলে। কিন্তু তার পর শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি কলেজে। তিনি ছিলেন এম. এ পাস পণ্ডিত। তাই তিনি সংস্কৃত জ্ঞান ও ইংরেজি বিদ্যা দুইই যুগপৎ আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। বিদ্যানদীর দুকূলচারী হয়েছিলেন বলেই তিনি সমসাময়িক পণ্ডিত ও বিদ্বান্‌মণ্ডলীর মধ্যে সমুন্নত হতে পেরেছিলেন। এখানে তাঁর কিছু তুলনা চলে এক-মাত্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে। কৃষ্ণকমল তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন। কৃষ্ণকমলের মন সর্বদা বিদ্যারসে অভিষিক্ত থাকত না। এবং তিনি আইন শিখে ও মাঝে মাঝে ওকালতি করে দু নৌকো চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। কৃষ্ণকমলের বিদ্যা ও মনীষা তাই ফলপ্রসূ হতে পারে নি। আরো মিল আছে হরপ্রসাদের কৃষ্ণকমলের সঙ্গে। দুজনেই বাল্যকালে বিদ্যাসাগরের স্নেহ পেয়েছিলেন এবং দুজনেই স্কুল-কলেজের পাঠ সংস্কৃত কলেজে শুরু ও শেষ করেছিলেন। কৃষ্ণকমল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো আচরণ করতেন না, হরপ্রসাদের আচার-ব্যবহার যথাসম্ভব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো ছিল।

সে সময়ে আরো তো কিছু কলেজে পড়া সংস্কৃতের এম. এ. ছিলেন। তাঁরা তো কেউ হরপ্রসাদের পথ ধরেন নি। তার কারণ কী?

তার কারণ আছে। হরপ্রসাদ এম. এ. পাস করবার পরই রাজেন্দ্র-লাল মিত্র মহাশয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল আমাদের দেশে প্রথম ভারততত্ত্ববেত্তার সম্মানমুকুটের অধিকারী। আমাদের দেশে আধুনিককালে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় অগ্রণী ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি যখন নেপালে প্রাপ্ত পুথি নিয়ে সংস্কৃতে— অল্পবিস্তর প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায়— লেখা মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের বিবরণ লিখতে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর অসুস্থতার দরুন ভালো সহকারীর আবশ্যক হয়। অনুকূল দৈব সংঘটনায় সেই কাজে রাজেন্দ্রলাল হরপ্রসাদকে গ্রহণ

করেছিলেন ( ১৮৭৮ খৃ. )। হরপ্রসাদ তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। মিত্র ও শাস্ত্রীর এই যুক্ত প্রচেষ্টার ফল *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* ( ১৮৮২ খৃ. )। যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অধিকারী তাঁরা এই বইটির নাম অবশ্যই অবগত আছেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গাথা ধরনের কবিতার বস্তু এই বইখানি থেকেই নেওয়া।

রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে হরপ্রসাদ বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবেশের চাবিকাঠি পেলেন। পুঁথি-সমুদ্রেরও সন্ধান পেলেন। রাজেন্দ্রলালের একটা বড়ো কাজ দেশের চার দিকে ছড়ানো সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ। এই কাজ কেন, রাজেন্দ্রলালের সব কাজই করা হয়েছিল কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে। এই কাজে— পুঁথির অনুসন্ধান ও তার বিবরণ প্রকাশে— হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের কাছে দীক্ষা পেয়েছিলেন। এই পথেই হরপ্রসাদের মনীষা সার্থক হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে যে সংস্কৃত পুঁথির বিবরণগুলি তিনি সংকলন করেছিলেন— তাঁর পুঁথি সংগ্রহের এবং সেগুলির আলোচনার ক্ষেত্র ছিল খুবই সুবিস্তীর্ণ— বৈদিক গ্রন্থ থেকে ঊনবিংশ শতকের বই পর্যন্ত। তাঁর *Descriptive Catalogue* গুলিতে যে দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া আছে সেগুলি একত্রে সমাহার করলে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের বিরাট ইতিহাস পাওয়া যায়। এই ভূমিকাগুলির মধ্যে আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণার বস্তু প্রচুর মিলবে।

এইভাবে হরপ্রসাদ বৌদ্ধবিদ্যায় প্রবেশ লাভ করে ও সংস্কৃত পুঁথির আলোচনা করে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন তার জন্যই প্রধানত তিনি সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিক উন্নতশীর্ষ। বৌদ্ধশাস্ত্রের— বিশেষ করে মহাযান দর্শন ও তান্ত্রিক সাহিত্য আলোচনার ফলে তাঁর ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়েছিল। আর সংস্কৃত পুঁথির সাগর মন্থন করায় তাঁর ইতিহাসবোধ গভীর ও সূক্ষ্ম হয়েছিল। তিনি ইতিহাসের বই পড়ে ঐতিহাসিক হন নি, পুঁথি ঘেঁটে প্রাচীন দলিল হাতড়ে, নানা দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ক্রিয়াকর্ম আচার-ব্যবহার অনুধাবন করে তাঁর ইতিহাসজ্ঞান মজ্জাগত হয়েছিল। এইজন্যে বাঙালি ঐতিহাসিকদের মধ্যে অগ্রণী রাজেন্দ্রলাল

মিত্রের পরেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম, এবং পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকের নামমালায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সর্বাগ্রগণ্য। পরবর্তীকালের ভারত-তাত্ত্বিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা সকলেই তাঁর শিষ্য অথবা ভাবশিষ্য। যেমন, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নিখিলনাথ রায় ইত্যাদি।

রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ ছাড়া আর কাউকে ঠিক ভারততাত্ত্বিক (Indologist) বলা চলে না। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলন যিনি না করেছেন তিনি ভারততাত্ত্বিক নন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধিকার ছিল সংস্কৃতে ও বাংলায়, তা ছাড়া তিনি প্রত্নতত্ত্বেরও অনুশীলন করেছিলেন। হরপ্রসাদ সংস্কৃত খুব ভালো জানতেন, পালি-প্রাকৃত বেশ ভালো জানা ছিল, অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠও অনুশীলন করে-ছিলেন, বাংলায় অগাধ অধিকার ছিল। তা ছাড়া হিন্দি, রাজস্থানি, গুজরাটি ও মৈথিলিও জানতেন। প্রত্নতত্ত্বেও তাঁর ঔৎসুক্য ছিল। এই দিক দিয়ে তাঁর কেউ জুড়ি ছিল না।

পুঁথি ঘেঁটে হরপ্রসাদ এমন অনেক পণ্ডিত মনীষীর পরিচয় আবিষ্কার করেছেন যাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নামটিতে পর্যবসিত ছিল। যেমন রায়মুকুটমণি বৃহস্পতি। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের লোক, সম্ভবত তৃতীয় পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দেশের রাজার বা সুলতানের মহামন্ত্রীর মতো ছিলেন বলে ইনি উপাধি পেয়েছিলেন 'রায়মুকুটমণি', সংক্ষেপে 'রায়মুকুট'। বৌদ্ধ ও যোগী তান্ত্রিকদের অনেক মূল্যবান্ পুঁথি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করে ভারততত্ত্বের একটা বিশিষ্ট অংশের তিনি পত্তন করে গেছেন বললে কিছুমাত্র অনুচিত হয় না। এই-সব পুঁথি অবলম্বন করে শাস্ত্রীমহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ডকটর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর অমূল্য গ্রন্থ দু খণ্ড 'সাধনমালা' প্রকাশ করে গেছেন। 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'র মূল্য তো সকলেই মোটামুটি জানেন। অপর বহু বিচিত্র প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কারের মধ্যে আমি শুধু তিনটি বইয়ের উল্লেখ করব। সৌন্দরনন্দ-কাব্য, রামচরিত ও কীর্তিলতা। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ-কাব্যের কোথাও কোনো উল্লেখমাত্র ছিল না। বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে কাব্যটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি থাকায়

পণ্ডিতেরা সৌন্দরনন্দ-কাব্যের অস্তিত্ব জানতে পারেন। সর্বানন্দ বাঙালি ছিলেন। বোঝা গেল যে অশ্বঘোষের এই কাব্যটি অন্যত্র লুপ্ত হলেও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। এই কাব্যের পুথি হরপ্রসাদ আবিষ্কার করেছিলেন নেপালে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় (১৯১০ খৃ.)। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অতিশয় মূল্যবান্ সংযোজন। রামচরিত কাব্যের পুথিও হরপ্রসাদ পেয়েছিলেন নেপালে। বইটি একটি অদ্ভুত রচনা। দ্ব্যর্থ কাব্য। শ্লোকগুলির এক অর্থে পাই রামচন্দ্রের সীতা-উদ্ধার কাহিনী, অপর অর্থে পাই রামপালদেবের পিতৃভূমি বরেন্দ্রী বিপক্ষহস্ত থেকে উদ্ধারের কাহিনী। বইটি বাংলা দেশে লেখা প্রথম ইতিহাসের— বলতে পারি সমসাময়িক ইতিহাসের— বই। গ্রন্থকার সন্ধ্যাকর-নন্দীর পিতা প্রজাপতি-নন্দী রামপালদেবের মহাপাত্র ছিলেন। কীর্তিলতার পুথিও নেপালে লব্ধ। অনেক দিক দিয়ে বইটি মূল্যবান্। প্রথমত, বইটির রচয়িতা বিদ্যাপতি। দ্বিতীয়ত, বিষয় প্রায় সমসাময়িক ইতিহাস— কবির পোষ্টার বংশের। তৃতীয়ত, বইটি অবহট্‌ঠ ভাষায় লেখা। এই অবহট্‌ঠ ভাষা থেকে মৈথিল ভাষা এসেছে, বাংলা ভাষাও এসেছে। এই দুই ও অন্যান্য পূর্বপ্রান্তীয় ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস জানবার পক্ষে কীর্তিলতা একরকম অপরিহার্য বলা যায়। কীর্তিলতার মতো আরো একটি মূল্যবান্ পুস্তকের পুথির আবিষ্কার হরপ্রসাদ করেছিলেন নেপালে। এটি হল 'বর্ণনরত্নাকর'। রচয়িতা জ্যোতিরীশ্বর ছিলেন মিথিলার রাজা হরিহরসিংহদেবের মন্ত্রী (চতুর্দশ শতাব্দী)। বইটি মৈথিল ভাষায় লেখা, গদ্যে। পূর্বপ্রান্তীয় ভারতীয় আর্যভাষায় গদ্যের পদক্ষেপ এখানেই প্রথম মিলল। বইটি এশিয়াটিক সোসাইটির Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়েছে (১৯৪০ খৃ.) পণ্ডিত বাবুআ মিশ্র ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনে। সুনীতিবাবু যে দীর্ঘ মূল্যবান্ ভূমিকাটি দিয়েছেন তা ভারতীয় ভাষা-বিদ্যার ছাত্র ও শিক্ষকদের অবশ্যপাঠ্য।

ভারততত্ত্বের বাইরে হরপ্রসাদের মনীষার ও বৈদগ্ধ্যের বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বাংলা রচনার স্টাইলে। বাংলা লেখায় তাঁর গুরু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাজেন্দ্রলালের সাহচর্য পাবার আগেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের

স্নেহলাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের প্রতিবেশী ছিলেন বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা তাঁর এতটাই আয়ত্ত হয়েছিল যে তাঁর 'কাঞ্চনমালা' নামে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাটি অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বলে ভুল করেছিল। ( গল্পটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন বঙ্গদর্শনে প্রায়ই লেখকের নাম উল্লিখিত হত না। এর কারণ ঠিক জানা যায় না। অনুমান হয়, লেখকের নাম অপরিচিত হলে পাঠকেরা তা উপেক্ষা করতে পারেন এই আশঙ্কা। ) শোনা যায়, কেন জানি না 'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনে ছাপা হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হন নি। (তখন সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মেজোদাদা সঞ্জীবচন্দ্র। এঁর সম্পাদকতায়ই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হরপ্রসাদের অধিকাংশ রচনা বার হয়েছিল। আমার বিশ্বাস হরপ্রসাদ সঞ্জীবচন্দ্রেরও স্নেহ ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন, এবং এই স্নেহ ও সাহচর্য তাঁর বাংলা লেখার রীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। হরপ্রসাদের স্টাইল যে সঞ্জীবচন্দ্রের রীতির বেশ কাছাকাছি তা তার মধ্য ও শেষ জীবনের লেখা থেকে বোঝা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে হরপ্রসাদ কোথাও কিছু লিখেছিলেন বলে জানি না। না লেখবার একটা কারণও অনুমান করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রকৃতি গোছালো ও সংযত ছিল না। তার ব্যবহার সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে সাংসারিক কারণ ঘটিত অপ্রসন্নতা তাই-ই ওঁদের প্রতিবেশীকে দুই ভাইয়ের মনান্তরের ইন্ধন যোগাতে দেয় নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তার বেশি হরপ্রসাদ বলতে পারতেন না বলেই হয়তো সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে উদাসীন রয়ে গেছেন। )

'কাঞ্চনমালা' পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীত না হবার কারণ কী তা বলা দুষ্কর। মনে হয়, তিনি হয়তো আশঙ্কা করেছিলেন যে গল্প লিখে হরপ্রসাদ নিজের পথ— ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ আলোচনা— থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশাসন মনে রেখেই বোধ হয় হরপ্রসাদ আর কোনো গল্প লেখেন নি। শেষের দিকে লিখেছিলেন 'বেনের মেয়ে' নিজস্ব রীতিতে নিজসৃষ্ট ইতিহাস-কল্পনা অবলম্বন করে। এই বইটির বিষয় বলতে পারি creative history।

'কাঞ্চনমালা' ও 'বেনের মেয়ে' বাদে হরপ্রসাদের প্রায় সব সাহিত্যরসমণ্ডিত রচনাই সংস্কৃত কবি ও কবিতার সানুরাগ সরস আলোচনা।

এই আলোচনায় কালিদাসই একচ্ছত্র। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এমন গভীর ও ব্যাপকভাবে কালিদাসের রচনার সৌন্দর্য বিচার করেন নি। সমসাময়িক পণ্ডিত-রসিকদের মধ্যে হরপ্রসাদের অনন্যতা এই বিষয়টিতে পরিস্ফুট।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার সম্পর্কে হরপ্রসাদের মনোভাবের কথা বলি। বর্ধমানে ( ২০ চৈত্র ১৩২১ বঙ্গাব্দ ) অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রধান সভাপতি রূপে হরপ্রসাদ যে অভিভাষণ রচনা করেছিলেন সেটি তাঁর ইতিহাস জ্ঞানের ও ইতিহাস বোধের জাজ্বল্যমান শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গৃহীত হয়েছে। সেই সম্মিলনে হরপ্রসাদ সাহিত্য-শাখার সভাপতিও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং তখন দেশেই আছেন। তবুও তিনি সাহিত্য সম্মিলনে আসেন নি দেখে অনেকে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাতেও বিশেষ কিছু হত না যদি হরপ্রসাদ সাহিত্যশাখার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির গুরুত্বকে চুটকি রচনার মর্যাদাদান বলে তুচ্ছ না করতেন। হরপ্রসাদের উক্তিতে রবীন্দ্র-অনুরাগীরা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর 'অ !' কবিতাটি পরের মাসে প্রবাসীতে বার হয়ে হরপ্রসাদের খ্যাতিকে সাময়িকভাবে তিমিরাবৃত করেছিল। অথচ একদা হরপ্রসাদ রবীন্দ্র-রচনার গুণাবলি সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। তার বিলক্ষণ সাক্ষ্য রয়েছে সাবিত্রী লাইব্রেরিতে প্রদত্ত (১২৮৭ বঙ্গাব্দ, সংযোজন ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ) তাঁর অভিভাষণে। ( এই প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্মিলনের ভাষণে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি ইঙ্গিতের একটা ব্যাখ্যা আমার মনে এসেছে তা বলে দিই। হরপ্রসাদ চলতি কথার পক্ষপাতী ছিলেন। এই পক্ষপাতের ফলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতা-গানগুলিকে চুট্‌কি রচনা বলেছিলেন। এই শব্দটি ব্যবহার না করলে অতটা গোলমাল হত না।)

বাংলা রচনায় গোড়া থেকেই হরপ্রসাদের একটু বিশেষ ক্ষমতা (flair) ছিল। পণ্ডিত তিনি, সাধুভাষায় দখল তাঁর স্বতঃসিদ্ধ। সেই সঙ্গে তাঁর আসক্তি ছিল চলিত ভাষার শব্দে, কথ্যভাষার ইডিয়মে। এই দুইয়ের সহযোগ হরপ্রসাদের লেখন-শিল্পের প্রসাধন ঘটিয়েছে। সঞ্জীব-

চন্দ্রের লেখাতেও এই রকম পাই। তবে তাঁর লেখায় হরপ্রসাদের মতো মনোযোগের পরিচয় খুব নেই। এই স্টাইল-দীক্ষা যদি হরপ্রসাদ সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে পেয়ে থাকেন তবে বলতে হবে যে এ শিল্পে তিনি গুরুকে লজ্জায় ফেলেন নি।

বাংলা ভাষার বিষয়ে হরপ্রসাদ যে প্রবন্ধ ক'টি লিখেছিলেন তার মূল্য এখনো কম নয়। তাঁর মতো ভাষাজ্ঞান ও ভাষাবোধ নিয়ে কম লেখকই বাংলা লিখেছেন।

বছর কতক আগে হরপ্রসাদের রচনাবলী সংকলন আরম্ভ করেছিলেন এক প্রকাশক। সম্পাদক ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সুনীতিবাবু হরপ্রসাদের অনুরাগী ছিলেন। হরপ্রসাদও সুনীতিবাবুকে স্নেহ করতেন। সুনীতিবাবুর বিরাট কীর্তিগ্রন্থ *Origin and Development of the Bengali Language* যখন প্রকাশিত হয় (১৯২৬ খৃ.) তখন দেশের কোনো বিদ্বজ্জনসভায় কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। না বিশ্ববিদ্যালয় না সাহিত্য পরিষৎ না এশিয়াটিক সোসাইটি— কোথাও সুনীতিবাবুকে সংবর্ধনা করা হয় নি। এ কাজ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি তাঁর পটলডাঙার বাড়িতে একদিন বিকালবেলায় সুনীতিবাবুকে সংবর্ধিত করার জন্যে At Home-এর আয়োজন করেছিলেন। সুনীতিবাবুর বন্ধু ও অনুরাগীরাই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রচুর জলযোগ করিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। তাঁর এই কাজ যে বাঙালি জাতির মুখ রক্ষা করেছিল তা এতদিন পরে বুঝতে পারছি।

সুনীতিবাবুর সম্পাদকতায় দুখণ্ড 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' বার হবার পর প্রকাশক তা বন্ধ করে দেন। এতদিন পরে শাস্ত্রীমহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত গবেষণা-কেন্দ্র হরপ্রসাদ-রচনাবলীর সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে লেগেছেন। উপস্থিত গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড। এই কাজে মনে প্রাণে লেগে আছেন ডক্টর অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী। এঁর এবং এঁর উপযুক্ত সহকারী ও সহযোগীদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমই এই বিরাট কাজ সফল করতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ না করলে এ কাজে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া যেত না। শ্রীমান্ সত্যজিৎ

ও তাঁর সহকারী-সহযোগীদের ধন্যবাদ দেওয়া সাজে না। এ কাজে তাঁদের গভীর অনুরাগ ও আগ্রহ ধন্যবাদ দিলে খেলো করা হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে কেননা তাঁরা সর্বদাই জনগণের (এবং বিদ্বজ্জনগণের) সমর্থন প্রত্যাশা করেন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের লেখায়— হস্তলিপিতে ও ছাপায় চলিত শব্দের অনেক রকম বানান দেখা যায়। আমাদের এই সংস্করণে যথাসাধ্য সে বৈচিত্র্য কমিয়ে এনে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। এই দিকে তাঁরও আগ্রহ ছিল। তদ্ভব শব্দের বানানে ঐক্য আনতে রবীন্দ্রনাথও সমর্থ হন নি। কেউ কখনো সমর্থ হবেন বলে মনে হচ্ছে না।

এখন আশা করব যে অপর খণ্ডগুলিও যথাকালে প্রকাশিত হয়ে আরব্ধ কাজটি সুসম্পন্ন হয় আর উপস্থিত খণ্ডটি পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করে।

কলিকাতা
২. ৩. ৮০

শ্রীসুকুমার সেন

# ভূমিকা

হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১ খৃ.) রচনাবলী প্রত্ন-সামগ্রী নয়। আধুনিক মনীষার বিকিরণে, মননের ব্যাপ্তিতে, সাহিত্যিক উৎকর্ষে তাঁর রচনা আমাদের প্রয়োজনীয় অপরিহার্য উত্তরাধিকার, আমাদের সচল ঐতিহ্যের অঙ্গ। আপন কালের অনিবার্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বদেশ-জিজ্ঞাসায় তিনি একটা যুক্তিযুক্ত, বিচারবুদ্ধি-নির্ভর অবস্থানে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। বিষয় যাই হোক, তাঁর রচনার বুননিতে ফুটে ওঠে যুক্তি-পরায়ণ মনের দীপ্তি। বিবেচ্য বিষয়কে তিনি যুগ বিশেষের সামাজিক শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব-বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন। বক্তব্যের ভিত রচনা করেন বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে। সে তথ্যের বেশিরভাগ তাঁরই আবিষ্কার, তাঁর জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল। শুধু রাজশক্তির ওঠাপড়ার বিবরণকে তিনি প্রকৃত ইতিহাস মনে করতেন না। "যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতকগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল,..."[১]— সেই রাজবংশাবলীর হিশাব-নিকাশে দেশের জনবৃত্তের আবহমান জীবন-যাত্রার, ধ্যান-ধারণার আবর্তন-বিবর্তনের পরিচয় অগোচর রয়ে যায়। এই বিশ্বাসে তিনি আজীবন অবিচলিত নিষ্ঠায় কৃষি ও কারু উৎপাদনের, ভাষা বিকাশের, শিল্প-সাহিত্যের বিবর্তনের, জনজীবনে আচরিত ধর্মের রূপ-রূপান্তরের বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ এবং বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কোথাও কোথাও চিন্তার স্বতোবিরোধ ও পিছুটান এবং তথ্য বিচারে, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও সামগ্রিক ইতিহাস-তত্ত্বের বোধের দিক থেকে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের দিক থেকে তাঁর রচনাবলী আমাদের স্বদেশ-চর্চায় আজও একান্ত প্রাসঙ্গিক। কোনো দেশেই বুদ্ধির মুক্তি এবং শুদ্ধ চৈতন্যের স্বাবলম্বন অকস্মাৎ কারো আয়ত্তে এসে যায় না। অর্জিত হয় বহু মনীষীর

১. "আমাদের ইতিহাস", ৬ অনুচ্ছেদ।

পরম্পরাগত আয়াসে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের চাপে অষ্টাবক্র দশা-গ্রস্ত ভারতীয় বাস্তবতায় এ মুক্তি, এ স্বাবলম্বন অর্জন স্বভাবতই আরো দুরূহ। আজও আমাদের সামাজিক জীবনে এবং জ্ঞানচর্চায় বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি ও অনাবিল যুক্তিবুদ্ধির উপরে নির্ভরতার পথে বাধা দুস্তর। নানা সংকীর্ণতার, সংস্কারের জড় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসার দুঃসাধ্য করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পরম্পরায় আধুনিক চেতনা বিকাশের একটা পর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একালেও তিনি আমাদের অনেকদূর পর্যন্ত সাহায্য করতে পারেন।

২

বাংলার এক প্রাচীন পণ্ডিত বংশে তাঁর জন্ম ( ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩ খৃ., ২২ অগ্রহায়ণ ১২৬০ বঙ্গাব্দ )। সাতপুরুষ আগের রাজেন্দ্র বিদ্যা-লংকারের ( আ. সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ) সময় থেকে এঁদের বংশের ধারাবাহিক নির্ভরযোগ্য পরিচয় জানা যায়।[২] এঁরা ছিলেন বিদ্যাজীবী ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠাবান্, কিন্তু গোঁড়ামি মুক্ত। দেশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ বংশের কারো কারো জীবনে কুলাচার অগ্রাহ্য করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন কুলীনের বংশধর রাজেন্দ্র বিদ্যালংকার অকুলীন ঘরে বিয়ে করে কুলভঙ্গ করেন। হরপ্রসাদের প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণও অকুলীন ঘরে বিয়ে করেছিলেন।

রাজেন্দ্র বিদ্যালংকার তাঁর সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। যশোর জেলার নলডাঙার রাজা তাঁকে সভাপণ্ডিতের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর পর থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিদ্যাচর্চায় এঁদের প্রতিষ্ঠা ক্রমেই বেড়েছে।

শাস্ত্রীমশায়ের প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ (মৃত্যু আ. ১৮০৯ খৃ ) ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পরে খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামের ভদ্রাসন ছেড়ে এসে কলকাতার ৩৮ কিলোমিটার উত্তরে নৈহাটিতে বসবাস

২. Dr. B. Bhattachrayya. *Our Ancestry*, Baroda 1943 ; শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য, নৈহাটীর ভট্টাচার্য্য বংশ, নৈহাটী ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

শুরু করেন। কুমিরায় তাঁর প্রতিষ্ঠা কিছু কম ছিল না। পাণ্ডিত্যের সমাদর করে যশোর-খুলনার দাঁতিয়া, নূরনগর, সর্পরাজপুরের জমিদাররা তাঁকে অনেক জমিজমা দেন। তবুও কালের পরিবর্তনে এই অঞ্চলের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তিনি কলকাতার কাছাকাছি বাস তুলে নিয়ে এলেন। মাণিক্যর দূরদৃষ্টির ফলে তাঁর উত্তরপুরুষরা কলকাতার নতুন বিদ্যাচর্চার এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছেন। নৈহাটিতে টোল প্রতিষ্ঠা করে মাণিক্য কষ্টে দিন যাপন করতেন। নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষায় তাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে হালিশহরের সাবর্ণ সন্তোষ রায়চৌধুরী এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে ব্রহ্মোত্তর জমি দান করায় বিত্তগত প্রতিষ্ঠাও সুনিশ্চিত হয়। তিনি প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র প্রতিপালন করতেন। সমকালীন পণ্ডিত সমাজে তাঁর রচিত 'পত্রিকা' বা নব্যন্যায়ের কূট প্রশ্নের সমাধানগুলির সমাদর ছিল। এই সমাধান আয়ত্ত করবার জন্য বাংলা দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে ছাত্র আসত। মাণিক্য কলকাতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর ( ১৭৪৬-৯৪ খৃ. ) বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন, বিচারের কাজে হিন্দু আইনের ব্যাখ্যায় জোন্স তাঁর সাহায্য নিতেন। মাণিক্য তর্ক-ভূষণের বাড়ির টোলের প্রভাব সম্পর্কে রমাপ্রসাদ রায় ( ১৮১৭-৬২ খৃ. ) ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন, "At this moment I believe one half of the real Sanskrit celebrities in this country are students of his [নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুর] ancestors··· ।"

মাণিক্যর ছয় ছেলেই পারিবারিক ধারায় বিদ্যাচর্চা করেন। তৃতীয় শ্রীনাথ তর্কালংকার ( মৃত্যু আ. ১৮০৮ খৃ. ) মেধায় প্রখর এবং স্বভাবে একরোখা মানুষ ছিলেন। পণ্ডিত সভায় তর্কযুদ্ধে তাঁর মেধা ও স্বভাবের খরতা প্রকাশ পেত। তিরিশ পেরোবার আগেই শ্রীনাথের অপমৃত্যু হয় দস্যুদের হাতে। তাঁর ছেলে রামকমল ন্যায়রত্ন ( মৃত্যু ১৮৬১ খৃ. ) কাকা-জেঠাদের যত্নে বাড়ির টোলে পড়াশুনো করে সেই পুরুষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। রামকমলের ছয় ছেলে নন্দকুমার, রঘুনাথ, যদুনাথ, হেমনাথ, শরৎনাথ ( হরপ্রসাদ ) এবং মেঘনাথ।

হরপ্রসাদের বড়োদাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু-তর্করত্ন ( ১৮৩৫-৬২ খৃ. )

দাদামশাই রামমাণিক্য বিদ্যালংকারের শিক্ষার গুণে এবং অসামান্য মেধায় খুব অল্প বয়সে পাণ্ডিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে প্রৌঢ় পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণিকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দেশের পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃতি পান। তরুণ পণ্ডিতের প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর ( ১৮২০-৯১ খৃ. ) তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ( প্রতিষ্ঠা ১৮২৪ খৃ. ) অধ্যাপনার কাজ দেন ( ১৮৫৬ খৃ. )। একটি প্রশংসাপত্রে বিদ্যাসাগর-মশায় নন্দকুমার সম্পর্কে লিখেছিলেন, "Pandit Nanda Kumar is a young man of extraordinary telents. He distinguished himself at a very early age in that most abstruse branch of Sanskritic studies the Nyaya or Logic. He has also acquired a very considerable knowledge of the Sanskrit Language and Literature— a qualification rarely to be met with amongst Sanskrit logicians.

"He has lately commenced to study the English Language and Literature and I have no doubt that he will soon make himself a respectable scholar."

নন্দকুমার কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কাজ করার পরে বিদ্যাসাগরমশায়ের সুপারিশে কান্দী স্কুলে হেডপণ্ডিত হয়ে যান। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, 'বৈশেষিক-সূত্র' সম্পাদনায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে সাহায্য করেন।

দেশে বৃটিশ শাসন জমাট হয়ে ওঠার ধাপে ধাপে ক্রমে সংস্কৃত-আরবি-ফারসি আশ্রিত আবহমান বিদ্যাচর্চার ধারা অবসিত, তাৎপর্যহীন হয়ে গেল। বিদ্যাজীবী পণ্ডিতদের সামাজিক প্রতিপত্তি লোপ পেল। ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত আইনে এই-সব পণ্ডিত পরিবারের আর্থিক ভিত্তিও ভেঙে গেল। ইংরেজ রাজত্বে আবহমান সংস্কৃতবিদ্যা-চর্চার পরিণতি সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু দিন পর্যন্ত ভট্টাচার্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য ; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিক দিন থাকিবে না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদির পর যে সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন, সকলেই জানে যে,

তাঁহারা উক্ত মহাত্মাদিগের অপেক্ষায় অনেক অনেক অংশে নিকৃষ্ট ; তাহার পর আরো নিকৃষ্ট, তাহার পর আরো নিকৃষ্ট। শেষ এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে, 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র ভূমিকায় খ্যাতনামা ৺জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন মহাশয় বলিলেন যে, ভট্টাচার্যগণ চারি পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের ৬৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্যদিগের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।"[৩] আক্ষেপের কারণ থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতির অনিবার্যতা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা প্রভাবিত আধুনিকতার ফলাফল বিচার করে জীবনের শেষে শাস্ত্রীমশায় ভাবতেন, সংস্কৃত-আরবি-ফারসি আশ্রিত দেশীয় বিদ্যাচর্চার ধারাকেই আধুনিক পর্যায়ে আনা যেত, যদি বৃটিশ সরকার বাধা না দিত। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ১৯২৮-এ লাহোর ভাষণে বলেন, "The mischief in relegating Sanskrit (and Arabic) culture to a secondary place, and in not, modernising it (like what has been done in the mediæval universities of Europe with the Latin culture) has been great."[৪] এই 'দুষ্কৃতির' মূল টমাস ব্যাবিংটন মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব ( ১৮৩৫ খৃ. ) সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন। সত্য তবুও সত্যই। আমাদের ইতিহাসে সমাজের ভেতর থেকে স্বাভাবিক উদ্বর্তনে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় নি। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নীতিই ছিল পরম্পরাগত সামাজিক বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটানোর মতো কোনো শক্তির অভ্যুদয় রোধ করা। এই নীতির নিপুণ রূপায়ণের ধাপে ধাপে পুরানো কারু-উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়, কৃষি-উৎপাদনের আয় শুষে নেবার বিধি-ব্যবস্থা পাকা করে তোলা হয়। দেশের উৎপাদন সম্পর্কের স্তরে, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দেশজ আধুনিকতার বিকাশ

৩. "বাংলা সাহিত্য : বর্তমান শতাব্দীর", ৬ অনুচ্ছেদ।

৪. *Sanskrit Culture in Modern India*, Presidential Address, Fifth Indian Oriental Conference, Lahore 1928, p. 23.

সম্ভব করে তোলার মতো কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। কী করে আর প্রাচীন বিদ্যার ধারা আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হবে।

অন্য দিকে সাম্রাজ্যিক-বাণিজ্যিক প্রশাসনের নতুন কেন্দ্র কলকাতায় বিচক্ষণ মানুষেরা ভিড় করে এসেছে জীবিকার সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে। তাদের পুঁজি ইংরেজি বিদ্যা। হেয়ার সাহেবের পালকির পেছনে 'me poor boy, have pity on me, me take in your school' বলতে বলতে বালক দলের ছুটে চলার বিবরণে শিবনাথ শাস্ত্রী সেকালের মধ্যবিত্ত মানসিকতার একটি চমৎকার প্রতীক তুলে ধরেছেন।[৫] বৃটিশ শাসন স্থায়ী ও নির্বিঘ্ন করে তোলার প্রক্রিয়ায় উপজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজি বিদ্যা সম্বল করে জীবন ও জীবিকার, ধ্যান-জ্ঞানের নতুন জমিতে এসে দাঁড়ালেন। এ প্রবণতা রোধ করার প্রশ্ন ওঠে নি, বরং 'চিন্তাশীল ব্যক্তি' মাত্রেই বুঝেছিলেন, অবধারিত পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়াই সমীচীন। বিদ্যাসাগরমশায় তাই সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়া আবশ্যিক করেন (১৮৫৩ খৃ.)। পুরানো ধারার পণ্ডিত তৈরি করায় তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা য়ুরোপীয় জ্ঞানের আলোয় আবহমান ভারতীয় বিদ্যার মূল্যায়ন করতে শিখবে, প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ে সমর্থ হবে, মুক্তদৃষ্টি মননের অধিকারী হয়ে উঠবে। বিদ্যাসাগরমশায়ের সঙ্গে নন্দকুমারের যোগাযোগ হরপ্রসাদের জীবনের দিক থেকে খুব তাৎপর্যময়। তাঁরই পরামর্শে নন্দকুমার ইংরেজি শেখেন এবং এই সূত্রে এঁদের পরিবারে ইংরেজি-চর্চার সূত্রপাত হয়।

১৮৬১-৬২-র মধ্যে পর পর রামকমল এবং নন্দকুমারের মৃত্যু হওয়ায় এঁদের পরিবার দুর্গতির মধ্যে পড়ে। হরপ্রসাদের 'এ বি সি শিক্ষা কান্দীর স্কুলেই হয়' ৮/৯ বছর বয়সে। তখন তাঁর নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য। একবার কঠিন অসুখে শিবের প্রসাদে সেরে ওঠায় নতুন নামকরণ হয় হরপ্রসাদ। দাদার মৃত্যুতে কান্দী থেকে চলে আসতে হল। উপার্জনহীন, অভিভাবকহীন পরিবারের ছেলেদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ভালো ছিল না। ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগর-

৫. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৯৭৬, পৃ. ২৬০।

মশায় তাঁকে নিজের বাড়ির ছাত্রাবাসে এনে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। এইভাবে হরপ্রসাদ বিদ্যাসাগরমশায়ের সংস্পর্শে এলেন এবং এ সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়েছে। প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও বিদ্যাচর্চায় তিনি বিদ্যাসাগরমশায়ের উপরে নির্ভর করতেন এবং বরাবর সম্পর্ক রাখতেন— এমন প্রমাণ আছে। হরপ্রসাদের মানসিক গঠনে, সাহিত্য-রুচিতে, জ্ঞান-দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের প্রভাব গভীর।

১৮৬৬ থেকে ৭৭ পর্যন্ত কৃতিত্বময় ছাত্র-জীবনে শাস্ত্রীমশায় পড়া-শুনো করেন মূলত সংস্কৃত কলেজে এবং অংশত প্রেসিডেন্সি কলেজে। সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যক্ষ হিশাবে পান প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ( ১৮২৫-৮৭ খৃ. ) এবং মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে ( ১২৪২-১৩১২ বঙ্গাব্দ )। প্রসন্নকুমার ইংরেজি এবং সংস্কৃত বিদ্যায় সমান পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর প্রভাবে এবং ব্যবস্থাপনায় ছাত্ররা দুই ধারা থেকে মানসিক পুষ্টির সুযোগ পেত। মহেশচন্দ্র টোলে পড়া পণ্ডিত হলেও ইংরেজি জানতেন, পূর্বতন অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাওয়েল-এর ( ১৮২৬-১৯০৩ খৃ. ) ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তাঁর আমলেও এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মিলিত ধারা ব্যাহত হয় নি। তা ছাড়া তখনকার সংস্কৃত কলেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্ররা ইংরেজি বিষয়গুলি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের য়ুরোপীয় বিদ্যাচর্চার পরিবেশের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ থাকত। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হলেও হরপ্রসাদকে বি. এ. পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সির ছাত্র ধরা হয়, কারণ, প্রেসিডেন্সিতেই তিনি 'was for the most part taught.' তাঁর সময়ের সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬ খৃ ), যাঁর বিচক্ষণ সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' ( ১৮৫৮ খৃ. ) পত্রিকা সামাজিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে সেকালের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল। হরপ্রসাদের অধ্যাপকদের মধ্যে আর একজন কৃতী মানুষ রামনারায়ণ তর্করত্ন ( ১৮২২-৮৬ খৃ. )। সংস্কৃত সাহিত্যে মার্জিত রুচি-সম্পন্ন এই পণ্ডিত সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজ-বাস্তবতার উপাদানে সৃষ্টি তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪ খৃ. ) এবং 'নব-নাটক'-এ ( ১৮৬৬ খৃ. ) বাংলা নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলা ভাষা-চর্চা তাঁর দৃষ্টিতে, 'প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের

পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক…'। হরপ্রসাদের কালিদাস-চর্চা শুরু এই রামনারায়ণ তর্করত্নের কাছে।

বিদ্যাজীবী প্রাচীন পণ্ডিত বংশের ছেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতায় এই পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠেন। টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা-পদ্ধতিতে অর্জিত বিদ্যায় শাস্ত্রীমশায়ের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই চূড়ান্ত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তিময় সেই বিদ্যাচর্চার গণ্ডির মধ্যে থেকেও নন্দকুমার প্রথম ইংরেজির সংস্পর্শে আসেন। শাস্ত্রীমশায়ের মেজোদাদা রঘুনাথ ( মৃত্যু ১৮৯৭ খৃ.) এবং সেজোদাদা যদুনাথ ( মৃত্যু আ. ১৮৯৯ খৃ. ) সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে আর সংস্রব রাখেন নি। ইংরাজিতে দক্ষ রঘুনাথ কিছু দিন কবি মধুসূদন দত্তের ( ১৮২৪-৭৩ খৃ. ) কাছে তাঁর লেখক হিশাবে কাজ করেন। নতুন ধরনের জীবিকার সন্ধানে এঁরা দুজনেই বাংলার বাইরে চলে যান। ছোটোভাই মেঘনাথও ( ১৮৫৫-১৯১১ খৃ. ) জয়পুর মহা-রাজা কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক এবং উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে এঁদের পারিবারিক পরিবেশ এমনিভাবে দ্রুত বদলে গেল।

কুলব্রত থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে যাবার এই প্রবণতার মধ্যে ব্যতিক্রম হরপ্রসাদ এবং ব্যতিক্রমের কারণ তাঁর প্রতিভান্বিত চারিত্র। প্রতিভাশালী মানুষ মাত্রেই প্রতিভা ফলবান্ করে তোলার জন্যে সচেতন আয়াসে নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি গঠন করেন। সচেতন নির্বাচনে, গ্রহণ-বর্জনে আত্মবিকাশের পথ তৈরি করেন। স্কুল জীবনেই হরপ্রসাদ মেধার শক্তি অনুভব করতেন। ক্রমে ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রখর হয়। এ সচেতনতা মানুষকে আত্মস্থ করে, নিজের জীবনতত্ত্ব গঠনে সাহায্য করে। প্রতিভার সহজাত দায়িত্ববোধে জীবনের কৃত্য বিষয়ে সংকল্প গঠনের এই পর্যায়ে বংশগত পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকার বোধ তাঁর ব্যক্তিত্বের, মানস চরিত্রের শিকড়ের মতো কাজ করেছে। এরই টানে তাঁর চিন্তা-চেতনা স্বদেশের রিকৃথ-এর দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে মন নিয়ে প্রাচীন বিদ্যার জগতের, স্বদেশীয় সংস্কৃতির মর্ম জিজ্ঞাসায় নিবিষ্ট

হন, সে মন গড়ে উঠেছিল তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশের মনন-বিচ্ছুরণের প্রভাবে। এ মন বিচারশীল, যুক্তিপরায়ণ ; ইতিহাসবোধ এর মেরু। টোল-চতুষ্পাঠীর বিদ্যাচর্চার সঙ্গে তাঁর চর্চার তাই কোনো মিল নেই। বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষতার সময়ে যে ধরনের মানুষ তৈরির কথা ভেবে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতি আমূল সংস্কার করে এসেছিলেন, মনের চরিত্রের দিক থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সেই আদর্শের প্রতিরূপ বলা যায়।

'বঙ্গদর্শন' ( ১৮৭২ খৃ. ) পত্রিকার প্রভাবে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে নতুন যুগে উত্তীর্ণ হল। হরপ্রসাদ তখন সংস্কৃত কলেজের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৪৫-৮৬ খৃ. ) ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪ খৃ.) ইষ্টগোষ্ঠীর অন্যতম. বঙ্গদর্শনে লিখতেন। বাংলা দেশের প্রথম 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস'-এর[৬] লেখক রাজকৃষ্ণ তাঁর স্নেহভাজন হরপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সদ্য বি. এ. পাস হরপ্রসাদের গবেষণা নিবন্ধ 'ভারত-মহিলা' পড়ে এই তরুণের সাহিত্যিক প্রতিভায়, অবলোকনের বৈশিষ্ট্যে এবং গদ্য শৈলীর অনন্যতায় বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হন। 'ভারতমহিলা' তিনি বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করলেন ( মাঘ-চৈত্র ১২৮২ বঙ্গাব্দ )। হরপ্রসাদের পক্ষে এ এক দুর্লভ সুযোগ। ছাত্রবয়সেই তাঁর আরো কয়েকটি লেখা বঙ্গদর্শনে এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ( ১৮৪৫-১৯০৪ খৃ. ) 'আর্যদর্শন' ( ১৮৭৪ খৃ. ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর চাইতেন, সংস্কৃত কলেজে তৈরি ছেলেরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানে মার্জিত মন নিয়ে বাংলা সাহিত্যের যোগ্য লেখক হয়ে উঠবে। "যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই"[৭] — বঙ্গদর্শন প্রকাশের মূলে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতীতি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা-মন্ত্র ছিল, "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ; / বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?" তরুণ হরপ্রসাদের সৃজনপর

৬. প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা ১৮৭৪।
উদ্ধৃত মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের।

৭. 'বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮২।

প্রতিভা উন্মীলিত হয় এই ভাব-মণ্ডলে এবং ছাত্রবয়স পেরোবার আগেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হল।

৩

চব্বিশ বছর বয়সে হরপ্রসাদ যখন ছাত্রজীবন শেষ করে কলেজ থেকে বেরোলেন, কলকাতার জ্ঞানী-গুণী সমাজের দৃষ্টিতে তখনই তিনি একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। এই মনোভবের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত ( ১৮৪৮-১৯০৯ খৃ. ) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ( ১৮২২-৯১ খৃ. ) আগ্রহে। এই দুই ভারত-জিজ্ঞাসু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় মার্জিত তীক্ষ্ণ মনীষার অধিকারী ছিলেন, হরপ্রসাদকে মানসিকতায় বিদ্যাবত্তায় নিজেদের সমপর্যায়ের মনে করতেন। এ'রা দুজনেই নিজেদের কাজে হরপ্রসাদের সাহায্য চান এবং হরপ্রসাদ এ'দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। *The Economic History of India*-র ( ১৯০২ খৃ. ) লেখক রমেশচন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ প্রত্যক্ষ যোগাযোগে ভারতীয় জীবনের বাস্তব ভিত্তি বিষয়ে— কৃষি-কারু উৎপাদন, জমির বিলি-ব্যবস্থা, খাজনার আইন, করনীতি ইত্যাদি বিষয়ে হরপ্রসাদ আগ্রহী হয়ে ওঠেন মনে হয়। এই-সব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখেছেন, গুরুত্বপূর্ণ অভিভাষণগুলিতে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের বৈষয়িক জীবনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতবিদ্যার চর্চায় প্রাচীন ভারতের বৈষয়িক জীবন ও সামাজিক রীতি-পদ্ধতি সংক্রান্ত শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অভিনিবেশে এই দৃষ্টির বিস্তার ঘটেছিল, যার প্রমাণ *Magadhan Literature* ( ১৯২৩ খৃ. ) গ্রন্থে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও বাৎস্যায়ন-কামসূত্র বিষয়ে আলোচনা এবং *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*-তে প্রকাশিত ( ১৯১৮ খৃ. ) "Gazetteer Literature in Sanskrit" প্রবন্ধ।

রমেশচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে বাংলায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ( ১৮৮৫-৮৭ খৃ. )। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এটিই ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদ। সায়ণাচার্য এবং ফ্রীদ্‌রিখ মাক্স ম্যুল্যার ( ১৮২৩-১৯০০ খৃ. ) ও অন্যান্য য়ুরোপীয় বেদবিৎ পণ্ডিতদের ভাষ্য মিলিয়ে তৈরি বিস্তারিত টীকা-টিপ্পনী সমেত এই অনুবাদ সম্ভব হয়েছিল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহায়তায়। ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লেখেন, "তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।" শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ভ্রান্ত সংস্কার জিইয়ে রাখার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপায় হিশাবে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খৃ.) শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ শুরু করেছিলেন। ঋগ্বেদের অনুবাদ এই ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রমেশচন্দ্রের সঙ্গে ঋগ্বেদের অনুবাদ শুরু করার অনেক আগে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (পৌষ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ধারণার মূল উচ্ছেদ করেন। রমেশচন্দ্রের পক্ষে ঋগ্বেদ অনুবাদ উপলক্ষে এই মুক্তদৃষ্টি তরুণ পণ্ডিতকে কাছে টেনে নেওয়া তাই খুবই স্বাভাবিক।

কলেজ ছাড়ার পরে হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছেও কাজ করবার সুযোগ পান। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিবরণ শাস্ত্রীমশায় নিজেই বলে গেছেন।[৮] তাঁর সম্পর্কে রাজেন্দ্র-লালের ধারণার পরিচয় আছে *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২ খৃ.) বইয়ের ভূমিকায়। "...a friend of mine..." হরপ্রসাদের "...thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature..."-এ গভীর আস্থায় রাজেন্দ্রলাল তাঁকে আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণায় দীক্ষা দেন।

জীবনের গঠনপর্বে এইভাবে বাংলা সাহিত্যের লেখক এবং ভারত-বিদ্যার গবেষক রূপে শাস্ত্রীমশায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হয়ে উঠেছিল। আজীবন তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত ছিল এই দুটি ক্ষেত্রে। ক্ষেত্র দুটি তাঁর ব্যক্তিগত বিকাশের দিক থেকে অন্যোন্য সম্পর্কে যুক্ত। বাংলা সাহিত্যের সংস্রবে আধুনিক জীবনের সমস্যা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন এবং বর্তমানকে বুঝবার আগ্রহে অতীত ইতিহাসের সত্য পরিচয় উন্মোচনের কাজে নির্বিষ্ট হন। আবার তথ্যের দিক থেকে এবং ব্যাপ্ত ইতিহাস-বোধে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে গবেষণার অভিজ্ঞতায়।

৮. "চল্লিশ বৎসর পূর্বে : রাজেন্দ্রলাল মিত্র", স্মারকগ্রন্থ।

৪

আমাদের আধুনিক শিক্ষার গোটা কাঠামোতেই যেমন, তেমনি ভারত-বিদ্যা বা প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার আয়োজনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের স্বার্থের সম্পর্ক ছিল ওতপ্রোত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রহস্যময় প্রাচ্যের প্রকৃতি এবং মানুষ সম্পর্কে য়ুরোপে নতুন আগ্রহ জেগে উঠেছিল। একে রোমাণ্টিক আকুলতা বা বিশুদ্ধ জ্ঞানতৃষ্ণা— যাই বলা হোক, য়ুরোপে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্রমিক প্রসারে উদ্ভূত নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে এ আগ্রহের উৎপত্তি। উৎপাদন ব্যবস্থায় অগ্রসর য়ুরোপীয় দেশগুলিতে ইতিহাসের এই পর্বে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠছিল। প্রাচ্য তখন প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে সত্যিই সোনালি স্বপ্নের জগৎ। কাঁচা মালের অফুরন্ত উৎস। বিরাট একচেটিয়া বাজারের সম্ভাবনা এখানে। প্রাচ্যে দখল বাড়াবার জন্যে য়ুরোপের উঠতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে রক্তাক্ত প্রতিযোগিতার সমানুপাতে এখানকার মাটি ও মানুষের আদ্যন্ত ইতিহাস জানবার গরজ বেড়েছে। এই ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ অধ্যায় ভারতে ইংরেজ আধিপত্য এবং ইংরেজদের তত্ত্বাবধানেই ভারতে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্‌স[১] এদেশে আসার পথে জাহাজে বসে উপলব্ধি করেন, কী গুরুত্বময় এবং বিশাল একটি এলাকা এখনো অনাবিষ্কৃত পড়ে রয়েছে। তখন তাঁর দৃষ্টির সামনে ভারতবর্ষ, বাঁয়ে পারস্য, আর বয়ে আসছে আরব্য বাতাস। তখনই বাংলা দেশে প্রবাসী স্বদেশীয়দের সংঘবদ্ধ করে এশিয়াকে জানার কাজ শুরু করবেন সংকল্প করেছিলেন। এশিয়ার ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে মানুষের যা-কিছু কীর্তি এবং প্রকৃতির যা-কিছু উৎপাদন— অনুসন্ধানের জন্যে ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করলেন। কবিত্বে, দার্শনিকতায় ভরপুর জোন্‌স ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন আদর্শ 'ইংরেজ

---

১. Suniti Kumar Chatterji, "Sir William Jones : 1746-1794", *Sir William Jones Bicentenary of his Birth Commemoration Volume,* Calcutta 1948, pp. 81-96.

ভদ্রলোক'। তিনি যুক্তিবাদী, আবার গোঁড়া খৃস্টান ; মানুষের সহজাত আত্মোন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, কিন্তু মানব-ইতিহাসে য়ুরোপের শ্রেয়ত্বে তাঁর অটুট আস্থা। ফলে এদেশ এবং এদেশের মানুষ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবে শ্রেয়ত্ব অভিমানীর করুণা স্বাভাবিক। 'They err, yet feel, though Pagans, they are men'— এই উক্তিতে তাঁর মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন পাওয়া যায়। প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের পরিত্রাতা-ভূমিকা বা ভারতে ইংরেজদের পরিত্রাতা-ভূমিকা সম্পর্কে য়ুরোপের বিদ্বৎসমাজে কোনো সংশয়-সন্দেহের অবকাশ ছিল না। যেমন অক্স্‌ফোর্ডের অধ্যাপক, মান্য জর্মান প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ মাক্স মৃ্যল্লার ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের কৃতিত্বে অভিভূত বোধ করতেন। ১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহ দমনের পরে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেন, "The suppression of the Indian Mutiny shows what stuff English soldiers and statesmen are made of." "Oil and water will not mix," তেল তো উপরে থাকবেই, য়ুরোপীয়দের প্রাধান্য তেমনি তাঁর অবধারিত মনে হত।[১০]

এই শ্রেয়ত্ব ও প্রভুত্বময় মর্যাদাবোধসম্পন্ন ইংরেজ রাজপুরুষদের উদ্যোগে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক মেথডলজি বা মনন-পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাচ্যের পরিচয় উন্মোচন।

১৭৮৬-এ উইলিয়ম জোন্‌স এশিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বলেন, সংস্কৃত-গ্রীক-লাতিন, এমন-কি গথিক, কেল্‌তিক, প্রাচীন ফারসি একই উৎস-জাত ভাষা মনে করার কারণ আছে। প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে তাঁর এই উপলব্ধির প্রভাব দূর-প্রসারী। জোন্‌সের তত্ত্বগত ধারণার বীজ থেকে তুলনাত্মক ও ঐতিহাসিক ভাষা-বিদ্যা এবং আনুষঙ্গিক বিদ্যা-প্রশাখা হিশাবে তুলনাত্মক ধর্মবিদ্যা, নৃবিদ্যার চর্চা বিকশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস জানবার প্রয়োজনে এবং সংস্কৃতির আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝবার আগ্রহে ক্রমে প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার অঙ্গ হয়ে ওঠে।

১০. Nirad C. Chaudhuri, *Scholar Extraordinary*, New Delhi 1974, p. 341.

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম আশ্রিত সমাজের আইন-কানুন, সামাজিক বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এ সব বিষয়ের মূল শাস্ত্র উদ্ধারের কাজও সোসাইটিতে সূচনাকাল থেকে চলে এসেছে।

এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা যে-উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হোক, এখানে প্রথম থেকে কাজ হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির মূল কথা, মানবিক সৃষ্টির কোনো নিদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে দেখার পরিবর্তে বিবর্তনশীল ইতিহাসের, সামাজিক রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করে তার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা। সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে যে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার পত্তন হয়েছিল, যে চর্চা-জাত জ্ঞান সাম্রাজ্যশাসনে নানা ভাবে কাজেও লেগেছিল, তার পদ্ধতিগত শিক্ষাটা কলুষিত মনে করার নিশ্চয়ই কোনো কারণ নেই। জ্ঞানের জগতে সমস্ত মেথডলজি উদ্ভবের কারণ ও পরিবেশ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং হয়েও থাকে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র শাস্ত্রীমশায়কে এশিয়াটিক সোসাইটিতে আনেন ( ১৮৮৫ খৃ. ) এবং এখানকার গবেষণার ধারার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করেন। সংস্কৃত জানা পণ্ডিতেরা সোসাইটির প্রকাশন প্রকল্পে, পুথির বিষয়-বিবরণী তৈরির কাজে বরাবর সাহায্য করে এসেছেন। এঁদের সাহায্য ছাড়া য়ুরোপীয় ভারতবিদ্যাবিৎদের পক্ষে এগোনো সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই-সব খ্যাতিমান্ শাস্ত্রবিৎ সাধারণত নির্ধারিত দায়িত্বটুকু পালন করতেন। এখানকার গবেষণা পরিচালনায় তাঁদের কোনো ভূমিকা থাকত না। ব্যতিক্রম শাস্ত্রীমশায়। এখানে আসার আগেই নিজের ক্ষমতা এবং জীবনের সংকল্প সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় তিনি একজন সংহত-চৈতন্য-সম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হয়ে উঠে-ছিলেন। পুরানো শিক্ষা-পদ্ধতিতে তৈরি শাস্ত্রবিৎরা মনীষার শক্তি প্রয়োগ করতেন টীকা-টিপ্পনীর ক্রমিক ধারায় উন্মোচিত মূল শাস্ত্রের তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন এবং সামাজিক আচার-বিচারে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান প্রয়োগে। প্রাচীন বিদ্যাজীবী বংশের ছেলে হলেও তিনি জানতেন এ চর্চার আর-কোনো সামাজিক উপযোগিতা নেই। অথচ স্বদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিচয় ও দেশের ইতিহাস জানার

জন্যে প্রাচীন বিদ্যার জগৎ থেকেই তথ্য আহরণ, সে তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রাচীন জ্ঞানের এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনের পারম্পর্য ও তাৎপর্য উন্মোচনের, বিবর্তমান সমাজের গতিধারা স্পষ্ট করে তোলার কঠিন দায়িত্বে তিনি নিজেকে বাঁধলেন। সচেতন নির্বাচনে শাস্ত্রবিৎ না হয়ে হয়ে উঠলেন ভারততত্ত্ববিৎ, ভারতীয় ইতিহাসের গবেষক। তাঁর সংকল্প গঠনে, কাজের ক্ষেত্র নির্বাচনে মনীষার আধুনিক চরিত্র সুস্পষ্ট।

তাঁর মনীষা বিকাশের প্রথম পর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংস্রব খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজেন্দ্রলালের আনুকূল্যে সোসাইটির পরিবেশে কাজের পদ্ধতি-গত এবং আয়োজন-গত সুযোগ যতটা ছিল, তার উপরে আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে তিনি সোসাইটির 'আজীবন' সহ-সভাপতি এবং সভাপতি ( ১৯১৯-২১ খৃ. ) নির্বাচিত হয়েছিলেন। শিক্ষকতাবৃত্তির পাশাপাশি সোসাইটির কাজের ভেতর দিয়ে ১৮৮৫-৯১, ৬ বছরে তিনি ভারতবিদ্যার গবেষণায় নেতৃভূমিকায় উত্তীর্ণ হলেন। এই সময়ে সোসাইটির অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিখ্যাত বিব্‌লিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে ১৮৯১তে Director of the Operations in search of Sanskrit Manuscripts পদে নিযুক্ত হন।

প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা মূলত পুঁথিতে নিবদ্ধ, 'অপ্রকাশিত'। ভারতবর্ষকে জানার একটি প্রধান উপায় এই পুঁথি-নিবদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় উদ্ধার। পুঁথি সংগ্রহ তাই সোসাইটির গবেষণা পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ ছিল। অপ্রকাশিত জ্ঞানের এই আকরে প্রবেশের শিক্ষা শাস্ত্রী-মশায় রাজেন্দ্রলালের কাছেই পেয়েছিলেন। সঞ্চিত পুঁথির ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগ তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল, শাস্ত্রী-মশায় সে কাজ শেষ করার দায়িত্ব নিলেন। সোসাইটি থেকে প্রকাশিত শাস্ত্রীমশায়ের ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগ এবং তার ভূমিকাগুলি দেখলে বোঝা যায় ভারতীয় বিদ্যার বিভিন্ন শাখার তথ্য-ভিত্তির উপরে তাঁর অধিকার কত ব্যাপক। এই বিশাল আকারের উপরে প্রত্যক্ষ দখল তাঁর ভারতবিদ্যা ভাবনার ভিত্তি এবং এই জ্ঞানের জন্যেই দেশ ও বিদেশের প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ সমাজে তাঁকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানুষ মনে

করা হত। তাঁকে লেখা বিখ্যাত য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎদের চিঠিপত্র[১১] থেকে য়ুরোপের প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চায় তাঁর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ 'স্থূল পাণ্ডিত্য' নয়, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের উপমা অনুসরণে বলা যায়[১২], তিনি খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডের সোনা এবং খাদ অংশ পৃথক করতে জানতেন। তথ্যের উপরে এই অধিকার কী আশ্চর্য দক্ষতায় কাজে লাগিয়েছেন, তার প্রমাণ ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগের ভূমিকাগুলি। যেমন ব্যাকরণ-অলংকার খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠা ভূমিকায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক এবং ধর্মীয় বিশিষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণের এক-একটি শাখার বিকাশ বিশ্লেষণ করেছেন। পুথি-নিবদ্ধ জ্ঞানের চর্চা তাঁকে সেই জ্ঞানের বৃত্তের বাইরে নিয়ে যায়, তাঁর দৃষ্টিতে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ যে জন-সমাজে, তার ইতিহাস। এই চেতনার দিক থেকে পুথি সংগ্রহ এবং পুথি চর্চা তাঁর গবেষণায় অন্য তাৎপর্য পেল। এ কাজের পরিধিও তিনি ক্রমেই প্রসারিত করেছেন। ক্রমে সংস্কৃত ও পালি ভাষা ছাড়াও অবহট্‌ঠ এবং নবীন ভারতীয় স্তরের বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, গুজরাটি, রাজস্থানি ভাষার পুথির আধারে সঞ্চিত সাহিত্য-সংস্কৃতির এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের আধুনিকতর রূপ তাঁর পর্যালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। নিতান্ত পুথি খোঁজা, পুথি বোঝার কাজের ভেতর দিয়ে এইভাবে তিনি বৈদিকযুগ থেকে আধুনিকতর যুগ অবধি ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রমাণ-ভিত্তিক পরিচয় উন্মোচন করলেন। ভারতবিদ্যার গবেষণায় দৃষ্টি ও বিষয়-পরিধির এমন ব্যাপ্তি সেকালের বা একালের আর-কোনো গবেষকের কাজে দেখা যায় না। বস্তুত ইণ্ডলজির ধারণাই বদলে গেছে শাস্ত্রীমশায়ের কাজে। বিশেষভাবে য়ুরোপীয় ভারতবিদ্যাবিৎদের গবেষণার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে শাস্ত্রীমশায় তাঁদের তৈরি ছক ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন এবং এক অখণ্ড ইতিহাস-তত্ত্বের উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পুথি-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিলালিপি, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন, লোক-সংস্কৃতির ধারায় বিক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে তিনি বিভিন্ন যুগের

১১. স্মারকগ্রন্থে সংকলিত।

১২. "হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিপুস্তকের জন্য", স্মারকগ্রন্থ।

মানবিক সৃষ্টির ও তার সামাজিক পটের সামগ্রিক পরিচয় ধারণায় আনতে চেষ্টা করেছেন। ব্যাপক পর্যটনে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোয় পুঁথিপত্রের এবং অন্য নিদর্শনের তথ্য পরীক্ষা করেছেন। প্রত্নতথ্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই চেষ্টা তাঁর লেখায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

আর্যপূর্ব কাল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রচুর তথ্য শাস্ত্রীমশায়ের বাংলা এবং ইংরেজি রচনায় সঞ্চিত রয়েছে। বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে দেখলে মনে হয় পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় ইতিহাসের কোনো খসড়া অনুসারে তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ইতিহাসের অধ্যায়গুলি তাঁর দৃষ্টিতে অবিচল রেখায় বিভাজিত নয়। তিনি দেখাতে চান, চলমান বিবর্তনশীল জন-সমাজে নানা প্রভাবের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় কী ভাবে চলে এসেছে। তাঁর রচনাধারায় ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং সামাজিক রীতি-পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণের ভেতর থেকে ভারতীয় সভ্যতার মিশ্র রূপ ফুটে ওঠে। চলমান জন-জীবনে অনার্য-আর্য-বৌদ্ধ-হিন্দু-ইসলাম— সব সংস্কৃতির উপাদান মিলে মিশে গেছে, কোনো ধারাকেই অবিমিশ্র বিশুদ্ধ রূপে পাওয়া আর সম্ভব নয়। গবেষক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি এই ধারণায় পৌঁচেছিলেন। কোনো একপেশে ঝোঁকে এ সত্যবোধ থেকে বিচ্যুত হন নি। 'বেদ ও বেদ-ব্যাখ্যা'র মতো আদি রচনাতেই তাঁর মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল। বস্তুনিষ্ঠ ও জীবননিষ্ঠ গবেষণায় মনের সেই দৃষ্টি ক্রমেই আরো ব্যাপ্ত হয়েছে। 'ভারত-হিন্দু-সভার অধিবেশনে সভাপতির সম্বোধন' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)-এর মতো একটি দুটি বিরল ব্যতিক্রম ভিন্ন শাস্ত্রীমশায়ের মূল রচনাধারায় সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় নেই বললেই চলে।

বৌদ্ধধর্মের উত্থান এবং ভারতীয় জনসমাজে তার ব্যাপ্ত ও দীর্ঘ প্রভাবের স্বরূপ উন্মোচনে শাস্ত্রীমশায়ের গবেষক জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় এবং শ্রম নিয়োজিত ছিল। বৌদ্ধ প্রভাবের তাৎপর্য তিনিই প্রথম এত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন।

৫

উত্তর ও পূর্ব ভারতের সামাজিক বিন্যাসে, সাংস্কৃতিক ধারায় বৌদ্ধ প্রভাব সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় বিশেষভাবে বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাসের অনেক 'প্রাচীন পাত' উল্‌টিয়ে দিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আজ আমরা যে পূর্ণতায় পাচ্ছি, তা শাস্ত্রীমশায়ের গবেষণার ফল।

তাঁর গবেষণার এই বিশেষ ধারার বিকাশ ঘটেছিল বাঙালির নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ( প্রতিষ্ঠা ১৮৯৪ খৃ. ) আশ্রয়ে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন, "আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেক দিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য-পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন।"[১৩]

সোসাইটিতেই বাংলা পুথিপত্র নিয়ে কাজ শুরু করলেও এই ধারায় শাস্ত্রীমশায় ব্যাপক চর্চা করেছেন সাহিত্য-পরিষদে। তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের প্রভাবে প্রথম থেকে সাহিত্য-পরিষদের একটা দেশীয় চরিত্র তৈরি হয়ে উঠেছিল। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরের এই প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করার পূর্ণ সুযোগ ছিল। বাঙালির আত্মপরিচয় সংগঠনে যেমন, শাস্ত্রীমশায়ের নিজের গবেষণার বিকাশ ও পরিণতির দিক থেকেও তেমনি পরিষদের কাজের ধারা তাৎপর্যপূর্ণ।

পরাধীন স্বদেশে ইচ্ছামতো সব কাজ সম্পূর্ণ করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সীমাবদ্ধ সুযোগ সদ্ব্যবহার করে অটল সংকল্পে শাস্ত্রীমশায় স্বদেশ-চর্চার পরিধি যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণকর দিক সম্পর্কে গভীর আস্থা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। ইংরেজ রাজত্ব আছে এবং থাকবে এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণার পরিসীমার মধ্যেই এঁরা জীবনের সংকল্প গঠন করতেন। ইংরেজদের মাধ্যমে য়ুরোপীয় আধুনিকতার সংস্পর্শে আসার সুযোগকে সেকালের অনেকের মতো তিনিও মনে

১৩. পূর্বোক্ত সূত্র।

করতেন এক যুগান্তকারী ঘটনা। দেশের রাজার হাত থেকে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শাস্ত্রীমশায় সি. আই. ই. (Companion of the Indian Empire) খেতাব নিয়েছেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ৫০তম রাজ্যাঙ্কের (১৮৮৭ খৃ.) উৎসব উপলক্ষে প্রবর্তিত মহামহোপাধ্যায় উপাধি নিয়েছেন (১৮৯৮ খৃ.)। আজ আমরা বুঝতে পারি, ব্যক্তিগত বা জাতীয় আত্মবিকাশের উদ্যম কোথায় অনিবার্য বাধা পাবে, এ বিষয়ে সেকালের মনীষীদের ধারণায় সীমাবদ্ধতা ছিল। তাঁদের মনীষার আলোয়, একনিষ্ঠ উদ্যোগে স্বদেশের জটিল দ্বন্দ্বময় বাস্তবতার নানা দিক সত্য স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু তখনকার ভারতীয় পরিস্থিতির মূল যে দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক শাসন ও ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব, তাঁদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যেত। ফলে সংকল্প গঠন এবং রূপায়ণে তাঁরা বাধা পেতেন। উদ্যম ও বাধার ঘাত-প্রতিঘাতে কারো কারো দৃষ্টি খুলেছে, নিজেদের কাজের পরিসীমার মধ্যেই পরাধীন স্বদেশের মূল সংকট কোথায়, উপলব্ধি করেছেন।

এই উপলব্ধি থেকেই বোধ হয় শাস্ত্রীমশায়রা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কে একটি বাধামুক্ত দেশীয় গবেষণার কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ঐতিহ্য আশ্রিত দেশীয় আধুনিকতার বিকাশ বিঘ্নিত হওয়ায় তাঁর খেদের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. [২৭ দ্র.)। য়ুরোপীয় উদ্যোগে ভারতবিদ্যা-চর্চার ফলাফল সম্পর্কে তিক্ত মন্তব্যে ঐ ভাষণ শেষ করেন, "At the present moment there is a large body of men who go as Sanskrit scholars without knowing a letter of Sanskrit. There are others again who tax the brains of poor Sastris and make big name as Oriental scholar. At the conference of Orientalists··· in 1911 a very great man told the august assembly that without two Sastris at their elbows they can not be Oriental scholars. Such Oriental scholarship should be discouraged. *The Sastris should be trained for Oriental scholarship. A historical sense should be awakened in their minds.*"···

"The Oriental scholars of Europe have done

Sanskrit literature a great service by infusing a historical sense in those who are interested in it in India. But in the present day there is a tendency amongst the younger generation of India, to make the Oriental scholars of Europe their Gurus or Spiritual guides in all matters relating to India. Not being in touch with the soil of India and its traditions the interpretation of Indian life by Europeans should always be received with caution, criticism and discrimination. *They should not be slavishly followed by Indians in matters relating to India.*"[১৪] [ইটালিক্ আমাদের ।]

মোহভঙ্গের আরো স্পষ্ট প্রমাণ আছে একটি একান্ত উক্তিতে। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটি সংশোধনের সময়ে শেষ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'ভারতে ইংরাজ শাসনের সুফল' বদল করার নির্দেশ দিয়ে সহকারীকে বলেন, "ইংরেজের স্তাবকতা অনেক করা গেছে এবং প্রসাদও কিছু মিলেছে। কিন্তু এই ৭৬ বৎসর বয়সে মিথ্যা কথা আর লিখতে পারব না। পারলে সুফল কেটে কুফল লিখতাম।··· যাক, তুমি পরিচ্ছেদের নাম লেখ— ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ফল।"[১৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর তিন দশকে বাংলা দেশে আধুনিক চিন্তা-চেতনা বিকাশের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে জীবনের শেষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই উপলব্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩১-এর ১৭ নভেম্বর, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ।

'প্রারম্ভ-বচন'-এ অধ্যাপক সুকুমার সেন শাস্ত্রীমশায়ের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োজনে তাঁর সম্পর্কে বিশদ তথ্য 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ' ( ১৯৭৮ খৃ. ) সংকলনে পাওয়া যাবে।

১৪. ৪ সংখ্যক সূত্রের পৃ. 41-3।

১৫. কালীপদ সেন, "স্মৃতিচারণ", স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৫৯।

৬

শাস্ত্রীমশায় ছোটো বড়ো সমস্ত পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। সেই বিক্ষিপ্ত লেখার অতি সামান্য অংশ নিজে বইয়ের আকারে প্রকাশ করে গেছেন। সে-সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে কিছু এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন 'বঙ্গবাসী' বা 'ভারতবাসী' পত্রিকা আমরা কোথাও পাই নি। একান্ত দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার রচনা ভিন্ন আর সমস্তই নৈহাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা-কেন্দ্রে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া আমরা তাঁর লেখা দেড়শোর বেশি চিঠি সংগ্রহ করতে পেরেছি। পরিকল্পিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' চার খণ্ডে তাঁর বাংলা রচনা যতটা সম্ভব বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করা হবে। শেষ খণ্ডে অন্য রচনার সঙ্গে চিঠিপত্র সংকলিত হবে। এই প্রথম খণ্ডে সৃজনধর্মী রচনাগুলি সংকলন করা হল।

বইয়ের বেলায় লেখকের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হচ্ছে। পত্রিকায় প্রকাশের সূচি, পত্রিকা থেকে বইয়ে আনবার সময় বিন্যাসের পরিবর্তন এবং পত্রিকার ও বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' পর্যায়ে দেখানো হয়েছে। সম্পাদকীয় টীকা প্রত্যেক রচনার শেষে 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' পর্যায়ে ছাপা হচ্ছে। মূল রচনায় লেখকের টীকা যেখানে যেমন ছিল অবিকল তেমনি থাকছে। শাস্ত্রীমশায়ের রচনার সমালোচনা, আনুষঙ্গিক তথ্য এবং প্রয়োজনে তাঁর বাংলা রচনার পরিপূরক ইংরেজি রচনা পরিশিষ্টে ছাপা হচ্ছে। কোথাও কোথাও মূল লেখায় [ ] বন্ধনীর মধ্যে তারিখ এবং শব্দ যোগ করা হয়েছে। এই-সব শব্দের অধিকাংশ অন্য পাঠ থেকে নেওয়া। সম্ভাব্য শব্দ অনুমানের উপরে নির্ভর করে বসানো হলে '?' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

স্পষ্ট ছাপার ভুল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও যতি চিহ্নের এবং অনুচ্ছেদ বিন্যাসে অসংগতি ছিল, অর্থ-সুগমতার প্রয়োজনে এ-সব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করা হল।

সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে দেখা দেয় শাস্ত্রীমশায়ের লেখার বানান নিয়ে। তাঁর বই বা পত্রিকার লেখায় কোথাও বানান ব্যবহারে শৃঙ্খলা নেই। তৎসম শব্দের বিকল্প রূপ এবং তদ্ভব, দেশী, বিদেশী সমস্ত শব্দেরই একাধিক বানান তিনি মিশিয়ে ব্যবহার করেছেন। এমন-কি

একই লেখার মধ্যে এক-একটি শব্দের দু-রকম বানান পাওয়া যাচ্ছে। ছাপার গোলমাল এর কারণ কিনা, তাঁর নিজের অভ্যাস ও প্রবণতা কী— তা বুঝবার একটি উপায় পাণ্ডুলিপির বানান দেখা। তাঁর কোনো বই বা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমরা পাই নি। চিঠিপত্র যা আমাদের সংগ্রহে আছে তা খুঁটিয়ে দেখা গেছে। তাঁর চিঠিতেও বানানের কোনো সমতা নেই। ছাপা লেখা এবং চিঠিপত্র থেকে সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত দেখানো হল—

অন্ততঃ অর্দ্ধ ঊর্দ্ধ করতঃ চক্ষুঃশূল
অন্তত অর্ধ ঊর্ধ্ব করত চক্ষুশূল

বিকসিত বর্দ্ধিত বর্ষা (অস্ত্রঅর্থে) প্রাণিবৃন্দ
বিকশিত বর্ধিত প্রাণীবৃন্দ

একটী কলসী কাণ কায ক্ষোদকারী ক্ষোদাই
একটি কলসি কান কাজ খোদকর খোদাই

ক্ষৌরী গিন্নী গৃহস্থালী ত্রুটী দীঘি ধূনা
খেউরি গিন্নি গৃহস্থালি ত্রুটি দিঘী ধুনা
দীঘী

নাড়ী ভঙ্গী ভুরূ মাটী রঙ্গ রাঙ্গা রাণী
নাড়ি ভঙ্গি ভুরু মাটি রঙ রাঙা রানী

সূতা সোণা হাতী
সুতা সোনা হাতি

ইংরেজী খুসী জমী জিনিষ জোড় জোগাড় তাঁতী
ইংরেজি খুশি জমি জিনিস যোড় যোগাড় তাঁতি

তেলী দড়ী দরকারী তর্জ্জমা দাড়ী দেরী পাইচারী বাকী বালুম
তেলি দড়ি দরকারি তর্জমা দাড়ি দেরি পাইচারি বাকি ভলুম

বাগ্দী বাঙ্গালা বাঙ্গালী ভারী মাঝী রাজী শীকার সহী
বাগ্দি বাঙ্গলা বাঙালি ভারি মাঝি রাজি শিকার সই

সব বয়সের লেখায় এ রকম অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। লেখার সময়ে বানান-সম্মিতি সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকতেন না বোঝা

যায়। এ অবস্থায় আমাদের সামনে দুটি বিকল্প ছিল। মূল রচনার বানান অবিকল রেখে দেওয়া, নয়তো কোনো একটা নীতির ভিত্তিতে বানান-সাম্মিতি সাধন। যেমন ছিল সেইভাবে ছাপা হলে বিশৃঙ্খল চেহারাটা স্থায়ী করা হয়। পাঠকদেরও পদে পদে অসুবিধেয় পড়ার সম্ভাবনা। কাজেই বানান-সাম্মিতির নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সাম্মিতি সাধনের জন্যে পুরানো বানানের ছাঁদ আশ্রয় করা হবে, না বানানের যে আধুনিক ছাঁদ দাঁড়িয়েছে তাই অনুসরণ করা হবে এটাও একটা সমস্যা। উপরের দৃষ্টান্তে দেখা যাবে দু-ধরনের বানান মিশে আছে, পুরানো ছাঁদের বানানই অবশ্য বেশি। এ বিষয়ে শাস্ত্রীমশায়ের সম্ভাব্য মতামত কী হত ?

তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে খাঁটি বাংলা ভাষার রূপ ও প্রয়োগবিধি সম্পর্কে যে আন্দোলন শুরু করেন তা ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের অকারণ প্রভাব থেকে মুক্ত করে বাংলা ভাষার স্বাধীন বিকাশ সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ। এই উপলক্ষে লেখা "বাংলা ব্যাকরণ" প্রবন্ধের ৮ অনুচ্ছেদে তাঁর ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যেমন বলেছেন, "…'তেল' শব্দ সংস্কৃতে 'তৈল', প্রাকৃতে 'তেল্ল', প্রাচীন বাংলায় 'তেল'। আমরা যদি 'তেল' লিখি, চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে কেন ?… 'কাজ' শব্দ প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে উৎপন্ন ; এখনকার পণ্ডিতাভিমানীরা সংস্কৃত 'কার্য' শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া 'কায' অন্তঃস্থ য দিয়া বানান করেন, এ জায়গায় পাঠকবর্গ বলুন তো দেখি 'জ' শুদ্ধ না 'য' শুদ্ধ।"

আরো স্মরণীয় ১৯৩০-এ রাজশেখর বসুর চলন্তিকা অভিধান প্রকাশিত হলে শাস্ত্রীমশায় দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সমালোচনায় ("অভিধান", প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) এই অভিধান সংকলনের মূল নীতি অনুমোদন করেন। বাংলা ভাষায় নানা ভাষার শব্দ এসে পড়ায় "তাহাদের ব-কার ভেদ, য-কার ভেদ, স-কার ভেদ ও ন-কার ভেদ" নিয়ে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে সাম্মিতি বিধানের দিক থেকে তিনি চলন্তিকাকে স্বাগত জানান।

মানব সংস্কৃতির চলন-শক্তিতে, পরিবর্তনে বিশ্বাসী শাস্ত্রীমশায়ের আরো অনেক রচনায় কালের ও পরিবেশের পরিবর্তনে সংস্কৃতির মুখ্য

বাহন ভাষার ছাঁদে অনিবার্য পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য পাওয়া যায়। কালে যা অবসিত হয়ে যায়, তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় তাঁর পক্ষে সায় দেওয়া সম্ভব ছিল না। বানানের বেলায় চিরকাল মান্য কোনো নিয়মে তাঁর বিশ্বাসও ছিল না। আবদুল করিম -সম্পাদিত 'রাধিকার মানভঙ্গ' (১৩১২ বঙ্গাব্দ) বইটির ভূমিকায় তাই শাস্ত্রীমশায় লেখেন, "বানান শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নাই। স্কুলের ছেলেদের জন্য একপ্রকার বানান বাঁধিয়া দেও, রাজি আছি। কিন্তু সেই বাঁধা বানান যে সর্বদেশে সর্বকালে চালাইতে হইবে, ইহা অতি অসঙ্গত নিয়ম।"

তা হলে প্রয়োজনে পরিবর্তনের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখাই নিশ্চয় তাঁর মতে সংগত নিয়ম। এই-সব উল্লেখ থেকে ধরে নেওয়া যায় বানানের আধুনিক ছাঁদ মেনে নিতে তাঁর কোনো আপত্তি থাকত না। চলন্তিকা প্রকাশের পরে পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। আজ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহের মতো একটি বড়ো প্রকাশনায় বানানের প্রত্ন-রূপ জিইয়ে তোলা আমাদের যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। বিশেষত, শাস্ত্রী মশায়ের লেখাতেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও বানানের এমন কিছু রূপ পাওয়া যাচ্ছে যা চলন্তিকায়ও নেওয়া হয় নি। যেমন, তাঁতি, তেলি, ইত্যাদি। এই ইঙ্গিত অনুসরণ করে আমরা তৎসম শব্দের বিকল্প বানানের মধ্যে এখন বাংলায় প্রচলিত রূপ এবং তদ্ভব ও অন্যান্য শব্দের আধুনিক রূপ সর্বত্র ব্যবহার করেছি। বানান-সমিতির এই নীতি পরের খণ্ডগুলিতেও অনুসরণ করা হবে। এর ফলে মূল রচনার শিরোনাম কোথাও কোথাও পরিবর্তন করতে হয়েছে। যেমন 'বেণের মেয়ে' 'বেনের মেয়ে' করা হয়েছে, 'একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব' হয়েছে 'একজন বাঙালি গবর্নরের অদ্ভুত বীরত্ব'। এইভাবে 'বাঙ্গালা সাহিত্য', 'বাঙ্গালা ভাষা' যথাক্রমে 'বাংলা সাহিত্য' 'বাংলা ভাষা' শিরোনামে ছাপা হবে।

শাস্ত্রীমশায়ের রচনাশৈলীর অনন্যতার একটি কারণ শব্দব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। পরিণত লেখায় চলতি ভাষার বিচিত্র শব্দ অসাধারণ নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দও তাঁর প্রয়োগে নতুন অর্থচ্ছটা বিকিরণ করে। সমগ্র রচনা থেকে একটি শব্দকোষ সংকলন করা হচ্ছে। এই শব্দকোষ চতুর্থ খণ্ডে ছাপা হবে।

বইয়ের পুরানো সংস্করণ, পুরানো পত্র-পত্রিকা থেকে অলংকরণের নক্শা, লিপির ছাঁদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে।

৭

এর আগে দুবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির একখণ্ডে 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী' নামে কিছু রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনে অসতর্কতা বশত বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সংকলনটিতে কোনো টীকা-টিপ্পনী ছিল না।

দ্বিতীয়, গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রকাশের আয়োজন। ১৯৫৬ এবং ১৯৬০-এ দুটি খণ্ড প্রকাশের পরে এই আয়োজন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'তে সংকলিত রচনায় বিস্তারিত এবং অত্যন্ত মূল্যবান্ টীকা ও আনুষঙ্গিক তথ্য যোগ করা হয়েছিল। 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' এখন পাওয়া যায় না। তাই এর গুরুত্বপূর্ণ টীকার প্রয়োজনীয় অংশ সূত্রনির্দেশসহ আমরা সংকলন করে দেব।

সদ্য প্রয়াত পরিতোষ ভট্টাচার্য এবং শাস্ত্রী মশায়ের অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রকে তাঁর সমস্ত রচনার স্বত্ব দান করায় এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয়। পশ্চিম বাংলার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ উদ্যোগী হয়ে রাজ্য-পুস্তক পর্ষদ থেকে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন মিত্র সাগ্রহে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রাথমিক আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। বর্তমান প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতার এবং তাঁর দপ্তরের সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা কখনো সরকারি 'লাল ফিতের' অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পাই নি, স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পেরেছি।

পুস্তক পর্ষদের পরিচালন সমিতির সদস্য উপাচার্য মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, উপাচার্য রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার, উপাচার্য প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত,

উপাচার্য দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপাচার্য সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবীশংকর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলা দেবী, অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী, শ্রীপরিতোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষয়-সমিতির সদস্য অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন ও কার্যকর করার ব্যবস্থা করেছেন। সরকারি অনুমোদন ত্বরান্বিত করায় সর্বদা সাহায্য করেছেন অধ্যাপক রূপচাঁদ পাল।

এই কাজে সর্বদাই আমাদের তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা হয়েছে। যখন যাঁর কাছে কোনো প্রয়োজনে গেছি, সকলেই ব্যক্তিগত প্রযত্নে, সাগ্রহে সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন। শাস্ত্রীমশায়ের রচনা বিক্ষিপ্ত রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংগ্রহে পত্র-পত্রিকায়। অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস, গ্রন্থাগারিক শ্রীশান্তিময় মিত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের কাছ থেকে সর্বদা সাহায্য পেয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য দীপ্তিভূষণ দত্তের আনুকূল্যে, উপগ্রন্থাগারিক শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্য ও সহকারী শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্তীর সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ আমরা প্রয়োজন-মতো ব্যবহার করতে পেরেছি। অনুরূপ সাহায্য পেয়েছি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী এবং নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ঢাকা বাংলা একাডেমির গবেষণা বিভাগের পরিচালক জনাব বদিউজ্জামান এবং লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রীমশায়ের লেখার অনুলিপি পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমাদের নিয়ত উৎসাহিত করেছেন এবং প্রয়োজনে তথ্য জানিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়। প্রয়োজনীয় বইপত্র দেখতে দিয়েছেন অ্যানথ্রপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ডক্টর হীরেন্দ্র-কুমার রক্ষিত। অধ্যক্ষা অলকা চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীঅতুল সুর কিছু তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন।

শ্রীশঙ্খ ঘোষের মমত্বময় সহায়তায় অনেক জটিলতা পেরোনো সম্ভব হয়েছে। শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আমাদের সাহায্য করে আসছেন।

শাস্ত্রীয় তথ্যের প্রয়োজনে আমরা সর্বদাই অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়-তীর্থ মহাশয়ের সস্নেহ আনুকূল্য পেয়েছি।

শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল তাঁর সংগ্রহের মূল্যবান্ চিঠিপত্র গবেষণা-কেন্দ্রকে দান করেছেন।

এঁদের উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানানো বাহুল্য, প্রতি পদে এঁরা আমাদের সহায় রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন আশা করব।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের অভিভাবকত্ব ভিন্ন এত বড়ো কাজের দায়িত্ব বহন আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হত। বয়সের ভার এবং শারীরিক অপটুতা সত্ত্বেও শুধু নীতি-গত নির্দেশ দেওয়া নয়, অনেক কাজ তিনি নিজে হাতে করে দিচ্ছেন। অধ্যাপক সেনের নির্দেশে ও অনুমোদনে কাজ করা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি যদি কিছু থেকে যায় তার দায়িত্ব পূর্ণত আমাদের।

যত্ন করে চার খণ্ড রচনা-সংগ্রহের প্রেস কপি তৈরি করে দিয়েছেন শ্রীতারাপদ ভৌমিক, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমালা বসুরায়।

সম্পাদনার কাজে সর্বদা আমাদের সহযোগী শ্রীমান্ অঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। মুদ্রণ ও বিন্যাসে আমরা নিয়ত শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সাহায্য পেয়েছি। গবেষণা-কেন্দ্রের সম্পাদনা-দপ্তর তত্ত্বাবধান করছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

মডার্ন প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেশ দত্ত ও তাঁর সুদক্ষ কর্মীদের যত্ন এবং সহযোগিতায় রচনা-সংগ্রহ সময়সূচি অনুযায়ী ছাপা সম্ভব হয়েছে। 'রয়াল হাফটোন'-এর শ্রীসুব্রত ঘোষ রুচিকর নৈপুণ্যে ব্লক তৈরি করেছেন এবং প্রচ্ছদ ছেপে দিয়েছেন। প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গী এঁরা আমাদের আত্মীয়ের মতো।

রচনা-সংগ্রহের এই প্রথম খণ্ডে ত্রুটিবিচ্যুতি যদি কিছু চোখে পড়ে এবং কোনো পরামর্শ যদি মনে আসে আমাদের জানাতে সকলকে অনুরোধ করি।

**সম্পাদক**

৬ ডিসেম্বর ১৯৮০

# বাল্মীকির জয়

# বাল্মীকির জয়।

## THE THREE FORCES,

*(Physical, Intellectual and Moral.)*

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌, এ,
প্রণীত।

কলিকাতা

৩৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন,
রায় যন্ত্রে,
শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত
ও
১৩ নং কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস ডিপজিটরীতে
প্রকাশিত।

১২৮৮।

বাল্মীকির জয়

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ,

Calcutta:
Printed by R. Dutt,
Hare Press:
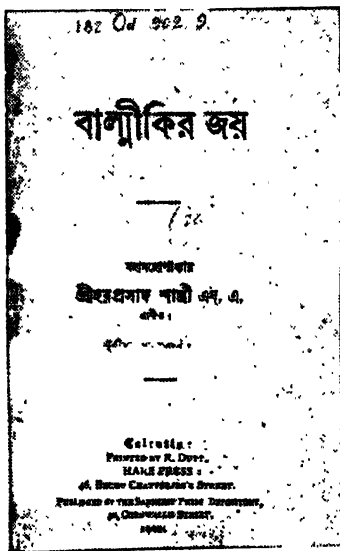
# প্রথম খণ্ড

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল-- সুনীল-- গাঢ় নীল-- বর্ণনার অতীত মনোমোহন নীলরঙের ছটার মাঝে বড়ো বড়ো তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজিমধ্যে ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষে নিজেও ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, গাছপালা সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সবুজরঙের ছটায় পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ: যেখানে এই দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানে বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই প্রকাণ্ড চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্মেঘ, যখন ধুস্কুলার* সম্পর্কমাত্র নাই, সেই সময়ে —সেই সুখের শরৎ সময়ে— কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি ?

---

* পশ্চিমাঞ্চলে যে ধূম ও ধুলায় গ্রীষ্মকালে আকাশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে তাহার নাম ধুস্কুলা।

# বাল্মীকির জয়।

একদিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, একদিকে পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্বতশ্রেণী, তাহার পরে— কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি ? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি ? পূর্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া ; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারিদিকে ঝরনা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেনার মতো সাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোনো নির্ঝরিণী চির-অন্ধকার মধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরনা সেইখানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে

আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা, আবার পরক্ষণেই গভীর খড ; তাহার তলা কোথায় ?— দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরনা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, ভয়ংকর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য। কিন্তু আমরা যে শরৎকালের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই শরৎকালের অমাবস্যারাত্রে হিমালয়ের এক অপূর্ব সৌন্দর্য হইয়াছিল। সে শরৎ সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিসময়ে।

## ২

মানুষ মরিয়া কি হয় ? কে বলিবে ? কেহ বলে ভূত হয় ; যাহাদের পিতা মাতা মরে, তাহারা বলে তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু বেদমতে তাঁহারা স্বর্গে যান না। যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য করিয়া যান তাঁহারা ঋভু* হন। ইঁহারা কোথায় থাকেন ? কি করেন ? কে বলিতে পারে ! ইঁহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোনো সুখময় ভবনে বাস করেন। উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর ; কিন্তু যখন তীব্রজ্যোতির্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া— আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে

* যে মানুষ সৎকর্ম করিয়া মরণের পর দেবতা হন বেদে তাঁহাকে ঋভু কহে।

আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্বায় টিব্বায়*, চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে, ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহা আনন্দ-ভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে। কিন্তু সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র অচল, দ্বিফাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিস্পন্দ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত—স্তিমিত— মহামোহ-নিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতানস্বরে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ-দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।

মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। যেমন বড়ো সুখের সময়ে সুখসন্তানবৎ— স্বপ্নবৎ— অর্ধচেতন, অর্ধ-অচেতনবৎ— মোহময়, সুখময়, শান্তিময়, অমৃতময়, দূরস্থ মধুর সংগীত-ধ্বনিবৎ, কানে কি জানি কি নিলীন হয়, সেইরূপ সে গীতধ্বনি সকলের কর্ণে লাগিল। কেহই বুঝিল না কেন তাহাদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল, অথচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল। কেবল তিনজন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনজনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন, তিনজনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়া হিমালয়চূড়ায় আসিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতের চূড়া, যতদিন ভারত থাকিবে, যতদিন হিন্দুধর্ম থাকিবে, যতদিন জগতে মাহাত্ম্যের মান থাকিবে, ততদিন ইঁহাদের নাম লোপ হইবে না।

৩ প্রথম মহর্ষি বশিষ্ঠ, ষষ্টিসহস্রশিষ্যপরিবৃত হইয়া আপন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহা-দিগকে জ্ঞান, ধর্ম, নীতি উপদেশ দিতেছিলেন। কাহাকে বাক্য, বাচ্য,

* পাহাড়ের উচ্চ অংশকে পাহাড়িরা টিব্বা বলে।

ব্যঙ্গ, কাহাকে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, সংশয়, নির্ণয়, ছল, জাতি, হেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব, কাহাকে পঞ্চতন্মাত্রের সহিত লিঙ্গশরীরের ভেদাভেদ, কাহাকে বিবর্তবাদ, কাহাকে পরিণামবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন : কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম, গোষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন : শিষ্য বিবেচনায় কাহাকেও বা দশকর্মও শিক্ষা দিতেছেন : এমন সময়ে সহসা তাঁহার শিষ্যসমূহ অন্যমনা, স্থির, নিস্পন্দ, শেষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্‌শক্তিবিহীন হইল। গীতধ্বনি বশিষ্ঠেরও কানে গেল, তিনি যোগবলে জানিলেন ঋভুগণ আসিয়াছেন ; অমনি যোগবলে হিমালয়ের শিখর লক্ষ্য করিয়া আকাশপথে গমন করিলেন। এবং মুহূর্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া, ঋভুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান শুনিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়, বিশ্বামিত্র। ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত দিন সৈন্যচালনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ পথশ্রান্তিনিবন্ধন যে যেখানে পাইল সে সেইখানেই তাম্বু গাড়িতে আরম্ভ করিল। বিশ্বামিত্র কয়েকজন মন্ত্রী লইয়া কালিকার সৈন্যচালনার পরামর্শ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী-তটে আসিয়া বসিলেন। এমন সময় আকাশ আলোকময় হইয়া উঠিল, আর সেই সুমধুর গীতধ্বনি সকলের কানে গেল। সৈন্যগণ যে যেভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই নিশ্চল, নিস্পন্দ, সুখ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যে তাম্বু গাড়িয়াছে তাহার বিছানা করা হইল না, যে গাড়িতেছে তাহার অর্ধেকেই শেষ হইল, আব যে গাড়িবাব উদ্যোগ করিতেছে, তাহার ঐ পর্যন্ত। বিশ্বামিত্র গীতধ্বনি বুঝিলেন, অমনি ত্রিবিক্রমের ন্যায় ত্রিপাদবিক্ষেপে এক টিবায় উঠিলেন ; কিন্তু তাঁহার আগমনে যে ঋভুদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয়, বাল্মীকি। ইনি নিজ দস্যুদল সমভিব্যাহারে গিরিরাজের প্রাসাদে ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। নিজে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া দুই-পাঁচ জনকেও তথায় আনিয়া সিঁড়ি ভাঙিবার উদ্যোগ করিতেছেন, চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, রাজরক্ষীগণ কে কোথায় যাইবে স্থির করিতে পারিতেছে না। কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে, কোথাও ডাকাতে ডাকাত কাটিতেছে,

কোথাও রক্ষী রক্ষী কাটিতেছে। বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন, আর সংকেতমত শিঙা বাজাইতেছেন। এমন সময়ে আলোক ও গীতধ্বনি হইল। অমনি যে যেভাবে ছিল চিত্রপুত্তলিবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল। বাল্মীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন। অমনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং নিকটবর্তী টিব্বায় আরোহণ করিলেন।

৪

গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায় তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরো মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরো মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে সে আরো মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কান না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহু-ক্ষালিত-চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-শীর্ষা প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন। কান, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কানে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কানে উঠিয়াছে। জ্ঞান, চৈতন্য হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরো মুগ্ধ।

সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। ঋভুরা যেন বাহুপ্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরো ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

পৃথিবী সুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই ভাই। ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই ভাই। পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হইতে প্রতিধ্বনি হইল ভাই ভাই। যেন মোহিনীতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল ভাই ভাই। একজন পণ্ডিত, একজন দিগ্বিজয়ী, আর-একজন দস্যু, সবারই মনের বিরোধীভাব যেন মুহূর্ত জন্য তিরোহিত হইল। সবারই হৃদয় যেন একতানমনপ্রাণে বলিয়া উঠিল— ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৫

তিন জনই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা গানে এমনি উন্মত্ত যে বেগবান্ চিন্তাস্রোতেও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তলবাহিনী অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র ভাবনার তো কথাই নাই। তাঁহারা যেমন গানে তন্ময় তেমনই আছেন। অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর-একরূপ হইতেছে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ— আমি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি।

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা— আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে।

আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি ? বিষম আত্মগ্লানি। হায় ! আমি কি করিতেছি, আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্বনাশ করিতেছি !!!

হৃদয়ে এই যে ভাবনা চলিতেছে তাহার প্রতি কাহারো লক্ষ্য নাই।

৬

কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল আকাশ প্রকাণ্ড

এক সাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে; দ্বাপরের শেষকালে অর্জুন যেমন বিরাটমূর্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন ছিল তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি এতক্ষণ একদৃষ্টে ছায়াপথের দিকে হা করিয়া চাহিয়া ছিলেন; ঋভুরা চলিয়া গেলে হতাশ হইয়া পড়িলেন; তখনো সে সুর কানে বাজিতেছে, যেন বলিতেছে, ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে যে চিন্তা তাঁহারা এতক্ষণ টেরও পান নাই, তাহা উদ্দামরূপে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন বাল্যের, যৌবনের, প্রাচীন, নবীন স্বার্থপর, অস্বার্থপর নানাবিধ প্রবল বিরোধীভাবমালা যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হইয়া এই নবাগত অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ এমন ক্ষমতা রহিল না যে উঠিয়া কোথাও যান। অথচ কানে বাজিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৭

বশিষ্ঠের একবার মনে হইতেছে, বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমনি কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? আবার কানে বাজিতেছে— সেই সুর— সেই ভাই ভাই। আবার ভাবিতেছেন, সর্বশাস্ত্র তো আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে তো বলে "স্বকার্যমুদ্ধরেৎ" তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা তো সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি।

তারও এই মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য, ধর্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারি না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন? আহা, কি গান! কি ভাব! পারিব কি? আর কি দেখিতে পাইব? এবার দেখিতে পাইলে আমরাও সেই ভাই ভাই করিয়া জবাব দিব। সম্বল বুদ্ধি আর শাস্ত্র। পারিব বইকি? কানে বাজিল ভাই ভাই ভাই।

বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন, এঁরাই ঋভু! কি গান! কি মূর্তি! আমার কি সৌভাগ্য। হবে না কেন? আমায়ও একদিন ঐরূপ মাতিতে হইবে। পারিব বোধ হয়। একবার ঋভুদের সঙ্গে জবাব করিব। অহং বিশ্বামিত্রঃ। ভুবন জয় তো করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত তো করি। তার পর মিলাইব। কানে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন, পৃথিবীতে একদিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র— কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে তো পারিলাম না। হায় কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম? কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পলায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল? আবার যেন বাজিল ভাই ভাই ভাই। বাল্মীকির নয়ন-জলে বুক ভাসিয়া গেল। ভাবিলেন, কি পাপই করিয়াছিলাম! এ স্মৃতি কি নিবিবে না? আরো নয়নে দরবিগলিত বাষ্পপাত হইতে লাগিল।

৮

তাঁহারা কতক্ষণ অন্তরের গোলমালে ব্যাপৃত ছিলেন, কে বলিতে পারে? কতক্ষণ ঋভুদত্ত নববৈদ্যুতীবলে তাঁহাদের অন্তরাকাশে তুমুল ঝটিকাবৃষ্টি হইতেছিল কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন ভাবশান্তি হইয়া বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল, তখন দেখিলেন,

সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ আকাশে ভানূদয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাতবায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে, নির্ঝরশব্দ কান জুড়াইয়া দিতেছে, তিনজনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে।

তুমুল-ভাব-ঝটিকার অন্তে বশিষ্ঠের মনে শান্তি ও সুখ দৃষ্ট হইল। তিনি বুদ্ধি, বিদ্যা ও তপোবলে পৃথিবীতে ভাই ভাই স্থাপন করিবেন, এই আশায়, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গর্বপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বামিত্রের মনে ঘোরতর আত্মগরিমা, একটু ত্রস্ততা, আমি বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি। বাকিটুকু শীঘ্রই জয় করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিব।

বাল্মীকির শান্তি রহিল না, সুখ রহিল না, দারুণ অনুতাপ তাঁহার সর্বস্ব হইল।

তিনি দস্যুদলের দিকেও গেলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তি উদ্দেশে নিবিড় গহনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ মহাহৃষ্টচিত্তে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগবলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন তেজঃপুঞ্জশরীর বিশালবক্ষাঃ বিশ্বামিত্র পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া অবতরণ করিতেছেন, অমনি সসম্ভ্রমে যোগবলে তাঁহার নিকট আসিয়া দুইজনে পদব্রজে পর্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

# দ্বিতীয় খণ্ড

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নামিতেছেন, পদভরে পর্বত নমিত ও কম্পিত হইতেছে, সম্মুখস্থিত উপল সকল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের পথপ্রদান করিতেছে। প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষাবলী শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে, ও ছায়াদানে তাঁহাদিগের শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে, শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী সকল সুমধুর গীতে তাঁহাদিগের কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে, লতাসমূহ বৃক্ষোপরি হইতে তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গে পুষ্প বিকীরণ করিতেছে। কলকলনাদিনী নির্ঝরিণীগণ প্রতিপদে তরঙ্গহস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের পথমার্জনা করিতেছে। বনতলস্থ কোমলকায় গুল্মসমূহ, শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যময় পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উঁহাদিগের শরীরে চামর-ব্যজন করিতেছে। অতি দুর্গম দুরারোহ সানুসমূহেও তাঁহারা অবলীলাক্রমে অবতরণ করিতেছেন। পশ্চাৎভাগে অভ্রভেদী পর্বতমালা, নিম্নে তৃণাচ্ছাদিত সুনীল সমতলভূমি, মধ্যস্থলে তীব্র তেজোময় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র! উভয়েই পর্বতচূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ডকায়। বোধ হইতে লাগিল যেন সৌর-কর-প্রতিফলিত অতএব তীব্রোজ্জ্বল তুষারশিখরদ্বয় স্বস্থানবিচ্যুত হইয়া সমানগতিতে নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছে।

প্রথম সাক্ষাতে বন্দনাদির পর বশিষ্ঠদেব উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়াপরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহা-কন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজাধিরাজ বহুদিবসাবধি আমি শ্রুত আছি আপনি ভুবনবিজয় ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। তপঃস্বাধ্যায়াদি আনুশ্রবিক ক্রিয়াকলাপে

নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাতে ভবাদৃশ বীরজনের অদ্ভুতচরিত্রসম্বন্ধীয় সংবাদও লইতে পারি নাই। অদ্য পরমসৌভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎলাভ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া স্বকীয় দিগ্বিজয়ব্যাপারের অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

বশিষ্ঠের জীমূতমন্দ্র কণ্ঠধ্বনি গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে নিলীন হইবার পূর্বেই রাজাধিরাজ বিশ্বামিত্র ভীষণকোদণ্ডটংকারের ন্যায় স্পষ্ট অথচ দ্রুত, গম্ভীর অথচ ঈষৎ কার্কশ্যময় বীরকণ্ঠে স্বরযোজনা করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মর্ষে, মাদৃশ দীনজনের চরিতজ্ঞানে ভবাদৃশ মহাশয়ের কৌতূহল নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অতএব নিজমুখে নিজকীর্তি বর্ণনে প্রত্যবায়সত্ত্বেও আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিব।"

"সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চারি উপায়ের মধ্যে দিগ্বিজয়ীর পক্ষে ভেদ ও দণ্ডই প্রশস্ত। এইজন্য আমি ঐ উপায়দ্বয়ই অবলম্বন করিয়া এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রবিড়, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাষ্ট্র, মৎস্য, মগধ, বিদর্ভাদি দেশসমূহ স্বয়ং অক্ষৌহিণীমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হস্তগত করিয়া অদ্য হিমালয়দ্বারে শিবিরসংস্থাপন করিয়াছি। পূর্বাঞ্চলে চীন, হূন, সান, মান, শ্যাম, মগ, নাগাদি রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম সুচতুর বিশ্বস্ত মন্ত্রীবর্গকে প্রেরণ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন, পারদ, দরদ, আরব, পারস, ম্লেচ্ছ, কিরাতাদি জাতিসমূহকে উচ্ছৃঙ্খল করিবার মানসে নবনবতি অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সর্বপ্রধান-সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছি। সকল স্থান হইতেই সুসমাচার আসিয়াছে। হিমালয়জয়ের পর একবার সসৈন্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই আমার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয়।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজের দিগ্বিজয়কাহিনী শ্রবণে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনানী। আপনার পক্ষে ভুবনবিজয় অসম্ভাবিত নহে ; কিন্তু আমার এক বিষয়ে সন্দেহ আছে, মহাশয় ভঞ্জন করিয়া দিলে কৃতকৃতার্থ হইব।"

বিশ্বামিত্র। দীনের প্রতি এরূপ আদেশ অন্য কেহ করিলে উপহাস বলিয়া বোধ করিতাম, কিন্তু ভবাদৃশ গম্ভীরপ্রকৃতির লোক হইতে উপহাস সম্ভাবিত নহে, অতএব আজ্ঞা করুন, দাস হইতে যদি

আপনার কোনো কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, দাস করিতে প্রস্তুত আছে।

বশিষ্ঠ। আমার প্রথম সন্দেহ এই যে, দিগ্বিজয়ের ফলোপধায়িতা কি ?

বিশ্বামিত্র। মহাশয় এমন আজ্ঞা করিবেন না। দিগ্বিজয়ে সমস্ত পৃথিবীতে একজন রাজা হন, এবং এক রাজার অধীনে সমস্ত জাতিতে ঐক্য সংস্থাপিত হয়।

বশিষ্ঠ। আমার বোধ হয় দিগ্বিজয়ে জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া ঐক্যসম্ভাবনা সুদূরপরাহত করে। বিজিত জাতিদিগের মধ্যেও জেতার অনুগ্রহতারতম্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমার মন্তব্য এই যে, দিগ্বিজয়ে কি জাতিসমূহ মধ্যে ভ্রাতৃ-ভাব উৎপন্ন হয় ? সকলে ভাই ভাই হয় ?

বিশ্বামিত্র। আমার সংস্কার এই, দিগ্বিজয় ভিন্ন অন্য কিছুতেই পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবন্ধন হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা পিতার ন্যায়; সমস্ত প্রজাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে। গত রজনীর ঘটনায় আমার এই সংস্কার আরো দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। আমাকে দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্য স্থাপনে উৎসাহিত করিবার জন্যই কল্য ঋভুদিগের আগমন হইয়াছিল।

বশিষ্ঠ। এইটি আপনার ভ্রম। ঋভুগণ সময়ে সময়ে জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাকে উৎসাহিত করিতে আসেন নাই। আর এক কথা আপনি দিগ্বিজয় করিয়া মনুষ্যের শরীরই জয় করিলেন, তাহাদিগের মনের উপর আপনার প্রভুত্ব কি ?

বিশ্বামিত্র। মনে যাহাই থাকুক প্রকাশ হইতে দিব না।

বশিষ্ঠ। তাহার নাম দমন, পালন নহে, তাহাকে ভ্রাতৃভাব বলে না। মনে বিদ্বেষ থাকিলে ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না !

বিশ্বামিত্র। প্রথম বলে শাসন অভ্যস্ত হইলে যখন সকলেরই সমান দশা হয়, তখন সকলেই ভাই ভাই হইয়া যায়।

বশিষ্ঠ। সে ভাই ভাই নয়, সে রুদ্ধ অগ্নির ধূমোদগম মাত্র। সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে দেশ জ্বলিয়া উঠে। এবং সেই অগ্নিশিখায়ই দিগ্বিজয়ীর আহুতি হয়।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

বিশ্বামিত্র। আপনি মনে করিবেন না, ( দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া ) এই হস্তে ধনুর্বাণ থাকিতে প্রজারা বিদ্রোহী হইতে পারিবে।

বশিষ্ঠ। যদি ধনুর্বাণদ্বারাই ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে হইল, তবে তাহাকে কি ভ্রাতৃভাব বলা যাইতে পারে ?

বিশ্বামিত্র। মানিলাম, পারে না। কিন্তু দিগ্বিজয় ভিন্ন ভ্রাতৃভাবের অন্য উপায় আপনি দেখাইতে পারেন ?

বশিষ্ঠ। না পারিলে এত কথা বলিব কেন ?

বিশ্বামিত্র। দেখা যাউক, আপনার কমণ্ডলুমধ্যে কি উপায় আছে।

বশিষ্ঠ। উপায় এই : বলে মানুষের মিল করানো যায় না। মানুষে যতক্ষণ নিজে নিজের জন্য চিন্তা করিতে শিখে, ততক্ষণ দুই মানুষকে এক করা কাহারো সাধ্য নয়। অতএব স্বাধীনচিন্তাস্রোত রুদ্ধ করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন। নীচজাতির যাহাতে স্বাধীন-চিন্তা না থাকে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বামিত্র। জন পাঁচ-ছয় ব্রাহ্মণে মিলে পৃথিবীর লোকের স্বাধীন-চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিবেন !

বশিষ্ঠ। বুদ্ধিবলে কি না হয় ? আমি বাল্যকাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে ফিরাইয়া দিব ! ভোগসুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মিতে দিব না। একবারে গ্রন্থাদি পাঠ হইতে বঞ্চিত করিব। এইরূপে একপুরুষে না পারি, অন্তত দশপুরুষেও মনুষ্যে মনুষ্যে দূরে থাকুক, মনুষ্যে পশুতেও ভ্রাতৃভাব জন্মাইয়া দিব।

বিশ্বামিত্র। মানুষ পশুবৎ হইবে, কি আশ্চর্য ভ্রাতৃভাব ! ! ! এই ভ্রাতৃভাব কেন ? ব্রাহ্মণের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য ? দিগ্বিজয়ে একজন রাজার অধীনে থাকে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের অধীন হইতে হইবে। আপনি মনে করিয়াছেন তাহাতেই আপনারা কৃতকার্য হইতে পারিবেন ? আপনাদের পরম শত্রু আকাশ আছে, দেখিতেছেন না ? অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীনচিন্তা যে আপনিই উদ্বেল হইয়া উঠে।

বশিষ্ঠ। আমরা তাহারো বন্দোবস্ত করিয়াছি। অনন্ত আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা বসাইব ! আকাশের তারার সহিত মনুষ্যঅদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

অন্তরীক্ষ বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিব। যে ভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীনচিন্তা প্রবল হয়, সে ভাব তাহাদের মনেও আসিতে দিব না। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করিব যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারো এক পাও যাইবার ক্ষমতা রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মণ রাজাও হইবে না।

বিশ্বামিত্র। হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি— বুঝিয়াছি। বিটলামি করিয়া জগৎবশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বিটলামিতে কয়দিন লোকে ভুলিয়া থাকিবে ? আমি বেশ বলিতে পারি বিশ্বামিত্রের দলের কাহাকেও আপনি ভুলাইতে পারিবেন না।

বিশ্বামিত্রের কটূক্তিতে বশিষ্ঠের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে উহা শমিত করিলেন। ক্রোধোদ্রেক হইতে ক্রোধশান্তি পর্যন্ত বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র কূটতর্কে এবং শ্লেষোক্তিতে বশিষ্ঠকে পরাজিত করিয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং তিনিও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না।

নিঃশব্দে কিয়দ্দূর অবতরণ করিলে, বিশ্বামিত্র দূরে আপন শিবির দেখিতে পাইলেন। তখন একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, যদি কোনো বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, দাসের শিবিরে আতিথ্যগ্রহণ করিলে দাস কৃতকৃতার্থ হইবে।" বশিষ্ঠ সম্মত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে আপন শিবিরে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ জাঁক-সহকারে যে-সমস্ত অপার রত্নরাশি নানা দেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখাইলেন এবং উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইবার সময় বিশ্বামিত্রকে আপন আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

২

বিশ্বামিত্র যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বহুদূর হইতে তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশ্বামিত্র

একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তপোবন শাল, তাল, তমাল, পিয়াশাল, হিন্তাল, বক, বকুল প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় বনবৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, তলায় লতাগুল্মাদির লেশমাত্র নাই, সব পরিষ্কার, সিন্দূর পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, গণ্ডার, মহিষ, বৃক, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ, কেউটিয়া, গোক্ষুর, বোড়া, বোয়া, প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি খাদ্যজন্তুর দিকে তাকাইতেছেও না। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা তাঁহাদের পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাত্মন্, বুদ্ধিবলে বন্যজন্তু বশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানুষ বশ করিতে পারিবেন না।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহারা স্থানমাহাত্ম্যে বশ হইয়াছে ; আমাদের বুদ্ধিবলে নহে।"

কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই এ দৃশ্যের পরিবর্তন হইল, হঠাৎ বন উদ্যানে পরিণত হইল, প্রকাণ্ড তপোবন নানা প্রকার শরতের ফুলের কেয়ারিতে বোধ হইতে লাগিল কে যেন একখানি গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। কোথাও সাদা, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে সাদা, কোথাও নীল, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে নীল, কোথাও রাঙা, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে রাঙা, কোথাও সবুজ, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে সবুজ, কোথাও পীত, কেমন এক রঙ কমিয়া আর-এক রঙ বাড়িয়া যাইতেছে। যে স্থলে ফুলের রঙে বৈচিত্র্য হইতেছে না, সে স্থলে উপলে সে দোষ পূরাইয়া দিতেছে। গালিচার চারি পার্শ্বে নানাজাতীয় গন্ধপুষ্প, তাহার বাতাসে চারি দিক ভর ভর করিতেছে, প্রকাণ্ড গ্যালিচা— ঠিক মধ্যস্থলে, প্রকাণ্ড সরোবরে মার্বল পাথরের সিঁড়ি তলা পর্যন্ত মার্বল পাথরে বাঁধানো, জল এমনি স্বচ্ছ, তলার মার্বল পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। সরোবরের মধ্য দিয়া শ্বেত মর্মরের সেতু। সেতুর মরকতময় রেলের উপর নানা মণি-নির্মিত বিচিত্র দাঁড় ; তাহাতে শুক, শারিকা, হরিয়াল, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী বিচিত্র পক্ষপুচ্ছধারী ময়ূরময়ূরীগণ গান ও নৃত্যদ্বারা অভ্যাগত রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে। সরোবরের

স্বচ্ছজলে লাল, নীল, পীত, হরিত, হরিদ্রা, প্রভৃতি নানা রঙের মৎস্যসমূহ সন্তরণ করিতেছে। সরোবরের ওপাশেও গালিচা। এই গালিচার অবিদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দ্বার কষ্টিপাথরে নির্মিত। দ্বারে খোদিত স্বর্ণাক্ষরে লেখা—

"স্বাগতং গাধিকুলতিলকস্য বিশ্বামিত্রস্য।"

বিশ্বামিত্র প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও এরূপ অট্টালিকা কখনো দেখেন নাই। হীরা, মোতি, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ। উৎকৃষ্ট বহুমূল্য প্রস্তরে বাটীর আদ্যন্ত নির্মিত, আর তাহার উপর পরশুরামের যুদ্ধকাহিনী চারি দিকে তোলা করিয়া অঙ্কিত, কোথাও ক্ষত্রিয়শোণিতহ্রদে পরশুরাম পিতৃতর্পণ করিতেছেন, কোথাও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে আর ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হইতেছে, এরূপ একুশটি দেয়ালে একুশটি যুদ্ধকাহিনী লেখা রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত ভালো করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, বশিষ্ঠ তাঁহার আতিথ্যের জবাব দিতেছে, এবং তাঁহার সহিত যে, কথোপকথন হইয়াছিল তাহারও জবাব দিতেছে। মনে মনে তাঁহার বিদ্বেষভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল। হিংসা জন্মিতে লাগিল। আপাতত মনোভাব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলেন। মহানন্দে পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদি দর্শন সমাপন হইল, যাইবার সময় বশিষ্ঠ যথোচিত উপঢৌকন আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য কোথা হইতে আসিল।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী। তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখনো কাহাকেও দিব না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, “না দিলে অতিথির অবমাননা হয় সেটা স্মরণ রাখিবেন, আপনারা সমাজের ব্যবস্থাপক।”

বশিষ্ঠ বলিলেন, “বলে বা কৌশলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করানো অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, অতএব আপনাকে এরূপ অসৎ অভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।”

বিশ্বামিত্র আর ভাব গোপন করিতে পারিলেন না; বলিলেন, “আপনি দিবেন না, কিন্তু আমি অপহরণ করিব। অপহরণ করার অপরাধ বোধ হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করানো অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর নহে” বলিয়াই আপন লোকজনকে গোরু চুরি করিতে হুকুম দিলেন। এ দিকে অতিথি সৎদেবময়,— ওদিকে বলপূর্বক অপহরণ, বশিষ্ঠ মহা-বিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। লোকে ধেনু অপহরণ করিবার উদ্যোগ করিল, ধেনু কাতরনয়নে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, “কি করি বৎসে, অতিথি, রাজা, প্রবল-প্রতাপ দিগ্বিজয়ী তোমায় অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমিই ইহার প্রমাণ।” বলিবামাত্র নন্দিনী হুংকার ছাড়িলেন, হুংকারশব্দে আকাশ পাতাল ফাটিয়া গেল। আর অগণিতসংখ্যক পারদ, পারস, চীন, সান, মান প্রভৃতি নানাজাতীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া তথায় তাঁহার ত্রাণার্থ উপস্থিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিয়াই ভাবিলেন যে, পারদাদি জাতিকে তাঁহার সেনানীরা আজিও বলে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, বশিষ্ঠ বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন। জানিলেন বুদ্ধিবলে মানুষও আয়ত্ত করা যায়।

৩ ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাধিয়া উঠিল, একদিকে ক্ষত্রিয় সেনা, আর-একদিকে যবনসেনা, মধ্যস্থলে নন্দিনী। পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা কোনোমতেই ছাড়িতেছে না। যবনগণ গাভী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, যবন ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ, ব্রাহ্মণের জন্যে যুদ্ধ— ব্রাহ্মণ দর্শক। দীর্ঘ দীর্ঘ তরবারি, দীর্ঘ দীর্ঘ বর্শা, আর

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনুক. টংকারে টংকারে, মেঘগর্জন অনুভব হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র স্বসৈন্যর অভিনেতা. ব্রাহ্মণ পক্ষে অভিনেতা কেহই নাই. বশিষ্ঠ অতিথির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, এবং পুত্র ও শিষ্যগণকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না, বলিলেন, পুত্রগণ, শিষ্যগণ, ক্ষত্রিয়ের যাহাই হউক "ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা". ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ করিলেন না। কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ক্রমে রক্তপাত আরম্ভ হইল, ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল. যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলি রক্তে কর্দম হইল। এক দুই করিয়া ক্রমে বিশ্বামিত্রের শত শত সৈন্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতি নিহত হইতে লাগিল. তিনি স্বয়ং ভীমা অসি করে ধারণ করিয়া রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এক এক আঘাতে শত শত যবনের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন. কিন্তু তিনি দেখিলেন তাঁহার. প্রয়াস বৃথা, নন্দিনীর প্রতিহুংকারে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিতেছে. তাঁহার নিজের রণদুর্মদ অক্ষৌহিণী সে অজস্রউদগমশীল সৈন্যতরঙ্গের সম্মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। তখন বিশ্বামিত্র হুকুম দিলেন, "গোরু মেরে ফেল।" গোরু এখনো ক্ষত্রিয়দিগের করকবলিত হয় নাই। উহারা দূর হইতে নারাচবল্লমাদি ক্ষেপ করিয়া গোরুর প্রাণ-সংহারে উদ্যম করিবামাত্র গোরু দিব্য স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়া আকাশপথে উত্থিত হইল। শ্বেতপদ্মাসনা শ্বেতবস্ত্রবিভূষিতা শ্বেতবর্ণচ্ছটায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না লজ্জিত হয়, হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো ; তাহার উপর আবার শ্বেতপদ্মের সমস্ত বিভূষণ! বলিলেন, "রে মূর্খ, আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা. তোর সাধ্য কি, তুই আমায় অপহরণ করিস। আমি কুলক্রমে ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিয়া থাকি, করিয়াছি ও করিব।" বিশ্বামিত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেখিলেন সরস্বতী আবার ধেনুমূর্তি ধারণ করত, বশিষ্ঠসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন, সমস্ত সৈন্য বাতে মিশিয়া গেল। বশিষ্ঠের নয়নে দর দর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি স্বহস্তে ধেনুর গাত্রকণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের এই সর্বপ্রথম পরাজয়। মনের ক্ষোভে. দুঃখে. হিংসায়, বিশ্বামিত্র আর গাভী বা বশিষ্ঠের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ক্রোধে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিলেন. সৈন্যসামন্তকে আপন আপন বাড়ি যাইতে বলিলেন, রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিলেন। বলিলেন—

"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং"

বলিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্বত-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বামিত্র যে কেবল বাহুবলে সমস্ত ভুবন এক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন।

## তৃতীয়
## খণ্ড

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে আসিলেন না। মন্ত্রী রাজ্য করিতে লাগিল। তাঁহার পরিবারেরা আজি আসেন, কালি আসেন, ভাবিয়া ক্রমে দিন, মাস, বৎসর কাটাইয়া দিল। বশিষ্ঠ আবার আপন মতলব অনুসারে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল, বিশ্বামিত্র-পক্ষীয়েরা তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল।

এদিকে বিশ্বামিত্র একবারে ঘোরতর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ হইবেন, নিজহস্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই বল এক করিবেন, এবং সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় প্রভু হইবেন, সকলকে একশাসনে রাখিয়া একভাবে মিলাইবেন। এই তাঁহার মনস্থ হইল। তিনি হিমালয়ের এক অতি-নিভৃত জঙ্গলময় দুর্গম-স্থানে গমন করত একবারে ঘোরতর তপ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনে, এক গ্রাস আহার, তাহার পর অর্ধগ্রাস; তাহার পর এক দানা, তাহার পর অর্ধদানা; তৎপরে জলবিন্দু, তৎপরে আহার বন্ধ করিয়া তপ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সমস্ত মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। দৃক্‌পাত নাই, কেবল ধ্যান। চক্ষু কোঠরগত হইল, নাসিকার মধ্য-অস্থিমাত্র স্পষ্ট দেখা যায়, শরীরের সমস্ত হাড় কেবল চর্মমাত্রে আচ্ছাদিত হইল। কেশরাশি বর্ধিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পদ-নখ বর্ধিত হইয়া শিকড়ের মতো মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গেল। উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল। বিশ্বামিত্রের ধ্যান শেষ হয় না। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ দেখে আর ধীরভাবে দূর দিয়া চলিয়া যায়।

এই ভয়ানক অবস্থায় বিশ্বামিত্র নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেন, কখনো বোধ হইত সমস্ত জগৎ বিশ্বসংসার পরমাণু হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে একমাত্র তিনি, তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উঠিল। তাঁহার তেজে পরমাণু দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষে নিজ শরীরও দগ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ অন্তরের জ্বালায় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন কতকগুলি পরমাসুন্দরী যুবতী, অপ্সরা কোথায় লাগে, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহারা কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কেহ মদনবিহ্বললালসাঙ্গ হেলাইয়া বেড়াইতেছে, কেহ শরীরের অর্ধ অংশে বসনত্যাগ করিয়া, কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কটাক্ষবর্ষণ করিতেছে. কটাক্ষ কখনো কোমল. কখনো চঞ্চল. কখনো ঠারে ঠারে হৃদয়ের অভিলাষ ছড়াইয়া দিতেছে। কখনো অলস. কখনো বিদ্যুৎবৎ. কখনো চক্ষের পাতা কাঁপিতেছে. তাহার উপর কটাক্ষ বাণবৎ ঘন ঘন পড়িতেছে। কাহারো বেণী বদ্ধ. কাহারো এলো. কাহারো অলক কুঞ্চিত. কাহারো বায়ুভরে দোলায়মান। আর সকলেই নানা হাব-ভাব বিকাশ করিয়া. কেবল বিশ্বামিত্র প্রতি আপনাদের আলস, মদনভাব প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বামিত্র দেখিলেন! তাঁহার অন্তর-দাহ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে. তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কোটি সূর্য প্রকাশ হইয়াছে, তেজে নয়ন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে, গা পুড়িয়া যাইতেছে. বিশ্বামিত্র পলায়ন করিয়া সূর্যসমূহ হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে. যাইতে, যাইতে. যাইতে সূর্যের তেজ মন্দ হইল, কিন্তু যেখানে গেলেন. সেই-খানে ভয়ংকর সর্প শতসহস্র তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন ভয়ানক কাণ্ড, নানা প্রকার ভীষণাকার জন্তুগণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছে। কাহারো মুখ শূকরের মতো, সিংহের ন্যায় কেশর, যোজনবিস্তৃত লাঙ্গুল। কেহ ভীষণ পিশাচ, মাথার উপর চোখ. অর্ধেক শরীর হাতে ভরা, দুই হাত আর দুই পা দিয়া. চারি দিকে আহার-সামগ্রী হাতড়াইতেছে, আর যাহা পাইতেছে অমনি উদরসাৎ করিতেছে। কাহারো দন্ত শূকরের ন্যায়, কাহারো হস্তীর ন্যায়, কাহারো মাথা পর্বতের চূড়ার ন্যায়. কাহারো কেবল মস্তক, পদদ্বয় আছে কি না সন্দেহ। কোনো স্ত্রী পিশাচীর কেবল স্তনদ্বয়

পর্বতচূড়ার ন্যায় বৃহৎ, আবার কালো। কেহ কালো, কেহ নীল, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রা, নানা রঙে ভয়ংকর। যখন এই ভয়ানক সৈন্য সেনাপতির আদেশে বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করিল, তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত হইয়া গেল। কাহারো পদ ভগ্ন হইল, কাহারো প্রাণনাশ হইল, কাহারো মস্তক ক্ষত হইল। স্তনবতীর স্তনভার খসিয়া গিয়া তাহার শরীর হালকা হইল। এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে গেল ওর পা তাহার মাথায় গেল।

এইভাবে পিশাচসেনার ধ্বংস দেখিয়া পিশাচসেনাপতি হাসি হাসি মুখে ভাব করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, তুমি অতি বড়ো পরাক্রমশালী— তুমি ভুজবলে সমস্ত জয় করিয়াছ। তুমি তপোবলে কটাক্ষে আমার পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত করিয়া দিলে। অতএব তুমি আমার পুত্র হও ; এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিতেছ, ইহার সমস্ত অসুর, পিশাচ, দৈত্য, দানব আমার অধীন, তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে। আমি অচিরাৎ তোমায় রাজা করিয়া দিয়া স্বয়ং বিলাসসুখভোগে নিরত হইব। অতএব তুমি আমার পুত্র হও। এই হিমালয়চূড়ার উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে অসংখ্য সমৃদ্ধরাজ্য চারি দিকে রহিয়াছে,— সমস্ত তোমার হইবে। চীন, জাপান, মিসর, পারস্য, সব তোমার হইবে। এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্যা। উহারা তোমার হইবে। যত মণি, মুক্তা, কাঞ্চনের খনি দেখিতে পাইবে, সমস্ত আমার। আমার প্রজার সংখ্যা নাই ; তুমি আমার পুত্র হও, এই সমস্ত অতুল রাজত্বের একমাত্র অধীশ্বর হও, তোমার কোনো ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। যতদিন তুমি রাজ্যে স্থির হইতে না পার, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার রাজ্যের রক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি আমায় ব্রাহ্মণত্ব দিতে পার ? নন্দিনী দিতে পার ? বিদ্যা দিতে পার ? সরস্বতী দিতে পার ?" "না, পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিবার ক্ষমতা দিতে পারি। নন্দিনীর প্রাণনাশ করিয়া দিতে পারি। বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।" "তবে তোমায় দিয়া আমার কাজ হইবে না" বলিয়া বিশ্বামিত্র আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

২ এবার তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হয় না। ক্রমাগত নিশ্বাস বন্ধ করায়, ক্রমাগত একবিষয়ক চিন্তা করায়, ক্রমাগত অনাহারে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল না। কিন্তু তিনি কঠোর তপস্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার কর্ণকুহর হইতে জাঁতার ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল, নাসিকা দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সেই শব্দের পর তাঁহার মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া রাশিচক্র দক্ষিণ হইতে বাম-দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছায়াপথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মাথার খুলি অভ্যন্তরস্থ অগ্ন্যুত্তাপে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল, বিশ্বসংসারে বুম করিয়া শব্দ হইল, শব্দ আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ; শেষে ব্রহ্মাণ্ডের কপাল কপালিকা বিদীর্ণ করিয়া সেই পথে বাহির হইয়া গেল।

তাহার বাহির হইতে দূরস্থিত শত সহস্র অনবরত মেঘগর্জনের ন্যায় শুনা গেল—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ॥

বিশ্বামিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মস্তকাস্থি নীচে নামিয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার শরীর সবল সতেজ ও কান্তিপুষ্ট হইল। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণত্ব না পাই, বেদমন্ত্রদর্শন ব্রাহ্মণের স্বত্ব ছিল, তাহা তো ছিন্ন করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট, বলিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

৩ বিশ্বামিত্রের ধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডে যে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর কাহারো অবিদিত রহিল না। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে মহাসভায় আহ্বান করিলেন। কণ্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, সব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশপথে সভা হইল, বোধ হইল, আকাশপথে শত শত সূর্যের উদয় হইয়াছে ; সভায় একজন শূদ্র রাজাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইল। বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র

ব্রাহ্মণমাত্রেরই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইল। কিন্তু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, কোনো ব্রহ্মর্ষি বা দেবর্ষিই অনুমোদন করিলেন না। কেহ বলিলেন, বিশ্বামিত্র এখনই বিশ্বের প্রায় কর্তা হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে। কেহ বলিলেন, উহার দুরাকাঙ্ক্ষা বড়ো প্রবলা, আজি ব্রাহ্মণত্ব পাইলে, কালি ব্রহ্মত্ব চাহিয়া বসিবে। অতএব উহাকে সাহস দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। অনন্তর সমবেত ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মাকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মার প্রতি ভার রহিল, আপনি ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন আর যাহাই চায়, দিবেন। তখন সূর্য-বিনিন্দিত প্রভারাশি বিস্তার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্যরশ্মিরথে আরোহণ করিয়া হিমালয়ের সেই নিভৃত গুহায় আবির্ভূত হইলেন। বিশ্বামিত্রের ধ্যান-ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রহ্মা, তোমার ধ্যানে তৃপ্ত হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। কি বর চাহ, যদি অদেয় না হয়, তবে দিব।" "আমি ব্রাহ্মণত্ব চাহি, দিতে পার?" "না।" "আমি তোমার মতো ব্রহ্মার বর চাহি না।" ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আবার সূর্যরশ্মিরথে আরোহণ করত ব্রহ্মর্ষিসভায় উপস্থিত হইলেন; এবং উহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই সম্মত হইল না। তখন পরামর্শ হইল সকলে গিয়া বিশ্বামিত্রকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অন্য কোনো বরদানে তুষ্ট করা যাউক। বশিষ্ঠ একবার নিজে যাইতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু পরে ব্রহ্মা ও অন্যান্য সভাসদগণের অনুরোধে যাইতে স্বীকার করিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জকান্তি ঋষিগণ কেহ সূর্যরশ্মিরথে, কেহ মনোজবে, কেহ বায়ু-অশ্বে, কেহ যোগবলে বিশ্বামিত্র সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন। বিশ্বামিত্র সমাগত বরদাতাগণের মধ্যে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন: এবং অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। সভাসদগণ বুঝাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণত্ব অতি সামান্য পদার্থ, তুমি যেরূপ উপযুক্ত, যেরূপ তপস্বী, মহা-পুরুষ, তুমি তো ব্রাহ্মণের চূড়া। যখন ব্রাহ্মণমাত্রেই তোমার মন্ত্র পাঠ করিবে, জপ করিবে, নিয়ম করা গেল, তখন তোমার ব্রাহ্মণত্বের বাকি কি রহিল? ব্রাহ্মণত্বে অনেক কষ্ট, অনেক ব্রত নিয়ম করিতে হয়। তুমি রাজা, তোমার তাহা কষ্টকর হইবে।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

বিশ্বামিত্র। আমি যখন এত কঠোর তপ করিয়াছি, তখন কি ব্রাহ্মণের ব্রত পালন করিতে পারিব না?

"তুমি পারিবে না, তা কি বলিতেছি, এত কষ্টে তোমার কাজ কি? তুমি ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য চেষ্টা কর না কেন? তাহাই তোমার যোগ্যপদ। আর আমরা তোমার তপে সন্তুষ্ট হইয়া, আজি তোমায় রাজর্ষি উপাধি দিলাম। তুমি জান ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষির নীচেই রাজর্ষি, তোমায় তৃতীয় শ্রেণীর ঋষি করিয়া দিলাম। তোমার ব্রাহ্মণত্বে কাজ কি? এই লহো রাজর্ষি সম্ভ্রমসূচক পদক গ্রহণ করো।" বিশ্বামিত্র এই সমস্ত কথার চাতুরী বেশ বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ যে তাঁহার তপে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। তিনি পদক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষিগণ তোমাদের চাতুরী বুঝিয়াছি। তোমরা স্তোক বাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্ব-প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোশামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখো দেখি তোমরা কেমন পার।" বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কেমন বলিয়াছিলাম তো, ব্রাহ্মণত্ব এখনো পায় নাই, তাহাতেই এই।" ঋষিরা আবার নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "তুমি মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য কি? যাহার তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য কি? কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু, তোমায় এক উপদেশ দিই, কেন এত কষ্ট পাইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমি তো অদ্বিতীয়। তুমি ব্রাহ্মণের উপর ব্রহ্মারও উপর; তবে কেন তুমি সৃষ্টিশ্রম স্বীকার করিতে চাও।"

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণকুল নির্মূল করো, আমি তোমাদের সৃষ্টিতে থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।

ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণার্থ ধবলগিরির সর্বোন্নত শিখর দেশে আরোহণ করিলেন।

# চতুর্থ খণ্ড

শরৎকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অগণ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোনো পদার্থ লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহা আরো পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে-সব আর কিছু নহে, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনো পৃথিবী বা সৌর-জগৎ গঠিত হয় নাই। নীহারের ন্যায় লক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ উহাকে নীহারিকা বলেন।

যে দিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন, সেই দিন প্রথমত ঐ সকল নীহারিকা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তাড়িতের ন্যায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্তে শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিজে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, তৎপশ্চাৎ আগুলফবিলম্বিত পিঙ্গল বর্ণ জটাজূটভার। সূর্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে। দিবসে দেখিয়া পৃথিবীস্থ লোক অকাল উল্কাপাতবৎ বোধ করিতে লাগিল। রজনী গাঢ়ান্ধকার হইলে বশিষ্ঠ আপন আশ্রমে নির্জনে নিজমন্ত্র সাধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সহসা আকাশে ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া ভাবী বিপৎ-পাতের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। যে হৃদয় মহারণে অটল, ব্রহ্মর্ষিসভায় অক্ষুব্ধ, সে হৃদয় অকস্মাৎ ভীত ভীত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ক্রমে বায়ুপথ, ক্রমে স্থিরবায়ুপথ, ক্রমে কারণবারিপথ, ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তগ্রহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার গ্রহ উপগ্রহ পার হইয়া তৃতীয়

সৌর-জগতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৌর-জগৎ হইতে সৌর-জগৎ, তার পর সৌর-জগৎ, তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকম্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন। উহা অনন্ত, অনাদি, গাঢ়, সুগম্ভীর, অকূল, অতল, অলঙ্ঘ্য, অপার, আকৃতিবিহীন ভীমপারাবারবৎ। আর গ্রহ নক্ষত্রাদি নাই, ক্রমে তাহারা দূরতর হইতে লাগিল। আলোকও ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র মানুষবলে উঠিতেছেন না, তিনি যোগবলে উঠিতেছেন। সুতরাং এই কল্পনারও অগম্য ভীষণ স্থানে তাঁহার ভীতি সঞ্চার হইল না। বহুদূর এই অগাধ অনন্ত-মধ্যে যাইয়া তিনি ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইলেন, কোনো অলক্ষ্য কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে আবর্তক্রমে অগাধ, অসীম, অসংখ্য, অনন্ত পরমাণুরাশি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এই তাঁহার গন্তব্য নীহারিকা বোধ হওয়ায় তাহার সন্মুখে অবিদূরে আপন গতি রোধ করিলেন।

২

বিশ্বামিত্র তথায় ধ্যানবলে জানিলেন অগাধ, অনন্ত, শূন্যগর্ভে অসংখ্য নীহারিকা আছে। তখন তিনি সেই সমস্ত নীহারিকা যোগবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশিমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অতিক্ষীণালোকে দেখিতে লাগিলেন, যেন প্রকাণ্ডকায় জলজন্তুসমূহ জলোন্মথনে ভীত হইয়া কাচস্বচ্ছতড়াগের তলদেশে ত্রস্তভাবে কোনো নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতেছে। অথবা যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডসমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রতাড়িত হইয়া একস্থানে সমবেত হইতেছে।

যখন ইচ্ছামতো-সংখ্যক নীহারিকা উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন যোগবলে সেই সমস্ত নীহারিকা একত্র করিয়া তাহাতে ঘূর্ণাগতি সমুৎপাদন করিলেন। প্রত্যেক নীহারিকা আপন আপন কেন্দ্রে ঘুরিতে লাগিল, আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণাগতি মুহূর্তে মুহূর্তে বর্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্বুদ অর্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব খর্ব, নিখর্ব নিখর্ব, পরার্ধ পরার্ধ ক্রোশ

ঘুরিতে লাগিল। যতই ঘুরিতে লাগিল ততই পরমাণুসমূহ নিকটবর্তী হইতে এবং ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে যত অধিক ঘনীভূত হইতে লাগিল ততই উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জ্বলিয়া উঠিল। পরার্ধ ক্রোশ দূরে নক্ষত্র ছিল, কোথায় লুকাইয়া গেল। গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া, তমোরাশিকে নূতন পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া, চিরান্ধকার অনন্তগর্ভগহ্বর আলোকিত করিয়া, সেই অনন্ত দিক্‌প্রসারী আলোকপরম্পরা নব নব বেশে পলে পলে ছয় কোটি ক্রোশ পর্যটন করিয়া বশিষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য ধাবিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ আলোক উত্তম হইয়াছে। তাঁহার সৌর-জগতের সূর্য উত্তম হইয়াছে। কোটি কল্পেও এ অগ্নি নির্বাণ হইবে না।

৩

কিয়ৎক্ষণ জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক", অমনি সেই ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্তপদার্থ হইতে এক-খণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল, এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক", অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া দূরে উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক", অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী-দ্বীপ-সাগরবতী পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া তিনদিনের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, হর্শেল, নেপচুন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আমাদের সৌর-জগতে যাহা যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটি গুণে বড়ো হইল, সূর্য কোটি গুণে বড়ো। পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল।

৪

তৃণ, বায়ু, জল, পর্বত, নদী, বন, বৃক্ষ, বরফ যেমন যেমন এ পৃথিবীতে আছে, সব ঠিক তেমনি হইল ; অধিকের মধ্যে নারিকেলগাছ, তখন এখানে ছিল না— তাহা হইল। তাঁহার জগতে হিংস্র জন্তু রহিল না ; বিচিত্রপক্ষী পক্ষচ্ছটায় নয়ন মন রঞ্জন করে, এইই অধিক ; বিচিত্র পশু, দেখিতে অতি মনোহর ; সমস্তই সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষ— বৃক্ষের পত্র সুগন্ধি, কাষ্ঠ সুগন্ধি, ফুল সুগন্ধি, আস্বাদ সুগন্ধি— যে তৃণদ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আচ্ছাদিত তাহাও আতর অপেক্ষা সুগন্ধি। আকাশ হইতে যে বৃষ্টি পড়িত, তাহা গোলাব। বায়ু, ধূপ-ধুনা-গন্ধামোদিত। আহারীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে হয় না— বন, জল, বায়ু আহারীয় প্রদান করে, এবং ইহার পরও সহস্র সহস্র বৎসর দিতে পারিবে, কাহারো কৃষিকর্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না ; লোকসংখ্যা যদি অগণ্য বর্ধিত হয়, তবেই যাহা হউক। বাড়ি ঘর দ্বার বিছানা রহিবে না, সুগন্ধি সুস্পর্শ অতি কোমল তৃণই শয্যা, সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময়ে থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার উপর দারুণ সূর্য উত্তাপ, এজন্য সমস্ত রাস্তার উপর আচ্ছাদন দেওয়া, তাহার উপর দুই প্রহরের সময় বরফ দেওয়া হয়, মাঠে যখন দারুণ গ্রীষ্ম রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। বিশ্বামিত্র নিজে স্বভাবসৌন্দর্যের জন্য বড়োই পাগল, এইজন্য পাহাড়ে উঠিবার উপায় করিয়া দিলেন। লোকে যাহাতে সর্বদা পর্বতের শিখরাগ্র হইতে সমুদ্রের তলা পর্যন্ত সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার নানা উপায় করিয়া দিলেন।

৫

আর মনুষ্য— নূতন জগতে নূতন মনুষ্য হইল। সৃষ্টি আপনার মনোমত, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে মনুষ্য সুখময়, দুঃখভোগের প্রবৃত্তি সকল আদৌ রহিল না। অতি উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইবার উপায় রহিল। বিশ্বামিত্রের সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; কেবলমাত্র মনের উচ্চতর বৃত্তি সকল চালনা করিয়াই তাহারা ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু

তাহার পর স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একেবারে চক্ষু-লজ্জাশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধি-বৃত্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য চারি দিকে বিদ্যালয়, কালেজ নির্মাণ করিয়া দিলেন। উচ্চনীতিশিক্ষা, উচ্চশাসন, প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক রহিল না; সকল লোক একত্র হইয়া এ সকল কার্য নির্বাহ করিবে। যুক্তি একমাত্র উপাস্য দেবতা, তদ্ভিন্ন আর উপাস্য দেবতা একেবারে রহিল না। সকলে নিত্য নিত্য যুক্তি-দেবীর মাত্র উপাসনা করিত।

আর প্রেম? সকলই প্রেমময়, মানুষ সব সমান। যদি কাহারো কোনো বিষয়ে উন্নতি হয়, তবে সে তাহাদ্বারা অন্য লোকের উপকার করিবে, সব সমান করিয়া লইবে। বিশ্বামিত্রের জগতে সব মানুষ সুন্দর, কালো কুৎসিত দুই-একটা কদাচ কখনো মিলিত কি না সন্দেহ। সকলেরই মুখে এমনি মোহিনীময় ভাব যে, মুখ দেখিলেই পরস্পর মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সেখানে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইলে, শেকহ্যাণ্ড বা নড বা নমস্কার করিত না, একেবারে কোলাকুলি ও গাঢ় আলিঙ্গন। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উন্নতিপথে ধাবমান। নূতন জগতে, নূতন উৎসাহে, লোকে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, কখনো পর্বতে উঠিয়া বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, কখনো নদীগর্ভে গিয়া তথাকার গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, কখনো আকাশ-পথে উড্ডীন হইয়া নানা কার্যে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নাই: কিন্তু প্রণয় এমনি পদার্থ, বিবাহ না থাকিলেও একবার মনোমিলন হইলে প্রায় আর বিচ্ছেদ হইত না। বিচ্ছেদ হইলেও তিন বৎসরকাল পুনর্মিলনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কেহ অন্যের সহবাস করিত না। এরূপ করিলেও কেহ দোষ বলিত না; লোকে জিতেন্দ্রিয় ছিল; চৌর্যাদি ভয়ানক দোষ কিছুমাত্র ছিল না। গীতবাদ্যাদি কলায় সমস্ত লোকই পটু ছিল, সকলে মিলিয়া সকল স্থানে হয় গান, নয় বাজনা, নয় অভিনয়, না-হয় নৃত্য প্রত্যহই হইত। প্রত্যহ পৃথিবীময় নূতন উৎসব হইত, কোনো

প্রকার রাজা, সেনাপতি, কিছুরই ভয় ছিল না। সকলে মিলিয়া যাহা করে, তাহাই হয়। পদার্থের গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান, আর প্রতিবেশীদিগের মনোরঞ্জন, ইহাই বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে লোকের নিত্যকর্ম হইল।

উল্লাস— উল্লাস— উল্লাস, মনের উল্লাসে পৃথিবীস্থ লোক নৃত্য করে। যে সকল কারণ থাকায় পৃথিবীর মানুষে মানুষে গরমিল, বিশ্বামিত্র মানুষের মন হইতে সেগুলি অতি যত্নে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যশের আশা, টাকার তৃষ্ণা ও আধিপত্যের আশা কাহারো ছিল না। কেবল আমোদ; আজি আমার আমোদে তুমি যোগ দিলে, কালি তোমার আমোদে আমি যোগ দিলাম। বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া যাইত; এইরূপে সাত-আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে জন্ম দুই প্রকার। পুনরাবর্তন জন্ম আর নূতন জন্ম; নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যাত ছিল, রোজ সেই কয়টি করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি পুনরাবর্তন জন্ম। বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত বলা যায় না।

৬

ওদিকে বাল্মীকি হিমালয়জঙ্গল-মধ্যে কেবল রোদন করিয়া বেড়ান, রোদনের বিরাম নাই, অন্তর্দাহেরও বিরাম নাই, কি পাপই করিয়াছি, কেমন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যত ভাবেন ততই হৃদয় উদ্বেল হয়, ততই একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। দস্যুদলের সহিত আর দেখা করেন না। তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখা পায় না। মানুষ দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা আরো বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশুপক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল, পশুপক্ষীও তাঁহার কাতর ভাবে কাতর। তিনি কোনো পশুকে আহার দেন, কাহারো গলা চুলকাইয়া দেন, কাহাকেও স্নান করাইয়া দেন, এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে একদিন এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন বড়ো আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে, এ ওর গায় পড়িতেছে, এ ওকে ঠোকরাইতেছে, এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে, ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া আসিতেছে। এ একবার

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

উলটিয়া উহার ঘাড়ে পড়িতেছে, ও আবার উলটিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতেছে। আবার উড়িয়া উড়িয়া পাখা নাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া আর-এক ডালে বসিতেছে. বাল্মীকি একতান মনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন. "ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও তো কত সঙ্গী আছে।" আর ভাবিতে পারিলেন না। পূর্ব কথা আবার নূতন হইয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া একটি পক্ষীর প্রাণ সংহার করিল। পক্ষী পড়িয়া ভূতলে লুটাইয়া ছটফট করিতে লাগিল। ব্যাধে দৌড়িয়া পাখি লইতে আসিল। বাল্মীকি বলিলেন, রে পাপাত্মা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

বলিবামাত্র বাল্মীকি দেখিলেন, নির্ঝর-মধ্য হইতে একটি কন্যা কানন-পথ আলো করিয়া আসিতেছে, তাহার কান্তি অপ্সরাবিনিন্দিত, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ মন্দ ও হৃদয়-মুগ্ধকর। কামিনীর কমনীয় কান্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চ সংগ্রহ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছিল, সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পশু, পক্ষীগণ নীরব হইল। কন্যা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্মীকির কথা সরিল না, কন্যাও বাল্মীকিকে কথা কহিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন, "বাল্মীকি, বিস্মিত হইও না, আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা! কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার মতো কোমলহৃদয় দেখি নাই, এইজন্য তোমায় এই বীণা দিতে আসিয়াছি। এই বীণা তোমার ও তোমার মতো লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে, তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ইহার ব্যবহার করিবে।" বাল্মীকি চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বীণা তাঁহার হাতেই রহিল, সরস্বতী অন্তর্ধান হইলেন।

# পঞ্চম খণ্ড

বিশ্বামিত্র পৃথিবী হইতে নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্থান করিলে পুরাতন সৃষ্টির কি হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পৃথিবীময় গোলমাল, অরাজক, লুঠপাট, সর্বদা শোণিতস্রোতপ্রবাহ। আমরা ইতিহাসে অনেক অরাজকসময়ের বিষয় পাঠ করিয়া থাকি। যবনসাম্রাজ্য বিনাশ হইলে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত ভারতে যেরূপ ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের সর্গার্থগমনের পর যাহা ঘটে, উহা তাহার শতাংশের একাংশও নহে। মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাক্ষস ও বানর এই চারিটি প্রধান জাতি ছিল। যবন, ম্লেচ্ছ, হূনাদিজাতির রাজ্য বিশ্বামিত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজারা অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে পলাইয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, অনেকে যে, কে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই, তাঁহাদের রাজ্যেও ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। লুঠেরারা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে, নগর দাহ করে, নগরকে নগর কাটিয়া ওয়ার করিয়া দেয়। এই সময় বাল্মীকি সর্বপ্রধান লুঠেরা দলের আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই, তাহারা গুহক নামক চণ্ডালকে কর্তা করিয়া সমস্ত হিন্দুস্থান লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। আজি যমুনোত্রী, কালি প্রয়াগ, অদ্য শতদ্রুসংগম, পরশ্ব সরযূতীরে লুঠ করিতে লাগিয়াছে। এই সময়ে লুঠেরার দল দেখিলে কলির একাকার বোধ হইত, বড়ো বড়ো দলে ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সব একত্র আহার, একত্র শয়ন, এক ব্যবসায়, এক আমোদে মত্ত হইয়া মহাধূমধামে বাস, এক নরহত্যা ও

দেশলুণ্ঠনকার্যে সব ব্রতী, তাহারা একেবারে দেবেরও দুর্দম হইয়া উঠিল। এই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময় যদি একটি রাজত্ব প্রবল থাকিত, তাহা হইলেও হইত। যদি এক জাতির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত। তাহা ছিল না। সকল রাজ্যেই দুইটি করিয়া দল ছিল। সকল জাতির মধ্যেই অনৈক্য ছিল, যে দলের হস্তে রাজক্ষমতা ছিল, তাহারা ঘোর অত্যাচারী, তাহাদের দারুণ অত্যাচার অপেক্ষা লুঠেরাদিগের অত্যাচার সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। লুঠেরারা খুন করিত, উহারা দগ্ধাইয়া দগ্ধাইয়া মারিত। এই সময়ে রাবণ প্রবলপরাক্রম নরপতি। পরস্ত্রীহরণ, পরধনঅপহরণ, পরদেশলুণ্ঠন, পরপীড়ন, ক্রীড়ার্থ পরকে যন্ত্রণাপ্রদান, তাঁহার প্রধান আমোদ। তাঁহার দেশে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষে ভ্রাতা বিভীষণ। রাবণ বিভীষণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বিভীষণের স্বপক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছিল বলিয়া, একজন প্রধান মন্ত্রীর নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বানররাজ্যস্থ সুগ্রীবের সহিত বিভীষণের মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য খর দূষণ নামক নিষ্ঠুর ও অবিমৃষ্যকারী সেনাপতিদ্বয়কে দণ্ডকারণ্যে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন।

বানরদিগের দেশে বালীরাজা নিজবিরুদ্ধপক্ষকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতেন। বড়ো বড়ো লোকালয় সকল বালীর অনুচরবর্গের অত্যাচারে জনশূন্য ভয়ংকর মরুর ন্যায় হইয়াছিল। ঐ যে "দণ্ডকারণ্য" "দণ্ডকারণ্য" শুনা যায়, উহা এক কালে সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বালীরাজার অত্যাচারে নির্জন অরণ্য, সিংহব্যাঘ্রাদিনিবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই দল, দুই দলই বা বলি কেন? সকলেই স্ব স্ব প্রধান, তবে এই সমস্ত স্ব স্ব প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের প্রধান নায়ক পরশুরাম —ক্ষত্রিয়ের নাম পর্যন্ত লোপ করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু পরশুরাম সকলের উপর চটা, তিনি সমুদ্রতীরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কথামতো কাজ না করাতে আবার ক্ষত্রিয় প্রবল হইয়াছে, অতএব তাঁহার ইচ্ছা দুয়েরই মূলোচ্ছেদ হয়।

তিনি একাই এক সহস্র। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কার্যে যোগ দেন না। তাঁহার মতো যাহারা ক্ষাত্রিয়ান্তক, তাহারা যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। ব্রাহ্মণদিগের অপর দলের অধিনায়ক বশিষ্ঠ, তিনিও আপন দলের সর্বময় প্রভু নহেন। তবে তাঁহার দলে তাঁহার কতকটা প্রভুত্ব আছে।

ক্ষাত্রিয়দিগের মধ্যে একদল বশিষ্ঠের নিকট নানা প্রকারে বাধ্য, এইজন্য তাহারা ব্রাহ্মণক্ষাত্রিয়ে যাহাতে মিল থাকে, তাহার জন্য যত্নবান্। এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান। আর-এক দল পরশুরাম যেমন ক্ষাত্রিয়ান্তক সেইরূপ ব্রাহ্মণান্তক। বিশ্বামিত্রবংশ ইহাদের সর্বপ্রধান। বশিষ্ঠ ভিন্ন আর সকল দলই পরস্পর অনিষ্ট করিবার জন্য প্রাণও দিতে পারে। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খর-দূষণকে আহ্বান করিতেন, কখনো কিন্তু করিতেন না। প্রয়োজন হইলে পরপক্ষ পীড়নের জন্য দস্যুদল আহ্বান করিতে কাহারো মনে কোনোরূপ কষ্ট হইত না, সামান্য কারণে বিবাদ হইয়া দেশকে দেশ ছারখার হইয়া যাইত। অধিক উদাহরণ দিতে হইবে না, একদিন বিশ্বামিত্রের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে একজন ব্রাহ্মণ ধরা পড়িল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত, কশাঘাত করিলেন, তাহার নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়া কর্ণে গলা সীসা ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর বহু-সংখ্যক কুকুর আনিয়া তাহাকে এই সকল কুকুর সমভিব্যাহারে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন, দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের নাম করিল। ভরদ্বাজ ঋষি বহু-সংখ্যক শিষ্য সঙ্গে যমুনা হইতে অল্প দূরে বাস করেন, তিনি এক প্রকাণ্ড জঙ্গলখণ্ডের সর্বময় কর্তা, কিন্তু তিনি বশিষ্ঠ বা পরশুরাম কোনো দলেই নহেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণ নির্বিরোধে থাকিবে, তিনি পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন ; কিন্তু তিনি অসদ্ভাবও করেন না, অতএব তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করে। মন্ত্রী যন্ত্রণায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের মুখে ভরদ্বাজের নাম শুনিয়া উহাকে ভরদ্বাজের গুপ্তচর মনে করিয়া আরো যন্ত্রণা দিয়া উহার প্রাণবধ করিলেন, এবং কুড়িদল দস্যু সংগ্রহ করত পরদিন ভরদ্বাজ মুনির তপোবনের চারি দিকে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ এবং

তাঁহার কয়েক জন শিষ্য যোগবলে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু অসংখ্য-প্রাণীসমেত সমস্ত বন একদিনে মরুময় হইয়া উঠিল।

২

এদিকে বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া, ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগ করত লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখে বোধ হয় সর্বপ্রথম তাঁহারই নয়ন দিয়া জলধারা পড়িল। এই জলধারা কয়জনের পড়ে? কিন্তু এ জলধারা এক-একটি অমূল্য ধন, এক-এক বিন্দুতে শত অত্যাচার শমিত হয়। এইভাবে রোদন ও গান করিতে করিতে বাল্মীকি সমস্ত হিন্দুস্থান পর্যটন করিলেন। কিরূপে নিবারণ করিবেন জানেন না; কিন্তু আর থাকিতেও পারেন না। একদিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন আর নয়নাসারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, এমন সময়ে অতি দূরে ঘোরতর ভয়ংকর শব্দ হইল— প্রথম ডাকাইতির মতো চীৎকার, তাহার পর আর্তনাদ আরম্ভ হইল, বাল্মীকি আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দূরে গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড নগরে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। বাল্মীকি বীণা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দস্যুদলের নায়কের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা এ কর্ম ছাড়ো।"

পরের জন্য কান্নার অনেক গুণ, তুমি নিজের জন্য কাঁদো, তোমার কান্না কেহ শুনিবে না, তুমি একবার পরের জন্য কাঁদো দেখি, সকলেই তোমার সঙ্গে কাঁদিবে: তাহাতে আবার যদি তোমার কান্নার গভীর সহৃদয়তা থাকে তাহা হইলে আরো কাঁদিবে। বাল্মীকির রোদনে ও গানে এবং তাঁহার ভাবে দস্যুদলপতি একটু গলিলেন, গলিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, গায়ক বাল্মীকি। দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ লুঠতরাজ বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার নিজের দল থামিল। কিন্তু তাঁহার দলে যে ম্লেচ্ছ, যবন, বানর, ও রাক্ষস ছিল, তাহারা থামিবে কেন? দলপতি

নিজে তাহাদিগকে থামাইতে গেলেন ; কিন্তু গিয়া দেখেন, রাক্ষসেরা রাজপরিবারস্থ সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। দস্যুদলপতি তখনো তাহাদের থামিতে বলিলেন। একে রাক্ষস, তাহাতে মদ খাইয়া লুঠে উন্মত্ত হইয়াছে। তাঁহার কথা তাহারা কেন শুনিবে ? তাহারা আরো খেপিয়া উঠিল। তখন দলপতি বাহুবলে তাহাদিগকে নগরবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু বাহিরে গিয়াই তাহারা যবন ম্লেচ্ছ ও বানরের সহিত মিলিত হইয়া ভীমপরাক্রমে দস্যুশিবির আক্রমণ করিল। দলপতি কষ্টে শিবির-মধ্যে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন, বাল্মীকি বীণাহস্তে "ভাই ভাই" গাইতেছেন, সমস্ত দস্যুদল শুনিয়া কেবল কাঁদিতেছে— নিঃশব্দে সহস্র যোদ্ধা কাঁদিতেছে। নরহত্যা যাহাদের ব্যবসায়, জীবিকা, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে— অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। সমবেত রাক্ষসাদি যে আক্রমণ করিতেছে, সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই। রাক্ষসেরা ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল, বাল্মীকির গান আরো উচ্চ হইল, দয়াভিক্ষায় পূর্ণ হইল। মানবদুঃখবর্ণনায় পূর্ণ হইল। হৃদয় মাতাইয়া তুলিল। রাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ঋভুদিগের গান শুনিয়া বাল্মীকির যাহা হইয়াছিল, আজি সমস্ত দস্যুদলের সেই ভাব হইল। কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি রাক্ষস, কি বানর সব মোহিত, দয়া সকল হৃদয়ে প্রবল হইল। গানে যেমন বলিতেছে, "ভাই রে, যা করেছিস করেছিস, আর করিস নে। দেখ দেখি, তোর যদি এমনি হয়, তুই কি করিস। সকলেই মানুষ তো ? তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময়, সবারই তেমনি। মনে কর, যদি তোর লাগে, কত দরদ হয় : কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হ'স্, আর অন্যের মস্তকে তরবারি আঘাত করিস। আহা ! একবার মনে কর দেখি রে তাদের তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসেই কাটিস, কিন্তু একবার মনে কর দেখি রে, তোর নিজের ছেলের ওরকম হলে কি হয় ?" শ্রোতৃগণ ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, "রক্ষা করো গুরো ! উপায় বলিয়া দেও।" আবার গান চলিল, "সব ভাই ভাই বলো, সবাই আপন, পর কেহ নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি।

গ্রীষ্মে তোমার ঘাম হয়, সবারই তেমনি। বর্ষার জলে তুমি ভিজ, সবাই সেইরূপ ভিজে। অতএব তোমায় আর আর-মানুষে ভেদ কি, সবাই মিল, সবাই মিল, একতান একপ্রাণ হও, আমি তোমার, তুমি আমার হও। এক তৃণ সবার শয্যা, এক পৃথিবী সবার বাস, এক সূর্য সকলকে আলো দেয়, এক চাঁদে সকলের প্রাণ জুড়ায়। তবে প্রাণ কেন দুই থাকে ?” গানে যে কত বলিতেছে, কে বলিবে, কতক্ষণ যে গাইল, কে বলিবে ? হীন কবি বাল্মীকির গান কতক্ষণ ব্যাখ্যা করিবে ?

গানের ফল এই হইল, সকলে দস্যু-বেশ ত্যাগ করিয়া বাল্মীকির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডাল পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে পা ছুঁইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, “আমি দেবতাও নহি, অবতারও নহি, রাজাও নহি, তোমরাও যাহা, আমিও তাহাই। আমার পায়ে পড়িলে কি হইবে, দুষ্কর্ম করিয়াছ, আর করিয়ো না। জীবন পরিবর্তন করিয়া সৎপথে জীবন কাটাও, সুখী হইবে।”

এই বলিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিতেছেন, এমন সময়ে নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকানা, কাহারো অগ্নিতে গাত্র দগ্ধ হইয়াছে, কেহ বৃদ্ধ পিতাকে কাঁকে করিয়া, কেহ অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় শিশু সন্তান বুকে করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইল, রাজবংশ রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং অরাজক রাজ্যে বাস করা অবিধেয় ভাবিয়া যাহার যেখানে আত্মীয় আছে, সে তথায় যাইতেছে। বাল্মীকি উহাদের দেখাইয়া বলিলেন, “দেখ তোমাদের কীর্তি দেখ” , বলিতে না বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। সকলেই অনুতাপে পাপবোধে বিষণ্ণ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। বাল্মীকি বলিলেন, “যাও, উহাদের ফিরাইয়া লইয়া এস।” সকলে উহাদের নিকট গেল, যাইবামাত্র নগরবাসীগণ আবার আর্তনাদ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইল। ডাকাইতেরা তখন বুঝিতে পারিল, দুষ্ট লোকে সত্য কথা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না। তাহারা বাল্মীকিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিল : বাল্মীকি যে দস্যু নন তাহা উহারা জানিবে কি প্রকারে ?

যাহা হউক, বাল্মীকি উহাদিগকে ফিরাইলেন, এবারও আপন গানে। বাল্মীকি এমনি মিষ্ট তান ধরিয়া উহাদের নিকট এমনি করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, উহাদের চিত্ত দয়ার্দ্র হইল ; উহারা বাল্মীকির কথায় নগরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু অরাজক দেশে বাস করা অন্যায়, এজন্য উহারা বাল্মীকিকে রাজা হইতে অনুরোধ করিল। বাল্মীকি রাজা হইলেন না, কিন্তু তিনি দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডালকে রাজা করিয়া দিলেন। গুহকের রাজ্যে সমবেত সমস্ত ম্লেচ্ছ, যবন, বানর, রাক্ষস একত্র সুখে বাস করিতে লাগিল, আর দস্যুবৃত্তির নামও করিত না। পরদেশ লুণ্ঠনের ইচ্ছা দূরীভূত হইল। কিন্তু অন্য কেহ অত্যাচার করিতে আসিলে, উহারা পরাক্রমসহকারে সে উপদ্রব নিবারণ করিত ; সুতরাং পৃথিবী-মধ্যে একটি শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু এ রাজ্য যে স্থায়ী হইবে, এত দস্যু যে এক হইয়া থাকিবে, বাল্মীকির মনে বিশ্বাস হইল না। বাল্মীকি প্রতিমাসে এক-একবার গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, আর অপর সময় আপন হৃদয়ের আদেশমতো গান করিয়া পৃথিবীসুদ্ধ বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

# ষষ্ঠ খণ্ড

বিশ্বামিত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে ও অপত্যনির্বিশেষে নিজ নূতন সৃষ্টি পালন করিতে লাগিলেন। যাহাতে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, যাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে, একটুকুও নষ্ট না হয় তাহার জন্য তাঁহার প্রাণপণ যত্ন, কিন্তু তাঁহার নিজের কি! যতদিন সৃষ্টিউৎসাহে ছিলেন নিজের কথা মনে হয় নাই। নিজে তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর। যখন মানুষে সঙ্গ না পায়, যখন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে না পায়, তখন সামান্য মানুষ খেপিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড পুরুষ, প্রধান মহারাজা, বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার এককত্ব বুঝিতে পারিলেন। সব হইল কিন্তু সুখ কই? নিজের কি হইল? তিনি নিজ সৃষ্টিস্থ মানুষের সঙ্গে মিশিলেন! কিন্তু যাহাদের সহিত চিরদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, যাহারা তাঁহার নিজসুখদুঃখ বুঝে, তাহারা কই। ইহারা তো কেবল সুখী, বিশ্বামিত্র তো মানুষ। দুঃখ-ভোগ তো তাঁহার অদৃষ্টলিপি। তিনি দুঃখিত হইলে, উন্মনা হইলে, তাঁহার মুখপানে তাকায় এমন লোক কই? তিনি মনে মনে বড়োই দুঃখ পাইতে লাগিলেন! এইরূপে কিছুদিন যায়, শেষ তাঁহার ইচ্ছা হইল যে কতকগুলি পৃথিবীর লোক আনিয়া রাখিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি কান্যকুব্জ নগরটি উঠাইয়া আনিবার জন্য প্রকাণ্ড নগর নির্মাণ করিলেন। এ সৃষ্টিতে তো শত্রু-ভয় নাই, নগরে গড় প্রাচীর কিছুই রহিল না। সুরম্য হর্ম্য প্রকাণ্ড প্রাসাদে নগর পরিপূর্ণ হইল। তখন বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জ নগরে গেলেন। মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিবারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,

দেখিলেন এই সমস্ত আপন লোকের মধ্যে যত সুখ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যদি ঈশ্বর হয় তথাপি একাকী তাহার তত সুখ হয় না। একবার ইচ্ছা হইল পৃথিবীতে থাকি। আবার সেখানকার কর্তৃত্ব ও এখানকার কর্তৃত্ব ও এখানকার ব্রাহ্মণদিগের কথা মনে পড়িল, তিনি স্বজনবর্গকে আপন সৃষ্টিতে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। সমস্ত কান্যকুব্জ নগরসুদ্ধ উঠিতে লাগিল। আস্তে আস্তে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর লোক আশ্চর্য হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। উড্ডীয়মান নগর-মধ্যে নানারূপ সুন্দর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তাহাদিগের সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিশ্বাস বহে না, গলা ফুলিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র পৃথিবীবায়ু আকর্ষণ করিলেন। তাহা আসিল না। বিশ্বামিত্র মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। পৃথিবীবায়ু সৃষ্টি করিতে গেলেন, তাহা হইল না। ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা আসিলে তিনি বলিলেন, "তুমি এখনো আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহ, আমি এই আপন স্বজন সঙ্গে নিজ সৃষ্টিতে যাইব, তুমি বাধা দিতেছ কেন?" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি যে তপের বলে সৃষ্টি করিয়াছ কেবল তাহাতেই ক্ষয় হইয়াছে, তোমার আর তপোবল নাই যে তুমি নূতন কাজ কর। নূতন কাজ করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে, আমি তোমায় বলি তুমি এখনো স্থির হও, বুঝিয়া চলো।" "পাষণ্ড যত বড়ো মুখ তত বড়ো কথা, আমায় বল কিনা বুঝিয়া চলো, এই দেখ নিজ পৃথিবী হইতে বায়ু আনিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইব" বলিয়া বিশ্বামিত্র বেগে প্রস্থান করিলেন। কান্যকুব্জ তথা হইতে বেগে পড়িতে লাগিল। ব্রহ্মা দেখিলেন তাহা হইলে নিজ সৃষ্টিই নাশ হইবে। নিজে ধীরে ধীরে তাহাকে নামাইয়া যথা-স্থানে স্থাপিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের অনুচরবর্গ ব্রাহ্মণদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাক্ষসদিগের সহিত যোগ দিয়া নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল।

২ বিশ্বামিত্র আপন পৃথিবীর বায়ু শূন্যপথে চালাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পারিলেন না। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মার স্মরণ করিলেন। আবার ব্রহ্মা আসিলে বলিলেন, "আমার বায়ু শূন্য-পথে যাইবার পথ ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মা বলিলেন, "সে তপোবল তোমার নাই, আর তোমার তপোবল না থাকিলে আমার দিবারও ক্ষমতা নাই।" বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে গেলেন। পারিলেন না। তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া গদা তুলিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি নাশে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "যে ভাবে আছ সেই ভাবেই থাকো, নূতন কার্য করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে।" বিশ্বামিত্র গালি দিয়া ব্রহ্মাকে দূর করিয়া দিলেন। পরে গদা তুলিলেন। গদা একবার হাত হইতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার মহা বেগে গদা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল। তিনি গদা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করেন। এই-জন্য লক্ষ্য করিতেছেন, আর গদা ঘুরাইতেছেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরো বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে গদা যত ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি নীহারিকারূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র গদা ছুঁড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকাসমূহ যে যেদিক হইতে আসিয়াছিল, ভীমবেগে সেই সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত-গর্ভ গহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমনি ক্ষীণালোকময়ই রহিল। আর নীহারিকাকুল যে-সকল নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত-মধ্যে নূতন পৃথিবী 'জলের বিম্ব জলের' ন্যায় শূন্যে মিশাইয়া গেল। যে ঈশান কোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্ররাশিতে ভরা-ভরা দেখা যাইত, তাহা আবার শূন্যময় হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র-পৃথিবীতে নূতন মনুষ্যের যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা আর রহিল না। মানুষও সব, আবার অগঠিত-পদার্থরাশি-মধ্যে বিলীন হইল। সে সুন্দর পাহাড় পর্বত, সৌধপ্রাকার-রাজপথসমেত সমস্ত পৃথিবী আবার অগঠিতপদার্থরাশিরূপে পরিণত হইল। যে সমাজবন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোটো বড়ো ছিল না,

যাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর সাম্য, তাহাও অনন্ত-গর্ভে নিহিত হইল।

৩ আর বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িয়াই মূর্ছিত। কোথায়? স্থান আছে কি? শূন্য-মধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজ পৃথিবীর আকর্ষণ এতক্ষণ ছিল, এখন তাঁহার মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড আমাদের পৃথিবী আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে বড়ো ভালোবাসিতেন, এইজন্যই বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও উঁহার নিকট বারবার যাইতেন এবং উঁহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য বারবার উদ্যোগও করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দেখিলেন বায়ু অভাবে অচিরাৎ বিশ্বামিত্রের প্রাণনাশ হয়। এজন্য নিজে পৃথিবীবায়ু আনিয়া তাঁহার নিকট ধরিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রাণ বিয়োগ হইল না, কিন্তু তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্য-পথে মূর্ছিত ভাবে পড়িতে লাগিলেন। মুখে রক্ত বমন হইতে লাগিল। শরীর ফুলিয়া উঠিল। আর তিনি পড়িতে লাগিলেন, কে জানে কত কাল ধরিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

## সপ্তম খণ্ড

আজি পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত। আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া প্রাণী থাকিবে, আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই ব্রাহ্মণাদিজাতি থাকিবে, আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই সৃষ্টিরক্ষা হইবে।

আজি কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন, তথায় সমস্ত ভূচর খেচর উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীবৃন্দ আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ সংবৎসরব্যাপী। কৌশাম্বীর চতুর্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারো স্থির নহে। এরূপ অগাধ জনসমুদ্রমধ্যে যখন চারি দিকে এরূপ শত্রুতা ও বৈরিতা, তখন একটুতেই প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্যবংশীয় নরপতি ব্রাহ্মণপক্ষপাতী। তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল খেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খর-দূষণ ও বালী রাজাকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেকদিবসাবধি বহু-সংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদলপতিকে অর্থদ্বারা বশ করিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠপক্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বশিষ্ঠের আশ্রিত পারদহূনাদিজাতিও তাঁহার রক্ষার্থ অস্ত্র ধরিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিলেন। এরূপ স্থলে শান্তিরাজ্যপতি গুহকও নিজ দল সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টা মিটাইয়া দিবেন, শেষ অন্তত যুদ্ধ রহিত করিবেন; না-হয় অন্যায়পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। আর বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহই তাঁহাকে মানিতেছে না। বাল্মীকির কান্নায় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়। কিন্তু যাহারা

রাজনীতিজ্ঞ, যাহারা উচ্চতর জাতি, যাহারা সভ্য বলিয়া গর্ব করে, যাহারা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপন প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রেরও গলায় ছুরি দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের মন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর উপাদানে নির্মিত। মানুষ লইয়া যাহারা খেলা করে, আপন সামান্য কার্যসাধনার্থ যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ, এমন-কি প্রাণনাশ করিতে এতটুকু সংকোচ করে না, তাহাদের কি কান্নায় মন গলে। গলুক আর নাই গলুক, বাল্মীকির বিশ্রাম নাই। তিনি একবার বশিষ্ঠের নিকট যাইতেছেন, একবার খর-দূষণের হাত ধরিতেছেন। সেনাগণ, সমবেত লোকগণ তাঁহার কান্নায় অধীর হইতেছে, কিন্তু বড়োলোক রাজনীতিজ্ঞ দয়া মায়া একেবারে শূন্য, দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। শেষ বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করো। অধ্বর্যুগণ বেদীতে আরোহণ করিলেন। বাল্মীকির ভরসা নির্মূল হইল। তিনি কাঁদিয়া গুহকের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িলেন। গুহক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই জানে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোত চলিতে আরম্ভ করিবে। বেদীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে শুনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। যাজ্ঞিকদল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার জন্য অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। গুহক ঠিক সম্মুখে, যে প্রয়োজন হইলে একেবারে মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িতে পারেন। বাল্মীকি বেদীতে উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অগ্নি কাড়িয়া লইলেন ; শেষ নিজে কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে টানিয়া বেদীর বাহির করিয়া দিল। তিনি আর আসিতে না পারেন, এজন্য তিন শত সদস্য তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। একটা মহাগোলযোগ বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা আবার অগ্নি জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু এ কি হইল, অকস্মাৎ কোথা হইতে কয়েক বিন্দু জল ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল। উপরে মেঘ নাই, অথচ জল পড়িল। জল নিশ্চয়ই অশুচি হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে অশুচি বিবেচনা করিয়া স্নানাদি করিয়া শুচি হইবার জন্য প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল। সকলেরই মনে কেমন একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হইল। কি

হইবে ভয়ে সকলেই ভীত হইল। সকলেই জানিল শীঘ্রই যাহা হউক একটা ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইবে।

২

ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বামিত্র পড়িতেছেন। ক্রমে ব্রহ্মার কৌশলে সেই অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে তাঁহার মনের ভাব কি হইল, মানুষে কি লিখিবে। একবার ভাবিলেন আমি কোথায়? একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, পুনর্বার চক্ষু মুদ্রিত হইল; আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। একবার ভাবিলেন কোথায় যাইতেছি। একবার মনে করিলেন, বুঝি নরক নিকটে। ভয়ে ভীত হইয়া আবার অজ্ঞান হইলেন।

একবার ভাবিলেন আমার সৃষ্টি কোথায়? আবার অজ্ঞান। আবার ভাবিলেন তাহা তো গিয়াছে। তখন ভাবিলেন যদি পৃথিবীতে থাকিতাম;— আবার অজ্ঞান। কেন দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম— কেন বড়ো হইতে গিয়াছিলাম— কেন তপ করিতে গিয়াছিলাম— কেন দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলাম— কেন সব হারাইলাম। এখন কোথায় যাইতেছি জানি না। ফিরিবার শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল। রোদনে শরীর আরো ক্ষীণ হইল। আবার অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল, ঋভুগণ গান করিতেছে, আর সব ভাই ভাই গাইতেছে, বলিতেছে মানুষ যদি মানুষের উপর কর্তা হইতে না চাহিত, তবে কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। রাজা যদি আপন কাজ করিত, কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। এই গান শুনিতেছেন আর মনের ভিতরতলায় যে মন আছে সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এমন সময় চৈতন্য হইল। তখন চেতন অবস্থায় কেবল পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন।

৩ ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেই-দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল। যাহারা বাল্মীকিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞ-কুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন একটি প্রকাণ্ড পুরুষ তথায় পড়িয়া আছেন। বাল্মীকি অলৌকিক শক্তিবলে জানিতে পারিলেন কুণ্ডস্থ মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড বিশ্বামিত্র; তখন তাঁহার ক্রন্দনের অবধি রহিল না। তাঁহার বীণা একেবারে অতি করুণস্বরে গান ধরিল। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন তোরা দেখ, তোরা তুচ্ছ মানব, তোরা সামান্য— দেখ দেখি, যে বিশ্বামিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে, যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মারও উপর হইয়াছিল, দেখ রে নিয়তির বলে তাহার কি হইয়াছে। দেখ একবার সেই বিশাল বীর— সেই প্রকাণ্ড তপস্বী— সেই অদ্ভুত মনুষ্য— তাহার কি দশা হইয়াছে। দেখ দেখি রে, তোরা সামান্য সুখে দুঃখে পাগল। দেখ, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আদি ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মত্ব গিয়াছে, তাহার যা ছিল, সে যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিল, এখন বুঝি তাহাও নাই, এখন বুঝি তাহার জীবনও নাই। ভাব দেখি বিশ্বামিত্রের কি কষ্ট! যখন বিশ্বামিত্র— তাহারই এই দশা, তখন ভাব দেখি তোদের কি হইয়াছে। তখন মনে কর দেখি তোদের কি হইবে। ঐ দেখ ব্রহ্মা আজি বিশ্বামিত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল। যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হাতে এত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, আজি সেও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অতএব তোরা ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ কর, তোরা স্থির হয়ে থাক। জীবন দিনকত বই নয়।

সকলেই নীরব হইয়া বাল্মীকির সকরুণ বীণাঝংকার শুনিতে লাগিল। সকলের মন গলিয়া গেল। সকলেরই মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। অস্ত্রশস্ত্র বিবাদ-বচসা ত্যাগ করিল। ক্রমে তাহাদের মন ফিরিল।

এদিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল। বীণাঝংকার

দূরস্থ সংগীত-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে লাগিতে লাগিল। তিনি মূর্ছিত, কত ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ক্রমে শরীর শীতল হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিশ্বামিত্র চক্ষু মেলিলেন। বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। গানের মৃদুমন্দ তিরস্কার ও দয়া-ভিক্ষা বিশ্বামিত্রের মনে শরবৎ বিঁধিতে লাগিল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা। ক্রমে সমবেত জনগণ-মধ্যে ব্রহ্মমূর্তি আবির্ভূত হইল। সঙ্গে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন। নয়নজলে শরীর স্নাত হইতেছে। তিনি জোড় করে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস আজি তুমি ব্রাহ্মণ হইলে।" বিশ্বামিত্র আবার কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেব, আমি কোথায়?" ব্রহ্মা বলিলেন, "পৃথিবীতে। তোমার যন্ত্রণার আমি অবসান করিয়া দিতেছি" বলিয়া নিজ কমণ্ডলুস্থিত স্বর্গীয় বারিবর্ষণে বিশ্বামিত্রের শরীরে বল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রোদন করিতেছে। আর একজন গায়ক গান করিতেছে। বশিষ্ঠ দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বিশ্বামিত্রের দুর্দিনে তাঁহার দয়া হইয়াছে। আর সে ভাব নাই, যে ভাবে একদিন বিশ্বা-মিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে দেন নাই। সে ভাব আর নাই। কঠিনতা গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন। বলিলেন, "ভাই রে, আজি তোয় আমায় এক হইলাম। আজি তুই বামন হইলি। আয় দুজনে কোলাকুলি করি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অনেক কটূক্তি করিয়াছি। আজি আমার বিপদে তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। তোমার দুঃখে কিন্তু আমি এক দিনও কাঁদি নাই। আজি তোমার করুণা দেখিয়া আমার নয়নজল প্রথম পড়িল। জানিলাম ব্রাহ্মণ 'বড়োই দয়ালু।' আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টি-কর্তা, তোমায় কত কটূক্তিই বলিয়াছি, তোমায় কারাগারে শৃঙ্খল-বদ্ধ

করিতে গিয়াছিলাম। আজি আমার বিপদে তুমি আমায় প্রাণ দিলে। তোমার করুণা অপার।" ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমাগুণ বৃথামাত্র।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দেখাদেখি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সব যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কোলাকুলি করিতে আরম্ভ করিল। সকলে আপনার মনোগত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুহকচণ্ডাল ভয়ানক সময় আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার এই শুভ পরিণাম দেখিয়া আহ্লাদে ঊর্ধ্বনৃত্য করিতে লাগিল। কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞের এই পরিণাম দেখিয়া প্রথম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভাণ্ডার-স্থিত যজ্ঞার্থ-আহৃত অগাধ সামগ্রী বিশ্বামিত্রের উপনয়ন উপলক্ষে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। আর বাল্মীকি আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, ভাই ভাই গাইতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর কিছু জ্ঞান নাই। শেষ নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে আসিয়া ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রতিভ হইবার জোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে, ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বশিষ্ঠ দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বিশ্বামিত্র আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আজি তোমারই জয়।" চারি দিক হইতে "জয় বাল্মীকির জয়" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গুহকের লোক চীৎকার করিয়া উঠিল "জয় বাল্মীকির জয়।" "জয় বাল্মীকির জয়।" দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, "জয় বাল্মীকির জয়।"

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল, সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে চলিয়া গেল। মনে মনে সবারই ভরসা রহিল, যে অরাজক শেষ হইল। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াই রাজ্য ত্যাগ করিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কনোজরাজ্য গ্রহণ করিল।

ব্রহ্মা যাইবার সময় ঋষিত্রয়কে বলিয়া গেলেন সর্বলোক-মধ্যে ঐক্যস্থাপনমানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখো। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

# অষ্টম
# খণ্ড

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি তিন জনে রামঅবতারের ষাটিহাজার-বৎসরপূর্বে রাম কি করিবেন তাহার যুক্তি করিতে বসিলেন। এ তো সুদ্ধ রামায়ণের রচনাকৌশলনির্ণয় নহে,/ইহা জগতীয় জাতিগণের মধ্যে ভাই ভাই সংস্থাপনের যুক্তি; বিশ্বামিত্র নানাবিধ দশাবিপর্যয়ের পর মনুষ্যশক্তির ক্ষীণতা বুঝিতে পারিয়াছেন: কিন্তু ঋভুদত্ত নববৈদ্যুতীবলে তাঁহার যে ভাই ভাই করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রবলই আছে। কৌশাম্বীক্ষেত্রের ব্যাপারে বশিষ্ঠের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল, যে বুদ্ধিবলে, নবজাতির কথা দূরে থাকুক, দুই জন মনুষ্যেরও ঐক্যসম্পাদন হইতে পারে না। কৌশাম্বীক্ষেত্রে বাল্মীকি যেরূপ বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উভয়েরই জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে হৃদয়ই ঐক্যবন্ধনের অমোঘ নিদান। তাঁহারা ইহাও জানিয়াছিলেন যে এই ঐক্যবন্ধনে বাল্মীকি ব্যতীত আর কেহই কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। সুতরাং এই বিষয়ে প্রাণপণে বাল্মীকির সহায়তা করাই তাঁহাদের নিজ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। অতএব বাল্মীকির হৃদয়, বশিষ্ঠের বুদ্ধি ও বিশ্বামিত্রের রাজনীতিজ্ঞতা একত্র হইয়া জগতের ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল।

সকলে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, যদিও আপাতত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে মিল হইয়া গেল, যদিও বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মিত্রতা হওয়ায়, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়ায়, এ উভয় জাতির আর বিরোধ হইবার সম্ভাবনা রহিল না, তথাপি অনেকেরই মনে এই সকল ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকিবে। যদিও প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ হইবে না, তথাপি

মনোমিল না হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য স্থির হইল, রাম প্রথম আসিয়া এই দুই জাতি একত্র করিবেন। তিনি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলারাজের কন্যা বিবাহ করিবেন ও গুহকচণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিবেন। পরশুরামের নাশ করিবেন। নাশে বাল্মীকি একান্ত অসম্মত। এজন্য স্থির হইল পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিবেন। এই-রূপ আর্যসমাজ একত্র করিয়া অনার্যসমাজ একত্র করিতে যাইবেন। বানরদিগের মধ্যে ধার্মিক দলের সহিত মিলিয়া অধার্মিক দলের বধ করিবেন। আবার এত প্রাণী-হিংসায় বাল্মীকি অসম্মত হইলেন, শেষ সুদ্ধ বালীমাত্র বধ করিবেন, স্থির হইল। তাহার পর অত্যাচারকারী রাক্ষসদিগের ধ্বংস করিয়া ধার্মিক বিভীষণকে রাজা করিবেন। এত রাক্ষস বধেও বাল্মীকি আপত্তি করিলেন, সে আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। কারণ রাক্ষসেরা সকলেই অত্যাচারী আর উহাদের সংশোধনও অসম্ভব। তাহার পর রামচন্দ্র নিজভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে পারদাদি রাজ্যেও শান্তি স্থাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন। স্থির হইলে বাল্মীকির উপর এই সমস্ত বৃত্তান্ত লইয়া নবরসগ্রথিত মহাকাব্য রচনার ভার হইল।

ভার দিবার সময় বশিষ্ঠ বলিলেন, "রাম যেন ধার্মিকচূড়ামণি হয়েন। তাঁহার শরীরে যেন পাপের লেশমাত্র থাকে না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "সুদ্ধ তাহা হইলেই হইবে না, রাম ক্ষত্রিয় হইবেন, রাম রাজা হইবেন, সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপ প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।"

বাল্মীকি বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষিগণের আজ্ঞা শিরোধার্য। আমি রামকে ধার্মিকও করিব না; বীরও করিব না; রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্রবর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, ও আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন— তথাস্তু। তোমার রাম যেন চিরদিন নরজাতির আদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকেন।

ভার প্রাপ্ত হইয়া বাল্মীকি অসাধারণ প্রতিভাবলে রামায়ণ রচনা করিয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে শুনাইলেন। শুনিয়া তাঁহারা বাল্মীকিকে শত মুখে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

২

ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিয়মানুসারে দুষ্টের দমন শিষ্টের প্রতিপালন করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় শান্তিস্থাপন করিলেন। তাঁহার করতলচ্ছায়ায় পৃথিবী ফল-শস্যবতী, ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল। যে সকল স্থান বিজন অরণ্য ছিল তাহা সমৃদ্ধ নগর রূপে পরিণত হইতে লাগিল। নদী সকল বাণিজ্য ও বিলাসপোতে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দস্যুতস্করাদির নাম লোপ হইতে লাগিল। মারীভয়, সংক্রামক পীড়া, অকাল মরণ প্রভৃতি লোকে বিস্মৃত হইয়া গেল। নৃত্য বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাচর্চায় লোকে সভ্যভব্য হইতে লাগিল। নানাবিধ শিল্পকার্যে উন্নতি হইতে লাগিল। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর দেখিবে— অভ্রভেদী সৌধশিখরে সৌর-কর প্রতিফলিত হইতেছে। যে দিকে গমন কর শ্রুতিমধুর গীতধ্বনি, বাদ্যধ্বনি শ্রবণগোচর হইবে। সর্বত্রই যূথি, জাতি, মল্লিকা, মালতী, বক, কুরুবক, নবমল্লিকা, কাষ্ঠমল্লিকা, নাগকেশর, গন্ধরাজ, বকুলাদি পরিশোভিত উদ্যানরাজি ও ইন্দীবর, কোকনদ, পুণ্ডরীক, কুমুদ, কহ্লার সমূহ সুবাসিত সরসীসমূহে নাসিকার তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। সর্বদা সুবৃষ্টিতে দীন দরিদ্রজনগণেরও দুঃখ বা কষ্ট কিছুমাত্র রহিল না। লোকসংখ্যা চারি দিক হইতে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বশিষ্ঠের সুশিক্ষায় লোকের মন উন্নত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্রের রাজনীতিচাতুর্যে ও ব্যবস্থাপ্রণয়নপারিপাট্যে দেশে বিবাদকলহাদি একেবারে শেষ হইয়া গেল। বাল্মীকিরও আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার বীণায় বিরতি রহিল না। তিনি

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

সমস্ত পৃথিবীময় প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার বীণার গুন্‌গুন্‌ ঝংকার দূর হইতে শ্রবণ করিয়াই নগরবাসীরা দলে দলে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বহির্গত হয়। তাঁহার গানের ভাব ও স্বর ক্রমেই গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম হইতে লাগিল। সর্বত্র এক স্বর ভাই ভাই ভাই, আমরা সবাই ভাই।

কিন্তু এখনো বাল্মীকির মন স্পষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যথার্থ ভ্রাতৃভাব জন্মিয়াছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার দারুণ সন্দেহ।

৩

এইরূপে সুখস্বচ্ছন্দে বৎসর কাটিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর, তাহার পর বৎসর, অযুত বৎসর কাটিয়া গেল। রামচন্দ্রের বৈকুণ্ঠ প্রতিগমনের কাল উপস্থিত। লক্ষ্মণ-বর্জন করিয়া শোকে সন্তাপে রামচন্দ্র সরযূজলে ঝাঁপ দিবেন সংকল্প করিয়া সরযূর বামতীরে প্রকাণ্ড সভা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল, রাক্ষস ও বানরাদি সকলে সভা পরিপূর্ণ। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আজি রামায়ণ প্রচারের জন্য বাল্মীকিকে অনুরোধ করিলেন। তখন বাল্মীকি সুশিক্ষিত শিষ্য কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে করুণবীণাঝংকারে গান আরম্ভ করিলেন।

বাল্মীকি বীণা বাজাইতেছেন। কুশলব গাইতেছে। শ্রোতৃবর্গ একেবারে জ্ঞানান্তরশূন্য হইয়া উঠিতেছে। গানে কাঁদিলে কাঁদিতেছে, গানে হাসিলে হাসিতেছে। আনন্দিত হইলে আনন্দিত হইতেছে। পূর্বলীলা স্মরণ হওয়ায় রামচন্দ্রও কখনো হর্ষিত, কখনো দুঃখিত, কখনো রোরুদ্যমান হইতেছেন। আবার পূর্বাবস্থা নবীভূত হইয়া শোক ও মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাল্মীকির আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্য দর্শনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

এমন সময়ে সহসা ছায়াপথদ্বার দ্বিধা বিভক্ত হইল। আর বাল্মীকির মস্তকোপরি অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঋভুগণ কুশলবের সহিত একস্বর একতানে রামায়ণ গান করিতে করিতে নামিতেছেন।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

তাঁহারা নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের গান ও স্বর আরো মিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাদের মুখে গান শ্রবণ করিয়া প্রজাপুঞ্জ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ একদিন আশা করিয়াছিলেন একবার ঋভুগণের সহিত সমস্বরে গান গান। আজি আনন্দে তাঁহাদের কণ্ঠভেদ করিয়া রামায়ণ বাহির হইতে লাগিল। ঋভুগণ, মনুষ্যগণ, ঋষিগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দুই হাত তুলিয়া গাইতেছেন, রামচন্দ্রও হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া সেই গানে ও নৃত্যে যোগ দিলেন। যদি ব্রহ্মা সেই সময়ে উপস্থিত না হইতেন, বোধ হয় এ নৃত্যের বিরাম হইত না।

৪

ব্রহ্মা আসিয়াও একবার এই প্রেমদশায় উন্মত্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নররূপী ভূতভাবনের ভাবে তিনি যে চঞ্চল হইবেন আশ্চর্য কি? কিন্তু তিনি কষ্টে সে চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া রামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়া পার্থিব দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও তনুত্যাগ করিয়া পূর্ণব্রহ্মে তিরোহিত হইলেন। প্রাচীনবয়া প্রজাবৃন্দ তাঁহার সমাভিব্যাহারী হইয়া ঋভুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ঋভুগণ মহা সমাদরে গাঢ় আলিঙ্গন করত নূতন ঋভুদিগের সংবর্ধনা করিলেন, ও পরম প্রেমভরে আবার সেই গান ধরিলেন, যে গানে একদিন ঋষিত্রয়ের মনে বৈদ্যুতী সঞ্চালন করিয়াছিলেন।

৫

ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে পার্থিব দেহত্যাগ করিয়া সপ্তর্ষিগণের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বশিষ্ঠ সরযূজলে মৃন্ময় দেহত্যাগ করত জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করিয়া প্রত্যহ জগতের কার্যপর্যালোচনার্থ উদয় হইতে লাগিলেন।

৬ বিশ্বামিত্রও দেহত্যাগ করিয়া ঋভুদিগের একজন প্রধান নেতা হইলেন। এখন তাঁহার জ্ঞান হইল, যে পার্থিব সাম্রাজ্য অসার, হৃদয়োন্নতিই সারাৎসার।

৭ বাল্মীকিকে স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে বাল্মীকি, বারিধারাপ্লুতনয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবাদিদেব! আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম; আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও তো তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, প্রভু! আমি পাপপঙ্কে মগ্ন, স্বর্গে যাইয়া কি করিব, দয়াময়! আমি মানুষের যে অপকার করিয়াছি, সব মানুষকে সমান সুখী করিতে না পারিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে, দীননাথ! এখনো মানুষের অভিমান আছে। এখনো আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই, ব্রহ্মন্। যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবীসুদ্ধ স্বর্গে যাইবে। তখন আপনার কথা রাখিব, দয়াময়! আমায় এবার ক্ষমা করুন, দয়াল প্রভু— "

বলিয়া বাল্মীকি রোদন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকির ভাবে ব্রহ্মার চিত্ত অস্থির হইল। এ দিকে বাল্মীকির মস্তকে ঋভুগণ-হস্তমুক্ত পুষ্প-সমূহ পড়িতে লাগিল।

৮ ব্রহ্মা বলিলেন, "নভোমণ্ডলে নেত্র নিক্ষেপ করো।" বাল্মীকি দেখিলেন সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলধারী কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপু শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন। ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া বাল্মীকি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণ বিরাটমূর্তি ধারণ করিলেন। বাল্মীকি অনেকবাহু, অনেকউদর, অনেকবক্ত্র, অনেকনেত্র, দ্রংষ্ট্রাকরাল অনন্তরূপ দেখিলেন। উহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। শশি-

সূর্যনেত্র, দীপ্তহুতাশবক্ত্র শরীরপ্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন। দেব দানব যক্ষ রক্ষ ব্রহ্মাদি সকলে মানব জীবজন্তু সকলেই সেই বিরাটের মুখে প্রবেশ করিতেছে। উহার প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে। দেখিলেন সে বিরাট মূর্তির নিকট দেবাদিও কীট, মানুষ তো তুচ্ছ পদার্থ। দেখিয়া বাল্মীকি স্তব করিতে লাগিলেন—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "বাল্মীকে! তুমি দেখো সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও, পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল "জয়"!

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

## ১. বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের সূচি

'বাল্মীকির জয়' পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা সংখ্যাগুলিতে উপবিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পৌষ, | পৃ. ৪২৪-৩০ | [ প্রথম খণ্ড ] | ( ১—৫ ) |
| মাঘ, | পৃ. ৪৬০-৬৮ | দ্বিতীয় খণ্ড | ( ১—৩ ) |
| | | তৃতীয় খণ্ড | ( ১—২ ) |
| চৈত্র, | পৃ. ৫৬১-৭১ | চতুর্থ খণ্ড | ( ১—৩ ) |
| | | পঞ্চম খণ্ড | ( ১—২ ) |

## ২. পাঠ-বিন্যাস

'বাল্মীকির জয়' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৮ বঙ্গাব্দে ( ১৮৮১ খৃস্টাব্দ )। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ ও ১৯০২ খৃস্টাব্দে। এর পরে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে ১৯৩২ খৃস্টাব্দে ( বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকার তারিখ ) প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'তে এবং সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভারে 'বাল্মীকির জয়' ছাপা হয়েছিল। বইয়ের প্রথম সংস্করণে পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি খণ্ডের বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনগুলি নিচে দেখানো হল। পরের সংস্করণ দুটিতে প্রথম সংস্করণের বিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছিল।

**প্রথম খণ্ড ॥**

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত ( পৌষ, ১২৮৭ ) ৪ উপবিভাগটি ভেঙে প্রথম সংস্করণে ৪ ও ৫ উপবিভাগে বিন্যাস করা হয়। ৪ উপবিভাগের ১৩-সংখ্যক বাক্য থেকে অবশিষ্ট অংশ সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত আকারে ৫ উপবিভাগে রাখা হয়েছে ( পাঠ-প্রসঙ্গ দ্র. )। ৪ উপবিভাগের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ নতুন সংযোজন।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত ৫ উপবিভাগটি পরিবর্তিত আকারে প্রথম সংস্করণে ৬ উপবিভাগে রাখা হয়েছে ( পাঠ-প্রসঙ্গ দ্র. )। ৭ এবং ৮ উপবিভাগ প্রথম সংস্করণে নতুন সংযোজন।

তৃতীয় খণ্ড ॥

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত ( মাঘ, ১২৮৭ ) ১ উপবিভাগটি ভেঙে প্রথম সংস্করণে ১ ও ২ উপবিভাগে বিন্যাস করা হয়। সপ্তম অনুচ্ছেদ থেকে ২ উপবিভাগের শুরু। কয়েকটি বাক্য বর্জিত ( পাঠ-প্রসঙ্গ দ্র. )।

বঙ্গদর্শন-এর ২ উপবিভাগটি প্রথম সংস্করণে ৩ উপবিভাগ রূপে মুদ্রিত।

চতুর্থ খণ্ড ॥

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত ( চৈত্র, ১২৮৭ ) ১ উপবিভাগটি ভেঙে প্রথম সংস্করণের ১, ২, ৩, ৪ উপবিভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। পাঠে অনেক পরিবর্তন আছে ( পাঠ-প্রসঙ্গ দ্র. )।

বঙ্গদর্শন-এর ২ ও ৩ উপবিভাগ প্রথম সংস্করণে ৫ ও ৬ উপবিভাগ রূপে মুদ্রিত।

## ৩. পাঠ-প্রসঙ্গ

বর্তমান মুদ্রণে ১৯০২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত অংশের এবং প্রথম ( ১৮৮১ খৃ. ) ও দ্বিতীয় ( ১৮৮৬ খৃ. ) সংস্করণের পাঠ-ভেদ সংকলন করে দেওয়া হল। নতুন সংযোজনগুলি যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটিতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে ছত্র-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড ॥

৭/১২ : "··· ছায়াপথ-দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।" বঙ্গদর্শন-এর পরে চিহ্ন দিয়ে পাদটীকা দেওয়া হয়েছিল ঃ "গ্রন্থকার গানটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।" প্রথম সংস্করণ ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্জিত।

৮/২২ : "···অমনি ত্রিবিক্রমের ন্যায় ত্রিপাদবিক্ষেপে এক টিব্বায় উঠিলেন ;" বঙ্গদর্শন-এর পাঠ ঃ "···অমনি চাঁকতের ন্যায় তিনলম্ফে এক টিব্বায় উঠিলেন,"

৯/১৪ : "তাঁহারা আবার বহুকাল ··জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন।" বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূর্ণিত হইয়া

গাইতেছেন, অন্তরের জ্বালাও আছে ! তাঁহারা কি দেখিয়া গিয়াছিলেন আর এখন কি হইয়াছে !"

৯/২০ : "...সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরো মুগ্ধ।" বঙ্গদর্শন-এ এর পরে এই অনুচ্ছেদেই ছিল : "গানে বলিতেছে সব ভাই ভাই এসো ভাই ভাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব ভাই ভাই ; সব আপন, সব প্রেম, প্রাণীমাত্রেই ভাই ; এসো কোলাকুলি করি এসো সবে মিলে এক হই একতানমনপ্রাণ হই। এতে কে না মুগ্ধ হইবে, শুধু মুগ্ধ ? মুগ্ধ হইতে মুগ্ধ, তাহা হইতেও মুগ্ধ কিছু যদি থাকে তাহাও হইতে হয়।"

প্রথম সংস্করণে ৫ উপবিভাগের পাঠ প্রস্তুত করা হয়েছে বঙ্গদর্শন-এর ৪ উপবিভাগের ১১-সংখ্যক বাক্য থেকে অবশিষ্ট অংশ সংক্ষেপ ও পরিবর্তন করে।

বঙ্গদর্শন-এ প্রাসঙ্গিক অংশের পাঠ :

"...তিন জনই তো মুগ্ধ কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ভাবিতেছেন না কিন্তু ভাবনা থামাইতেও পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলে ইচ্ছার মতো শক্তি নাই কিন্তু যখন সমস্ত মন উদ্বেল হয় সমস্ত মন দ্রব হইয়া একদিকে স্রোত চলিতে থাকে, তখন তাহাকে ইচ্ছার সাধ্য কি নিবারণ করে ?

"বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ, আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি. নিজে ক্ষত্রিয়ের পুরোহিত হইয়াছি। লাঘব স্বীকার করিয়াছি এই ভাবনাস্রোত যত বাড়িতেছে ততই তিনি আরো উন্মত্ত হইতেছেন।

"বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে, যতবার তাঁহার এই ভাবনা হইতেছে ততই তাঁহার মুগ্ধভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি ? হায় আমি কি করিতেছি আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্বনাশ করিতেছি !!! আমার এ কলঙ্ক কিসে যায়, এ দারুণ জ্বালা কিসে নিবাই ; কিরূপে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। গান যত জমিয়া আসে তাঁহার আকুল ভাব আরো বৃদ্ধি হয় ক্রমে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল তিনি কাঁদিয়া ঋভুদেবের পায়ে জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শরীর ধুলায় লুঠিতে লাগিল, দেব, রক্ষা করো, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কহিয়া দেও, প্রাণ আর বাঁচে না।

"দেবমাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে ! সহসা বাল্মীকির মন প্রফুল্ল হইল। কে

যেন অন্তরের অন্তরে বলিয়া দিল ভয় নাই ভয় নাই, পাপ ত্যাগ করো, ভাই ভাই করিয়া গান করিয়া বেড়াও, তোমার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর কিন্তু ভয় নাই তুমি ভাই ভাই গাইয়া বেড়াও তোমার জীবনে তুমি কিছু সুখ পাইয়া মরিবে, কিন্তু তোমার আত্মা এই পৃথিবীতেই থাকিবে, যেখানে ঘোর অত্যাচার সেইখানেই উহার উপস্থিতি হইবে, যেদিন পৃথিবীময় ভাই ভাই হইয়া উঠিবে সেইদিন তুমি আমাদের সঙ্গে ঋভু হইবে ঋভুরাজ হইবে তোমার সুখের শেষ থাকিবে না।

"অল্পক্ষণেই বশিষ্ঠের আত্মপ্রসাদ নৈরাশ্যরূপে পরিণত হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন কিছু হয় নাই তাঁহার সব চেষ্টা বিফল হইবে।

"বিশ্বামিত্রের বোধ হইল তাঁহার ঘোর বিপদ সম্মুখে, তিনি যেন কত পাপ করিয়াছেন কিন্তু তিনি সে কথায় কান দিলেন না বীরজনসুলভ আত্মমদে মত্ত হইয়া আত্মগরিমায় পূর্ণ হইতে লাগিলেন।

"ক্রমে গানে মুগ্ধভাব অন্তরিত হইল। শেষ এই যে ভাবনাস্রোত তাহাতেই তিনি জলমগ্ন হইলেন, ডুবিয়া রহিলেন, পূর্বে সকল ইন্দ্রিয় কানে উঠিয়াছিল এক্ষণে ফিরিয়া হৃদয়ের তলে তলে লুকাইয়া হৃদয়ের খেল দেখিতে লাগিল। ঋভুগণ যে কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেলেন তাহা টেরও পাইলেন না, তখন যে রাত্রি নাই তাহা তাহাদের জ্ঞানও নাই, আত্মচিন্তায় যে মগ্ন তাহার আবার দিন রাত্রি কি?"

১১/৮ : "পৃথিবীতে প্রভাত হইল ; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।" এই বাক্যের পরে বঙ্গদর্শন-এ (পৌষ, ১২৮৭) অতিরিক্ত অংশ, বইয়ে বর্জিত :

"যেমন বড়ো ভয়ানক ক্রিয়াকাণ্ড শেষ হইলে সমস্ত বাড়ি খাঁ খাঁ করিতে থাকে সমস্ত বিশ্বসংসার তেমনি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি আপনআপন টিব্বায় ভাবনায় ডুবিয়াছিলেন কতক্ষণ ছিলেন কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ— আকাশে ভানূদয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাতবায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে নির্ঝরশব্দ কান জুড়াইয়া দিতেছে তিন জনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। বাল্মীকি যখন উঠিয়া দেখিলেন সে গানও নাই সে দেবও নাই তিনি শোকে আকুল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বশিষ্ঠ প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগ বলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন বিশ্বামিত্র নামিতেছেন ; অমনি সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট আসিয়া দুজনে পদব্রজে পর্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।"

১১/১০ : "বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি…" থেকে ৬ উপবিভাগের শেষ দুটি অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তী সমগ্র ৭ ও ৮ উপবিভাগ প্রথম সংস্করণে নতুন সংযোজন।

**দ্বিতীয় খণ্ড ॥**

বঙ্গদর্শন-এ ( মাঘ, ১২৮৭ ) দ্বিতীয় খণ্ডের ১ উপবিভাগের পাঠ নিম্নরূপ :

"পর্বত হইতে নামিবার সিঁড়ি থাকিলে বড়ো ভালো হইত, বড়ো বড়ো ধাপ-ওয়ালা চাঁদপাল ঘাটের মতো যদি সিঁড়ি থাকিত, বোধ হয়, তাহা হইলে সকলেই তাহাতে উঠিত, কিন্তু তাহা নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া কখনো গাছের ডাল ধরিয়া, কখনো ঝরনার ধার দিয়া, কখনো আবার নিম্ন হইতে উচ্চমুখে, কখনো পাহাড় বেড়িয়া কখনো বরাবর নামিয়া, আসিতে হয়। কখনো এমনি ভয় যে পা একটুকু সরাইলেই পড়িয়া যাইতে হয়। কখনো ভয় হয় প্রকাণ্ড পাথর মাথায় আসিয়া পড়িবে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে অবলীলাক্রমে গল্প করিতে করিতে নামিতেছেন। বিশাল বক্ষ, তেজঃপুঞ্জ, বলিষ্ঠ, প্রকাণ্ড দেহ ; মুখকান্তিতে একজনের অসাধারণ শৌর্য আর-একজনের অদ্বিতীয় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইতেছে। উভয়ে গল্প করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিয়া যাইতেছেন। গল্পের বিষয় সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। গতরাত্রের ঘটনাবলী—

"বশিষ্ঠ বলিলেন. 'যাহাতে ভাই ভাই হয় তাহার কি উপায় করিতেছেন ?'

"বিশ্বামিত্র। তাহার আবার উপায় কি ? প্রায় সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছি, আর অল্প বাকি, এইটুকু হইলেই এক রাজার অধীনে সব প্রজাই ভাই ভাই হইয়া উঠিবে।

"বশিষ্ঠ। আপনি কি মনে করেন. এক শাসন আর ভ্রাতৃভাব একই জিনিস।

"বি। তাহার আর সন্দেহ কি ?

"বশিষ্ঠ। রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ বিপ্লব চৌর্য দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় কেন ?

"বিশ্বামিত্র দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, 'এই হস্তের বলে সে সমস্ত নিবারণ করিব।'

"বশিষ্ঠ বলিলেন, 'মন ?'

"বি। মনে যাহাই থাকুক প্রকাশ করিতে দিব না।

"বশিষ্ঠ। তবে আর ভাই ভাই হইল কই, মনে বিদ্বেষ থাকিলে ভ্রাতৃভাব হয় কই।

"বিশ্বামিত্র। আপনারা জনকতক ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদেরই মাত্র মন অত্যন্ত ক্রূর, মনোভাব লুকাইয়া কাজ করিতে পারেন, অন্যলোকে কাজে না করিতে পারিলে মনেও কিছু করিবে না।

"বশিষ্ঠ দেখিলেন নির্বোধকে বুঝানো দায়, তিনি কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের উপর আপনার এত রাগ কেন ? ব্রাহ্মণ আপনার কি করিয়াছে ?'

"বি। আমার কিছু রাগ নাই আমার কিছু করে নাই, কিন্তু আমার

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

বোধ এই যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার প্রথম বিবাদ হইবে। কারণ, উহাদের বুদ্ধি বড়ো পেঁচাও, আপনার কর্তৃত্ব করিবার জন্য উহারা সব করিতে পারে।

"বশিষ্ঠ। বলেন কি মহাশয়! ব্রাহ্মণ বরং সকলের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলার জন্য বিশেষ উদ্যোগী, তাহার সাক্ষী দেখুন আমি ক্ষত্রিয়ের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়াছি, ইহাতে লাঘব থাকিলেও স্বীকার করিয়াছি।

"বিশ্বা। রাজপৌরোহিত্যে লাঘব আছে তাহা স্বীকারই করি না। বিশেষ আর আপনি যে, বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর আপনি কি মতলবেই বা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই কে জানে।

"বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন, আপনি যে মতলবেই আসুন, আর ব্রাহ্মণের যত কুমন্ত্রণাই থাকুক, বিশ্বামিত্র এই ভুজবলে সমস্ত শাসিত করিবে, সমস্ত পৃথিবী একশাসন এবং একমন, একপ্রাণ করিয়া দিয়া যাইবে।

"বশিষ্ঠ দেখিলেন, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। চুপ করিয়া পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

"বিশ্বামিত্রও দেখিলেন, অকারণ ব্রাহ্মণের মনঃক্ষুণ্ণ করিয়া ভাল করেন নাই, তিনিও খানিক চুপ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! কিছু মনে করিবেন না, আমি আপনাকে অকারণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছি ক্ষমা করুন, আর যদি কোনো বাধা না থাকে, আমার শিবির নিকট, আজি আতিথ্য গ্রহণ করুন।' বশিষ্ঠ সম্মত হইলেন। মহা আদরে বশিষ্ঠের আতিথ্য করা হইল, এবং কিঞ্চিৎ জাঁকসহকারে তাঁহাকে যে সকল অপার রত্নরাশি নানা দেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা দেখাইলেন, এবং উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইবার সময় বিশ্বামিত্রকে আপন তপোবনে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

১৯/৪ : "এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক··· " থেকে ১৯ পৃষ্ঠার ১৪ ছত্রের "··· বুদ্ধি বলে নহে।" পর্যন্ত প্রথম সংস্করণে নতুন সংযোজন।

১৯/১৫ : "কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই এ দৃশ্যের পরিবর্তন হইল," বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "কিন্তু যাইবার একটু পরেই সে দৃশ্য পরিবর্তন হইল,"।

১৯/২৬ : "সরোবরের মধ্য দিয়া শ্বেত··· ওপাশে গালিচা।"—এই অংশটুকু প্রথম সংস্করণে সংযোজিত, বঙ্গদর্শন-এ নেই।

২০/২৪ : "···তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামতো দিয়া থাকেন।" এর পর বঙ্গদর্শন-এর অতিরিক্ত অংশ, প্রথম সংস্করণে বর্জিত : "বাস্তবিক সে ধেনু আর কিছুই নহে, বশিষ্ঠের সর্বগ্রাহিণী বিদ্যামাত্র।"

২১/১ : "বিশ্বামিত্র বলিলেন, না দিলে অতিথির অবমাননা··· নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।"—এ পর্যন্ত প্রথম সংস্করণে সংযোজিত, বঙ্গদর্শন-এ নেই।

২১/৭ : "অপহরণ করার অপরাধ বোধ হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করানো অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর নহে।" —এই বাক্যটি প্রথম সংস্করণে সংযোজিত, বঙ্গদর্শন-এ নেই।

২১/১১ : "লোকে ধেনু অপহরণ··· দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল।" বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "লোকে ধেনু অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, ধেনু যাইবার সময় কাতরনয়নে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল।"

২১/১৯ : "বিশ্বামিত্র দেখিয়াই ভাবিলেন যে,··· আয়ত্ত করা যায়।" —এই অংশটুকু প্রথম সংস্করণে সংযোজিত, বঙ্গদর্শন-এ নেই।

২২/৪ : "বলিলেন পুত্রগণ, শিষ্যগণ, ক্ষত্রিয়ের যাহাই হউক, 'ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা', ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ করিলেন না।"—এই অংশটুকু প্রথম সংস্করণে সংযোজিত, বঙ্গদর্শন-এ নেই।

২২/৭ : "এক দুই করিয়া ক্রমে বিশ্বামিত্রের·· সৈন্যতরঙ্গের সম্মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।" —এই অংশ প্রথম সংস্করণে সংযোজিত, বঙ্গদর্শন-এ নেই।

২২/১৩ : "তখন বিশ্বামিত্র হুকুম দিলেন, 'গোরু মেরে ফেলো।'" এর পরের তিনটি বাক্য বঙ্গদর্শন-এ নিম্নরূপ : "গোরু এখন ক্ষত্রিয়দিগের করকবলিত ছিল, উহার প্রাণসংহারে উদ্যম করিবামাত্র গোরু দিব্য স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়া আকাশ-পথে উত্থিত হইল। স্ত্রীমূর্তি স্বয়ং সরস্বতী, শ্বেতপদ্মাসনা শ্বেত-বস্ত্রবিভূষিতা শ্বেতবর্ণচ্ছটায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ঝক্‌মারে, হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো, তাহার উপব আবার শ্বেতপদ্মের সমস্ত বিভূষণ!"

২২/১৯ : "··· আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা, তোর সাধ্য কি, তুই আমায় অপহরণ করিস।" এর পরের বাক্যটি বঙ্গদর্শন-এ নিম্নরূপ :

"আমি কুলক্রমে ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিয়া থাকি, করিয়াছি ও করিব, তুই কি গায়ের জোরে আমায় হরণ করতে পারিস, মনে করিয়াছিস।"

২২/২৩ : "সমস্ত সৈন্য বাতে মিশিয়া গেল।" বঙ্গদর্শন-এ আছে : "সমস্ত সৈন্য বায়ুতে মিশিয়া গেল।"

২৩/১ : "… তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্বত-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।" এর পরে বঙ্গদর্শন-এ দুটি অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ :

"বশিষ্ঠ দেখিলেন, তাঁহার মনের আশা ব্যর্থ হইল।

"বিশ্বামিত্র যে কেবল বাহুবলে সমস্ত ভুবন এক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন, আর বাল্মীকি দস্যুদল ত্যাগ করিয়া, অন্তরের জ্বালায় বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।"

তৃতীয় খণ্ড ॥

২৪/৬ : "… তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল।" বঙ্গদর্শন-এ এই বাক্যের অবশিষ্ট অংশ নিম্নরূপ :

"বশিষ্ঠবংশের কি ভয়ানক পরিণাম হইয়াছিল, ইতিবৃত্তে তাহার উল্লেখ আছে।"

২৫/৫ : "দারুণ অন্তরের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল।" বঙ্গদর্শন-এ এবং বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এর পরের বাক্যটি নিম্নরূপ :

"সম্মুখে দেখেন কতকগুলি পরমাসুন্দরী— যুবতী— অপ্সরা কোথায় লাগে, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের নিতম্ব-দোলন অতীব চমৎকার, তাহারা কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে।"

২৭/২৪ : "… ব্রহ্মর্ষিদিগকে মহাসভায় আহ্বান করিলেন।" বঙ্গদর্শন-এ আছে : "ব্রহ্মর্ষিদিগকে সিণ্ডিকেটে আহ্বান করিলেন।"

২৭/২৬ : "আকাশ-পথে সভা হইল", এর পরের বাক্যাংশ, "বোধ হইল, আকাশ-পথে শত শত সূর্যের উদয় হইয়াছে", বঙ্গদর্শন-এ নেই, প্রথম সংস্করণে সংযোজিত।

২৮/৯ : "… আপনি ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন আর যাহাই চায়, দিবেন।" এর পরের বাক্যটি "তখন সূর্য বিনিন্দিত… নিভৃত গুহায় আবির্ভূত হইলেন।" বঙ্গদর্শন-এ নেই, প্রথম সংস্করণে সংযোজিত।

২৮/১৮ : "… অন্য কোনো বরদানে তুষ্ট করা যাউক।" এর পরের বাক্যটি বঙ্গদর্শন-এ এইরূপ :

"বশিষ্ঠ একবার যাইতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও অন্যান্য সভাসদ-গণের অনুরোধে গেলেন।"

২৮/২০ : "…যাইতে স্বীকার… উপস্থিত হইলেন" পর্যন্ত প্রথম সংস্করণে সংযোজিত।

২৯/২৬ : "ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।" এর পরের অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটির জায়গায় বঙ্গদর্শন-এ আছে :

"ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'তোর যত শক্তি আছে কর। আমাদের সঙ্গে তোর কোনো সম্পর্ক আর কোনো সম্বন্ধ নাই।' বলিয়া ক্রোধভরে বেগে প্রস্থান করিলেন।"

চতুর্থ খণ্ড॥

বঙ্গদর্শন-এর ( চৈত্র, ১২৮৭ ) ১ উপবিভাগের পাঠ নিম্নরূপ :

"শরৎকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে, অগণ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে সময়ে সময়ে সাদা মেঘের মতো কিছু কিছু দেখা যায়। দূরবীন দিয়া দেখিলে, ঐ সকল আরো পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নয়, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনো পৃথিবী সৌর-জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড গড়া হয় নাই। উহাদের ইংরেজি নাম নেবুলা।

"যেদিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে উঠেন, সেদিন ঐ সকল নেবুলায় তাঁহার চোখ পড়ে ; তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্য-পথে তদভিমুখে ধাবিত হন। বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তীরের ন্যায়, তড়িত-গতির ন্যায়, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র গমন করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমে পাতলা হইতে লাগিল, ক্রমে নিশ্বাস বহে না এইরূপ হইয়া উঠিল। অমনি বিশ্বামিত্র পৃথিবীবায়ু স্মরণ করিলেন, স্মরণ করিয়া সঙ্গে লইলেন, নিশ্বাস ফেলিবার কিছুই ক্লেশ হইল না। বাইশ ক্রোশ পরেই স্থির বায়ু, সেই বায়ুতে ক্রমাগত উল্কা ঘুরিতেছে, ব্রহ্মার আদেশে সমস্ত উল্কা আজি বিশ্বামিত্রের গায়ে পড়িতে লাগিল, বিশ্বামিত্র আরো বেগে শূন্য-পথ পার হইতে আরম্ভ করিলেন, ধূমকেতুগণ তাঁহার পথরোধ করিল। তিনি তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া গেলেন, সমস্ত শূন্যে ঈথর নামে যে পদার্থ আছে, তন্মধ্যস্থ জীব সকল তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিতে লাগিল ; তাহারা এত সূক্ষ্ম যে, দূরবীন দ্বারাও দেখা যায় না, কিন্তু ক্রমে শরীর গুরুতর হইয়া উঠিল, তাহাতেও বিশ্বামিত্রের দৃক্‌পাত নাই। বিশ্বামিত্র তো মানুষবলে উঠিতেছেন না, যোগবলে উঠিতেছেন। তিনি ক্রমে অসংখ্য সৌর-জগৎ অতিক্রম করিয়া নেবুলার নিকট উপস্থিত হইয়া, অনন্ত গগনস্থ সমস্ত নেবুলা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। চারি দিক হইতে নেবুলাসমূহ সংগ্রহ হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িতে লাগিল। কত

অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশি-মধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে ? ক্রমে আকাশের এক কোণ নেবুলায় পুরিয়া গেল ; বিশ্বামিত্র তাহার উপর দাঁড়াইয়া নিজ অঙ্গুলি ঘুরাইতে লাগিলেন, আর সেই অনন্ত, অগঠিত পদার্থরাশি ঘুরিতে লাগিল, ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে একত্র হইতে লাগিল, ক্রমে পরস্পর নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে পরস্পর গায়ে গায়ে লাগিল, ক্রমে আবার ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আটিয়া বসিয়া গেল। আরো— ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্নি সে সকল উদগম হইল, প্রকাণ্ড পরমাণুরাশির চারি দিকে অগ্নিময় Atmosphere হইল, খানিক জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'বুধ হউক', অমনি সেই জ্বলন্ত পদার্থ হইতে একখণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল, এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, 'শুক্র হউক' অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর-একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, 'পৃথিবী হউক' অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর-একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী-দ্বীপ-সাগরবতী-পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি আমাদের সৌর-জগতে যাহা যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটি গুণে বড়ো হইল, সূর্য কোটি গুণে বড়ো, পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল। তৃণ, বায়ু, জল, পর্বত, নদী, বন, বৃক্ষ, বরফ, যেমন যেমন এ পৃথিবীতে আছে, সব ঠিক তেমনি তেমনি হইল ; অধিকের মধ্যে নারিকেল গাছ তখন এখানে ছিল না তাহা হইল। তাঁহার জগতে হিংস্র জন্তু রহিল না ; বিচিত্রপক্ষী পক্ষচ্ছটায় নয়ন মন রঞ্জন করে, এইই অধিক ; বিচিত্র পশু, দেখিতে অতি মনোহর ; সমস্তই সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষ— বৃক্ষের পত্র সুগন্ধি, কাষ্ঠ সুগন্ধি, ফুল সুগন্ধি, আস্বাদ সুগন্ধি— যে তৃণদ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আচ্ছাদিত তাহাও আতর অপেক্ষা সুগন্ধি। আকাশ হইতে যে বৃষ্টি হইত, তাহা গোলাব। বায়ু, ধূপ-ধুনা-গন্ধামোদিত। আহারীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে হয় না— বন, জল, বায়ু আহারীয় প্রদান করে, এবং ইহার পরও সহস্র সহস্র বৎসর দিতে পারিবে, তাহারও কৃষিকর্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না ; লোকসংখ্যা যদি অগণ্য বাঁধিত হয়, তবেই যাহা হউক। বাড়ি ঘরদ্বার বিছানা রহিবে না, সুগন্ধি সুস্পর্শ অতি কোমল তৃণই শয্যা, সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময় থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার উপর দারুণ সূর্য-উত্তাপ এজন্য সমস্ত রাস্তার উপর শেড দেওয়া, তাহার উপর দুই প্রহরের সময় বরফ দেওয়া হয়, মাঠে যখন দারুণ গ্রীষ্ম রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। বিশ্বামিত্র নিজে স্বভাব

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

সৌন্দর্যের জন্য বড়োই পাগল, এইজন্য পাহাড়ে উঠিবার উপায় করিয়া দিলেন। লোকে যাহাতে সর্বদা পর্বতের ডগা হইতে সমুদয় তলা পর্যন্ত সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার নানা উপায় করিয়াছিলেন।"

৩৪/১৫ : "...একেবারে কোলাকুলি ও গাঢ় আলিঙ্গন।" এর পরের বাক্যটি বঙ্গদর্শন-এ নিম্নরূপ :

"সকলেই ব্যস্ত every thing onward & forward."

৩৪/২৪ : "মনোমিলন হইলে প্রায় আর বিচ্ছেদ হইত না।" এর পরের বাক্যটি বঙ্গদর্শন-এ নিম্নরূপ :

"বিচ্ছেদ হইলেও তিন বৎসরকাল ভগ্ন প্রণয়ের জন্য শোক না করিয়া কেহ বিবাহ করিত না।"

৩৫/৪ : ...মনের উল্লাসে পৃথিবীস্থ লোক নৃত্য করে।" এর পরে বঙ্গদর্শন-এ নিম্নবর্তী বাক্যটি আছে :

"আহা! এমন পৃথিবী যদি আমাদের হইত, তবে না জানি কত সুখই হইত।"

পঞ্চম খণ্ড ॥

৩৭/৭ : "কিন্তু বিশ্বামিত্রের সর্গার্থগমনের পর যাহা ঘটে," বঙ্গদর্শন-এ আছে 'স্বর্গার্থগমনের'। সংশোধন করে বই-এ 'সর্গার্থগমনের' করা হয়েছে মনে হয়। 'সর্গ' শব্দের এক অর্থ— সৃষ্টি, নির্মাণ। বিশ্বামিত্র নতুন সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই গমন করেন।

৪১/২৪ : "...আর অন্যের মস্তকে তরবারি আঘাত করিস্"। বঙ্গদর্শন-এ এবং বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এর পরে নিম্নবর্তী বাক্যটি আছে :

"আপন পরিবারের প্রতি নজর দিলে সইতে পারিস্ না; কিন্তু পরের পরিবারের প্রতি কত অত্যাচার করিস্।"

৪১/২৮ : "রক্ষা করো গুরো! উপায় বলিয়া দেও।" এর পরের অংশটির পাঠ বঙ্গদর্শন-এ নিম্নরূপ :

"আবার গান চলিল, 'সব ভাই ভাই বলো, সবাই আপন, পর কেহ নাই। যম ছাড়া শত্রু আর নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি।"

৪৩/১১ : "…পৃথিবী মধ্যে একটি শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল।" এর পরের বাক্যটির বঙ্গদর্শন-এর পাঠ নিম্নরূপ :

"কিন্তু এ রাজ্য যে স্থায়ী হইবে, এত দস্যু এক হইয়া থাকিবে বাল্মীকির তাহা মনে মনে বিশ্বাস হইল না, কিন্তু পরিণামে দৃষ্ট হইবে যে, এই রাজ্য হইতেই পৃথিবীর শান্তি পুনঃস্থাপিত হইবে।"

৪৩/১৫ : "…আপন হৃদয়ের আদেশমতো গান করিয়া…"।
বঙ্গদর্শন-এ আছে : "…আপন হৃদয়ের আবেশমত গান করিয়া…"।

সপ্তম খণ্ড ॥

৫১/৪ : "ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল।" এর পরে প্রথম সংস্করণে নিম্নবর্তী বাক্যটি আছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে বর্জিত : "ক্রমে দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা মহর্ষি দেবর্ষি সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন।"

৫১/৭ : "…তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।" এর পরে প্রথম সংস্করণে নিম্নবর্তী অংশ আছে :

"বাল্মীকি কাঁদিয়া ব্রহ্মার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। 'প্রভো তোমার সৃষ্টি তুমি রক্ষা কর। আমার কথা কেহ শুনে না।' ব্রহ্মা বাল্মীকিকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন 'বৎস তোমারই জয় হইবে।' বলিয়া অচেতন মৃতদেহ দেখাইয়া সমবেত জনগণকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিতে ব্রহ্মার কথা সরিল না। দুঃখে ও মনস্তাপে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। তিনি বাল্মীকির মনে বলিবার সকল কথা যোগাইয়া দিলেন।"

"বাল্মীকি দৌড়িয়া…অলৌকিক শান্তিযত্নে"—পর্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত।

৫২/৫ : "তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা।" এর পরের দুটি বাক্য : "ক্রমে সমবেত…আবির্ভূত হইলেন।"—পর্যন্ত প্রথম সংস্করণে নেই। দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত।

## ৪. অনুষঙ্গ

১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাল্মীকির জয়'-এর বিস্তৃত সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের সূচনায় এই সমালোচনা মুদ্রিত হয়।

বঙ্গবাসী পত্রিকার ১২৮৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় এই বই সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়, আলোচনা করেন দেবেন্দ্রবিজয় বসু।

*The Calcutta Review* পত্রিকায় ১৮৮২ ও ১৮৯১ খৃস্টাব্দে 'বাল্মীকির জয়' সম্পর্কে দুটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি অস্বাক্ষরিত। দ্বিতীয়টির লেখক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আলোচনাটি তাঁর "The Neo-Romantic Movement in Bengali Literature" নামক প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ, পরে *New Essays in Criticism* (Calcutta, 1903) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। *The Calcutta Review* পত্রিকার ১৯০৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় 'বাল্মীকির জয়'-এর ইংরেজি অনুবাদ *The Triumph of Valmiki*-র একটি অস্বাক্ষরিত সমালোচনাও প্রকাশিত হয়।

*Journal Asiatique* পত্রিকার ১৯১০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় (পৃ. 389-93) সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Levi) *The Triumph of Valmiki*-র সমালোচনা করেন।

এই আলোচনাগুলি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল।

'বাল্মীকির জয়' সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক Edward Dowden-এর নিম্নবর্তী মন্তব্য চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত "মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী" প্রবন্ধে উদ্ধার করেছেন: "It will extend the horizons of western imagination".

'বাল্মীকির জয়'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন রজনীরঞ্জন সেন। *The Triumph of Valmiki*/From the Bengali/of/H.P. Shastri, M.A./By/R.R. Sen, B.L./Pleader, and Law Lecturer, Chittagong College/Chittagong/1909.

# কাঞ্চনমালা

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ

# কাঞ্চনমালা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

সি আই ই প্রণীত।

ফাল্গুন, ১৩২২।

কাঞ্চনমালা

( দ্বিতীয় সংস্করণ )

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

সি, আই, ই, প্রণীত

আশ্বিন—১৩২৪
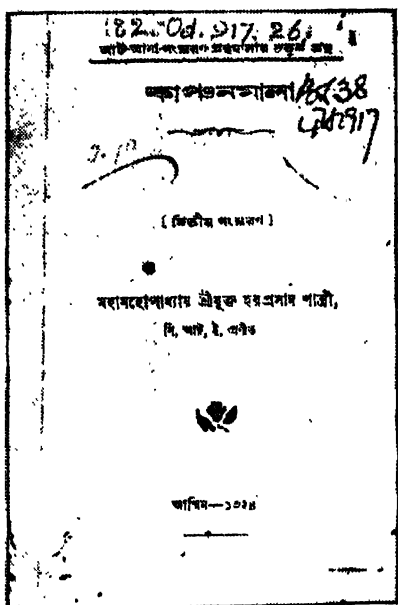
# ভূমিকা

১২৯০ [ ১২৮৯ ] সালে যখন ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদক তখন "কাঞ্চনমালা" "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পর নানা কারণে আমি অনেক দিন ধরিয়া বাংলা লিখি নাই ; সুতরাং "কাঞ্চনমালা" প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। কেন, কি বৃত্তান্ত— সে অনেক কথা বলিয়া কাজ নাই। এতকালের পর আধুলি-গ্রন্থমালা-প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা পুনরায় প্রকাশ করিতে চাওয়ায় আবার প্রকাশ করা গেল। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লেখা হইয়াছিল তাঁহাদের নাতিরা এই পুস্তক কি চক্ষে দেখিবেন বলিতে পারি না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

২৬, পটলডাঙা স্ট্রিট

কলিকাতা

১লা ফাল্গুন ১৩২২

# কাঞ্চনমালা ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

দুইটি ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারি দিক আমোদ করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে। একবার এ উহাকে পাপড়ি দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর! এরূপ সমবিকশিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর!

আবার দুইটি পাখি— সুন্দর, সুরস, সুকণ্ঠ, সুপুষ্ট, ও সুহৃষ্ট— যখন মদভরে খেলা করে তখন উহারা কেমন সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পড়িতেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে বন পূরিয়া ডাকিতেছে, আবার দেখা হইলেই ঠোকরাইতেছে, কেমন? এমন দুটি পাখির মিল কেমন সুন্দর!

পাখি ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকশিত,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর আছে কি ? সুন্দর— সুস্থ— সবল— সতেজ— সুশিক্ষিত, সুবংশজাত, কলাকোবিদ দুটি মানুষের যদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড়ো লোভনীয় হয়। তাহার উপর আবার যদি তাহাদের দুইটি হৃদয়ের মিল হয়, যদি সর্মবিকশিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি, হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিল হইয়া যায়, তবে দেবতারাও তাহা স্বর্গ হইতে দেখেন।

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি ? হৃদয়ে হৃদয় প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি ? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি ? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি ? দেখিলে বাক্‌শক্তি থাকে না দেখিয়াছ কি ? না দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়াছ কি ? নয়নে শরৎ-জ্যোৎস্না, কর্ণে সুধাধারা, স্পর্শে অমৃতহ্রদ, আর হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল দেখিয়াছ কি ? অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্মল, স্বচ্ছ বারিধির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্মল, স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি ? তেমনি অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি ? যখন আবার সেই অপার, অগাধ, অনন্ত, নির্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশিদ্বয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সেই অনন্ত সমুদ্রে আকাশস্পর্শী তরঙ্গ উঠে দেখিয়াছ কি ? আবার যখন অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে, তখন দেখিয়াছ কি ?

দেখিবে কোথা হইতে ? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দেবদুর্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে ? পৃথিবীতে এরূপ অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশি কদাচ কখনো মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে, কিন্তু কাজে মিলে না।

একবার মিলিয়াছিল। দুই হাজার বৎসর আগে পাটলিপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদকাননে, এইরূপ দুইটি হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।

২ একটি রমণী অপরটি পুরুষ। দাঁড়াইয়া মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের মধ্যে অগাধ পুষ্পরাশি; মল্লিকা, মালতী, যুতি, জাতি, শেফালিকারাশির দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই জনে মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের রূপরাশি পুষ্পরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছে। পুষ্পরাশির রূপরাশি উভয়ের কমনীয় শরীর-প্রভায় প্রতিফলিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময় পুষ্পরাশিতে প্রেমিক যুগলের জ্যোৎস্নাময় লাবণ্য পতিত হইয়া সাদার উপর সাদা, তাহার উপর সাদা মিশাইতেছে। তরল দীপ্তির উপর তরল দীপ্তি, তাহার উপর তরল দীপ্তি পড়িয়া মিশিয়া তরলতর তরলতম হইয়া যাইতেছে। যুবকের উজ্জ্বল, শ্যামল, দীর্ঘ, কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত নয়ন একবার মালায় আর-একবার যুবতীর মুখে পড়িতেছে। নয়নের গতি কখনো অলস কখনো চঞ্চল হইতেছে। অলস— অথচ মধুর, চঞ্চল— অথচ মধুর, সদাসর্বদাই মধুর। দৃষ্টি "অলস বলিত মুগ্ধ স্নিগ্ধ নিস্পন্দ, মন্দ"; অলস অথচ মধুর, বলিত কুঞ্চিত, অথচ মধুর; মুগ্ধ— হৃদয়ের মোহব্যঞ্জক— অথচ মধুর, স্নিগ্ধ, স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ মধুর; নিস্পন্দ, অথচ মধুর; মন্দ— ধীর-গতি— অথচ মধুর; ডাগর ডাগর চক্ষু-মধ্যে, গাঢ়ান্ধকারময় স্থানের ভিতর দিয়া এক-একবার বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে। প্রতিনয়ন-নিপাতে প্রণয়িনীর উপর স্নেহ, মমতা, প্রেম, বিকীর্ণ করিতেছেন। নয়ন দিয়া হৃদয় যেন গলিয়া প্রাণেশ্বরীকে স্নান করাইয়া দিতেছে।

যুবতীও মুগ্ধ, সুন্দর ও কমনীয়। তিনি আপন মনে মালা গাঁথিতেছেন আর মনে মনে কি ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন কেমন করিয়া জানিব— বোধ হয় প্রাণনাথের অপরিমেয়, অজেয়, অক্ষুব্ধ, প্রেমরাশির কথা ভাবিতেছেন। নহিলে তাঁহার কোমল, চিক্কণ, মার্জিত, মহামূল্য মণিমনোহর কপোলে মধ্যে মধ্যে রক্তিমোদয় হইতেছে কেন? তিনি এক-একবার তাঁহার প্রিয়তমের দিকে চাহিতেছেন কেন? তাঁহার চাহনি বড়ো চমৎকার, তিনি চঞ্চলসুন্দরীর ন্যায় আড়ে আড়ে চাহিতেছেন না; একবার চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইতেছেন না; যখন চাহিতেছেন উজ্জ্বল ও বৃহৎ চক্ষু মেলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিতেছেন; যেন একতান মনে, প্রাণ ভরিয়া, নয়নচকোরকে প্রিয় বক্তসুধা পান করাইতেছেন।

তাঁহাদের কাজ দেখিয়া বোধ হইতেছে একটু ত্বরা আছে, মালা গাঁথিতে দুই জনেই ক্ষিপ্রহস্ত। দেখিতে দেখিতে ফুল অর্ধেক হইয়া দাঁড়াইল। তখন যুবক আপন হস্তস্থিত মালাগুলি যুবতীর মাথায় ও সর্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন। যুবতীও আপন মালাগুলি যুবকের মাথায় ও সর্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন, সেই সময়ে যুবক রমণীর চিবুক ধরিয়া তুলিলে যুবতী দেখিলেন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে ; যুবক দেখিলেন, মাটিতে চাঁদ উঠিয়াছে। দুই জনেই দেখিলেন, দুই জনেই মুগ্ধ হইলেন, নয়ন ভরিয়া দেখিলেন তৃপ্ত হইলেন না। যুবক মুখ অবনত করিয়া আনিতেছেন, এমন সময় যুবতী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—

"আকাশের দিকে দেখিতেছ না? আর যে বেলা নাই, মালা গাঁথিয়া শীঘ্র শীঘ্র সাজিয়া লইতে হইবে।"

যুবক "তা হোক" বলিয়া বাহুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বারংবার যুবতীর বিম্বাবিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধরের উপর, আপনার বিম্বাবিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধর স্থাপন করত তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন। যুবতীও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন।

## ৩

মালা গাঁথিতেছেন। এক হস্তে সূচ ও সূত্র, অন্য হস্তে ফুল। টুপ টুপ করিয়া তুলিতেছেন ও পরাইতেছেন, যেটির উপর যেটি বসিবে, যেটির পর যেটি বসিলে সুন্দর দেখাইবে, সেটি ঠিক সেইটির পর সেইরূপেই বসিতেছে। উভয়েই কৃতকর্মা, এজন্য ফুল তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইতেছে না। একছড়া মালা হইল সরু যুঁইফুলের, একছড়া মোটা মল্লিকার, একছড়া ছোটো কুঁদফুলের। কোনো ছড়ায় দুই প্রকার ফুল, কোনোটিতে তিন প্রকার, কোনোটিতে চারি প্রকার! লাল, নীল, সবুজ পুষ্প, কেয়ারিতে কেয়ারিতে সাজানো হইতে লাগিল। যুবকের মস্তকে যুঁই-এর গোড়ে, তাহার পার্শ্ব হইতে কর্ণবিলম্বী দুই ছড়া ছোটো ছোটো মালার আগায় ভূমিচম্পক দুলিতেছে। তিনি যতবার হাত নাড়িতেছেন, ভূমিচম্পক ততবার তাঁহার নাকের উপর পড়িয়া তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীতল করিয়া দিতেছে।

রমণীর অঙ্গে সমস্ত পুষ্প আভরণ, পুষ্পের কঙ্কণ, পুষ্পের মুকুট, পুষ্পের হার, পুষ্পের অঙ্গদ, পুষ্পের অবতংস, পুষ্পনির্মিত গ্রীবা-ভূষণ। তিনি মালা গাঁথিতেছেন, আর সেইগুলি নাড়িতেছে, দুলিতেছে। পুষ্প-রাশি যত কমিয়া আসিতেছে, দুজনে তত নিকট হইতেছেন, ততই কাছে আসিতেছেন। এক-একখানি গহনা গাঁথা হইতেছে, আর উহা যথাস্থানে পরানো হইতেছে, আর দেখা হইতেছে। একে তো যখনই দেখা যায়, তখনই নূতন, তাহাতে আবার নূতন নূতন গহনা, বড়োই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যত পুষ্পরাশি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, প্রণয়ীযুগল ততই বসিতে লাগিলেন। মনে মনে বাসনা, সমস্ত পুষ্পা-ভরণ প্রস্তুত হইলে খানিক দুজনে একটু গল্প করিয়া যান : দুই জনে সেই পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া একবার কাছে কাছে বসিয়া, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পার্থিব সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া স্বর্গের উপর স্বর্গ, তাহার উপর স্বর্গ, তাহার উপর যে স্বর্গ আছে, একবার সেই স্বর্গীয় লোকের মতো "প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজিয়ে" কিছুকাল মনুষ্য জীবনে দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, সুখস্বপ্নবৎ অবস্থায় মৃদু মৃদু আলাপ করেন। আলাপ বলিব, না রসালাপ? ছি! রসালাপ! অশোক রাজার প্রিয়পুত্র, প্রধান সেনাপতি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কলাভিজ্ঞ, ধর্মানুরাগী কুণাল, রমণীকুলচূড়া, সুশিক্ষিতা, সুপণ্ডিতা, প্রেমপূর্ণহৃদয়া কাঞ্চনমালার সঙ্গে রসালাপ করিবে? কুৎসিত নায়ক-নায়িকাবৎ কদর্য ভাবের অথবা কদর্য ভাবব্যঞ্জক কথায় ঠাট্টা-তামাসা করিবে? আমার তো এমন বোধ হয় না। যদি তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইত, যদি তাহারা সেইরূপ আলাপ বা রসালাপ করিতে পারিত, তবে বুঝিতাম, লিখিতেও পারিতাম কি কথাবার্তা হইয়াছিল। কিন্তু এখনো ফুলধনু প্রস্তুত হয় নাই, এখনো পঞ্চশর প্রস্তুত হয় নাই, এখনো কাঞ্চনমালার মুকুটের মাথার ফুলের থোব্‌না প্রস্তুত হয় নাই, ফুল ফুরাইয়া গেল।

৪

সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত; সূর্যদেব রক্তবর্ণ হইয়াছেন, এখনো ডুবেন নাই। মৃদু পবনহিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ দুলিতেছে ও খেলিতেছে। কিন্তু ফুল ফুরাইয়াছে, সন্ধ্যার একটু পরেই

তূর্যধ্বনি হইবে ; সেই সময় সকলকে সাজিয়া ললিতবিস্তরের অভিনয়ে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু সাজা এখনো হয় নাই, ফুলও ফুরাইয়াছে। এই কার্য উপলক্ষে বাগানের অর্ধস্ফুটিত কোরক পর্যন্ত তোলা হইয়াছে, আর ফুল বাগানে নাই। কুণাল ও কাঞ্চনমালা চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন নবদূর্বাদলময় সমতল ভূভাগ, তাহার উপর দূর্বা পুষ্প সুধাময় শ্বেতকান্তি দুলাইয়া নামিয়া নমিয়া পড়িতেছে ; দেখিলেন, অশোক, কিংশুক, বক, বকুল, নাগ, পুন্নাগাদি বৃক্ষসমূহ বায়ুভরে নড়িতেছে, দেওদার জাতীয় নানা বৃক্ষ শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ করিতেছে। বক্ষস্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষ প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকাসমূহ সারি দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণ খুলিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কানে লাগিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের একটু উৎকণ্ঠা থাকায় তাঁহারা ইহার তত মর্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দ্রুতপদে লতা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, পুষ্পবৃক্ষাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, পুষ্প কোথাও পাইলেন না। সময় যত বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই একটু একটু করিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটু ত্বরাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা গাত্রস্থিত পুষ্পাভরণ সকল মোচন করিয়া নিকটস্থ সংমর্মর নির্মিত মঞ্চে রাখিলেন। কাঞ্চনমালার অলংকারগুলি বামে ও কুণালেরগুলি দক্ষিণে রক্ষিত হইল ; তখন উভয়ে একটুকু উত্তর মুখে গেলেন। তথায় নিকটে কৃত্রিম শৈলের প্রতি তাঁহাদের নয়ন পড়িল। তখন কাঞ্চনমালা বলিলেন—

"যাহারা পুষ্প চয়ন করিয়াছিল, তাহারা বাগানের ফুলই তুলিয়াছে। বোধ হয়, দুরারোহ বলিয়া এই শৈলশিখরস্থিত পুষ্প চয়ন করে নাই। উহার উপর গেলে নিশ্চয়ই ফুল পাইব।"

কুণালও সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে শৈল আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন।

যে দুইটি পথ শৈল বেষ্টন করিয়া বরাবর উপরে উঠিয়াছে তাহার একটির পার্শ্বে অত্যন্ত বন হইয়াছে। ঘাস, লতা, ফুল, গাছ প্রভৃতি

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

এত ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কিছুই দেখা যায় না। এইটি কিছু অধিক খাড়াই, অতএব ইহা দ্বারা শীঘ্র উঠিতে পারিবেন ভাবিয়া উভয়ে ঐ পথই অবলম্বন করিলেন। দুই-এক পা উঠিতে না উঠিতেই নিবিড় লতান্তরাল হইতে কুপিতফণিফণার ঘোরগর্জনবৎ কি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু ত্বরাপ্রযুক্ত তাঁহারা কেহই উহার প্রতি কোনো লক্ষ্য করিলেন না। কিছু দূর উঠিয়াই দেখিলেন কোথাও একটা পাতা ছেঁড়া, কোথাও একটা ডাল ভাঙা, কোথাও দুটি পুষ্প দলিত। দেখিয়া কাঞ্চন বলিল, "বুঝি কে এইমাত্র এখানে আসিয়াছিল।" আরো কিছুদূর উঠিয়া একস্থানে দেখিলেন, একটি ডালে একেবারে পাতা নাই। পাতাগুলি যেন পদদলিত দেখিয়া কুণাল বলিলেন, "যে আসিয়াছিল, সে বোধ হয় এইখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ছিল।" আর-একটু উপরে উঠিয়াই দেখিলেন কাঞ্চন যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক, পুষ্পচয়নকারীরা এত দূর উঠে নাই। রাশি রাশি পুষ্প শৈলাগ্রদেশ পর্যন্ত ফুটিয়া যেন আকাশের লঘু বায়ুকেও সৌরভময় করিয়া তুলিতেছে। তখন কাঞ্চন আপন অঞ্চলে এবং কুণাল উত্তরীয়ে পুষ্প তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। উভয়ে পুষ্পচয়নে ক্ষিপ্রহস্ত— ফুল চয়ন বড়ো সোজা, টানিয়া ছিঁড়িতে হয় না, হাত দিলেই খসিয়া যায়— অমনি ধরেন, আর যথাস্থানে রাখেন। এই ফুল, এই ফুল, এই ফুল, দুটিতে নাড়িয়া নাড়িয়া যাইতেছেন আর ফুল তুলিতেছেন। নাচ ইহার কাছে কোথায় লাগে? হে নৃত্যকলা-কোবিদত্বগর্বকারিণী বঙ্গীয় নৃত্যেশ্বরীগণ! তোমরা যদি তাহাদের দুজনের সেদিনকার ফুল তোলা দেখিতে তোমাদের নৃত্যগর্ব কোথায় থাকিত? এই এখানে, আবার পাহাড়ের আড়ালে, আবার উপরে আবার পার্শ্বে। কুণাল যেমন সময়ে সময়ে আপন মনোমধ্যে দেখিতেন, এই এই আসে যায়, থাকে না তিলেক, এখানেও সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল পদে চলিতেছেন, আর তর তর করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছেন, আর ফুল তুলিতেছেন। অত দ্রুত না কাঞ্চন, অত দ্রুত না কুণাল, একবার একটু থামো, আমি একবার তোমাদের এই অবস্থার চিত্র লিখিয়া লই। না, তোমরা থামিবে না। বুঝিয়াছি তোমাদের ত্বরা আছে। যাও, শীঘ্র পুষ্প চয়ন করিয়া ধনুক বাণ আর থোপ্‌নাটি তৈয়ারি করিয়া লও। দাঁড়াইও না, যে মহৎ কর্মের জন্য
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

তোমরা আজি উদ্যোগী, বিধর্মী ব্রাহ্মণের যদি আশীর্বাদ গ্রাহ্য হয়, আশীর্বাদ করি, কৃতার্থ হইয়া জগৎকে কৃতকৃতার্থ করো।

ক্রমে ফুল তুলিতে তুলিতে অপ্সরার ন্যায়, প্রোজ্জ্বলকান্তি দেবদেবীর ন্যায় কুণাল ও কাঞ্চনমালা পর্বতের শিখরারোহণ করিলেন। তথায় উপবেশনার্থ যে সুন্দর মর্মরখণ্ড পাতিত ছিল তথায় বসিয়া অঞ্চল ও উত্তরীয়স্থিত পুষ্প লইয়া ত্বরায় অভিলষিত ধনুর্বাণাদি প্রস্তুত হইল। গগনে বিষমমণ্ডল রাজহংস ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধফেনধবল কিরণমালা বসুধাকে স্নাপিত করিয়া দিতে লাগিল। শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যময় মলয় সমীর দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে শীতল করিতে লাগিল।

কুণাল তখন বলিতে লাগিলেন, "কাঞ্চন, আমি যখন যখন এই শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনই আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।"

কাঞ্চন। তুমি আমায় এখানে আর আসিতে দিবে না, তাহারই যোগাড় করিতেছ।

কুণাল। না, কাঞ্চন! এখানে আসিলেই সেই কথা মনে পড়ে, যেদিন গয়াশীর্ষ পর্বতে মৃগয়া করিতে গিয়া—

কাঞ্চন। আমি কানে আঙুল দিলাম, ও কথা আমি শুনিব না।

কুণাল। কেন, কাঞ্চন? যেদিন আমার ধর্মলাভ হয়, যেদিন আমার প্রাণলাভ হয়, যেদিন আমার তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিনের কথা শুনিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন, কাঞ্চন?

কাঞ্চন মৃণালকোমল বাহুযুগলে কুণালের কণ্ঠ জড়াইয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "কণ্ঠরত্ন! যাহাতে তোমার এত আমোদ তাহা শুনিতে কি আমার অনিচ্ছা হইতে পারে? তবে— "

কুণাল। তবে তোমার অনেক প্রশংসার কথা আছে বলিয়া তুমি শুনিতে রাজি নহ?

কাঞ্চন। তা কেন?

কুণাল। তবে কি?

কাঞ্চন। তুমি আমার কথা কেন বলিবে? তুমি তোমার কথা বলো।

কুণাল। তা কি হয়, কাঞ্চন, সেইদিন থেকে আমার কথা বলিলেই তোমার কথা, তোমার কথা বলিলেই আমার কথা—

কাঞ্চন। হবে বৈকি ? বলিবে বলো। তোমার কথা তুমি বলো, আমার কথা তাহার পর আমি বলি।

কুণাল। আচ্ছা বেশ ! প্রায় আট বৎসর হইল ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দিন আমি শিকার করিতে করিতে গয়াশীর্ষ পর্বতের চূড়ায় উঠিলাম। তথা হইতে দেখিলাম একটি ব্যাঘ্রদম্পতী এক জায়গায় রহিয়াছে। আমি একেবারে অশ্বপৃষ্ঠে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ব্যাঘ্রদিগের খরনখরপ্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া আছি, স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন এক প্রাচীন ঋষির আদেশে ব্যাঘ্রেরা, পালিত কুকুরের মতো তাঁহার গা চাটিতে লাগিল। তখন তিনি অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী একটি দেবকন্যাকে আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত করিলেন। কন্যা আমায় বক্ষস্থলে রাখিয়া আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করাইল। তখন আমার চৈতন্য হইল। চারি দিকে চাহিয়া দেখি, সত্য সত্যই সেই বটবৃক্ষ, সত্য সত্যই সেই অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী কন্যা, আর সত্য সত্যই সেই ঋষিতুল্য সিতশ্মশ্রু স্থবিরবর রক্তাম্বর পরিধায়ী। তাঁহার দুই দিকে দুইটি ব্যাঘ্র। তিনি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে আমার মন গলিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাঁহার বাটী রহিলাম ! আহা ! তেমন সুখের দিন কি আর হইবে ! তাহার পর আমি একদিন সেই অপ্সরার সহিত গয়াশীর্ষ পর্বতে গেলাম, সে কত কি বলিল। রোজ সেইখানে বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। ঋষি-প্রবর্তনায়, অপ্সরার প্ররোচনায় ও নিজের মনের আবর্তনায়, সর্বপ্রথম জানিতে পারিলাম, ঐহিক ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে। ভোগ ভিন্ন জগৎ চলে, আকাঙ্ক্ষা অনেক উচ্চে উঠিতে পারে, অনেক সুন্দর হইতে পারে। ক্রমে সেই ঋষির অনুকম্পায় আমার ত্রিরত্ন লাভ হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমা হেন চতুর্থ রত্ন লাভ করিলাম।

কাঞ্চন। আর কত বলিবে ?

কুণাল। তাহাব পর ধর্ম ত্যাগ করায় পিতা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, কত দেশে কত অবস্থায়ই ঘুরিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম

গৃহে বনে শ্মশানে মশানে গাছতলায় পালঙ্কে তুমি সকল অবস্থাতেই সমান।

কাঞ্চন। সে কাহার গুণ? তোমার না আমার?

কুণাল। আজ এই পাহাড়ে উঠিয়া পূর্বকথা মনে পড়িল। যেদিন ত্রিরত্ন লাভ হয়, যেদিন তোমায় লাভ হয়, যেদিন ঐহিক পারত্রিক সুখের বীজ বপন হয়, আজি সেই দিন স্মরণ হইতেছে। কারণ, সে একদিন ছিল, আর এ আর-একদিন; বলো দেখি, তোমার কোন্‌টি ভালো লাগে, কাঞ্চন?

কাঞ্চন। যখন রোজ রোজ বনে ও পাহাড়ে তোমায় দেখিতাম, তুমি বাঘ শিকার করিতে, বাঘের পিঠে বর্শা ফুটাইয়া দিয়া তাহারই উপর আরোহণ করিয়া পর্বতচূড়া হইতে পর্বতচূড়ায় গমন করিতে, তোমায় দেখিতাম আর পিতার সহিত সদ্ধর্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতাম, সে সময়ের কথা মনে হইলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। তুমি তখন আমার প্রতি কত সদয় ছিলে, পরিচয় ছিল না অথচ বোধিবৃক্ষমূলের নিকটে আসিলে আমার সঙ্গে দুই-চারি দণ্ড গল্প না করিয়া যাইতে না। সে এক দিনই ছিল। যেদিনের কথা কহিতে তুমি এত ভালোবাসো, যেদিন তুমি যখন ব্যাঘ্রনখরাঘাতে পীড়িত হইলে, পিতা তোমার উদ্ধার করিলেন, তখন তোমার অসুখ দেখিয়া আমার যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা কি প্রকারে বলিব? তাহার পর তোমায় যখন বোধিবৃক্ষমূলে লইয়া গেলাম, তখন বড়োই আনন্দ হইল, বোধিদ্রুম সহসা মুকুলিত হইল। উহার শোভাসমৃদ্ধি যে সুদ্ধ আমিই দেখিলাম এমন নহে, পিতা দেখিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার হইতে সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব হইতেই তোমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলাম, তুমিও আমার প্রতি বিরূপ নও জানিতাম। কিন্তু সুদ্ধ ভোগমাত্র যে প্রণয়ের উদ্দেশ্য সে প্রণয়ে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। যখন শুনিলাম, তোমা হইতে আমার চির অভিলষিত সদ্ধর্ম বিস্তার হইবে, "অহিংসা পরমোধর্ম" প্রচার হইবে, সর্বজীবে সমজ্ঞান বিস্তার হইবে, তখন তোমার সহিত মিলিবার জন্য বড়োই বাসনা হইল। পিতার অনুগ্রহে ত্রিরত্ন প্রসাদে ও তোমার অনুকম্পায় মিলন হইল। তোমার সহিত মিলনে একদিনও অসুখী নহি। এখন সদ্ধর্ম প্রচারের যত সমৃদ্ধি হয়, ততই আমার আনন্দ বৃদ্ধি

হইবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, সদ্ধর্ম প্রচার আর তোমার অতুল্য প্রণয়, এই উভয়ে আমি এত মগ্ন আছি যে আর আমার অন্য চিন্তা নাই!

এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োন্মাদক বাক্যলহরী সৃজন করিয়া উভয়ে উভয়কে মোহিত করিতেছেন। উচ্চপর্বতোপরি শান্ত সমীরণ বহিতেছে, নির্মল আকাশে উজ্জ্বল তারা জ্বলিতেছে, জগৎ যেন তাঁহাদের অগাধ অপার অনন্ত প্রশান্ত প্রণয়ের প্রতিকৃতি। ঝিল্লিরব যেন তাঁহাদের প্রণয়পূর্ণ স্বরলহরীর প্রতিধ্বনি।

## ৫

উভয়ে কথাবার্তা কহিতেছেন. কথাবার্তায় হৃদয় পূরিয়া উঠিয়াছে. মন উন্মত্ত হইতেছে. মন ক্রমে মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গে. তাহার পর ভুবর্লোক. মহর্লোক. জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি সপ্তশত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সুখময়. প্রেমময়, মোহময় ধামে উঠিতেছে। সমস্ত জগতের সত্তালোপ হইয়াছে, শরীর আছে কি না আছে জ্ঞান নাই. আছে কেবল তিনটি জিনিস, একটি সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময় স্বরলহরী, একটি সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময়-আত্মা আর তাহার সঙ্গে উহারই সমান সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময় আর-একটি আত্মা। পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে।

এমন সময় দূরে বাজনা বাজিল. অভিনয়ারম্ভসূচক তূর্যধ্বনি হইল। উভয়কে আবার পৃথিবীর অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিল। উভয়ে আবার পৃথিবীবায়ুস্পর্শ অনুভব করিলেন, আসনস্বরূপ মর্মর প্রস্তরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। কিন্তু হঠাৎ স্বর্গ হইতে নামিতে হইল বলিয়াই হউক বা আর-কিছুতেই হউক. কাঞ্চনমালা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। যেন মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কি যেন হারাইয়াছি, আশা যেন পুরিল না। যে সুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাম. উহা যেন আর ইহজন্মে ফিরিয়া আসিবে না। যেন যে সকল আশা এতক্ষণ করিতেছিলাম. তাহা যেন স্বপ্ন, কখনো পূরিবে না। তিনি একবার বলিলেন, "হঠাৎ মনটা কেন উদ্বিগ্ন হইল, বলো দেখি?"

কুণাল বলিলেন, "আমরা আত্মচিন্তায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অন্য চিন্তায় বিশেষ কার্যনাশসম্ভাবনা চিন্তা উদয় হওয়ায় আমিও উদ্বিগ্ন হইলাম।"

কাঞ্চন বলিলেন, "না, এ সে উদ্বেগ নহে, বোধ হয় কোনো বিপদ শীঘ্র উপস্থিত হইবে।"

এই কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সত্বরে শৈলশেখর হইতে নামিয়া আসিলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুণাল নামিয়া আসিয়া দেখেন, কঞ্চনমালার উৎকণ্ঠার বাস্তবিকই কারণ হইয়াছে। যেখানে তাঁহারা আপন আপন পুষ্পাভরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কুণালের আভরণ সেইখানেই রহিয়াছে, কিন্তু কাঞ্চনের পুষ্পগুলি সেখানে নাই। কোথায় গেল? কে লইল? এ রাত্রে এখানে লোক আসিবার তো সম্ভাবনা নাই? আর তো সময় নাই যে খুঁজি। অভিনয় সত্বর আরম্ভ হইবে। ললিতবিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইলেই কুণাল ও কাঞ্চনমালা মার ও মারপত্নী সাজিয়া বুদ্ধদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইবেন। উভয়েই অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কি করা যায়, কাঞ্চন ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন, কুণালের আর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবারও অবসর হইল না। আবার তূর্যধ্বনি হইল, প্রস্তাবনা শেষ হইয়াছে। পাত্রপ্রবেশ আবশ্যক। কুণাল বলিলেন, "কাঞ্চন, তুমি অমনি আইস; তুমি নিরাভরণা হইয়াও মারপত্নীর গর্ব খর্ব করিবে।"

কিন্তু কাঞ্চন কোনো জবাব করিল না। তাহার উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, সে কেবলই ভাবিতেছে, আমার মন যে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে জানিয়াছিলাম অমঙ্গল অবশ্য হইবে। কিন্তু সে অমঙ্গল কি এই মাত্র— না, তা হইবে না— এখনো তো উৎকণ্ঠা দূর হইতেছে না, তবে নিশ্চয় আরো বিপদ হইবে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং কুণালের কথার উত্তর দিলেন না, সমস্ত শুনিলেন কিনা সন্দেহ।

কুণাল বলিলেন, "মারপত্নী কিছু নাটকে নাই। তুমি আমায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব অশোক রাজার ধর্ম গ্রহণের সময় তুমি

আমোদ করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া আমি মারপত্নী নামে একটি নূতন পাত্র উহাতে নিবেশ করিয়াছি। অতএব তুমি না যাইলেও আমি যাই। নচেৎ অভিনয়ে ব্যাঘাত হইবে।" বলিয়া কুণাল দ্রুততর বেগে অভিনয়স্থলে গমন করিলেন। কাঞ্চন ভাবিতে লাগিলেন, "আমার অমঙ্গলের কি এইখানেই বিরাম হইবে?"

২

কুণাল আসিয়া দেখেন সমস্ত প্রস্তুত, তাঁহার জন্য নেপথ্যগৃহে সকলেই ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। তাঁহার জন্য লোকও প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গস্থল-প্রবেশের আর বিলম্ব নাই, বরং দুই-এক মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। কুণাল আর নেপথ্য-শালায় বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কই? আমার সেনাপতি ও দুহিতৃগণ কই?"

অমনি মারপত্নী আসিয়া কহিলেন, "নাথ! সকলই উপস্থিত। বসন্ত, কোকিলকুহু, আম্রমুকুল, দক্ষিণপবন প্রভৃতি দলবল সব উপস্থিত। আপনার কন্যাগণ সব উপস্থিত।"

কুণাল বড়োই উৎকণ্ঠিত হইলেন। যে মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে, এ কে? মুখ দেখিতে পাইলেন না, কারণ উহা আবৃত। গলার স্বরে বুঝিলেন, কাঞ্চনমালা নহে। কিন্তু, কি আশ্চর্য! তাঁহার স্বহস্তগ্রথিত পুষ্প অলংকারগুলি সমস্তই তাহার গায়ে রহিয়াছে। এ অলংকার এ কোথা হইতে পাইল? তিনি এই সকল ভাবিতেছেন আর অন্যমনস্ক হইতেছেন। যে যুবতী মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে সে অতি রসিকা, প্রত্যুৎপন্নমতিশালিনী। সে অমনি বলিল, "নাথ, এত চিন্তিত কেন? যখন সত্যযুগে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের ধ্যানভঙ্গ করাইয়াছ [করাইয়াছেন], তখন কলিতে এই সামান্য রাজপুত্রের ধ্যান-ভঙ্গ করিতে পারিবেন না?" কুণাল ভয়বিস্ময়সূচক স্বরে কহিলেন, "কিন্তু বোধ হয় এ অত্যন্ত কঠিন ঠাঁই।" তাঁহার ভাব এমনি মনোহর হইল যে সভাস্থ লোক সকলেই "বেশ বলিয়াছ" "খুব বলিয়াছ" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া উঠিল। কুণালের বিস্ময়জড়তা কতক দূর হইল। তিনি তাহার পর রীতিমতো অভিনয় করিতে লাগিলেন; দেখিতে লাগিলেন

যে মারপত্নী হাবভাব আদির দ্বারা তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা কে জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাঁহার এইরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় থাকা প্রযুক্ত তাঁহার অভিনয় আজি অন্য দিন অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; সকলেই কুণালের অভিনয়-পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কুণাল অভিনয়ে অত্যন্ত পটু, কিন্তু আজি তাঁহার সুখ্যাতির কারণ শিক্ষার গুণ নহে। ঐ-যে চমকিত ভাব উহাই সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জনের মূল। তাহারা কিন্তু জানিল না যে কেন তাঁহার অভিনয় এত সুন্দর, তিনিও জানিতে পারিলেন না কেন আজিকার অভিনয় এত ভালো লাগিল।

এই রমণী কে? এ তো কাঞ্চনের ফুলের গহনাগুলি চুরি করিয়াছে? নিশ্চয়ই ঐ করিয়াছে, নহিলে সে সব দেবদুর্লভ অলংকার, কুণালের স্বহস্তগ্রথিত ও তো আমরা বেশ চিনি, ও গহনা ও কোথায় পাইল, বিশেষ ঐ দেখো মুকুটের থোপ্না নাই। এই থোপ্নার ফুলের জন্য পাহাড়ে উঠিয়াই তো কাঞ্চন বেচারার আজি এই মনঃপীড়া ভুগিতে হইল। অতএব এ নিশ্চয় সেই গহনা চুরি করিয়াছে, কিন্তু লোকটা কে? কেমন করিয়া জানিব? স্ত্রীলোকের মুখের ঘোমটা খুলিয়া তো দেখিতে পারি না। আপনার কেহ হইত, কোনোরূপ আশা থাকিত, না-হয় অভব্যতা করিয়াও দেখিতাম। কিন্তু ঐ চোরের মুখের ঘোমটা খুলিয়া উহার পরিচয় লইব, উহাকে চিনিয়া লইব? ছি! ও কেন রাজরানী হউক না? ও চোর— না-হয় চোরাও মাল কিনিয়াছে— ওর সঙ্গ আমরা চাই না।

নিজেই চুরি করিয়াছে, নহিলে ফুল আবার কে চুরি করিতে যাইবে? ধরা পড়ারও তো ভয় করিতেছে না! কি সাহস! যাহার চুরি করিয়াছে তাহারই সম্মুখে, সেই জিনিস লইয়া কেমন সপ্রতিভের মতো কথা কহিতেছে, যেন কোনো দুষ্কর্মই করে নাই। এত সাহস! এ তো সামান্য লোক নয়! কিন্তু কি জন্য চুরিই করিল, কি জন্যই বা এত সাহস করিয়া চোরাও মাল সুদ্ধ রাজাধিরাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল? দেখিতেছ না উহার রকম? ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া কুণালের কাছে দাঁড়াইতেছে; যতবার নাম করিতেছে যেন গলার স্বর জড়িত হইয়া আসিতেছে, দেখিতেছ না ভাবভঙ্গি? ও কি ভালো?

ওর বড়ো সুবিধা হয়েছে, লোকে জানে এ কাঞ্চনমালা— কুণাল ভিন্ন আর কেহ তো জানে না যে ও কাঞ্চনমালা নহে। কাঞ্চনমালা হতাশ্বাস হইয়া অভিনয় দেখিতেও আজি আইসেন নাই। সুতরাং ও লোকের কাছে ঠিক কাঞ্চনের মতোই বোধ হইতেছে। দুষ্টাও এসব ঠিক বুঝিয়া বুঝিয়া আপনার সুবিধা পাইয়াছে, একেবারে মারপত্নী ও কাঞ্চন এই উভয়ের ভূমিকা ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে। কুণাল প্রথম খানিক হা করিয়া অন্যমনস্ক ছিলেন, তাহার পর রীতিমতো অভিনয় করিতে লাগিলেন। হতবুদ্ধি ভাবটা কতক অন্তর্হিত হইল। তিনি আপন কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল নজর রাখিলেন যে, দুষ্ট মাগী যেন হঠাৎ বাহির হইয়া না যায়। উহার প্রতি কুণালের বারবার দৃষ্টি পড়ায় সে মনে করিল, বুঝি শিকার পাকড়াইয়াছি। সে তখন মারপত্নীর কর্তব্য নৃত্য করিতে লাগিল। সম্মুখে উপগুপ্ত, অশোকের দীক্ষাগুরু, বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি, বুদ্ধ সাজিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যান করিতেছেন। প্রশান্তমূর্তি, স্থূলকায়, মুণ্ডিতশির, কৌপীনমাত্র রক্তাম্বর পরিধান, অটল অচলবৎ নিস্পন্দ। তাহারই প্রলোভনার্থ মার ও মারপত্নী বসন্তসেনা মারদুহিতাদিগের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মারপত্নী নৃত্য করিতে লাগিল। যে হও তুমি সে হও, অত নাচিও না, সুন্দরি! কি নৃত্য!! মরি মরি মরি! বুদ্ধদেব নিতান্ত পাষাণ তাই তোমার নৃত্যে ভুলে নাই। তোমার নৃত্য ধ্যানের দুর্লভ, কামনার উচ্চপদ, সার হইতেও সার— অত নাচিও না, সুন্দরি! মনুষ্য দর্শক মজিয়া যাইবে, হয়তো অশোক রাজার দীক্ষা লওয়া ফিরিয়া যাইবে। অত নাচিও না। উহার সঙ্গে আবার ও কি! কটাক্ষ! এক-একবার বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। ও কাহার উপর! কুণাল, আজি বুঝিব, তুমি সীসা কি সোনা, আজি তোমার ধর্ম বুঝিব, আজি তোমার বিদ্যা পরীক্ষা হইবে। ও কি কুণাল, তুমিও যে আরম্ভ করিলে, তুমিও কটাক্ষ করিতেছ, এ কি তোমার কলানৈপুণ্য? তুমি কি সুদ্ধ দর্শকমণ্ডলীর মন রাখিবার জন্য কটাক্ষে কটাক্ষের জবাব দিতেছ? না, কাচ মূল্যে কাঞ্চনমণি বিক্রয় করিতেছ? না! না! তোমার কটাক্ষ আমি বুঝিয়াছি, ভয় নাই, ও কখনো পালাবে না, তোমার রূপ দেখিয়া যে মজিয়াছে তাহাকে না তাড়াইলে সে যাইবে না নিশ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ সব স্তব্ধ হইল কেন? এ কি? সূচ পড়িলে শুনা যায়, হঠাৎ এরূপ কেন হইল? এক অংশে রাজপরিবার সমভি-ব্যাহারে মহারাজ অশোক, আর-এক পার্শ্বে করদ ও মিত্ররাজগণ, মধ্যস্থলে মন্ত্রী প্রাড়্‌বিবাক মহাপাত্র প্রভৃতি সকলেই নিস্তব্ধ। পার্শ্বে রমণীকুল নিস্তব্ধ। কেন এত নিস্তব্ধ? সুদ্ধ নিস্তব্ধ। সকলে একতানমনে বুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া আছে। অর্হৎশ্রেষ্ঠ উপগুপ্তের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি কথা কহিতেছেন, মারকন্যারা তাঁহাকে লোভ দেখাইতেছে, আর তিনি তাহার জবাব দিতেছেন। কি গভীর ভাব! কি গভীর স্বর! যে স্বরে উপগুপ্ত দেবাসুর যক্ষ রক্ষ নর কিন্নর সমীপে সদ্ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, যে স্বরে বৌদ্ধমণ্ডলী মোহিনীমুগ্ধ হইয়া থাকে, আজি সেই স্বরে ভগবান্ উপগুপ্ত মার দুহিতাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "তোমরা আমায় নির্বাণ পথ দেখাইয়া দিতে পার তো দাও। ধর্মপথ ছাড়িয়া আমার মন তোমাদের ভোগ আশায় নিবিষ্ট হইবে না। তোমরা বিদায় হও। অসংখ্য প্রাণী আমার চারি পার্শ্বে জন্ম জরা মরণকৃত দুঃখের জ্বালায় দহিয়া মরিতেছে, আমি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কিরূপে আবার সেই দুঃখে পড়িব? আমি প্রাণত্যাগ করিয়া এই অসংখ্য জীবের মুক্তির উপায় করিয়া দিব। তাহাদের নির্বাণ লাভের পথ করিয়া দিব। তোমরা কি মনে কর আমায় ভুলাইবে? এইরূপ নানা কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া, কর্ণ ভরিয়া নিজ উপাস্য দেবতার অধরচ্যুত বচন-সুধাপানে আত্মজীবন সার্থক করিতে লাগিল। কুণালের চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

চোরের মন বুঁচকির দিকে। দুষ্ট রমণী ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উপগুপ্তের বক্তৃতায় সকলে মোহিত হইতেছে, কিন্তু সে দুষ্ট চরিত্রার তাহাতে কানও নাই। না শুনিলে কে কবে কোন্ কথায় মজিয়া থাকে? তাহার চেষ্টা কুণালকে লইয়া কোনো ঘরাও কথা পাড়ে, অভিনয় ছাড়া অন্য কথা পাড়ে, কিন্তু ধর্মবুদ্ধি কুণাল উপগুপ্তের বক্তৃতায় মোহিত হইতেছেন। বক্তৃতা যখন বড়ো জমিয়া আসিল, তাঁহার নয়ন বাষ্পে ভরিয়া গেল, সে অমনি তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মার্জনা করিতে প্রস্তুত।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

কি দুষ্ট ! কুণালের এটা অত্যন্ত অসহ্য হইল। তিনি সরিয়া গিয়া দূরে উপগুপ্তের ওপাশে দাঁড়াইলেন। বৌদ্ধধর্মে কুণালের বড়ো অনুরাগ, তিনি যদিও মার সাজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনিই পাটলিপুত্র রাজধানীর প্রথম বৌদ্ধ। উপগুপ্তের বক্তৃতায় তাঁহার ভাব লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণের পর উপগুপ্ত মার দুহিতাদিগের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পাত্রগণ রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কুণাল বাহির হইয়া যে রমণী মারপত্নী সাজিয়াছিল তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাকে পাইলেন না। তখন কাঞ্চনমালাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এবং তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার জানাইবার জন্য দ্রুতপদবিক্ষেপে কাঞ্চনপুরী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। আর-একবার ফুলের গহনা পরিয়া যাত্রাভঙ্গের সময় দেবদম্পতী সাজিয়া অশোক রাজাকে আশীর্বাদ করিতে আসিতে হইবে। এবার স্থির করিয়াছেন নিরাভরণা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

৩

তিনি দ্রুতপদে যাইতেছেন আর ভাবিতেছেন—আহা! কাঞ্চন এতক্ষণ কত মনস্তাপ পাইতেছে, তাহার এই অভিনয়ে উপস্থিত হইবার বড়োই সাধ ছিল। তাহাকে গিয়া কি ভাবে দেখব? হয়তো শয্যায় শুইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে, না-হয় গৃহকর্মে নিযুক্ত আছে, না-হয় গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া আছে, সেই প্রেমময়ী মূর্তি জ্যোৎস্নায় নাইয়া জ্যোৎস্নায় মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এই ভাবিতেছেন আরো দ্রুতপদে যাইতেছেন। এমন সময়ে রাজবাটীর একজন দাসী বলিল যে, তোমার ফুল যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাও? কুণাল কহিলেন, "হাঁ, চাই।" সে বলিল, "তবে ঐ লতাকুঞ্জ-মধ্যে যাও।" কুণাল ভাবিলেন, একাকী লতাকুঞ্জ-মধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট যাওয়া উচিত কি না— কিন্তু মাল্যচোর কে, ও চুরি করার অভিপ্রায়ই বা কি, জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য ছিল, এই ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ এই যে, জানিলে কাঞ্চনমালাকে

প্রবোধ দিতে পারিবেন। একটু ইতস্তত করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

৪

স্ত্রীলোকটা কোন্ পথে আসিয়াছিল জানি না। আসিয়া এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে, কুঞ্জটি নানা বিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। কোথাও বারিপূর্ণ গন্ধবারি, কোথাও স্বাদুতোয়, কোথাও স্বাদু অন্ন প্রভৃতিতে সুশোভিত। সে কি ভাবিতেছিল জানি না। বোধ হয় ভাবিতেছিল, কতদিন ভেবেছি কুণালকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, যেদিন অশোক রাজার বাটীতে কুণাল আমার নজরে পড়িয়াছে সেইদিন অবধি জানিয়াছি যে রাজ-পরিবারে এই বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে কুণাল বৈ আমার গতি নাই। কতদিন কত দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি পারি নাই, কতদিন ঠারে ঠোরে লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছি, প্রত্যাখ্যান বৈ পাই নাই। আজ পাহাড় থেকে প্রাণভরে দেখিয়াছি। আর আসবার সময় ফুলের মালা চুরি করায় আরো সুবিধা হইয়াছে। রঙ্গভূমে কেহই টের পায় নাই আমি কে? আমি প্রাণ ভরিয়া তাহারে আমার জীবন সর্বস্ব দিয়াছি। তাহাকে "নাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। কত কথাই কহিয়াছি। কতবার কটাক্ষ করিয়াছি; বোধ হয় কুণালও একটু টলিয়াছেন। টলিবার কথাই তো। তাতে আর সন্দেহ আছে? একবার, দুই বার, বার বার আড়ে আড়ে দেখিতে ছিলেন— না টলিবে কেন? যা হোক আজ অতি সুদিন, যা ধরেছি তাই হয়েছে, ধরিলাম, দেখিব— প্রাণভরে দেখিলাম। ধরিলাম, রঙ্গভূমে উহার পাশে উহার স্ত্রী সাজিয়া দাঁড়াইব— বিধাতা ফুলের গহনাগুলি আমার পথে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর রঙ্গস্থলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বিধাতা বুঝি বড়ো সদয়। কি চোখ! পটলচেরা!! এমন চোখ কখনো দেখি নাই! মরি! সেই চোখের আড়ে আড়ে চাহনিতে প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। ঐ চোখেই তো আমায় মজাইয়াছে। ঐ চোখেই তো আমায় এই কলঙ্কে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু কলঙ্কই বা কি? টের তো কেউ

পাবে না, আর যদি কেউ টের পায়, আমার রসিক বুড়া কখনো বিশ্বাস করিবে না। বাকি লোক তো বাজে লোক। বিশ্বাস করলে আর না করলে বড়ো বয়ে গেল। কিন্তু এ যে নূতন ফাঁদ পেতে বসে আছি, এ ফাঁদে তো এখনো কিছু হল না!

সে স্ত্রীলোক ব্যস্ত ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া খানিক রহিল। তখনো কুণাল ইতস্তত করিতেছেন। পরে কুণাল যখন যাওয়াই স্থির করিলেন, তখন লতাকুঞ্জ-মধ্যে তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষা এইরূপ চিন্তায় আকুল ছিলেন।

৫

কুণাল ক্রমে যত নিকটে আসিতে লাগিলেন, তিষ্যরক্ষা আহ্লাদে আটখান হইতে লাগিলেন। দ্বারের আড়ালে লুকাইয়া উঁহার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন কুণাল কুঞ্জগৃহে কাহাকেও না দেখিয়া কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন, তখন তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি, রাজকুমার, চিনতে পার?" তখনো অভিনয়ের বেশ অপনীত হয় নাই।

"পারি বৈকি— মালাচোর!"

"তবে চোরের কাছে এত রাত্রে নির্জনে!"

কুণালের স্বর একটু গম্ভীর হইল, বলিলেন, "আমি জানিতে আসিয়াছি আপনি কাঞ্চনের গহনাগুলি কেন চুরি করিলেন?"

"সত্য কথা বলিব?"

"নির্ভয়ে বলুন।"

"তুমি আমার মন কেন চুরি করিলে?"

"আমি আপনার কথার ভাব পাইলাম না।"

তখন পাপীয়সী তিষ্যরক্ষা আপন অন্তরের পাপ আশা, পাপ আকাঙ্ক্ষা, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিল; আপনার অন্তরের পাপজ্বালা জানাইল; স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; আপনার পরিচয় দিল; বলিতে লাগিল, "জানি আমি, তোমার পাপ হইবে, কিন্তু এই সংসারে বিশুদ্ধ পুণ্য কোথাও নাই। তোমার হৃদয়

বিশাল, তাহার এক প্রান্তে আমায় স্থান দাও। আমার দারুণ পিপাসা, আমায় বারি দান করো।”

কুণাল বলিল, “মাতঃ”—

“এই সম্বোধনটি করিও না। তোমার মুখে ও সম্বোধন বিষবৎ লাগে।”

“আপনি এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না।”

“দেখ কুণাল! তুমি আমায় চরণে রাখো। আমি তোমার উপকার করিব। তুমি জানো অশোক রাজা আমা-অন্ত প্রাণ। আমি বলিতেছি এই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তোমায় দেওয়াইব। তুমি জানো তোমার শতাধিক ভ্রাতা আছে, তোমার উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা বড়ো অল্প। তুমি জানো রাজকর্মচারী-মধ্যে তোমার অনেক শত্রু। সমস্ত হিন্দুগণ তোমার বিদ্বেষী. তোমার জীবন নাশের জন্য অনেকে উদ্যোগী আছে। তোমার বন্ধু নাই, তোমার ন্যায় গুণবান্ সাধুশীলের বন্ধু মিলে না। অতএব যদি বন্ধু চাও, যদি উত্তরাধিকার চাও, আমায় ভিক্ষা দাও। আর দেখো. অশোক রাজার জীবন আমার মুষ্টি-মধ্যে, চাও, কালই তোমায় উত্তরাধিকার দেওয়াইতে পারি।”

কুণাল। আপনি এ সকল নিষ্ঠুর কথা মুখেও আনিবেন না। ত্রিরত্ন আমার একমাত্র সহায় ও বন্ধু। আমি উত্তরাধিকার চাহি না, বিশেষ আপনি যে উপায়ে উহা দিতেছেন, ও উপায়ে আমি ইন্দ্রত্ব লইতেও স্বীকৃত নাহ। আমায় আর-কিছু বলিবেন না, আমি চলিলাম।

তিষ্যরক্ষা। বলিব না, জানিও তুমি স্ত্রীহত্যা করিলে, জানিও তুমি মাতৃহত্যা করিলে।

কুণাল। আমি নির্দোষী।

তিষ্যরক্ষা। একদিন ইহার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে। একদিন বলিবে তিষ্যরক্ষার মান রাখিলে আমার এ বিপদ হইত না।

“কখনো না” বলিতে বলিতে কুণাল কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইলেন এবং ত্বরিতগতিতে কাঞ্চনমালার অন্বেষণে গেলেন।

৬ তখন তিষ্যরক্ষার মনের ভিতর বসিয়া সুমতি আর কুমতি দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল।

সুমতি বলিল, "কেমন? সতীনপোর কাছে গিয়েছিলে, উচিত শাস্তি হয়েছে?"

কুমতি। একদিনেই কি আসা ছেড়ে দিতে হবে নাকি?

সুমতি। আবার যাবে নাকি?

কুমতি। যাব না? আজ ও আমার কাছে এসেছিল, এবার আমি ওর কাছে যাব।

সুমতি। ধন্য মেয়ে! আবার যদি অমনি হয়? এবার কি কিছু সুবিধা দেখেছ না কি?

কুমতি। না।

সুমতি। তবে আর কেন? মিছা কষ্ট পাবে। ও আশা ছেড়ে দাও।

কুমতি। খুব বুদ্ধি! এতটা করিলাম, এত অপমান সইলাম, বুঝি ছেড়ে দিবার জন্যে?

সুমতি। ধরতে তো পার নাই, তবে আর ছাড়লে কই? বৃথা চেষ্টায় কষ্ট পাও কেন? তাই বলি ও আশা ত্যাগ করো। কুণাল বড়ো ভালো ছেলে।

তখন কুমতি ও সুমতি একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুমতি। বলি অপমানটার শোধ লও না কেন? যে ভরসায় যাইতেছ সে ভরসা নাই।

কুমতি। এই ভালো পরামর্শ, খানিকটে জব্দ হলে উহাকে বশে আনা সুকর হইবে।

সুমতি। তবে সেই ভালো, যাও।

এই বলিয়া দুজনে নিরস্ত হইল। তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল।

## তৃতীয়
## পরিচ্ছেদ

কুণাল অত্যন্ত কাতর ও আকুল মনে কাঞ্চনের সন্ধানে গেলেন কিন্তু অন্তঃপুরে উঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, পুষ্পোদ্যানে খুঁজিলেন, পাইলেন না, বড়ো উদ্বিগ্ন হইলেন। যেখানে কাঞ্চনমালাকে ফেলিয়া অভিনয়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া খানিক ভাবিলেন। তথা হইতে নিকটবর্তী মঠায়তনে দেখিলেন, তখনো আলো জ্বলিতেছে। কাঞ্চন প্রত্যহ তথায় ত্রিরত্নসেবার্থ গমন করেন, কিন্তু সে তো এত রাত্রে নয়। এ রাত্রে কাঞ্চন কুণালের কাছ ছাড়া প্রায় থাকেন না, আজি কাছ ছাড়া হওয়ায়, কোথায় গেলেন, ভাবিয়া কুণাল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মঠ দেখা ভালো বলিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে ও ত্রস্ত ভাবে তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুণাল ত্যাগ করিয়া গেলে পর কাঞ্চন খানিক আপনাকে বড়োই অসহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, স্বামী বুঝি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অন্তঃপুরে গেলেন না, রঙ্গভূমিতে গেলেন না, কোনোখানেই গেলেন না, খানিক ত্রিরত্নের ধ্যান করিয়া "ভগবান্ রক্ষা করো, যে বিপদ হয় আমার হউক, যেন কুণালের পায়ে কাঁটাটিও না ফুটে। আর যেন অভিনয়ান্তে তাঁহাকে দেখিতে পাই।" এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মঠের সন্ধ্যাকালীন পূজা আরম্ভ হইল, কাঞ্চন সেই দিকে গেলেন, পূজার সমস্ত উদ্যোগ স্বয়ং স্বহস্তে করিলেন। পূজার পর অর্হৎগণের অনুমতি লইয়া ত্রিরত্নমূর্তির সম্মুখে বসিয়া পূজা, স্তব ও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। মঠ-বাসীরা অনেকেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, সুতরাং কাঞ্চনকে, কেন এখানে ? কি বৃত্তান্ত ? ইত্যাদি প্রশ্নের বড়ো একটা জবাব দিতে হইল

না। যাহাও হইল তাহা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়া একান্ত মনে গললগ্নী-কৃতবাসা হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে ধর্ম! হে সঙ্ঘ! হে বুদ্ধ! আমার উৎকণ্ঠা দূর করো, আমার স্বামীর কোনোরূপ অমঙ্গল যেন না হয়, আমার স্বামীকে সুস্থ শরীরে আমার নিকটে আনিয়া দাও।"

এমন সময় স্বয়ং কুণাল ত্রিরত্ন সমীপে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া নমস্কার করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ত্রিশরণ! আমার সমূহ বিপদ উপস্থিত, আমার চিত্ত স্থির করিয়া দাও, আজি যাহা শুনিলাম ও এ পর্যন্ত যাহা জানি, তাহাতে প্রাণ বড়োই আকুল হইতেছে, ধৈর্য হইতেছে না। দেব! মনে বল দাও, তোমাতে যেন মন স্থির থাকে ইহা করিয়া দাও, আমি রাজ্য ধন কিছু চাহি না। সদ্ধর্ম প্রচার আমার উদ্দেশ্য, যাহাতে সদ্ধর্ম প্রচারের সুবিধা হয়, করিয়া দাও, পাপ হইতে রক্ষা করো।"

উভয়েই অবনতমস্তক হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, আর প্রার্থনা করিতেছেন। কুণাল যে উপস্থিত তাহা কাঞ্চন জানেন না। কুণালও কাঞ্চনের ধ্যানে এ পর্যন্ত বাধা দেন নাই। কিন্তু প্রণয়ীদের মনে কিছু বৈদ্যুতী আছে, তাহার বলে উহারা পরস্পরের কার্যকলাপ যেন কিছু কিছু টের পায়। বিশেষ কাছে আসিলে, কে যেন সে সুখের কথা উহাদের মনোমধ্যে বলিয়া দেয়। সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদ-গন্ধামোদিনী, ঝিল্লীরবরূতমাবুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জপুঞ্জমঞ্জুতারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয়কচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌতবিধৌতসুরভিচর্চিত বদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ়প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃসংযোগবৎ, পুরীত-কীমনঃসংযোগবৎ, বুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল।[১] যেন ঘোর ঝটিকা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ গ্রীষ্মক্লেদের পর ধীরে ধীরে শৈত্যসৌগন্ধ্য-মান্দ্যময় সমীরণ বহিল। তখন দেবতা প্রসন্ন বুঝিয়া কাঞ্চনমালা মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, পার্শ্বেই কুণাল— গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাঞ্চন একবার ভাবিতেছেন, ধ্যান ভঙ্গ করি কি না? তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, অমঙ্গলের ভাবীফল উত্তম, অতএব তিনি নির্ভয়ে উঁহার

ধ্যানভঙ্গ করাইলেন, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা চিন্তা মনোবেগের পর পরস্পর সাক্ষাতে, পরস্পর গাঢ়ালিঙ্গনের পর, কাঞ্চন কহিলেন, "নাথ! আমার প্রতি ত্রিরত্ন প্রসন্ন হইয়াছেন, আমাদের উপস্থিত অমঙ্গল শুভফল প্রসব করিবে। কিন্তু নাথ! রাজবাটীর এ সকল সুখ দুঃখময়, ইহাতে পদে পদে উৎকণ্ঠা, পদে পদে বিপদ, ও পদে পদে বাধা, আইস, অদ্যাবধি আমরা এই বৃথা সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম প্রচারার্থ তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, বেড়াই গিয়া, আমাদেরও কখনো বিচ্ছেদ হইবে না। বিশেষ যাহার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা তাহারও সুসিদ্ধি হইবে।"

কুণাল বলিলেন, "কাঞ্চন! তুমি কি মনে করিয়াছ আমি সুখ-ভোগের জন্য আবার রাজবাটীতে আসিয়াছি? ধনলোভে অথবা যশোলোভে আসিয়াছি? কিছুমাত্র না। আমি এই আশায় আসিয়াছি যে, এখানে থাকিলে— রাজার প্রিয়পুত্র হইতে পারিলে সদ্ধর্ম প্রচারের সুবিধা হইবে। দেখ আমি করি আর নাই করি, রাজপরিবারের কেহ কেহ আমাদের মত গ্রহণ করিতেছে, রাজা সদ্ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আবার উপগুপ্তের নিকট পুনর্দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এবার উনি সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিবেন, এইবার আমার দ্বারা অনেক কার্য সম্পন্ন হইবে ভরসা আছে।"

কাঞ্চন কহিলেন, "নাথ, তোমার এরূপ উদ্দেশ্য তাহা কি আমি জানি না? জানি, কিন্তু আজি আমার এক প্রস্তাব আছে, আজি পূর্ণিমা রাত্রি শুভলগ্ন উপস্থিত। আজি ত্রিরত্ন আমাদের উপর বড়ো সদয়। নচেৎ এমন উৎকণ্ঠার সময় তোমায় আমার কাছে আনিয়া দিবেন কেন? অতএব আমার নিতান্ত ইচ্ছা আজি এই দ্বিপ্রহর রাত্রে দেবতা-সাক্ষাৎ শুভলগ্নে আমরা সদ্ধর্মের জন্য এ জীবন উৎসর্গ করি।"

কুণাল—"সেটা বাহুল্য, কাঞ্চন!" বলিয়া জোড়করে গললগ্নীকৃত-বাসে জানূপরি উপবেশন করত উভয়ে একতানমনপ্রাণ হইয়া একস্বরে পরস্পরের গলা মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ধর্ম! হে সঙ্ঘ! হে বুদ্ধ! হে বোধিসত্ত্ব! প্রত্যেক বুদ্ধ! শুদ্ধ বুদ্ধ! জীবন্মুক্তগণ, তোমরা সাক্ষী, আমরা স্ত্রী পুরুষ অদ্য শুভদিনে, শুভক্ষণে, সদ্ধর্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য জীবনের অবশিষ্ট অংশ উৎসর্গ করিলাম। যাহাতে সদ্ধর্মের উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা ঘোষণা নাই,

এমন কার্য আমরা কখনো করিব না। অদ্যাবধি ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, বিদ্যা যদি কখনো চাই, সে কেবল ঐ একমাত্র কার্যের জন্য। হে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, আমাদের চিত্তস্থৈর্য সম্পাদন করো।" সহসা মঠায়তনের দীপ হাসিয়া উঠিল। দেবমূর্তির মুখে আনন্দময় মৃদু হাস্যের আবির্ভাব হইল। শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যময় বায়ু প্রবাহিত হইল। আকাশে যেন মাঙ্গল্য তূর্যধ্বনি হইল, বোধিসত্ত্বগণ যেন বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হউক।" এইরূপে জীবন উৎসর্গ করার পর উভয়ে দীক্ষানন্তর অশোক রাজাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য দেবদম্পতী সাজিতে গেলেন।

## ২

তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ হইতে যখন বহির্গত হন, তখন তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, ভয়মৈত্রী ভিন্ন কুণালকে বশ করা অসম্ভব। এইজন্য তিনি অশোককে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। অশোককে আশু খুশি করার একমাত্র উপায় আছে বলিয়া বোধ হইল। অশোকের কোনো মহিষীই অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তিষ্যরক্ষা যদি এই দিনেই অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বড়োই প্রিয়-পাত্র হইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া পাপীয়সী নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অনায়াসে এক ধর্মত্যাগ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। নিজ গৃহে গিয়া নিভৃতে অশোক রাজার নামে এক চিঠি লিখিল, পত্রের মর্মার্থ এই -"কয়েক মাস ধরিয়া আমি স্বপ্নে দেখিতেছি ভগবান্ বুদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। পাছে লোকে অন্যরূপ ভাবে বলিয়া শ্রীচরণে এ ঘটনার বৃত্তান্ত নিবেদন করি নাই, কিন্তু আজি এ উৎসবের সময় আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রার্থনা দাসীর অনুনয় গ্রাহ্য হয়, ইতি।" দাসী দ্বারা পত্র প্রাড্‌বিবাকের নিকট প্রেরিত হইল। পূর্ব হইতেই প্রাড্‌বিবাক নানা কারণে এই দুশ্চারিণীর বশীভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মুহূর্ত-মধ্যে সভাস্থ রাজার হস্তে পত্র পহুঁছিল, রাজা পত্র পাঠে মহা-হৃষ্ট হইয়া তিষ্যরক্ষাকে সময়োচিত রক্তাম্বর পরিধান করিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। মহা-আদরে নিকটবর্তী

অনুচরবর্গকে পত্র দেখাইলেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজি রাজার প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষারও দীক্ষা হইবে।

৩

গভীর নিবাত-নিস্তব্ধ পয়োধির ন্যায় মহার্হৎ উপগুপ্ত বুদ্ধ সাজিয়া বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, তাঁহার সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, ক্রমে তাঁহার মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। নয়ন মুদ্রিত, মুখ হাস্যময় হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর আহ্লাদে কাঁপিতে লাগিল। তিনি ক্রমে নয়ন উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া ত্রিশরণের নাম উদগীর্ণ হইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে সিদ্ধ পুরুষ একজন নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগবান্, আপনার তপঃসিদ্ধির উদ্দেশ্য কি?" উত্তর হইল, "মগধ সাম্রাজ্যে ধর্মভ্রংশ হইয়াছে, এইখানে সদ্ধর্ম প্রচারই আমার উদ্দেশ্য।" অমনি সিদ্ধপুরুষবেশী অশোক রাজার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীত করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ সদ্ধর্মে দীক্ষিত হইতে বাসনা করিতেছেন, তাঁহার প্রিয়-মহিষী তিষ্যরক্ষাও এইসঙ্গে দীক্ষিতা হইতে চান।"

তখন বুদ্ধরূপী উপগুপ্ত উভয় হস্তে উভয়কে ধারণ করত উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র গাথা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই গভীরস্বরে মধ্যরাত্রির গভীর নিস্তব্ধভাব ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। সভ্যবৃন্দ একতানমনে তাঁহার গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ-মধ্যে স্বর্গের দেবদম্পতী উপস্থিত হইলেন। শরীর নিরাভরণ, অথচ শরীর-প্রভায় সভাস্থ দীপ-মালা নিস্তেজ হইয়া গেল। তাঁহারা আশীর্বাদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সদ্ধর্ম গ্রহণ করিতেছেন, অচিরাৎ সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী বৌদ্ধধর্ম-মহিমায় ব্যাপ্ত হইবে। অশোকের কীর্তিকলাপ দিক্‌চক্রবাল আচ্ছাদন করিবে। মহারাজাকে আর জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হইবে না, তাঁহার ইহলোকেই নির্বাণ লাভ হইবে। যেমন, কৌমুদী স্রোত এক প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া অবিরতধারে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পূরিত করে, তেমনি অশোকের যশ একমাত্র প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর আচ্ছাদিত করুক।"

সকলে মুগ্ধ হইয়া দেবদম্পতীর আশীর্বাদ শুনিতে লাগিলেন, মহারাজ অশোক দেখিতে লাগিলেন দিগ্বলয় সমুদ্রজলে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কেন্দ্রস্থ দ্বীপে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার চারি দিকে দ্বীপমালা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈর্ঋত যে দিকে চাও দ্বীপের পর দ্বীপ, তাহার পর দ্বীপ, অনন্ত দ্বীপমালা অনন্ত দিগ্বলয়ে লীন হইয়াছে, আর দেখা যায় না। প্রত্যেক দ্বীপে এক-একটি বোধিদ্রুম : এক-একটি বৃক্ষের বহুকোটি পত্র, বহুকোটি ফল, বহু-কোটি শাখা এবং বহুকোটি কাণ্ড। কোথাও পত্র সকল মরকতময়, স্বর্ণময় ফল, মর্মর নির্মিত ডালপালা ও স্ফটিকের কাণ্ড : কোথাও শ্বেতমণির পত্র, পীতমণির ফল, নীলমণির পত্র, কৃষ্ণমণির গুঁড়ি : কোথাও কোটিপত্র নীল, কোটিপত্র সবুজ, বৃক্ষসমূহ আদ্যন্ত উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। সমস্তের উপর ধর্মজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি অপেক্ষা শুভ্রতর স্নিগ্ধতর কিরণ বর্ষণ করিতেছে। বোধ হইতেছে, দুগ্ধসমুদ্রে নবনীত দ্বীপসমূহ ভাসমান। প্রত্যেক বোধিদ্রুমতলে এক-এক জন বোধি-সত্ত্ব ধ্যানমগ্ন। কেহ নবনবতি কোটিকল্প ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা তাহার অধিক, কেহ বা তাহা অপেক্ষা অল্প ধ্যান করিতেছেন। কেহ কীটযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি কোটি যোনি ভ্রমণান্তেও এক্ষণে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। কেহ কেহ বুদ্ধ হইতেছেন, নির্বাণ লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের ওষ্ঠাধরে হাস্য হইতেছে, আর দন্তপাঁতি হইতে শ্বেত নীল পীত হরিদ্বর্ণের অংশু নির্গত হইয়া জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া গাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবগণের নিকট ধর্মজ্যোতি বিকীরণ করিতেছে।

তিষ্যরক্ষা দেখিলেন, ভয়ানক অন্ধকার-মধ্যে চৌরাশীটি নরককুণ্ড রহিয়াছে ; একরকম না-আলো না-অন্ধকার দেখা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এই অন্ধকারে চীৎকার করিতেছে ! একটি নরকে গন্ধকের অগ্নি জ্বলিতেছে, নাক জ্বলিয়া যায় ! কোথাও বিন্মূত্রহ্রদে পড়িয়া পাপী বিন্মূত্র উদগার করিতেছে ! তাহাদের যাতনায় উঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। অমনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। করিলে কি হয় ? তখনো উপগুপ্তের হস্ত তাঁহার অঙ্গে স্থাপিত : সেই নরকদৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, কাঞ্চনমালা অবলোকিতেশ্বর

সাজিয়া পাপীদের ত্রাণার্থ উপস্থিত, দেখিলেন লক্ষ লক্ষ পাপী চৌরাশীকুণ্ড ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা তাঁহার দিকে চাহিল না। সমস্ত পাপীগুলি উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। সেই ঘোরান্ধকার মধ্যে, চৌরাশী ভীষণ নরককুণ্ডের মধ্যে তিষ্যরক্ষা— একাকিনী —বড়ো ভীতা— প্রায় সেই সভা-মধ্যে চীৎকারোদ্যতা। এমন সময় একটি রশ্মি উপর হইতে তাঁহার মুখে পড়িল। রশ্মি-পথে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কাঞ্চনমালা তাঁহাকে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেছে, আর কুণাল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

এইভাবে উভয়ে আছেন, উপগুপ্ত তাঁহাদের শরীরস্পর্শ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা আবার মর্ত্যভুবনে প্রবেশ করিয়া উপগুপ্তকে প্রণাম করিলেন। উপগুপ্ত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল ও কাঞ্চনমালা কোথায়?" তিনি তাহাদিগকেও আশীর্বাদ করিতে চান। তাহারা পরম ধার্মিক, ধর্মার্থ বহুতর ক্লেশ পাইয়াছে।

তখন অশোক রাজা প্রিয়পুত্রের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া পুত্রকে আহ্বান করার জন্য লোক পাঠাইলেন। পুত্র উপরে বসিয়া তিষ্যরক্ষার ভাব দেখিতেছিলেন! যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত স্মরণ হইতে লাগিল, তাহার পর দেখিলেন, তিষ্য কেমন ভালোমানুষের মতো, বকঃপরমধার্মিকের মতো, অশোকের পাশে বসিয়া দীক্ষাসূচক আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। যেন সে লোকই নয়। কুণাল তিষ্যের আচরণে স্ত্রীচাতুরীর চরম দেখিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, পিতা তাঁহার অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিতেছেন। অমনি সস্ত্রীক উপর হইতে নামিয়া পিতার চরণে নমস্কারপূর্বক তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া উপগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্ত তাঁহাদের মস্তকে হস্ত দিয়া গাথা উচ্চারণকরত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। কুণাল দেখিলেন, জেতবনে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম উপদেশ দিতেছেন। সিদ্ধচারণ দেব নর কিন্নর সকলে শুনিতেছেন, বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মের কাহিনী বলিতেছেন, এবং কিরূপে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ হওয়া যায়, কিরূপে ক্রমে দশভূমি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ হওয়া যায়, সমস্ত বিবৃত করিতেছেন; কর্ণামৃত পানে হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধদেব কুণালকে লইয়া আপন আসনপার্শ্বে বসাইলেন।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

অমনি সমবেত জনমণ্ডলী হইতে "জয় কুণাল, জয় কুণাল" ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।

কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন, তিনি নিজে বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানমগ্না, তাঁহার নির্বাণ সময় উপস্থিত, প্রায় দশম ভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ দেবদানব সিদ্ধচারণগণ তাঁহার চারি দিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "মাতঃ! আমাদের কি উপায় করিয়া গেলে?" বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল। তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "আমিও অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডে এক প্রাণী নির্বাণশূন্য যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণ প্রত্যাশী নহি।" অমনি সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী, চৌরাশী নরক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠল, দেখিলেন ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ অবলোকিতেশ্বর তাঁহার দেহে মিশাইয়া গেলেন।

চতুর্দিকে জয়ধ্বনি শুনিতেছেন, আশীর্বাদ শেষ হইল। উপগুপ্ত, কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার পুত্র ও পুত্রবধূর তুল্য লোক জগতে আর নাই। উহারা সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।" কুণাল ও কাঞ্চনমালার প্রতি, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণাবধি, রাজার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অদ্য উপগুপ্তের মুখে তাহাদের অতিবাদ প্রশংসা শুনিয়া রাজার আনন্দ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি স্নেহনির্ভর-হৃদয়ে উহাদের গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন জয় ধর্ম, জয় সঙ্ঘ, জয় বুদ্ধ, জয় মহারাজ ধর্মাশোক, জয় কুণাল জয় কাঞ্চনমালা, জয় রাজমহিষী তিষ্যরক্ষা— ইত্যাকার জয়ধ্বনির মধ্যে সকলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আপন আপন বিশ্রামালয়ে গমন করিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিষ্যরক্ষা প্রাতঃকালে কি করিল বলিবার পূর্বে উহার জীবনবৃত্তান্তের পূর্বকথা বলা আবশ্যক। তিষ্যরক্ষা একজন ক্ষৌরকারের কন্যা। তাহার পিতার অবস্থা ভালো ছিল না। স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধেও এ বংশের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তিষ্যরক্ষা ভূমিষ্ঠ হইলে একজন গণক বলিয়াছিলেন যে সে রাজরানী হইবে। তিষ্যরক্ষা অতি অল্প বয়সে সে কথা শুনিয়াছিল। তদবধি রাজরানী হইবার জন্য বাসনা বড়োই প্রবল হয়। তাহার পিতা তাহাকে সমান ঘরে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন; তাহাতে সে বলিয়াছিল, "রাজরানী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে শূর্পণখার ন্যায় বাসরঘরেই বৈধব্যের উপায় করিয়া লইব।"

এই সময়ে, বিন্দুসার-পুত্র অশোক অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। বয়স অল্প; অথচ তাঁহার জ্বালায় রাজা, মন্ত্রী, রানীগণ, প্রজা, বণিক, ব্যবসায়ী সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজা এরূপ দুর্বৃত্ত পুত্রকে রাজধানী হইতে দূর করিবার অভিপ্রায়ে কীকট দেশের দক্ষিণস্থিত অরণ্যবাসী পিঙ্গলবৎসের নিকট শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। পিঙ্গলবৎস যে কেবল জ্যোতির্বিদ ছিলেন তাহা নয়; তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ তিনি দুর্গম জঙ্গল-মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া সন্তান দুর্বৃত্ত হইলে লোকে তাঁহারই নিকট শিক্ষার্থ প্রেরণ করিত।

অশোক তথায় প্রেরিত হইবার অল্পদিন পরেই, তিষ্যরক্ষার পিতাও উহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উহাকে [ সেইখানে ] প্রেরণ করেন। এইরূপে পিঙ্গলবৎসের গৃহে এই দুই ঘোর দুর্বৃত্ত, নিষ্ঠুর, খলস্বভাব যুবক যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হয়।

অশোকের ইতিপূর্বে দুই-তিন বার বিবাহ হইয়াছিল। পিঙ্গলবৎস গণিয়া বলিয়াছিলেন যে বিন্দুসারের সন্তানগণের মধ্যে অশোকই রাজা হইবে। এই কথা শুনিয়া অবধি পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে অশোককে মুগ্ধ করাই তিষ্যরক্ষার প্রধান কর্ম হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষা তাদৃশ সুন্দরী ছিল না, শিল্পাদি বিদ্যায়ও তাহার কিছুমাত্র দখল ছিল না; কিন্তু সে যাহা ধরিত তাহা ছাড়িত না।

সংকল্প করিল, যেরূপে হয় অশোককে বিবাহ করিতেই হইবে। সে ষড়যন্ত্র কার্যে বাল্যকাল হইতেই বৃহস্পতি; প্রথম হইতেই অশোককে ভুলাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। অশোক প্রথম হইতেই নাপিতের মেয়ে বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং বিবাহের নামেই তিনি চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা পণ করিল, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়াও আশোকের সহিত মিলিত হইবে।

অশোকেরও এ সময় পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ভালো-মন্দ, কিছুই জ্ঞান ছিল না। সুতরাং নিজ পণ বজায় করিতে তিষ্যরক্ষার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। তিনি অচিরাৎ পাপীয়সীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ধর্ম বিক্রয় করিয়া তিষ্যরক্ষা সর্বপ্রথম মহাবিপদে পড়িল; এ কথা প্রকাশ করিলে অশোক তাহাকে জন্মের মতো পরিত্যাগ করিবে। অপ্রকাশ থাকিলেও রাজরানী হওয়া হইবে না। আপনা আপনি প্রকাশ হওয়া অনেক গোল। অতএব পাপীয়সী গোপনে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। পত্রে জানাইল, "এখানে অনেক দুষ্ট লোক আছে, অধিক দিন রাখিলে আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।"

পত্র পাইয়া ধূর্ত নাপিত বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে গিয়া প্রকৃত অবস্থা পিঙ্গলবৎসকে বলিল। আর বলিল, "আমাদের জাতি [ কুল ] যাহাতে রক্ষা হয় তাহা আপনি করুন।"

পিঙ্গলবৎস ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশোককে ডাকাইলেন, জোর করিয়া তিষ্যরক্ষার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং আনুপূর্বিক সমস্ত রাজাকে লিখিয়া বলিলেন, "এরূপ দুর্বৃত্ত কুমারের শিক্ষাদান আমার কর্ম নহে। আপনি আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে এখান হইতে লইয়া যান।"

বিন্দুসার উভয়কে রাজধানী লইয়া গেলেন। পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, পুত্রবধূকে অন্তঃপুর-মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সে অতি দীনভাবে অন্তঃপুর-মধ্যে দিনযাপন করিতে লাগিল!

অল্পদিনের মধ্যেই আবার রাজপুত্রের অত্যাচারে নগরসুদ্ধ লোক উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা পুত্রকে আবার রাজধানী হইতে বিদায় করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্রোহী হইয়াছে সংবাদ আসিল। রাজা এই সুযোগে অশোককে সেনাপতি করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন।

তিষ্যরক্ষা অশোকের মহিষী হইল এবং রাজার অন্তঃপুরেও রহিল। কিন্তু সে দেখিল রাজরানী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অশোকের জ্যেষ্ঠ অনেকগুলি ভাই আছে। সেগুলিকে বঞ্চিত করিতে না পারিলে রাজরানী হওয়া হইবে না। অতএব কি উপায়ে ইহাদিগকে দূর করা যায় সেই চেষ্টায় রহিল। প্রথমত বিহিত বিধানে শাশুড়ী সুভদ্রাঙ্গীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজার কানে গেল, নাপিত-কন্যা পুত্রবধূ বড়োই সাধুশীলা। অতএব এই অবধি তাহার আদর বাড়িল, তাহার পরিচর্যায় দাসদাসী নিযুক্ত হইল। অন্তঃপুরস্থিত অপর স্ত্রীলোকেরা তাহার শত্রু হইল। সেও রানীর কাছে বসিয়া নিত্য নিত্য পৌরস্ত্রীগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কানভারি করিয়া দিতে লাগিল। রাজারও কান ক্রমে অন্যান্য পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে ভারি হইয়া উঠিল। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে জানিল অন্তঃপুরে তিষ্যরক্ষা যা করে তাই হয়।

এই সময়ে রাধগুপ্ত রাজবাড়িতে প্রথম চাকরি স্বীকার করিয়াছেন। রাধগুপ্ত চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য। ষড়যন্ত্র নির্মাণে কুটিল, রাজনীতিজ্ঞতায় বিষাদি প্রয়োগে চাণক্যের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাহার মর্ম জানিতে পারে নাই। সেও বুঝিয়াছিল যে, একটি কোনো বিষম গোলযোগ না ঘটিলে সহসা বড়ো হইতে পারা যাইবে না। সুতরাং সে রাজ্যের মধ্যে বিষম একটা গোলমালের সময় অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল, নাপিতানী তিষ্যরক্ষা আমার অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। নাপিতানীও দেখিল রাধগুপ্তকে হাত করিলে রাজরানী হইবার যোগাড় হইতে পারে। সুতরাং

অর্ধপথে উহাদের মিল হইল। দুজনেই পরস্পরের মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল। দুজনেই অপেক্ষা করিতে লাগিল একটা গোলযোগ বাধিলে হয়। তাহাদের অধিকদিন অপেক্ষা করিতে হইল না ; শীঘ্রই একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুষীম এই গোলযোগ বাধাইবার হেতু। রাজা অনেক কার্যে সুষীমের পরামর্শ লইতেন। সুষীম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর ও সর্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি লম্পটস্বভাব। তাঁহার লাম্পট্য দোষ হেতু রাধগুপ্ত ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েই তাঁহার প্রতি চটা ছিলেন। এক্ষণে পাটলিপুত্রস্থ শ্রেষ্ঠীবংশীয় কোনো মহিলার প্রতি দারুণ অত্যাচার করায় তাঁহার প্রতি দেশের লোক অতিশয় চটিয়া গেল। এমন-কি সকলে আসিয়া মহারাজের নিকট উহার নির্বাসনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষা সকলেই এই লোকবিরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে রাজপ্রাসাদের মধ্যেও সুষীমের বাস করা দুরূহ হইয়া পড়িল। তখন রাজা অনন্যোপায় হইয়া সুষীমকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন এবং অশোককে রাজধানী প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন।

মাস-মধ্যে অশোক আসিয়া পাটলিপুত্রে পৌঁছিলেন। তিনি পৌঁছিবার দুই-তিন দিনের মধ্যেই হঠাৎ রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইল। হঠাৎ মৃত্যুর কারণ নির্ণয় হইল না। নগরবাসীরা কেহ কেহ "বিষ বিষ" বলিয়া কানাকানি করিতে লাগিল, কিন্তু কে দিল কেহই জানে না। দুই-এক দিনের মধ্যেই নগরবাসীগণ নূতন অভিষেকে মত্ত হইল। পুরানো রাজার আকস্মিক মৃত্যুর কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। রাধগুপ্ত অশোককে অভিষেক করিলেন ; রাধগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী হইলেন। অশোকের প্রধান মহিষী পরিষ্যরক্ষিতা পাটরানী হইয়া সিংহাসনার্ধভাগিনী হইলেন।

কিন্তু সাত-আট দিনের মধ্যেই অভিষেকের আহ্লাদ ভয়ে পরিণত হইল। সুষীম বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া পাটলিপুত্র অবরোধ করিলেন। অশোকের মন ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা উচিত কি না ভাবিয়া চলৎচিত্ত হইল। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে তিষ্যরক্ষা আসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজার মনের অস্থিরতা দেখিয়া বলিলেন—

"মহারাজ! আমি আপনার মতো অবস্থায় পড়িলে এতদিনে ফলে ফুলে বাগানের সমস্ত গাছ কাটিয়া পার করিয়া দিতাম।"

তিষ্যরক্ষা যেরূপ দার্ঢ্য সহকারে বাগানের গাছ কাটিয়া পার করিবার কথা বলিলেন তাহাতে অশোকের মনে দার্ঢ্য সম্পাদন করিল। তিনিও বলিয়া উঠিলেন—

"নাপিতানী! এই চলিলাম, বাগানে একটি গাছ থাকিতে কুঠার ত্যাগ করিব না।"

বলিয়া সশস্ত্রে মন্ত্রীসভায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধকার্যে অশোক বীরাগ্রগণ্য। তাঁহার ভুজবলে সুষীমসেনা পরাজিত হইল। সুষীমও পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহার পর চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণসংহার করিয়া অশোক বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। [কেবল] মাতা সুভদ্রাঙ্গীর একান্ত অনুরোধে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে জীবিত রাখিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা তাঁহাকে ধর্মভ্রষ্ট করিয়া বৌদ্ধ মঠে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। বীতাশোক শাক্যভিক্ষু হইয়া পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিল।

## ২

এইরূপে অশোক রাজা হইলেন, তিষ্যরক্ষা রাজরানী হইল। সে নাপিত-কন্যা এবং সম্যক বিবাহিতাও নহে, এইজন্য সে পাটরানী হইতে পারিল না। কিন্তু গণকে সে তো পাটরানী হইবে বলে নাই? সুতরাং সেজন্য তাহার মনের ক্ষোভও নাই। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরানী হইল। বাল্যকালাবধি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিনরাত্রি চিন্তা করিত, যাহার জন্য ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য সকলই অসার বলিয়া বোধ হইত, যাহার জন্য কোনো দুষ্কর্ম করিতেই কুণ্ঠিত হয় নাই, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরানী হইল। উভয়েই পৃথিবীর
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির আমোদে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে রাজপদ ও রানীপদ পুরানো হইয়া উঠিল। উভয়েরই ভাবিবার অবসর হইল।

উভয়েই দেখিলেন যে সব তো হইল, কিন্তু আমার কি হইল? এত কষ্ট করিয়া এত লোকের সর্বনাশ করিয়া এত আত্মীয় বান্ধবের প্রাণনাশ করিয়া এই যে উচ্চপদে আরোহণ করিলাম, ইহাতে আমার নিজের কি হইল?

অশোকের "নিজের কি হইল" ইহার অর্থ আমার পরকালের কি হইল? তিষ্যরক্ষার "আমার কি হইল" ইহার অর্থ আমার নারীজন্মের সুখ কই হইল?

অশোকের এই ভাবনার ফল বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রয় ও জগতে "অহিংসা পরমোধর্মঃ" প্রচার।

তিষ্যরক্ষার ভাবনার ফল হইল, স্বামীতে তাহার মন উঠিল না। স্বামীর বয়স হইয়াছে, তিনি রাজকার্যে ব্যস্ত, আবার তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচারক হইলেন। তিষ্যরক্ষা জানিল এ স্বামী হইতে তাহার নারীজন্মের সুখ হইবে না। সুতরাং সে পরপুরুষ সহবাসে নারীজন্মের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে ভুবনমোহন রূপবান্ কুণাল তাহার নয়নপথের পথিক হইল। কুণালের স্নিগ্ধ শ্যামল উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল। সে কুণালকে পাইবার জন্য বিবিধ বিধানে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালার সুখ তাহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে প্রচ্ছন্নভাবে সর্বদাই কুণালকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিল। তাই আজি সন্ধ্যার সময়ে কৃত্রিম শৈলোপরি দাঁড়াইয়া সে কুণাল ও কাঞ্চনমালার মালা গাঁথা দেখিতেছিল। তাই সে কাঞ্চনমালার মালাগুলি চুরি করিয়া অভিনয়স্থলে মারবেশী কুণালের পত্নী সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই সে আজ কুঞ্জ-মধ্যে এ প্রকার নির্লজ্জ ভাবে আপনার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুণাল ও কাঞ্চন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুজনেরই মনে ভয়ানক আশঙ্কা হইয়াছে, শীঘ্রই বিপদ হইবে, কিন্তু দুজনেরই ভরসা হইয়াছে, যে উহার পরিণাম সদ্ধর্ম প্রচারের পক্ষে বড়ো শুভকর হইবে। তাঁহারা সমস্ত পথ কাটাইয়া কাঞ্চনকুটিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দ্বার উদঘাটন করিবামাত্র দ্বারের উপর হইতে একখানি ভূর্জপত্র পতিত হইল, তাহাতে এই লেখা আছে—

"তোমায় আজি আমার বিশেষ প্রয়োজন ; একবার তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও— অভিনয়ান্তে তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

কুণাল দেখিলেন, পাটরানী পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর। তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কাঞ্চনকে বলিলেন—

"কাঞ্চন! পাটরানী আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

কাঞ্চন বলিলেন, "এত রাত্রে পাটরানী ডাকিবেন কেন ?"

"যখন ডাকিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য" বলিয়া কুণাল তিষ্যরক্ষার কুঞ্জাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কাঞ্চন ভাবিলেন, রাজবাড়িতে কেবল ভয় ভাবনা আর বিচ্ছেদ ও অধর্ম। ইহা অপেক্ষা বনে বনে ভ্রমণ ভালো না কি ? ভাবিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কুণালও দ্রুতপদে কুঞ্জ-মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

২ তিষ্যরক্ষাই বাস্তবিক যত নষ্টের গোড়া। সে পরিষ্যরক্ষিতার গৃহ হইতে ঐ পত্রখানি চুরি করিয়াছিল, গোপনীয় পত্র বলিয়া তাহাতে শিরোনাম ছিল না। চুরি করিয়া সে নিজেই পত্রখানি কুণালের দ্বারের চৌকাঠে লাগাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে. অভিনয়ের পর এই উপায়ে আবার কুণালকে কুঞ্জ-মধ্যে পাইবে : এবং সেই সুযোগে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির সুবিধা করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সাধনের এক বড়ো বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অভিনয় শেষ হইলে রাজা বলিলেন—

"তিষ্যরক্ষে প্রেয়সি ! আজি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তুমি আমায় বড়ো সন্তুষ্ট করিয়াছ। আজি আমি তোমার মহলেই রাত্রিযাপন করিব।"

তিষ্যরক্ষা মুখে মহা আনন্দসহকারে বলিল. "মহারাজ ! দাসীর প্রতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অনুগ্রহ হইতে পারে ?"

কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কি উপায়ে বৃদ্ধ রাজাকে শীঘ্র ঘুম পাড়াইয়া নিজের পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে. তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন. "আমি তোমার গৃহে যাইব শুনিয়া হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হইলে কেন ?"

দুষ্টবুদ্ধি তিষ্যরক্ষা অমনি বলিল, "মহারাজ ! আমার ইচ্ছা [ ছিল ] অদ্যরাত্রে শয়ন করিব না। বহুকাল অসদ্ধর্মে কাটাইয়াছি. কখনো বৌদ্ধ দেবায়তন দেখি নাই, তাই মনে করিতেছিলাম. দীক্ষা লইয়া একবার রাজপ্রাসাদের ও নগরের মঠগুলি নমস্কার করিয়া আসি।"

রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "প্রেয়সি ! তুমি অত্যন্ত সাধু সংকল্প করিয়াছ। অতএব আমি আর তোমার মহলে যাইব না, আমি নিজ মহলেই যাই।"

তিষ্যরক্ষা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল— "স্বামিন্ ! দেবদর্শন অপেক্ষা স্বামীপাদ দর্শন অধিক বাঞ্ছনীয়। অতএব আপনি যদি আজি আমার মহলে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে অতি সত্বর দেবদর্শন সমাপন করিয়া স্বামীপাদ দর্শন করিব, তাহাতে অনেক পাপ বিনষ্ট হইবে এবং সদ্ধর্ম গ্রহণের বিশেষ অধিকারী হইব।"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

রাজা মহা আহ্লাদিত চিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং শত মুখে তিষ্যরক্ষার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

৩

কোনোরূপে রাজাকে শয়ন করাইয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি কুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল, কুণাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তিষ্যরক্ষা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিষ্যরক্ষাকে দেখিয়া কুণালের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—

"তবে তুমিই কি চক্র করিয়া আমাকে এখানে আনাইয়াছ ?"

তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে কহিল—

"হাঁ, আনাইয়াছি। আমি পরিষ্যরক্ষিতার পত্রখানি চুরি করিয়া তোমার দ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। উহা গোপনীয় পত্র, উহাতে শিরোনামা ছিল না বলিয়া আমার বড়োই সুবিধা হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমি তোমার জন্য এত করিতেছি, তোমার মন কি কিছুতেই বিচলিত হয় না ? এইমাত্র বৃদ্ধ পতিকে বঞ্চনা করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি, তুমি এত কঠিন কেন ?"

কুণাল অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করিয়া তথা হইতে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তিষ্যরক্ষা দৌড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল—

"যখন তুমি আসিয়াছ, যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তোমায় আমার কতকগুলি কথা শুনিতে হইবে। নহিলে আমি ছাড়িব না, এখনই চীৎকার করিয়া উঠিয়া মহারাজার নিদ্রা ভঙ্গ করিব।"

কুণাল বড়ো বিপদে পড়িলেন। উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াও যাইতে পারেন না, অথচ রাগে সর্বাঙ্গ শরীর জ্বলিতেছে, বলিলেন,

"বলো, কিন্তু আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না।"

তিষ্যরক্ষা বলিল—

"আচ্ছা শুন, রাজার উপর আমার প্রভাব দেখিলে তো ? এক

মুহূর্তে আমি রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হইয়াছি। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে আমি তাহাই দেওয়াইতে পারিব। তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। যদি না হও, আমি রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার কাঞ্চনমালার সর্বনাশ করিব।"

কুণাল বলিলেন—

"সে যাহা করিবার করিও, এখন আমায় ছাড়িয়া দেও।"

তিষ্যরক্ষা বলিলেন—

"তবে জানিও, রাজপুরী-মধ্যে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম!"

কুণাল বলিলেন—

"থাকো, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই। তোমার আর-কিছু বলিবার আছে?"

"না, কিন্তু আর-একদিন তোমায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।"

"সে যখন হইবার তখন হইবে, এখন আমায় পথ ছাড়িয়া দেও।"

এমন সময় দূরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তিষ্যরক্ষা বুঝিল, পরিষ্যরক্ষিতা এই কুঞ্জে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া একটি নিবিড় লতার মধ্যে প্রবেশ করিল, কুণালকে বলিল—

"তুমি পলাও।"

## ৪

পরিষ্যরক্ষিতা লতাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

"আজি কি কি ঘটনা হইল?" ব্রাহ্মণ সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। তিষ্যরক্ষা বৌদ্ধ হইয়াছে শুনিয়াই পাটরানী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—

"সে কি !!! সে যে আমার ডান হাত।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—

"তাহার অভিপ্রায় তো বুঝিতে পারিলাম না।"

পাটরানী বলিলেন—

"তবে তো কাহাকেও বিশ্বাস নাই। আমাদের কাজকর্ম অতি গোপনে করিতে হইবে। তুমি কি পরামর্শ বলো?"

ব্রাহ্মণ। গোপনে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিসে এ বিধর্ম স্রোত রোধ হয় ?

পাটরানী। দেবতারা নিজেই রক্ষা করবেন। কিন্তু আপাতত কি করিলে লোকের মন ফিরানো যায় ?

ব্রাহ্মণ। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ প্রবল সেইখানে সেইখানেই বিদ্রোহ হইবে।

পাটরানী। কিন্তু অশোক রাজার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কি ?

ব্রাহ্মণ। সকলে একত্র হইলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু সকলের একত্র হইবার সম্ভাবনা বড়োই অল্প। ব্রাহ্মণেরা যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান।

পাটরানী। বিদ্রোহের কথায় আমাদের কাজ নাই। অন্য কিছু উপায় আছে বলিতে পারো ?

ব্রাহ্মণ। এক উপায় আছে। আমরা বোধিদ্রুমটি লুকাইয়া ফেলি। তাহার পরদিন দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিব, যে বিধর্মীদের বট-গাছ দেবতারা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পাটরানী। কিন্তু তাহা কি প্রকারে করিবেন ? সেখানে অনেক পাহারা আছে।

ব্রাহ্মণ। সে ভার আমার। বৃক্ষ অদৃশ্য হইলে লোকে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিবে এবং বিধর্মীর মুখে চুনকালি পড়িবে।

এই প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হইয়া দণ্ড-দুই রাত্রি থাকিতে ফিরিয়া গেল। উভয়ে দিব্য করিয়া গেল, কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার পর প্রয়োজন হয় নগর-মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামাও লাগাইয়া দিবে। কিন্তু এই দুজন ছাড়া আর-কাহারো কানে উঠিবে না।

তিষ্যরক্ষা বনান্তরালে বসিয়া সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—

"আর কাজ নাই।"

আবার—

"যদি অভীষ্টই সিদ্ধ না হইল তবে জীবনেরই প্রয়োজন কি ?"

এইরূপে কুণালের কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিষ্যরক্ষিতা ও ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল। তখন পাপীয়সী ভাবিল—

"এই পরিষ্যরক্ষিতাকে তাড়াইয়া পাটরানী হইবার বড়োই সুবিধা হইয়াছে। পাটরানী হইলে, পরিষ্যরক্ষিতা অপেক্ষা আমার অনেক অধিক ক্ষমতা হইবে। যদি পাটরানী হইতে পারি, কুণালকে আয়ত্ত করিবার অনেক সুবিধা হইবে। আমি পাটরানী হইলে, আমিই রাজা, আমিই মন্ত্রী, এবং আমিই সেনাপতি হইব। তখন আর-একবার দেখিব।"

পরিষ্যরক্ষিতার সর্বনাশ করিয়া পাটরানী হইবে আপাতত ইহাই তাহার সংকল্প হইল। সে কিছুকালের মতো কুণালকে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মন বাঁধিল।

৫ কুণাল নিজগৃহে ফিরিয়া দ্বার খুলিলেন। খুলিয়াই দেখিলেন, কাঞ্চনমালা স্বপ্নে কাঁদিয়া বলিতেছে—

"তুমি কোথায় নাথ! তুমি কোথায় নাথ!"

কুণাল শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, কাঞ্চনের শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে যেন কোনো বিষম স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কুণাল আস্তে আস্তে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—

"এই যে কাঞ্চন, আমি এসেছি।"

কাঞ্চন কাঁদিয়া বলিল—

"ওকি, তুমি যে পথ দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যে অন্ধ হইয়াছ!"

কুণাল আবার বলিল—

"কই কাঞ্চন, আমার তো দিব্য চক্ষু রহিয়াছে?"

"না, না, তুমি অন্ধ হইয়াছ বৈকি। চলো, এখানে আর কাজ নাই। ঐ দেখো, ভগবান ডাকিতেছেন। আমি লাঠি ধরি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে এসো। [ আস্তে আস্তে! ] নহিলে উঁচট খাইয়া পড়িবে।"

কুণাল দেখিলেন, কাঞ্চনমালা বড়োই যন্ত্রণা পাইতেছে। উহার অনাবৃত শ্বেতবক্ষ তরঙ্গাভিহত গঙ্গাসলিলের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া উহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। ভাবিলেন—

"সমস্ত দিন উৎকণ্ঠার পর একটু ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙাব কি ?"

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিলেন, স্বপ্নের কষ্ট নিবারণ হইল না। কাঞ্চন বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। উহার বুক আরো ফুলিয়া উঠিতে লাগিল! তখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে—অতি ধীরে নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

ঘুম ভাঙিলেই কাঞ্চনের একটু সুস্থ বোধ হইল। কিন্তু তখনো হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—

"নাথ! করিলে কি ? এ যে শেষ রাত্রের স্বপ্ন ?"

কুণাল বলিলেন—

"তা হোক, তুমি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করো।"

বলিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন। কুণাল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সহজেই ঘুম আসিল। কিন্তু কাঞ্চন অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। তাহার প্রাণ হুহু করিতে লাগিল। বার বার প্রাণনাথকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভয় ও উদ্বেগ দূর হইল না।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই তিষ্যরক্ষা আপন মহলে আসিয়া জুটিল। দেখিল, মহারাজের এখনো নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সে আর নিজে ঘুমাইল না। রাজার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিজের এক-একবার ঢুলনি আসিতে লাগিল, অতি কষ্টে তাহা সংবরণ করিয়া রাজার নিদ্রা-ভঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগিল; একবার অঞ্চল পাতিয়া রাজার পদপ্রান্তে শয়ন করিল। আবার উঠিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বেই মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা তাঁহার পদসেবা করিতেছে; উঠিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন--

"তুমি এখনো ঘুমাও নাই!!"

"না মহারাজ, আমার আর ঘুমাইবার জো নাই।"

"সে কি, জো নাই কেন? তুমি বুঝি এই ঠাকুর দেখিয়া আসিতেছ?"

"না মহারাজ, আমার ঠাকুর দেখিতে যাওয়া হয় নাই!"

"আমি তো দেখিলাম, তুমি বাহির হইয়া গেলে?"

"গিয়াছিলাম বটে; তখনই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।"

"আসিতে হইয়াছে! ইচ্ছাপূর্বক আইস নাই?"

"না মহারাজ, সে সব কথায় কাজ নাই।" বলিয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি স্বহস্তে রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ সুগন্ধি বারি আনিয়া দিল, এবং তাঁহার মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রাত্রে কি স্বপ্ন দেখিয়া রাজার মন বড়ো উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষার কথায় তাঁহার মন আরো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি উহার কার্যে বাধা দিয়া বলিলেন—

"তুমি বলো, কেন তোমায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে ?"

"সে অতি সামান্য কারণ, আমি ভয় পাইয়াছিলাম।"

"না, না, তুমি গোপন করিতেছ। ঠিক করিয়া বলো কি হইয়াছে।"

"কিছু নয়" বলিয়া তিষ্যরক্ষা আবার রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন—

"না বলিলে আমি ছাড়িব না ; তোমায় বলিতেই হইবে।"

"সত্যই মহারাজ আমার ভয় লাগিয়াছিল।"

"কিসের জন্য ভয় লাগিল ?"

"মহারাজ, আমি মহল হইতে বাহির হইয়া আমার বাগানের সীমা পার হইতে না হইতেই দেখি, আমারই কুঞ্জ-মধ্যে জনকতক লোক বসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। আমার অত্যন্ত ভয় হইল। তাহার পর দেখি, দুই-তিন জন লোক আমার বাড়ির দিকে আসিতেছে। মহারাজ এখানে একাকী শয়ন করিয়া আছেন, সুতরাং আমার বড়ো ভয় হইল। আমি ঘুরিয়া অন্যপথে বাড়ি-মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলাম, দেখিলাম, সকল পথেই দুই-এক জন দুই-এক জন লোক! হঠাৎ কতকগুলা শুষ্ক পাতা আমার পায়ে লাগিল। তাহার মধ্যে একটা কি ঠাণ্ডা জিনিস বোধ করিলাম, আস্তে আস্তে তুলিলাম : তুলিয়া দেখি ছোরা। তখন আর আমার সন্দেহ রহিল না! ভয়ে প্রাণ হাঁপাইতে লাগিল। ভাবিলাম, মহারাজ আমার মহলে একা শয়ন করিয়া আছেন।"

"অ্যাঁ, শুষ্ক পাতার মধ্যে ছোরা পেলে !!!"

"তাই পাইয়াই তো আমার আরো ভয় হইল; আমি একটু থতমত খাইয়া রহিলাম। শেষ ভাবিলাম, মহারাজ একাকী শুইয়া রহিয়াছেন, আমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়!"

"তোমার কি বোধ হয়, আমারই উপর তাহাদের রাগ ?"

"কেমন করিয়া জানিব মহারাজ ? আমি তো সেই ছোরা সহায় করিয়া, সাহসে ভর করিয়া দরজার দিকে দৌড়িলাম। যাহারা আমার

বাড়ির দিকে আসিতেছিল, তাহারা আমায় তাড়া করিল। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা ফেলিয়া হুড়কা দিলাম। সে শব্দ কি শুনিতে পান নাই ?"

রাজাও স্বপ্নে কি একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন, বলিলেন—

"ঝনাৎ শব্দ শুনি নাই, একটা কি হড়্ হড়্ হড়্ হড়্ শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"তবে আপনি হুড়কা দিবার শব্দ শুনিয়াছিলেন।"

রাজা অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন—

"হবে।"

তিষ্যরক্ষা আবার তাঁহার মুখ প্রক্ষালনাদির উদ্যোগ করিতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রাজা সম্বিৎ হইলেন, তিষ্যরক্ষাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

"কে কে লোক আসিয়াছিল, কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি ?"

"না, মহারাজ, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।"

"তাহাদের বেশ কিরূপ ছিল ?"

"একে আমার ভয়ে ধাঁদা লাগিয়াছিল, তাহার পর জ্যোৎস্নালোকে সবই চক্‌চকে দেখাইতেছিল।"

"কয়েক জন লোককে এদিক ওদিক দিয়া [আসিতে] দেখিলে, কে কোন্ দিক দিয়ে আসিল মনে হয় ?"

"দুই-এক জন লোক কাঞ্চনকুটিরের দিক দিয়া আসিয়াছিল।"

"কাঞ্চনকুটিরের দিক দিয়া। ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারিতেছি না। যা হোক, তুমি আমায় ডাকো নাই কেন ?"

"প্রথমে দরজা দিয়াই তো খানিকক্ষণ অজ্ঞানের মতো পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আসিয়া দেখিয়া গেলাম, মহারাজ নিদ্রাগত আছেন, বাড়ির ভিতরে কোনো গোলযোগ নাই। একবার ভাবিলাম, মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করি ; আবার ভাবিলাম, ছাদের উপর হইতে দেখিয়া আসি ; বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিলে মহারাজকে জাগাইব।"

"তুমি ছাদে উঠিয়াছিলে ? কিছু দেখিতে পাইয়াছ ?"

"কিছুই না।"

"একেবারে কিছু না ? এত লোক সব তবে কোথায় গেল ?"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"কেবল বোধ হইল যেন দুজন একজন লোক পাটরানীর মহলের কাছ দিয়া কোথায় গেল।"

"পাটরানীর মহলের দিক দিয়া গেল, না মহলে গেল ?"

"ঠিক বলিতে পারিতেছি না ; সেই পর্যন্তই গেল, তার পর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

"আমার একটা বড়ো সন্দেহ হইতেছে।"

"আমি তো, মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না : রাত্রে আমার বড়ো ভয় হইয়াছিল।"

মহারাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন--

"ভয়ের তো খুবই কারণ আছে দেখিতেছি।" বলিয়া মহারাজ সত্বর রাধগুপ্তকে ডাকাইয়া তাহাকে এই ব্যাপারের তথ্য অনুসন্ধানের ভার দিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিষ্যরক্ষা আপত্তি করিল. যে তাহার মহলে বসিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয়। রাজা তাহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

২

রাজা চলিয়া গেলে, রাধগুপ্ত রানীকে ইঙ্গিত করিয়া একটু নিভৃত স্থানে গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ আবার কি খেলা খেলিতেছ ?"

"বুঝিতেছ না কি ?"

"কার মাথা খেতে হবে ?"

"পরিষ্যরক্ষিতার প্রথম, আর কুণালের যদি পারি।"

"পরিষ্যরক্ষিতার কি অপরাধ ? পাটরানী হবার শখ হয়েছে না কি ?"

"কণ্টক দূর করাই ভালো।"

"কুণালের উপর অত্যাচার কেন ?"

"রাজা বৌদ্ধ হইয়া অবধি উহার উপর বড়ো ভক্তি. উহাকে বিদায় করা প্রয়োজন।"

"আবার তক্ষশিলায় না কি ?"

"বিম্বিসার বংশের কোন্ ছেলে তক্ষশিলার জল না খেয়েছে ?"

"বুঝিলাম। আপাতত তবে কুণাল আর পরিষ্যরক্ষিতাকে ধরে আনতে হচ্ছে?"

"শুধু তাই নয়, আর জনকত লোক যারা পড়লেই কথাটা বুঝতে পারে, আর কিছুতেই ডরায় না, এমন চার-পাঁচ জন লোকও সেই সঙ্গে।"

৩

রাধগুপ্ত অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল—

"কিছুই তো ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

রাজা অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর কিছুই সন্ধান পাইল না শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমার বাড়ির মধ্যে আমার দ্বারদেশে কতকগুলা লোক জমায়েত হইল, তোমরা ইহার কিছুই সন্ধান করিতে পারিলে না? তোমাদের মতো মন্ত্রী লইয়া রাজ্য করা বিড়ম্বনামাত্র।"

রাধগুপ্ত অবনতবদনে অধোমুখে বলিতে লাগিলেন—

"মহারাজ, আমি তো কিছুই সন্ধান পাইলাম না, কিন্তু আপনি সত্বরই সন্ধান পাইতে পারেন। যাহারা জমায়েত হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ কাঞ্চনকুটিরের দিকে, কেহ কেহ পাটরানীর মহলের দিকে গিয়াছে। আপনি ইহাদের কাহাকেও যদি আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অনেক সংবাদ পাইতে পারেন। আমি উহাদের ভৃত্য কঞ্চুকীবর্গকে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা কেহই কিছু বলে না।"

"বলে না, তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে হইবে। কঞ্চুকী! শীঘ্র যাইয়া কুণাল ও পরিষ্যরক্ষিতাকে কহো যে রাজা অশোক আপনাদের স্মরণ করিতেছেন।"

কঞ্চুকী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা গত রাত্রের ঘটনাবলীর বিষয় কথাবার্তা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা রাজার ভয় ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

৪

কঞ্চুকী কাঞ্চনকুটিরে প্রবেশ করিবামাত্র টিকটিকি "টিক্ টিক্ টিক্" শব্দ করিয়া উঠিল, বামভাগে কাক সকল "আকা আকা আকা" করিয়া বিকট শব্দ করিয়া উঠিল, আর মৎস্যাহারক গৃধ্রের মুখচ্যুত রক্তবিন্দু কাঞ্চনের সম্মুখে পতিত হইল। কাঞ্চন কুণালের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে চারি দিকে নেত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই কঞ্চুকীকে দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন যমদূত। তিনি ত্বরায় কুণালের পার্শ্বে যাইয়া লুকাইলেন। কঞ্চুকী কুণালকে রাজাদেশ বিজ্ঞাপন করিল। কাঞ্চন শুনিয়া আরো উৎকণ্ঠিত হইল। কুণালও একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। কুণাল উৎকণ্ঠিত চিত্তে রাজসমীপে যাইতে লাগিলেন, কাঞ্চন পথ-পানে তাকাইয়া রহিল। কুণাল নয়নের অন্তরাল হইলে সে বসিয়া পড়িল, ভাবিল, "বুঝি আর দেখা হইবে না।"

৫

কুণাল রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠিত ভাব বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া রাজারও বিস্ময় ও ত্রাস হইল। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কালি কতকগুলি লোক কোনো গুপ্ত অভিপ্রায়ে এই বাড়ির বাগানে জমায়েত হইয়াছিল, তাহাদের হাতে অস্ত্রাদিও ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার বাড়ির দিকে বা দিক দিয়া গিয়াছে। তাহারা কে তুমি জান ?"

"না মহারাজ, আমি নিজেই তিষ্যরক্ষা দেবীর কুঞ্জে কালি আসিয়াছিলাম।"

"তুমি ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"সশস্ত্রে ?"

"যে বেশে অভিনয়ে আশীর্বাদ করিতে গিয়াছিলাম সেই বেশে।"

"তুমি তবে অভিনয়ান্তে নিজগৃহে যাও নাই ?"

"গিয়াছিলাম, তথায় এক পত্র পাইলাম।"

"পত্র কাহার ?"

"হস্তাক্ষরে বোধ হইল পরিষ্যরক্ষিতার।"

"পরিষ্যরক্ষিতার ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রী বলিল, "যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, তিনি সদ্ধর্মের বড়োই দ্বেষবতী।"

এমন সময় প্রতিহারী পরিষ্যরক্ষিতার আগমন সংবাদ রাজার গোচর করিল. রাজা যথোচিত সংবর্ধনা সহকারে তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! আপনি কল্য কুণালকে তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আসিতে বলিয়াছিলেন ?"

"কুণালকে ? কই না।"

রাজা মন্ত্রীর মুখ-পানে চাহিলেন। কুণালকে বলিলেন. কই সে পত্র ?"

"কোথায় ফেলিয়াছি মনে নাই— "

মন্ত্রী বলিল, "ওরূপ কথায় এখানে হইবে না, স্বরূপ বলো। রাজার নিদ্রাগৃহের নীচে সশস্ত্রে লোক আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তোমার পত্র।"

রাজা বলিলেন, "একি কুণাল, তোমার পিতার যাহারা সর্বনাশ করিতে বসিয়াছিল, তাহাদের আজি বিচার হইবে, তুমি কোথায় আগ্রহ-সহকারে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ সন্ধান করিয়া দিবে, না তুমিই তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছ !"

কুণাল। আমি নির্দোষ, আমি কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেছি না ; কিন্তু আপনি তো আমার সব কথা শুনিলেন না।

রাজা। এ বিষয়ে তোমার কি কথা থাকিতে পারে তাহা আমি জানি না।

কুণাল। কথাটি এই, পত্রখানি যদিও পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর, কিন্তু সেখানি তিষ্যরক্ষা পাঠাইয়াছেন।

মন্ত্রী বলিলেন—

"তাহার প্রমাণ ?"

কুণাল। তিষ্যরক্ষা ঠাকুরানী কাল আমাকে তাহা কুঞ্জগৃহে বলিয়াছেন।

রাজা। তবে তিষ্যরক্ষার সহিত কাল তোমার কুঞ্জগৃহে সাক্ষাৎ হইয়াছিল !!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

কুণাল। হইয়াছিল।

রাজা বিরক্তভাবে তিষ্যরক্ষার মুখপানে চাহিলেন। তিষ্যরক্ষার মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে বলিল—

"মহারাজ! ভয়ে আপনাকে আমি সকল কথা বলিতে পারি নাই। আমি বৌদ্ধ দেবায়তন দর্শনের সঙ্গী কুণালকেই স্থির করিয়াছিলাম, এবং উহাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন—

"পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর কোথা হইতে আসিল?"

তিষ্যরক্ষা অম্লানমুখে বলিল—

"উনি বিনা-স্বাক্ষর, বিনা শিরোনামা অনেক পত্র প্রত্যহ পাঠাইয়া থাকেন।"

পরিষ্যরক্ষিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"মহারাজ, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। আমি দেখিতেছি, আপনি বৌদ্ধ হইয়া অবধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, কুচক্রী লোকে সেই সুযোগে আমার সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ, আপনি বিচারকর্তা, সুবিচার করুন, আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।" বলিয়া ব্যস্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কুণাল কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা কিয়ৎক্ষণ পরস্পর চাহাচাহি করিতে লাগিল। তিষ্যরক্ষা বলিল, "আরো আছে, টের পাবেন।"

রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে পরিষ্যরক্ষিতাই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কথা কহিবার পূর্বেই নগর-মধ্যে মহা কোলাহলধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড দাঙ্গা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপরে উঠিলেন। গিয়া দেখিলেন, কুক্কুটারাম ভস্মীভূত হইতেছে। রাজা তিষ্যরক্ষার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"এও কি উহার কাণ্ড না কি?"

তিষ্যরক্ষা বলিল, "বিচারে যাহা হয় করিবেন, আমার কোনো কথায় কাজ নাই।"

রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া মন্ত্রীর প্রতি পরিষ্যরক্ষিতার ঘর ঘেরাও করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং কুণাল সমভিব্যাহারে দাঙ্গা হঙ্গাম নিবারণার্থ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৬

এরূপ মহামারীর সময় তিষ্যরক্ষা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে পুরুষের বেশ ধারণ করিল, দশ-বারো জন সৈনিক সংগ্রহ করিল, করিয়া একবারে দাঙ্গা হঙ্গামাস্থল ভেদ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ দাঙ্গা হঙ্গামা সমস্ত বাধাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, যেন কিছুই জানে না। তিষ্যরক্ষা হঠাৎ [ সশস্ত্র ] লোক সঙ্গে তাহার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। মহামাত্য একটু ব্যস্ত হইলেন। তখন তিষ্যরক্ষা বলিল—

"আমার পুরুষের বেশ দেখিতেছ আমি পুরুষ নহি, আমার নাম তিষ্যরক্ষা। আমার কুঞ্জে বসিয়া পাটরানীর সহিত যে পরামর্শ করিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। তুমিই এই দাঙ্গা হঙ্গামার মূল আমি জানি, এবং রাজাকে বলিয়াছি। তুমি যদি প্রাণ চাও, গাছটি কোথায় দেখাইয়া দেও; যদি দেখাইয়া দেও তোমায় নির্বিবাদে নগরের বাহির করিয়া দিয়া আসিব। যদি না দেও তবে এখনই তোমায় রাজার নিকট লইয়া যাইব। লইয়া গিয়া তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াইব। জান, বৌদ্ধ রাজার দেশে ব্রাহ্মণ আর অবধ্য নয়।"

ব্রাহ্মণ ভয়ে ত্রাসে শঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল, একটি কথাও কহিতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে একটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখাইয়া দিল। তিষ্যরক্ষা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেল। সেখানে ব্রাহ্মণের কথা ফুটিল। ইতিপূর্বেই পরিষ্য-রক্ষিতার কি দশা হইয়াছে তিষ্যরক্ষা তাহাকে শুনাইয়াছিল। সে করজোড়ে নানা প্রকার বিশ্লিষ্ট বাক্যপরম্পরা সৃজন করিয়া তিষ্যরক্ষার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

তিষ্যরক্ষা তাহাকে গঙ্গাতীরে শপথ করাইয়া লইল যে, "অদ্যাবধি আমি যা বলিব তুমি তাহাই করিবে।"

শপথ শেষ হইলে তিষ্যরক্ষা বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ, তুমি তক্ষশিলায় যাও। তোমায় আমার বিস্তর প্রয়োজন আছে। আমি প্রাণপণে তোমার ভালো করিব।"

কুঞ্জরকর্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তিষ্যরক্ষা স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

৭

অশোক ও কুণালের প্রতাপে দাঙ্গা হাঙ্গামা শীঘ্রই শমিত হইল। কুক্কুটারামের অগ্নি নির্বাপিত হইল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের কি ঘোর অপযশ! ব্রাহ্মণদের দেবতা কি জাগ্রত! নাস্তিকদের সেই বটগাছ দেবতারা হরণ করিয়াছেন। তাহা আর পাওয়া গেল না। রাজা অশোক, কুণাল, উপগুপ্ত প্রভৃতি বহু-সংখ্যক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিষণ্ণবদনে, অনাহারে, যেখানে বৃক্ষ ছিল, তাহার চারি দিকে বসিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে তিষ্যরক্ষা মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল। রাজা আসিলেন না। তিষ্যরক্ষা রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইল। রাজা সম্মত হইলে, তিনি বোধিমণ্ডপে গমন করিলেন, এবং তথায় অন্য লোকেও যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, তিনিও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষা কহিল—

"মহারাজ! ভগবান্ অবলোকিতেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন! আমি এখনি ঋদ্ধিবলে সেই বোধিবৃক্ষ দেবভবন হইতে পুনরানয়ন করিব। আপনারা আর-কিয়ৎক্ষণ কোনো মঠায়তনে গিয়া ধ্যানমগ্ন থাকুন।"

তিষ্যরক্ষা যেখানে বৃক্ষ ছিল সেইখানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল, বোধিবৃক্ষ অল্পে অল্পে উঠিতে লাগিল। ভূখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বোধিদ্রুম স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। চারি দিক হইতে তিষ্যরক্ষার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে যথাস্থানে স্থাপিত হইল। দেবপূজকদিগের মুখ কালিমাবর্ণ হইল— বৌদ্ধদিগের জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অশোকাদি বৌদ্ধমণ্ডলী তিষ্যরক্ষার চারি দিকে দাঁড়াইয়া তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উপগুপ্ত এই সভাস্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্হৎ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং অর্হতী দীক্ষা দিয়া আপনার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী তখন এই ঋদ্ধিমতী পতিপরায়ণা ধর্মানুরাগিণী, রমণীকুলললামভূতা কামিনীকে সদ্ধর্মবিদ্বেষিণী পতিপ্রাণহারিণী ষড়যন্ত্রকারিণী পরিষ্যরক্ষিতার পরিবর্তে পাটরানী করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির হইল তিষ্যরক্ষা পাটরানী হইবেন এবং পরিষ্যরক্ষিতা পৌণ্ড্রবর্ধনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইবেন।

৮

এই জয়োল্লাসের মধ্যে তিষ্যরক্ষা পুনঃপুনঃ কুণালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন কুণালের মুখে সেই ঘৃণা, সেই অবজ্ঞা ও সেই বিতৃষ্ণা।

৯

এই ব্যাপারের দুই-পাঁচ দিনের মধ্যেই তিষ্যরক্ষার অভিষেক হইল। তিষ্যরক্ষা অন্যান্য পাটরানীদের ন্যায় কেবলমাত্র অন্তঃপুরের কর্ত্রী হইলেন না, তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। যে-সকল আজ্ঞা বাহির হইত তাহা অশোক ও তিষ্যরক্ষা এই উভয়ের নামে বাহির হইত। মন্ত্রীসভায়ও তিষ্যরক্ষা রাজার বামে বসিতেন। রাজাও এই অবধি ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিষ্যরক্ষার মহল ত্যাগ করিতেন না। সুতরাং এই অবধি তিষ্যরক্ষাই প্রকৃতপক্ষে মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অন্তঃপুর চলিত, মন্ত্রীসভা চলিত এবং রাজা অশোকও চলিতেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা সর্বদাই ভাবিতেন—

"আমার উদ্দেশ্য কি করিয়া সিদ্ধ করিব।"

## সপ্তম
## পরিচ্ছেদ

তিষ্যরক্ষার রাজ্যাভিষেকে বৌদ্ধধর্মের বড়োই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজবাড়ি-মধ্যে একটি ধর্মসভা স্থাপিত হইল। ভগবান উপগুপ্ত তাহার সভাপতি হইলেন। মহারাজা অশোক, কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত উহার প্রধান সভ্য হইলেন। বোধিবৃক্ষের অলৌকিক আবির্ভাব অবধি বৌদ্ধগণ তিষ্যরক্ষাকে "ঋদ্ধিমতী" বলিয়া ডাকিত। এই সভার মধ্যে রাজা ও উপগুপ্ত আপন আপন উপাসনাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মন্ত্রী রাজকার্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম প্রচারাদির ভার তিষ্যরক্ষা ও কুণালের উপর অর্পিত ছিল। তিষ্যরক্ষা কুণালকে সর্বদা রাজকার্যে [ ধর্মকার্যে ] সাহায্য করিত; রাজা বা উপগুপ্তের সহিত কুণালের মতান্তর হইলেই কুণালের পক্ষ সমর্থন করিত; যাহাতে সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে দেশে দেশে অর্হৎগণ প্রেরিত হয়, যাহাতে "ভিক্ষুদের" সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে "শ্রমণদিগের" বিদ্যোন্নতি হয়, যাহাতে "শ্রাবক" সংখ্যা বর্ধিত হয়, যাহাতে বহু-সংখ্যক মঠ স্থাপিত হয়, যাহাতে "চৈত্য"সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের লীলাভূমি [তে] সকলের সমুচিত সম্মান হয়, যাহাতে বাৎসরিক বিজ্ঞান সভার উন্নতি হয়, যাহাতে চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের নখ কেশাদি সুসংরক্ষিত হয়, যাহাতে "দন্তযাত্রাদি" উৎসবের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে ধর্মের, সঙ্ঘের ও বুদ্ধের প্রতি লোকের মন আকর্ষিত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে সর্বপ্রযত্নে কুণালকে সাহায্য করিত। যাহাতে তাহার প্রতি কুণালের শ্রদ্ধা জন্মে, তদ্বিষয়ে সে কিছু-মাত্র ত্রুটি করিত না।

২

কাঞ্চনমালা এই সভার কেহই নহেন। তিনি সভায় আসিতেন ; কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও উপগুপ্তের সহিত সর্বদা পরামর্শ করিতেন। কিন্তু তিনি রাজবাটীতে প্রায় থাকিতেন না। তিনি দিবারাত্রি হীনবেশে নগর-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, "ভিক্ষুক-দিগকে" [ ভিক্ষুদিগকে ] ভিক্ষা দিতেন, বালক বালিকাদিগের সহিত মিলিয়া সদ্ধর্মে তাহাদের মতি লওয়াইতেন। যেদিন উপগুপ্ত কুক্কুটারামে বসিয়া বৌদ্ধমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, সেদিন অবহিত চিত্তে ভক্তিভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ করতেন, এবং তৎপরদিবস গোষ্ঠে গোষ্ঠে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি, সেই উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেন। যাহারা সদ্ধর্মবিদ্বেষী তাহাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাহাদের বিপদ হইলে, তাহাদের অন্নাভাব হইলে, তাহাদের পীড়া হইলে, তিনি সাধ্যমতো তাহাদের সাহায্য করিতেন। প্রত্যহই সঙ্ঘভোজন করাইতেন। প্রত্যহ স্বহস্তে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। যেখানে শোক, যেখানে পীড়া, যেখানে দ্বন্দ্ব, যেখানে দুঃখ, কাঞ্চনমালা সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কাহাকেও পর ভাবিতেন না। পরদুঃখ নিবারণে কাতর হইতেন না। পরের সুখে তাঁহার সুখ, পরের দুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। ধর্মালয়, চিকিৎসালয়, মঠায়তন প্রভৃতি স্থানে তিনি সর্বদাই ভ্রমণ করিতেন। এমন-কি, তিনি পরের জন্য একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া উঠিলেন। রাজা কাঞ্চনমালার ধর্মাচরণে এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, যে কোষাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, কাঞ্চন যখনই যাহা চাহিবেন, তখনই বিনা আপত্তিতে যেন তাহা প্রদান করা হয়। কাঞ্চনের প্রবর্তনায় রাজা ও কুণাল, এমন-কি, তিষ্যরক্ষাও নগর পরিভ্রমণার্থ বাহির হইতেন এবং আধিব্যাধিপীড়িতদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। লোকে কাঞ্চনমালাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করিত। যেন নূতন ধর্ম প্রচারের জন্য, আর্ত ব্যক্তির আর্তি নিবারণের জন্য, এবং আপামর সাধারণ লোককে নির্বাণপ্রদানের জন্য, ভগবান্ "অবলোকিতেশ্বর" রমণীবেশে পাটলিপুত্র নগরে ভ্রমণ করিতেছেন।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

৩

এইরূপে বৎসরাবধি কাটিয়া গেল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়া গেল। পাটলিপুত্র নগরে সদ্ধর্মবিরোধী লোক রহিল না। সব পরিবর্তন হইল, কিন্তু তিষ্য-রক্ষার মন ফিরিল না। কুণালকে ভুলাইবার জন্য তিষ্যরক্ষা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল— কিন্তু দেখিল কুণাল অটল। সুতরাং তিষ্যরক্ষা আর সাহস করিয়া আপন মনের কথা তাঁহার নিকট পাড়িতে পারিল না। এইরূপে সংবৎসর কাটিয়া গেল— তিষ্যরক্ষা নানা ছলে কুণালের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিবার চেষ্টা পাইত। কখনো নিজ মহলে, কখনো কাঞ্চনকুটিরে, কখনো গঙ্গাতীরে, কখনো উদ্যান-মধ্যে, কখনো কুঞ্জবনেও, উঁহার সহিত পরামর্শ করিতে যাইত, কিন্তু [ মুখ ] ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। কেবল একদিন কুণালকে এক নিভৃত স্থানে পাইয়া সাবধানে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

"কুণাল, তুমি কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না ?"

কাঞ্চনমালার সন্ধ্যভোজনে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া কুণাল সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। এই অবধি নির্জনে পরামর্শের প্রস্তাব হইলে কুণাল আর সম্মত হইতেন না। দৈবাৎ নির্জনে তিষ্যরক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুণাল অন্যপথে চলিয়া যাইতেন।

৪

একদিন তিষ্যরক্ষা অশোক রাজার প্রাচীন রাজ-প্রাসাদে অর্থাৎ অশোকের পূর্বকার কেলিগৃহে গমন করিয়া তাহার একটি প্রকোষ্ঠ নানাবিধ বিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিল। তথায় কতকগুলি কদর্য চিত্রপট ছিল, তাহাতে গৃহটি সাজাইল। নিজে নানাবিধ বেশভূষা করিল, এবং সেই অবস্থায় প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র দ্বারা কুণালকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

কুণাল এবার আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সম্রাটের প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি উঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ কাঞ্চনমালা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল, এবং নানা প্রকারে জেদ করিতে লাগিল, "আজি তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না।" কুণাল তাহাকে

আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন, কিন্তু কাঞ্চনমালা আজি প্রবোধ মানিল না। সে আজি বড়ো অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইল— "কেন" "কি বৃত্তান্ত" কিছুই বলে না; হয়তো নিজেই জানে না যে তাহার এত ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু কোনো মতেই কুণালকে যাইতে দিতে চাহে না। কুণাল নানারূপে কাঞ্চনমালাকে ভুলাইতে লাগিলেন, শেষ বলিলেন—

"কাঞ্চন, কুক্কুটারামের পশ্চিম দিকে আম্রকাননের মধ্যবর্তী পুষ্করিণীর ধারে যে ব্রাহ্মণ সন্তানটি পীড়িত হইয়াছিল এতক্ষণ হয়তো সে মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে মুমূর্ষু দশায় দেখিয়া আসিয়াছি, সে অনেক-ক্ষণ হইয়াছে। তুমি যাও, গিয়া তাহার পিতাকে সান্ত্বনা করো।"

কাঞ্চন আগ্রহসহকারে বলিল—

"আমি যাই, তুমি কোথাও অনেকক্ষণ থাকিও না, শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইও," বলিয়াই প্রস্থান করিল।

৫

কুণালের মাথার উপর "কা কা কা" করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই একটা ভয়ানক সাপ তাঁহার রাস্তা পার হইয়া গেল। দূরে শিবাগণ বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। কুণাল ক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন— দেখিলেন, অন্তঃপুর বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ। এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে গমন করিয়া তিনি শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, কক্ষভিত্তিতে অশ্লীল আলেখ্য ঝুলিতেছে। কিন্তু শয়নকক্ষদ্বারে আসিয়া দেখিলেন ভিত্তিসমূহে কতকগুলা অতি জঘন্য আলেখ্য; চারি ভিত্তিরই ঠিক মধ্যস্থানে পরস্পর সম্মুখীন চারি খানি প্রকাণ্ড দর্পণ। গৃহমধ্যস্থলে খট্টোপরে অর্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা বিচিত্র অঙ্গরাগে বিভূষিত। দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব, তাহার প্রতিবিম্ব, আবার প্রতিবিম্ব, অনন্ত অসংখ্য অর্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়াই কুণাল ফিরিলেন। তিষ্যরক্ষা তখন সেই আলুথালু অবস্থাতেই দৌড়াইয়া উঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া লুণ্ঠিত হইল। আপন অনাবৃত হৃদয় কুণালের পদপ্রান্তে ফেলিয়া পদদ্বয় বেড়িয়া ধরিল। সর্পে পদ বেষ্টন করিয়া

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ধরিলে লোকে যেমন পা ছুঁড়িয়া সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করে, কুণাল তিষ্য-রক্ষাকে তদ্রূপ ফেলিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

৬

বহুক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষার চৈতন্য হইল। সে ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ— " পরে মাটিতে পা ঘষিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ— একদিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি তিষ্যরক্ষা।"

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

তিষ্যরক্ষা আবার যে সে-ই হইল। যেন কিছুই জানে না ; যেন কোনো গোলযোগই ঘটে নাই। পূর্বমতো ধর্মসভার অধিবেশন হইতে লাগিল, তিষ্যরক্ষা কুণালের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল ; বৌদ্ধধর্মের জন্য সে বড়োই উৎসাহবতী হইল। বাহিরে সব যেমন ছিল, তেমনি রহিল। কিন্তু সে ভুলিবার পাত্র ছিল না। এইরূপে মাসেক কাটিয়া গেল। ত্রিশ দিনের দিন তক্ষশিলা হইতে দ্রুত অশ্বারোহণে দূত আসিল। তথায় বিদ্রোহ হইয়াছে। আমাদের পূর্বপরিচিত কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রোহীদের নেতা।

পত্র পাইয়াই রাজা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পাটলিপুত্র নগরে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। কামারের দোকানে দিবারাত্রি ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল . রাশি রাশি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আয়ুধা-গারে সংরক্ষিত হইতে লাগিল। বড়ো বড়ো বাঁশ কাটিয়া ধনুক নির্মাণ হইতে লাগিল। মণিপুর. পৌণ্ড্রবর্ধন. অঙ্গ. ওড্র. বিদেহ. সমতট প্রভৃতি প্রদেশের করদ রাজগণকে সুরক্ষিত [সুশিক্ষিত] হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। সহস্র সহস্র ঘোটকে রাজার অশ্বশালা পূরিয়া যাইতে লাগিল। হ্রেষারবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র সূত্রধর দিবানিশি রথ নির্মাণ করিতে লাগিল। পাটলিপুত্র বন্দরের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ ক্রীত হইতে লাগিল। নানা দেশীয় বীরগণকে সৈন্য ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইল। সৈন্যেরা নগর প্রান্তরে সর্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত অযুত শকট ও অযুত অযুত নৌকা আনীত হইতে লাগিল। দেশের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এ দিকে তক্ষশিলা হইতে দূতের পর

দূত আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা। আজি এ গ্রাম, আজি ও গ্রাম, আজি সে গ্রাম, বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, বৌদ্ধদেবায়তন সকল উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্যে বৌদ্ধদিগকে ধরিয়া বলি দিতেছে। সমস্ত উদ্যোগ সমাধা হইলে, রাজা, মন্ত্রী, ও প্রধান পারিষদবর্গ সেনাপতি নির্বাচন করিতে বসিলেন। রাজা প্রিয়পুত্র কুণালকে ছাড়িয়া দিতে একান্ত অসম্মত। কিন্তু মন্ত্রী যে-সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে, কুণাল বৌদ্ধ এবং তাঁহার ধর্মত্যাগ অসম্ভব। দ্বিতীয়, তিনি বীর। তৃতীয়, তিনি কষ্টসহিষ্ণু। তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। চতুর্থ, যে-সমস্ত জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা কুণালের একান্ত অনুগত।

এই সকল কারণবশত কুণালই এই বিদ্রোহশান্তি নিমিত্ত সর্বপ্রধান সেনাপতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। রাজাও অন্য উপায় না দেখিয়া কুণালকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার মন কেন এরূপ ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

২

কুণাল সেনাপতি হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যে ত্রিশরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সেই ত্রিশরণের কার্য সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে জীবন গেলেও ক্ষতি নাই। তিনি আবার ভাবিলেন যে, এই সুযোগে তিনি পাপীয়সী তিষ্যরক্ষার চক্র হইতে অন্তত কিছু কালের জন্য পরিত্রাণ পাইবেন। একবার কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়িল। কাঞ্চনমালাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া একবার বড়োই কষ্ট হইল। আবার ভাবিলেন, কাঞ্চনমালা যেরূপ মহৎ কার্যে ব্রতী আছে, যে কার্যের জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে যে আমায় যাইতে বাধা দিবে তাহা বোধ হয় না। যদি আমি না থাকায় তাহার কিছু কষ্ট হয়,

সেইজন্য তাহাকে আমার সমস্ত কার্যের ভার দিয়া যাইব। যে সমস্ত কার্য লইয়া তাহার জীবন, যে সকল কাজ সে এত ভালোবাসে, তাহা পাইলে সে নিশ্চয়ই দিন কতকের মতো আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে।

৩

কাঞ্চনমালা যখন শুনিলেন কুণাল সেনাপতি হইয়াছেন, তখন তাঁহার মন হর্ষে ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় সদ্ধর্মের পুনরুদ্ধার করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আবার যখন সে দিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, যখন সেই ফুল চুরির উৎকণ্ঠার কথা মনে পড়িল, যখন কঞ্চুকীর আগমনে নানা অনিমিত্ত দর্শনের কথা মনে পড়িল, তখন তিনি ভাবিলেন, এত কাল যে অমঙ্গলের ভয় করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি সেই অমঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু এই মহৎ কর্মে বাধা দিতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি একবারও "না" এ কথা বলিতে পারিলেন না।

কুণাল বিদায় হইতে আসিলে, তিনি উঁহাকে নানা প্রকার উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত করিলেন। পরে বুদ্ধদেব যশোধরাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় যে-গান করিয়াছিলেন, সেই গান গাইলেন— বলিলেন—

"ভগবান্ যেরূপ যশোধরাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া লোকহিতকার্যে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সদ্ধর্মের হিতে সিদ্ধকাম হও। আমি এখানে যে ভাবে আছি এই ভাবেই থাকিব। কিন্তু আমায় অনুমতি দিতে হইবে, যে এই সময়ে একবার গয়াশীর্ষ পর্বতে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

কুণালও কাঞ্চনমালার ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন— বলিলেন, "তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমতি রহিল।" এই বলিয়া হাসিমুখে অথচ সজলচক্ষে অশ্বারোহণ পূর্বক সৈন্যমণ্ডলীর অগ্রবর্তী হইতে চলিলেন। কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন, মুহূর্ত-মধ্যে নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। যখন কুণালের অশ্ব আর দেখা গেল না, তখন কাঞ্চনমালা সত্বরপদে আবার সেই শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, অগণ্য রণপোত এক-তালে দাঁড় ফেলিয়া যাইতেছে।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

মাঝিরা ও আরোহীরা সমস্বরে সিংহনাদ-পূর্বক অশোক রাজার জয়গান করিতে করিতে যাইতেছে। তাহাদের জয়ধ্বনিতে নৌকার দাঁড়ের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক-প্রকার প্রশান্ত গম্ভীর শব্দ হইতেছে। সে শব্দে ভীরুলোকেরও সাহস উদয় হয়। নৌকার মাস্তুলে মাস্তুলে শ্বেত, নীল, পীত, হরিদ্রাদি নানা রঙের পতাকা সকল শোভমান হইতেছে। অনুকূল বায়ুতে পতাকা সকল প্রতাড়িত হইয়া দুলিতেছে— যেন বলিতেছে— শত্রুগণ পলায়ন করো, আমাদের সঙ্গে পারিবে না। কাঞ্চনমালা আর-একদিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তক্ষশিলা-যায়ী রাজবর্ত্ম পরিপূরিত করিয়া সৈন্যসমূহ চলিতেছে। কোথাও ভেরী, তুরী, কাড়া, পাড়া, দামামা, দগড়া বাজাইয়া পদাতিগণ চলিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় হস্তীসমূহ ধূলিপটলে আবৃত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর একতা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে আরোহী-দিগের শাণিত তরবারিতে ক্ষীণ সূর্যালোক পড়িয়া ক্ষীণ চাকচিক্য বিকাশ করিতেছে-- যেন গাঢ় মেঘে ক্ষীণ বিদ্যুৎ উঠিতেছে। কোথাও দেখিলেন, অশ্বসমূহ লাল, নীল, পীত, সবুজ নানা বর্ণের পৃষ্ঠাবরণে শোভিত হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর প্রকাণ্ডকায় বীরসকল শব্দায়-মান বর্মকবচাদি ধারণ করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" "আমি অগ্রে যাইব" বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেছে।

আর-একস্থানে দেখিলেন, রথসমূহ দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতেছে। রথের অশ্বসকল সারথি-কর্তৃক প্রতাড়িত হইয়া বায়ু অপেক্ষাও বেগে ধাবিত হইতেছে। দেখিলেন, রথের পতাকা সকল হেলিতেছে ও দুলিতেছে। এই দিগন্তব্যাপী রথমণ্ডলীর মধ্যে দেখিলেন, একখানি প্রকাণ্ড রথ, উহার অভ্রভেদী ধ্বজ, চীনাংশুক-নির্মিত চারুপতাকা। রথের স্বর্ণময় কিঙ্কিণী সকল সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করিতেছে। কাঞ্চনমালা দেখিয়াই জানিলেন, যে এই কুণালের রথ। কাঞ্চনমালা চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বায়ু অনুকূল, আকাশ নির্মেঘ, চারি দিকে বলাকা উড়িতেছে। দেখিলেন, আকাশে চাতকপক্ষী মদভরে শব্দ করিতেছে। এই সকলের মধ্যে কেবল একটি জিনিস দেখিয়া তাঁহার কিছু উৎকণ্ঠা হইল। তিনি দেখিলেন, কুণালের অভ্রভেদী ধ্বজের উপর একটি শকুনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## নবম
## পরিচ্ছেদ

প্রথমে পাটলিপুত্র হইতে কুণালের যুদ্ধযাত্রা সংবাদ তক্ষশিলা প্রদেশে পৌঁছিল। তৎকালে তক্ষশিলা প্রদেশ প্রায় দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ নিজে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী : সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধদ্বেষীগণ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শ করিল, আপনাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ আয়ত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজার সৈন্য উপস্থিত হইলেই প্রজারা রাজার সহিত যোগ দিবে। অতএব রাজার অধিকৃত দেশেই যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত।

এই পরামর্শের পর এক লক্ষ রণ-দর্পিত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তক্ষশিলা প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অশোক রাজার রাজ্য-মধ্যে আসিয়া কুণালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সৈন্য শিবিরের চারি দিক খাত করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ তাহারা শুনিতে পাইল, কুণাল অল্প-সংখ্যক কিন্তু বীরপূর্ণ সৈন্যের সহিত পশ্চাৎ ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কুণাল শত্রুদের শিবির সন্নিবেশের বিষয় চরমুখে বিশেষরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি কতকগুলি দ্রুতগামী অশ্ব এবং হস্তী আপন সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা অনেকদূর ঘুরিয়া শত্রু শিবিরের প্রায় পাঁচ-সাত ক্রোশ পশ্চাদ্ভাগে নির্বিঘ্ন স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে লাগিল। কুণাল সৈন্যদের প্রতি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন শত্রুদের রসদাদি যেন বন্ধ করা না হয়। দেশের লোক আমাদের পক্ষীয়, অতএব তাহাদের প্রতি যেন কোনো উৎপাত

করা না হয়। সর্বদা সাবধান থাকিবে, তোমরা কোথায় আছ তাহা যেন শত্রুরা টের না পায়। কুণাল এই সময়ে কেবল আকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। যুদ্ধের জন্য কোনো ব্যস্ততাই প্রদর্শন করিতেন না। সেনাপতিরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "যুদ্ধের বিলম্ব আছে।" আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিত না। কিন্তু বিলম্বে সৈন্যগণ ক্রমে বড়োই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে কুণাল হঠাৎ আজ্ঞা করিলেন, "অদ্য বৈকালে যুদ্ধ।" সৈন্যগণ রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল।

## ২

শত্রুরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছিল, যে কুণালের অধিকাংশ সেনা তাহাদের সম্মুখে আছে। সুতরাং আশঙ্কা করিয়াছিল নিশ্চয় সম্মুখে যুদ্ধ হইবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন পশ্চাদ্ভাগ হইতে কুণাল পদাতি ও অশ্বারোহীর সহিত ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিলে তাহারা কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পরে তাহারা দুই ভাগ হইয়া একভাগ ফিরিয়া কুণালের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল ও অপর ভাগ শিবিরে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বিদ্রোহীরা প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। পুরুষানুক্রমে তাহারা কখনো রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে কুণালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন বৌদ্ধসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কুণাল স্বয়ং রথোপরি হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। দার্ঢ্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"ধর্মের জয়! ব্রাহ্মণ কখনোই জিতিবে না।"

তথাপি কুণালসৈন্য ক্ষত্রিয়দিগের রণে স্থির থাকিতে পারিল না। অনেকশত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাগিল। কিছু পরে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন। পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া ভীমবেগে আঁধি উঠিল। পশ্চিম দিক হইতে যে ঝড় বহিতে লাগিল, সেই বায়ুতে পৃথিবীস্থ ধূলি আকাশে উত্থিত হইয়া চারি দিকে অন্ধকার করিয়া তুলিল। কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কুণালের সৈন্য পশ্চিমে, তাহাদের মুখ পূর্ব দিকে; ব্রাহ্মণ সৈন্য পূর্বে— তাহাদের মুখ পশ্চিম দিকে। সুতরাং এই আঁধির সমস্ত ধূলি আসিয়া ব্রাহ্মণ সৈন্যের নয়নে পতিত

হইতে লাগিল। কিন্তু কুণালের সৈন্যের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। তখন কুণাল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"সৈন্যগণ! বৌদ্ধগণ! ধর্ম আমাদের অনুকূল, বুদ্ধ আমাদের অনুকূল, আঁধি থাকিতে থাকিতে বিধর্মীদিগকে পরাজিত করো।"

ঝঞ্ঝাবায়ুর সহিত অসির ঝন্‌ঝনা বিদ্রোহী সৈন্যের বিষম ভয় উৎপাদন করিল। তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না— কে স্বদল কে বৈরী কিছুই চিনিতে পারে না, সুতরাং ভ্রমে আপনাদের সৈন্য আপনারা কাটিতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু কুণাল তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং কৌশলে আপনার সেনা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। পরে যখন আঁধি ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, বিদ্রোহীরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিল। সেই সময় কুণালের সেনা সদর্পে ঘোর হুংকার করিয়া তাহাদের উপর পড়িল। কুঞ্জরকর্ণ দেখিলেন সৈন্যরা পলায়নোন্মুখ, তাহাদের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। ক্রমে অশ্বে, হস্তীতে, মানুষে, ঢালে, তরবারিতে ধুলায় আর ভয়ে, ব্রাহ্মণশিবিরে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া উঠিল।

কুণাল অমনি এই সুযোগে পলায়নপর শত্রু ও শত্রুশিবিরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকজন বীর সৈনিককে অশ্বারোহণে দ্রুতগতি উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন।

এইরূপ অল্প প্রাণীহত্যায় জয়লাভে তাঁহার উল্লাসের সীমা রহিল না। কুণালের পর অনেকেই আঁধির আশ্রয়ে জয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণীহিংসা নিবারণার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যবন ও মুসলমান পশ্চিম হইতে আসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই জানেন, যে আঁধি তাঁহাদের অনুকূল, আর হিন্দুর প্রতিকূল ছিল। এই আঁধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়?

## ৩

ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। দুই দিকের শত্রুসৈন্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কুণালের কিছুমাত্র ত্রাস জন্মিল না। তিনি সমস্ত রাত্রি স্বয়ং প্রহরীর কাজ করিতে

লাগিলেন, এবং "ধর্মের জয়, সত্যের জয়, বুদ্ধের জয়" বলিয়া তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে অশ্বারোহীদিগকে তিনি পলায়নপর হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা কয়েকজন প্রধান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বন্দীরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী কুঞ্জরকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কুঞ্জরকর্ণকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে এমনি নিঃশঙ্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যেন সে-ই প্রকৃত বিজেতা। কুণাল তাহাকে একজন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজ অশোককে এই যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং কুঞ্জরকর্ণের প্রতি কি আজ্ঞা হয় জানিতে চাহিলেন।

## ৪

তৎপরদিনে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিন্দুশিবির ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তখন কুণাল বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে তক্ষশিলা রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তক্ষশিলা রাজ্যে আবার শান্তিস্থাপিত হইল। কুণাল ভগ্ন মঠায়তন সকল পুনর্নির্মিত করিতে লাগিলেন। অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক, আবার নির্ভয়ে বৌদ্ধধর্ম পালন করিতে লাগিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই কুণাল বিদ্রোহীদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কাঞ্চনমালাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া তিনি যে পত্র লিখিলেন তাহার শেষভাগে লিখিলেন, "বহু-সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ যুদ্ধে আহত হইয়া বড়োই কষ্ট পাইতেছে, আমি তাহাদিগের শুশ্রূষার চেষ্টা করিতেছি সত্য; কিন্তু তুমি থাকিলে বোধ হয় তাহারা শীঘ্রই আরাম হইতে পারিত।"

# দশম
# পরিচ্ছেদ

যথাকালে কুণালের পত্র রাজধানী পৌঁছিল। কিন্তু তখন অশোক আর রাজা নাই। যেদিন কুণাল যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তদবধি প্রিয়পুত্রের শোকে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বদাই ভাবনা হইতে লাগিল, কুণালের পাছে কোনোরূপ অনিষ্ট হয়: এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। একবার মনে করিলেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন; কিন্তু আর কেহই সে পরামর্শ দিল না। ক্রমাগত ভাবনায় ও ক্রমাগত পরিশ্রমে অশোক রাজার বহুমূত্র রোগ উপস্থিত হইল। বহুমূত্র রোগের লক্ষণ এই যে প্রথম অবস্থাতেই উহা অতিশয় ভয়ংকর হইয়া উঠে। কুণাল যাইবার দশ-বারো দিন পরে রাজার এই বিষম অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। পাটলিপুত্র নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসক পুস্তকাদি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্রি রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পাতা লতা ফল মূল গুল্ম অস্থি প্রভৃতিতে রাজবাড়ির এক মহাল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে বড়ো বড়ো কবিরাজেরা পঞ্চবার্ষিকী সভায় সাত-আট বার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং স্বহস্তে ঔষধ তৈল আরক বটিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পাটলিপুত্র নগরের বড়ো বড়ো বৌদ্ধ মঠে প্রত্যহ উপহারাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। ভগবান্ উপগুপ্ত রাজবাটীতে আসিয়া রাজার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে পরিচর্যার কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই রাজার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। ঔষধ সেবন, পথ্যাদি প্রদান, নিদ্রার সময় ব্যাঘাত হইতে না দেওয়া, আহারাদির বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া, শয্যা গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতির কোনো-

রূপ ত্রুটি হইলেই তাঁহার আর অব্যাহতি থাকিবে না। এরূপ পরিচারিকা অন্তঃপুর-মধ্যে মিলিয়া উঠা ভার। অশোকের মহিষীগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ-পক্ষীয়, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না। যাঁহারা বৌদ্ধ তাঁহারা হয় সেরূপ পরিচর্যা করিতে জানেন না ; না-হয় করিতে প্রস্তুত নন। কাঞ্চন রোগ শোকে পরের মাতা পিতা। কিন্তু রাজার পীড়ায় পুত্রবধূ অপেক্ষা মহিষীরা সেবা করিলেই ভালো হয়। সুতরাং সে ভার তিষ্যরক্ষার স্কন্ধেই পড়িল।

তিষ্যরক্ষা দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, রাজা অশোকের সেবা করিতে লাগিলেন। দুই-তিন দিনেই অশোক এরূপ দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার উত্থান শক্তি একেবারে রহিল না। তখন তিষ্যরক্ষাই তাঁহার হাত পা হইল। তিষ্যরক্ষারও কিছুতেই সেবার বিরতি হইত না। যে সময়ে কোনো কাজ না থাকিত, সে সময়ে সে রাজার কাছে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিত। দিনরাত্রি গায় হাত বুলাইত, পাখা লইয়া বাতাস করিত, একবার ঘর হইতে বাহির হইত না। দাসীবৃন্দকে রাজার নিকটে আসিতে দিত না। রাজা নিদ্রিত হইলে পার্শ্বে বসিয়া মশা মাছি তাড়াইত এবং যাহাতে রাজার নিদ্রার বিঘ্ন না হয় তাহার জন্য নিজে ঘুমাইত না। দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে সে রাজার মহলটি এমনি সুশীতল করিয়া রাখিত, যে গেলে লোকের আর ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিত না।

## ২

এইরূপ নিরন্তর সেবায় রাজার শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তিষ্যরক্ষা অনিদ্রায় অনাহারে অস্নানে ও অনিয়মে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি উহার সেবায় বিতৃষ্ণা বা বিরতি রহিল না। অনিয়মে তাহার একপ্রকার উৎকট শিরঃপীড়া জন্মিল ; শিরঃশীড়া উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে সে দুই-তিন ঘণ্টা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিত।

রাজা আরোগ্য হইয়া উঠিয়া তিষ্যরক্ষার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। পরে বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করাইয়া উহার শরীর শোধরাইয়া দিলেন এবং তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। সে প্রার্থনা

করিল যে আমি একাকী এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্য শাসন করিব। অশোক সম্মত হইলেন। চারি দিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, মহারানী তিষ্যরক্ষা এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্যে সর্বময়ী কর্ত্রী হইবেন। মৌল, রক্ষী, সামন্ত, গ্রামীক, সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হইল যে তাহারা এই এক বৎসরের জন্য তিষ্যরক্ষার আজ্ঞানুবর্তী হইবে। এই কয়দিন অশোক প্রজাভাবে রাজপুরীমধ্যে বাস করিবেন।

৩ এই নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় দিনে কুণালের দূত জয়-বার্তা লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল এবং কুঞ্জরকর্ণের বন্দী হওয়ার সংবাদ আনিয়া দিল। যুদ্ধের জয় সংবাদে মহারানী তিষ্যরক্ষা ঘোষণা দ্বারা নগরবাসীদিগকে উৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন, রাত্রিতে মহানগর দীপরাজিতে আলোকিত হইল; বৌদ্ধমহলে আজি বড়োই আনন্দ। অশোক শুনিলেন, তিনিও নিজ বাসস্থান প্রদীপ দিয়া দীপান্বিত করিয়া তুলিলেন।

রাজা ও তিষ্যরক্ষার পীড়ার সময় কাঞ্চন সর্বদাই রোগীদের নিকট থাকিত, উভয়ে সারিয়া উঠিলে আবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। আজি এই সুখের দিনে সেও কাঞ্চনকুটির দীপমালায় শোভিত করিল। দূত আসিয়া তাহাকেও পত্র দিল, পত্রের শেষ অংশ পড়িয়া তাহার বড়োই কষ্ট হইল। সে তক্ষশিলা গমনের অনুমতি তিষ্যরক্ষার নিকট প্রার্থনা করিল। তিষ্যরক্ষা যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয় বলিয়া যাইতে দিলেন না। কাঞ্চনের যাওয়া হইল না এবং সে বড়ো বিষণ্ন হইল। তাহার হাসি-খুশি ও প্রফুল্লভাব দিনকত বড়ো একটা দেখা গেল না। দুই-পাঁচ দিন পরে আবার যে সেই হইল, কুণালের নিকট হইতে সদ্ধর্মের জয়-সংবাদ এবং কুণালের অবিচলিত প্রণয়ের চিহ্ন সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাঞ্চন ইহাতেই সুখী।

ওদিকে যথাসময়ে কুণালের নিকট তিষ্যরক্ষার রাজ্যারোহণ বার্তা পঁহুছিল। তৎপরদিন যুদ্ধজয় শ্রবণে মহারানী বড়ো আনন্দিত হইয়াছেন সংবাদ আসিল। তৎপরে কুঞ্জরকর্ণকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা আসিল,

কুণাল তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তৎপরদিন পত্র আসিল যে কুঞ্জর-কর্ণ আমায় "মা" বলিয়াছে, অতএব আমি তাহাকেই তক্ষশিলায় শাসন-কর্তা করিলাম, তুমি তাহার আজ্ঞাধীন হইবে। এই সংবাদে কুণালের অধীনস্থ সেনাপতিগণ বড়ো অসন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে নাপিতকন্যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দিল। কুণাল বলিলেন. সে যেই হোক, সে যখন মহারানী হইয়াছে তখন অবশ্যই আমায় তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে। সেনাপতিরা অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু সেনাস্থ লোক রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের রাজত্বে মানুষের বাস করিতে নাই। কি অবিচার! বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বন্দী রাজা হইল, আর বিজয়ী রাজপুত্র তাহার অধীন হইল!"

এইভাবে তিন-চারি দিন কাটিয়া গেল। পাঁচ দিনের দিন কুঞ্জর-কর্ণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে কুণালকে আসিয়া বলিল. "মহারানীর আজ্ঞা, আজি তোমায় আমার সহিত তক্ষশিলার দুর্গের মধ্যে যাইতে হইবে।" কুণাল মস্তক অবনত করিয়া রানীর আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। বামাঙ্গ স্পন্দন হইল, কাক চিল্ল উড়িতে লাগিল, কুণাল ভাবিলেন বুঝি কাঞ্চনের সঙ্গে আর দেখা হইল না। বাহিরে তাঁহার আন্তরিক আবেগের চিহ্নও দেখা গেল না। ধর্ম. সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম করিয়া তিনি কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

বহু-সংখ্যক সৈনিক তাঁহার সহিত যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি হস্ত সংকেত দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

কুঞ্জরকর্ণ কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "কুণাল, মহারানী তোমার উপর বড়ো কঠিন আজ্ঞা করিয়াছেন।"

"তিনি যাই আজ্ঞা করুন তাহাই আমার শিরোধার্য।"

"সে আজ্ঞা পালন করিলে জীবন ও মৃত্যু সমান হইবে।"

"হয় হইবে।"

কুঞ্জরকর্ণ বলিলেন—

"এসো! আমরা কেন দুই জনে যোগ করিয়া তক্ষশিলায় নূতন রাজত্ব স্থাপন করি না?"

কুণাল এ কথার উত্তর দিলেন না ; কিন্তু এমনি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। সে ভয়কম্পিত স্বরে বলিল—

"তবে আমি মহারানীর আজ্ঞার সহিত লোক পাঠাইয়া দিতেছি, তুমি আপন মন দৃঢ় করো।" বলিয়া কুঞ্জরকর্ণ প্রস্থান করিল।

৪

কুণাল ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের স্তব করিতে লাগিলেন। একমনে বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন--

"জীবলোকের সুখের জন্য জীবন ত্যাগ করা শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমি কিসের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছি ? ইহাতে পাপীয়সীর পাপ-বাসনা চরিতার্থ বৈ আর কিছুই হইবে না।" তখনি আবার মনে হইল, "সে যেই হোক সে এক্ষণে মহারানী। তাহার আজ্ঞা কোনো-রূপেই লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। করিলেই যুদ্ধবিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে।"

এই সময়ে একবার কাঞ্চনমালার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি উদ্দেশে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন-- বলিলেন—

"জীবিতেশ্বরি ! আমার সহিত তোমার এবার আব দেখা হইল না।"

এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে দুই জন চণ্ডাল রাজপত্র হস্তে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সর্বশরীর তৈলাক্ত ; প্রকাণ্ড মুখ, বড়ো বড়ো চোখ, অনবরত মদ্য সেবনে জবা ফুলের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সেই কালো তৈলাক্ত মুখের উপর কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ি এবং অপরিষ্কৃত ভয়ানক কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গলায় রাঙা জবা ফুলের মালা, হাতে তীর ও ধনুক। আসিয়াই একজন আর-একজনকে বলিল, "ওরে, এই শালাটার কি চোখ তুলতে হবে ? কিন্তু শালার চোখ দুটো কি বড়ো !"

দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল, "লেখনখানা ওর হাতে দে।"

প্রথম চণ্ডাল আবার বলিল—

"আর পত্র দিয়ে কি হবে ? এখনি তো ওর পত্র দেখা ফুরিয়ে যাবে।"

"তবে আর কাজ নাই" বলিয়া উভয়ে কুণালের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া তীর তুলিল। প্রথম চণ্ডাল বাম ও দ্বিতীয় চণ্ডাল দক্ষিণ চক্ষু লক্ষ্য করিল। কুণাল দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা পত্রখানি আগে দেখাও, তাহার পর যাহা হয় করিও।"

"দেখিয়া আর কি হইবে, কাজ দেখো না।"

"না দেখিলে আমি কিছুই করিতে দিব না" বলিয়াই তিনি তাহাদের প্রতি এমনি তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন যে তাহাদের হস্ত কম্পিত হইল।

কুণাল উহাদের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মস্তকে ছোঁওয়াইয়া পড়িলেন —দেখিলেন তাঁহারই চক্ষু উৎপাটনের আজ্ঞা। দেখিলেন তাহাতে তিষ্যরক্ষার নাম স্বাক্ষর !

পত্রখানি পাঠ করিয়া চণ্ডাল দুইজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"তোমরা যাহা আজ্ঞা পাইয়াছ তাহা করো।"

প্রথম চণ্ডাল বলিয়া উঠিল—

"দেখলে তো, এখন চোখ তুলি ?"

এই বলিয়া তীর ধনু তুলিল। কিন্তু চোখের দিকে সে আর চাহিতে সাহস করিল না।

ধনুর্বাণ ভূমিতে রাখিয়া কুণালের চক্ষে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটি উৎপাটন করিল। কুণাল তখন—

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"

বলিতে লাগিলেন। প্রথম চক্ষু উৎপাটন করিয়াই সে মাতিয়া উঠিল এবং অপর অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল—

"ও চক্ষু আমার, আমি তুলিতে দিব না" এবং কুণালের চক্ষু আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথম চণ্ডাল উহাকে পদাঘাত দ্বারা দূর করিয়া

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

দিয়া কুণালের অপর চক্ষুটিও উপাড়িয়া লইল। পরে চক্ষুদুটি কুড়াইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় দ্বিতীয় চণ্ডালকে আর-একটি লাথি মারিয়া গেল।

৫

দ্বিতীয় চণ্ডাল কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—সে এপর্যন্ত কথা কহে নাই। প্রথম চণ্ডাল চলিয়া গেলে সে কুণালকে জিজ্ঞাসা করিল--

"তুমি এখনো সেই মন্ত্র পড়িতেছ ?"

কুণাল বলিলেন—

"হাঁ।"

"তোমার লাগে নাই ?"

"অল্প।"

"চোখ উপড়াইয়া লইল, অথচ অল্প লাগিয়াছে বলিতেছ কেমন করিয়া ?"

কুণাল বলিলেন—

"আমার তো সামান্য কষ্ট হইল, কিন্তু কত লোক আমা অপেক্ষা কত অধিক কষ্ট পায়।"

"তুমি কি তাই ভাবিয়া এত স্থির থাকিতে পারিয়াছ ?"

"হাঁ, তাহাই আমাদের ধর্মের উপদেশ।"

"কি তোমাদের ধর্মের উপদেশ ?"

"আপনার কষ্ট মনে করিবে না, কেবল পরের কষ্ট মনে করিবে এবং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে।"

"এই তোমাদের ধর্ম ?"

"হাঁ।"

"তবে আমি চলিলাম।"

কুণাল দেখিতে পাইলেন না, সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তীর ধনুক অস্ত্রশস্ত্র জবাফুলের মালা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

৬

কিয়ৎক্ষণ পরে কুঞ্জরকর্ণ কুণালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল— বলিল—

"কুণাল, তোমায় এই গৃহেই অবস্থান করিতে হইবে— মহারানীর আজ্ঞা।"

"শিরোধার্য" বলিলে কুঞ্জরকর্ণ স্বহস্তে সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

পাটলিপুত্রে তিষ্যরক্ষা একাধিশ্বরী। মহামন্ত্রী রাধগুপ্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। উভয়ে পরামর্শ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন ; দুই-এক বিষয়ে মহারাজা অশোকেরও মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাস [ চারি মাস ? ] অতীত হইয়া গেল। পঞ্চম মাসের প্রথমেই সংবাদ আসিল, "তক্ষশিলার কুঞ্জরকর্ণ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে।" দুই-এক দিন পরে আবার সংবাদ আসিল, "কুঞ্জরকর্ণ আবার বিদ্রোহী হইয়া কুণালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" আবার দুই-তিন দিন-মধ্যে সংবাদ আসিল, "যুদ্ধে কুঞ্জরকর্ণ জয়লাভ করিয়াছে ও কুণাল বন্দী হইয়াছেন।"

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিতে প্রায় একমাস লাগে, সুতরাং এই একমাস কুঞ্জরকর্ণ কি করিতেছে তাহা কেহই জানিতে পারিল না। নগরবাসী লোকদের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ বিজয়ী সৈন্য সর্মাভব্যাহারে পাটলিপুত্র নগরে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বৌদ্ধ বধ করিতে করিতে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"মেয়েমানুষের হাতে রাজ্য দিলে সবই বিশৃঙ্খল হয়।"

কেহ বলিল—

"যখন কুণালকে পরাজয় করিয়াছে, তখন রাজা অশোকের তো কথাই নাই।"

অনেকে পাটলিপুত্র নগর হইতে স্ব স্ব পরিবার স্থানান্তরে প্রেরণ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা কুণালের বন্দিত্ব শ্রবণ করিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তিষ্যরক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করিল— তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল— কিন্তু এবার তাহার প্রাণ বড়োই কাঁদিতেছে— সে আর কাহারো কথা মানিল না। সেই রজনীযোগেই সে তক্ষশিলা যাইবার পথ আশ্রয় করিল। কাঞ্চনমালা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, শুনিয়া নগরের মধ্যে আবার হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—

"অশোক রাজার রাজলক্ষ্মী এইবার ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

কাঞ্চন যে দুঃখী দরিদ্রের মাতা পিতা ছিলেন। কাঞ্চন যাওয়া অবধি তাহারা সর্বদাই অশোক রাজাকে গালি দিতে লাগিল— কেহ কেহ উহার অনুসন্ধানার্থ তক্ষশিলার পথে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কাঞ্চনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাটলিপুত্র হইতে বহু-সংখ্যক সৈন্য আবার প্রেরিত হইল। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই সংবাদ আসিল, তাহারা কুঞ্জরকর্ণের সহিত যোগ দিয়াছে। তখন নগরবাসীদের ভয়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সকলে তিষ্যরক্ষার প্রাসাদের চতুর্দিকে গিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল— বলিতে লাগিল—

"শত্রু তো এল, নগরের রক্ষার উপায় কি ?"

তিষ্যরক্ষা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে গালি দিতে দিতে অশোক রাজাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহারাজা অশোক তখন নগর হইতে অনেক দূরে বেণুবনে উপগুপ্তের সহিত বাস করিতেছিলেন। সমস্ত লোক গিয়া তথায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং তাঁহাকে এই অভাবনীয় বিপদের সময় স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন অশোক, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২

অশোক আসিতে আসিতে নগরবাসীদের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। কাঞ্চন ও কুণালের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার মনের উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজবাটীর দ্বার

হইতে আশ্বাসবাক্যে প্রজাদিগকে বিদায় দিয়া প্রথমেই তিষ্যরক্ষার মহালে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত কি পরামর্শ করিতেছেন। রাজা রাধগুপ্তকে দেখিয়া বলিলেন—

"কুঞ্জরকর্ণ নাকি সসৈন্যে আসিতেছে ?"

রাধগুপ্ত বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ তক্ষশিলায় জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়াছে এরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই।"

"কুণালের কি হইয়াছে ? কাঞ্চন কোথায় ? তোমরা এত দিন সৈন্য পাঠাও নাই কেন ? যে সব সৈন্য পাঠাইয়াছ তাহাদেরই বা সংবাদ কি ? আমি তো এপর্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রাজা এত দ্রুত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে রাধগুপ্ত কিছুরই জবাব দিতে পারিল না। রাজা যে এ সময় উপস্থিত হইবেন, তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। রাজা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া আরো ব্যস্ত হইয়া আরো লক্ষ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন— এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তিষ্যরক্ষাকে সংবাদ দিল যে, তক্ষশিলা হইতে একজন বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। সে বলে মহারানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

রাজা বলিলেন—

"তক্ষশিলা হইতে ?" কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়াই আভূমি প্রণত হইয়া বলিল—

"মহারাজের জয় হউক।"

"জয় পরে হবে, সে লোক কি তক্ষশিলা হইতে আসিয়াছে ?"

কঞ্চুকী বলিল—

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তাহাকে লইয়া আইস।" মন্ত্রী নিষেধ করিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়া বলিল—

"দূতের সহিত সাক্ষাতের এ সময় নহে, বিশেষ মহারানী ক্লান্ত আছেন।"

রাজা রাধগুপ্তের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—

"তুমি মহারাজের আজ্ঞা পালন করো।"

কঞ্চুকী শশব্যস্তে বিজ্ঞানবিৎকে আনিতে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী বলিল—

"মহারাজ, আপনার রাজ্যারম্ভের আর অল্প দিনই আছে।"

রাজা বলিলেন—

"অল্প দিন আছে তাহা জানি, কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়া দিবার তাৎপর্য ?"

"এই কয় দিন [ মহারানীকে ] স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে না দিলে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।"

"ততদিনে মগধ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইবে।" রাজা এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী বিজ্ঞানবিৎকে লইয়া উপস্থিত হইল, এবং মহারানীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিজ্ঞানবিৎ আপন বস্ত্র-মধ্য হইতে একটি বাক্স লইয়া রানীর হস্তে দিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তক্ষশিলা হইতে আসিতেছ ?"

সে বলিল—

"হাঁ।"

সে রাজার কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল,

"দেবি, এই দুইটি চক্ষু লইয়া আসিতে আমায় যে কষ্ট পাইতে হইয়াছে বলিতে পারি না। রাজপথে বিশল্যকরণী মিলে না। সুতরাং আমাকে— "

চক্ষুর কথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষা শিহরিয়া উঠিল, বাক্সটি খুলিল, খুলিয়া চক্ষু দুইটি বাহির করিল— দেখিল সে চক্ষু এখনো তেমনি উজ্জ্বল— সে উহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল— করিয়াই ব্যস্তসমস্তভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

রাজাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চোখ কাহার ? কোথা পাইলে ?" কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার পথের কষ্টের কথা বলিতেছিল। সে বিশল্যকরণী অন্বেষণ করিবার জন্য কখনো সাপের মুখে পড়িয়াছে, কখনো বাঘের মুখে পড়িয়াছে ; নহিলে সে চক্ষু টাটকা থাকে না ; ইত্যাদি বলিতেছিল।

রানী চলিয়া গেলে রাধগুপ্ত তাহাকে বলিলেন—

"থামো, দেখিতেছ না, রানীর অসুখ হইয়াছে ? তোমায় এ সময় কে আসিতে বলিয়াছিল ?"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

সে বলিল—

"আমি কি করিয়া জানিব ? আমায় একজন অনেক টাকা দিয়া ঐটি মহারানীর হস্তে দিতে বলিয়াছিল। আরো বলিয়াছিল যে, মহা-রানীর হাতে দিলে তিনি অনেক পুরস্কার দিবেন।"

রাজা বলিলেন—

"কে সে লোক ?"

বিজ্ঞানবিৎ বলিল—

"তাহা আমি জানি না। আমায় বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন। সে আমায় টাকা দিল এবং আরো পাইবার আশা দিল— আমি লইয়া আসিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে সে, তুমি তাহাকে চেনো।"

সে বলিল—

"না।"

"তুমি আসিতেছ কোথা হইতে ?"

"বাসুকিশীল হইতে।"

"সে কোথায় ?"

"তক্ষশিলা হইতে আট ক্রোশ পূর্বে।"

"সেখানকার বিদ্রোহের কি সংবাদ জানো ?"

"বিদ্রোহ কোথায় ?"

"তক্ষশিলায়।"

"হাঁ একটু একটু জানি। পাঁচ-ছয় মাস হইল কতকগুলি কাটা পা জোড়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, বিদ্রোহে তাহাদের পা কাটা গিয়াছিল।

রাজা দেখিলেন, উহার নিকট হইতে কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না; জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি-পরীক্ষার জন্য এত টাকা চাও ?"

সে বলিল—

"অন্ধত্ব দূর করিবার জন্য।"

রাজা বলিলেন—

"অশোক সিংহাসনে আরূঢ় হইলে আসিও ; তিনি তোমায় পুরস্কার করিবেন।"

"মহারানী আমায় পুরস্কার কই দিলেন ? আমি কি অশোকের অভিষেক পর্যন্ত বসিয়া থাকিব ?"

"থাকিলেই বা হানি কি ?"

"তাহাও যদি ঠিক জানিতাম যে নিশ্চয় হইবে, না-হয় দু-পাঁচ দিন থাকিতাম। কিন্তু যে একবার আপন রাজ্য পরকে, বিশেষ স্ত্রীলোককে দেয়, সে কি আর উহা ফিরিয়া পায় ?"

মন্ত্রী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—

"তুমি তো বড়ো অর্বাচীন। তুমি জানো কাহার সহিত কথা কহিতেছ ?"

সে বলিল—

"জানি আর নাই জানি, সত্য কথা যমের সাক্ষাতেও কহা যায়।"

মন্ত্রী বলিলেন—

"তুমি এখন অতিথিশালে যাও, আমি রানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব।"

"কিন্তু আমি অধিক দিন থাকিতে পারিব না।"

"আজিই ব্যবস্থা করিব।" বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে বিদায় দিলেন।

৩

বিজ্ঞানবিৎ চলিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ সব কি ?"

মন্ত্রী গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রাজার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—

"মহারাজ, এ কয়দিন আমায় কিছু বলিবেন না। আমি আপনারই ভৃত্য। আপনিই আমাকে অন্যহস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আপনি জানেন, রাজ্যের কার্য অতি দুরূহ। এ কয়েক দিন আমার প্রভুর আ[ন]নুমতিতে আপনাকে কোনো কথা বলিতে পারিব না।"

রাজা বলিলেন—

"সাধু, কিন্তু নগরবাসীদের ভয় নিবারণের কি উপায় করিয়াছ ?"

"তাহাও মহারানীর ইচ্ছা।"

এই সময়ে আবার তক্ষশিলা হইতে দূত আসিল। কুণাল বন্দী হওয়ার পর তাঁহার সৈন্যেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কেহ বিদ্রোহে যোগ দিতেছে, কেহ দেশীয় লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে।

শীঘ্র সৈন্য ও সেনাপতি না পাঠাইলে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইবে। এই সংবাদ লইয়া উভয়েই দ্রুতগতি রানীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখনো তাহার মনের আবেগ শান্ত হয় নাই। সে হস্ত দ্বারা সংকেত করিয়া উহাদিগকে পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে বলিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তথায় [ আসিয়া ] মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

"মহারাজ, আমার আর রাজত্বে কাজ নাই। আমি স্ত্রীলোক। রাজ্যচিন্তা আমার পক্ষে বড়োই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।"

মন্ত্রী তখন বার বার রানীর শরীরের অসুখের কথা কহিতে লাগিল, "এদিন শিরঃপীড়া হইয়াছিল, ওদিন ভ্রমি হইয়াছিল, সেদিন মূর্ছা হইয়াছিল, আজিও তো দেখিলেন" ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন—

"রাজ্যভার [ আমি ] গ্রহণ করিতে পারি না।"

অমনি রাধগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন—

"তবে আপনি প্রধান মন্ত্রী হইয়া আমায় অব্যাহতি দিন।"

"রাধগুপ্ত থাকিতে অন্য কেহ মন্ত্রী— "

রানী বলিলেন—

"তবে এই গোলযোগের সময় আপনি সেনাপতি হন।"

রাজা বলিলেন—

"সেই ভালো। আমি নগরবাসীদিগকে শান্ত করিয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিব। যাবৎ না ফিরিয়া আসি তোমরা যেমন রাজ্য করিতেছিলে তেমনি রাজ্য করো।"

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী বন্দী হওয়ার সংবাদ পাইয়া অবধি কাঞ্চনের মনের স্ফূর্তি ছিল না। তাঁহার যাহা নিত্যকর্ম ছিল, তাহা তিনি করিতেন— কেবলমাত্র অভ্যাসের গুণে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বড়ো একটা উৎসাহ ছিল না। নিত্য সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, নিত্য দীন-দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দিতেন, নিত্য রোগীদের সেবা করিতেন, নিত্য ঔষধ বিতরণ করিতেন, সমস্ত কেবল অভ্যাসের গুণে। ক্রমে দেখিলেন তাহাতে তাঁহার কাজ ভালো হয় না। একদিন সঙ্ঘ-ভোজনে পরিবেশন করিতে গিয়া সর্বাগ্রে পায়স দিয়া ফেলিলেন; একদিন একজন রোগীকে ঔষধ সেবন করাইয়া আসিলেন, পরদিন পথ্য দিতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্বে পথ্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল না। মনে পড়িলেই দৌড়িয়া গেলেন, গিয়া দেখেন, রোগী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য কিছু খাবার লইয়া যাইতে যাইতে এক পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। মনে হইল একদিন কুণাল ও তিনি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন; আবার সেই পূর্ব কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, গয়াশীর্ষ পর্বতের বাঘ শিকার হইতে সকল কথা মনে পড়িল। দাঁড়াইয়া একমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন— আত্ম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া উঠিলেন, খাবার-গুলি চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

কাঞ্চন দেখিলেন, এরূপ মনে গৃহে বাস আর সংগত নয়। যে কাজে উৎসাহ নাই সে কাজ করিতে নাই। যেখানে থাকিলে মনের স্ফূর্তি হয় না, সেখানে থাকিতে নাই। সাত-পাঁচ ভাবিয়া কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিলেন। একদিন ঘোরা দ্বিপ্রহরা নিবিড়-গাঢ় তমস্বিনী রাত্রিতে পতি-অন্বেষিণী কাঞ্চনমালা আপন কুটিরে বসনভূষণ পরিত্যাগ

করিলেন ; শাক্য ভিক্ষুকী সাজিলেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন, স্বহস্তে আপাদলুণ্ঠিত কেশরাশি ছেদন করিলেন। কতগুলা ধুলাকাদা মাখিয়া সে তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণের হীনতা সম্পাদন করিলেন। ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন ; ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন ; করিয়া অনন্ত পিচ্ছিল অন্ধকার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিলেন।

২

পাটলিপুত্র হইতে তক্ষশিলা যে অনেক দূর। একখানি চিঠি আসিতে একমাস লাগে : একা কাঞ্চন এতদূর কি করিয়া যাইবে ? কিন্তু কাঞ্চন ঋষিকন্যা, পর্বত তাঁহার জন্মভূমি ; সে রাজপুরীর সুখকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে। রাজপুরীতে পাখিরা প্রাণ খুলিয়া গান গাইতে পারে না। যে বায়ু পর্বত-শীর্ষে প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া দেয়, সে বায়ু রাজবাড়িতে পাওয়া যায় না। রাজবাড়িতে প্রাণ খুলিয়া কথা কহারই জো নাই ; সুতরাং কাঞ্চনের পক্ষে রাজবাড়িই কষ্টকর ; পথশ্রম তাঁহার পক্ষে কষ্টকর নহে। কিন্তু এবার পথ চলিতে গিয়া কাঞ্চন বুঝিতে পারিল যে, সেকালের পথ চলায় আর একালের পথ চলায় অনেক তফাত। এখন ভাবনার ভারে মন পীড়িত, পথ যেন বড়ো লম্বা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পা যেন উঠিতেছে না বোধ হইতে লাগিল। তিনি অন্য লোক অপেক্ষা অনেক দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তথাপি তাঁহার মন উঠিল না। পাছে রাজপথে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি সে পথে গেলেন না। রাজপথ বাঁকিয়া গিয়াছে, মগধ সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরগুলি ঐ একটি রাস্তার ধারে, সুতরাং সে পথে যাইতে গেলে অনেক দেরি হইবে ভাবিয়া কাঞ্চন গ্রাম্যপথ আশ্রয় করিলেন। কখনো মাঠের উপর দিয়া, কখনো বনের মধ্য দিয়া, কখনো গ্রামের ভিতর দিয়া, কখনো বড়ো বড়ো নদী সন্তরণ করিয়া, পতিগতপ্রাণা পতির অন্বেষণে গমন করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে পতির রূপ অঙ্কিত, পতির ভাবনায় পথের ক্লেশ অনুভব হইল না। একদিন সরযূতীরে বহু-সংখ্যক লোক সংগ্রহ হইল, দেখিল, মধ্যাহ্ন, সূর্যকিরণে দীপ্যমান মূর্তি দেবতা বা গন্ধর্ব বা বিদ্যাধর সকলের সম্মুখে সরযূজলে ঝাঁপ দিল ; সরযূ তখন উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-পরিপ্লুত মৃত্যুর

দন্তাবলীর মতো বঙ্কুর। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িল, কেহ কেহ নৌকা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সে দেব না মানুষ হাত তুলিয়া বারণ করিল এবং "ধর্মং শরণং গচ্ছামি". "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি". "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিতে বলিতে বক্ষোভরে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া অবিরল ঘূর্ণ্যমান হস্তদ্বয়ের দ্বারা নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া অল্পক্ষণেই নদীর অপর পারে পঁহুছিল। তাহার পর সেই আর্দ্র বস্ত্রে পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৩

একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অহিচ্ছত্রের লোক সহসা জাগরিত হইয়া শুনিল, স্বরলহরীতে আকাশ পাতাল পরিপূর্ণ করিয়া গাথা গান করিতে করিতে কে রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতেছে। কেহ বলিল নগরের অধিষ্ঠাত্রী, কেহ বলিল বিদ্যাধরী।

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় মদিপুরার লোকে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহা কোলাহল করিতেছে, একটি বালক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, কেহ তুলিতে পারিতেছে না। তাহার পিতামাতা হাত-পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে। কেহ সান্ত্বনা করিতেছে, কেহ ক্রন্দন করিতেছে, কেহ ডুবারি ডাকিতে যাইতেছে। এমন সময়ে সহসা আশ্চর্য হইয়া তাহারা দেখিল. 'জয় ধর্ম' 'জয় সঙ্ঘ' 'জয় বুদ্ধ' ধ্বনি করিয়া এক রক্তাম্বরী-দেবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কাহাকে কোনো কথা বলিলেন না, জল-মধ্যে ঝাঁপ দিলেন, ডুবিলেন, কিয়ৎপরে জল যেমন ছিল তেমনি হইল। তাহার গর্ভে যে দুইটা মানুষ আছে তাহার কোনো চিহ্ন রহিল না। সকলে ভাবিল কোনো যক্ষ বালককে লইয়া পাতালপুরী প্রবেশ করিল। ও মা!! অল্পক্ষণে বালককোলে দেবী জলোপরি ভাসমান হইলেন, বালক মূর্ছিত অচেতন। তাহার বাপ মা দৌড়িয়া বালক কোলে লইতে আসিল। দেবী দুই পা ধরিয়া বালককে ঘুরাইতে লাগিলেন, লোকে বিস্মিত হইল ; পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেল ; কিন্তু মানুষের সাধ্য কি দেবীর বল রোধ করিতে পারে? কয়েক মুহূর্ত পরে দেবী মাতার ক্রোড়ে সন্তান দিলেন। সন্তান মাতৃক্রোড়ে হাসিতে লাগিল। সকল লোকে ছেলের মা

বাপের জন্য আহ্লাদ করিতে লাগিল। এ দিকে দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন।

৪

ক্রমে কাঞ্চনমালা মাণিক্যালা আসিয়া পোঁছিলেন। মাণিক্যালা পার হইয়াই বিদ্রোহী দেশ। কাঞ্চন মাণিক্যালার প্রধান মঠে একরাত্রি অবস্থান করিলেন। সমস্ত দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং প্রাতঃকালে ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে বিদ্রোহী রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই-তিন দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শতদ্রু নদী পার হইয়া তিন-চারি ক্রোশ যাইয়া তিনি দেখিলেন, এক স্থানে বহু-সংখ্যক সেনা সমবেত হইয়াছে। কাঞ্চনমালা সৈন্য দেখিয়া অন্য পথে যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন, কিয়ৎ দূর গিয়া ক্রমে শালবনে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর যাইতে-না-যাইতেই তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দেখিলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ যাহার মধ্যে সূর্য-রশ্মি কখনো প্রবেশ করিতে পায় না। সেই নিবিড় অন্ধকার-মধ্যে দেখিলেন কোথাও কতকগুলা কম্বল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা ভাঙা ডাল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা ভাঙা হাঁড়ি রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা কাঠ রাশি করা রহিয়াছে; কিন্তু সব ঝোপের মধ্যে লুকানো; কোথাও একটি মনুষ্য নাই। চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন কোথাও একটি মনুষ্য নাই। পশ্চাৎ ভাগে অনেক দূরে বোধ হইল একটা কি আসিতেছে, ঠিক স্থির করিয়া বুঝিতে পারিলেন না মানুষ কি জানোয়ার। তিনি সত্বর পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়ৎ দূর গেলেই একটা বিকটধ্বনি শুনিতে পাইলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলেন কয়েকজন প্রকাণ্ডকায় অশ্বারোহী কতকগুলি গুনে গোরু বেড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইয়াই তিনি বৃক্ষান্তরাল দিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার সমস্ত বনভূমি কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ হইল; আর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে দুইটি, একটি, তিনটি করিয়া বহু-সংখ্যক লোকে কানন ব্যাপ্ত হইল। কাঞ্চন যে দিকে চাহেন, দেখেন রণবেশ। ব্রাহ্মণ সেনা, প্রকাণ্ড বলবান, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কার শরীর; কাহারো যজ্ঞোপবীত আছে,

কাহারো নাই। বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া সকলে অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবিত হইল, বোধ হয়, অশ্বারোহীগণ ইহাদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। দেখিয়া কাঞ্চন রক্তাম্বরখানি বিলক্ষণরূপে মুড়ি দিয়া একটি বৃক্ষের দুইটি শিকড়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু বহু-সংখ্যক দুষ্টস্বভাব সৈনিক বৃক্ষের উপর হইতে অসামান্য রূপ-লাবণ্য-বতী একটি রমণীকে কানন-মধ্যে একাকী দেখিয়াছিল। দেখিয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কি করে? অশ্বারোহীগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্বে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার নিষেধ ছিল। সুতরাং এতক্ষণ তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা সুন্দরী কোথায় গেল, খোঁজ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ খুঁজিতে হইল না। সন্ধান করিয়া, সন্ধান করিয়া, বৃক্ষমূলে রক্তাম্বর দেখিয়া তদভিমুখে সাত-আট জন ধাবিত হইল। যখন কাঞ্চন দেখিলেন, লুকানো আর থাকা গেল না, তখন তিনি সত্বর বৃক্ষারোহণ করিলেন। বৃক্ষের শাখায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি পতি-অন্বেষণে বহুদূর হইতে আসিতেছি, আমার পতি তক্ষশিলায় বন্দী আছেন, আমি তথায় যাইব, আমায় বাধা দিও না।

একজন সৈনিক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, ততদূর যাইতে হইবে না, এই স্থানেই পতিলাভ করিবে। আর-একজন বলিল, পতির অন্বেষণে না উপ-পতির? দুই-তিন জন সত্বর বৃক্ষ আরোহণ করিতে লাগিল; কাঞ্চন বলিল, বৃক্ষে উঠিও না, এক পদাঘাতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিব। সকলে হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু যে সর্বাপেক্ষা উহার নিকট-বর্তী হইয়াছিল, তিনি উহাকে এমন দারুণ পদাঘাত করিলেন যে সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়িল। বহু-সংখ্যক লোক বৃক্ষতলে সমবেত হইল। তখন সকলে কি করা যায় পরামর্শ করিতে লাগিল, আর-কাহারো সাহস হইল না যে বৃক্ষে আরোহণ করে। কেহ বলিতে লাগিল প্রেতিনী, কেহ বলিল দেবী, কেহ বলিল উহাকে ছাড়িয়া দাও, কেহ বলিল ও পতি-অন্বেষণে আসিয়াছে উহাকে দুই-একটা পতি দিয়া দিতে হইবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দুষ্ট

হইল, দূরে সংগৃহীত কাষ্ঠ কম্বলাদি জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন বনরাশিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ অগাধ ধূমরাশিতে কাননাভ্যন্তর গাঢ়তর অন্ধকার হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যে স্থানে অশ্বারোহীগণ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর খাদ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে প্রচণ্ড পাবকরাশি পরিদৃশ্যমান হইল। সেনাপতি বারংবার তূর্যধ্বনি করিতে লাগিলেন ; বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিদেব, সৈনিকদিগের প্রাণভূত অন্নরাশি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন বৃক্ষতলস্থ সকলেই আহার্য দ্রব্যরাশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল কাঞ্চন যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ও আর-একজন বিকটাকৃতি লোক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল, এবং ঘন ঘন বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের কি অভিসন্ধি ছিল বলিতে পারি না ; কিন্তু যতদূর অনুমান করা যায় অভিসন্ধি ভালো ছিল না। কাঞ্চন একবার মনে করিলেন নামি, আবার ভাবিলেন, এরূপ দুর্দান্ত লোকের হাতে পড়া ভালো নয়, ভাবিয়া তিনি বৃক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কিছু উপায় আছে কিনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঞ্চনের উপায় ভগবান্ আপনি করিয়া দিলেন। কাঞ্চন বৃক্ষোপরি উঠিয়া দেখিলেন, অরণ্যানী পরিবেষ্টন করিয়া বহু-সংখ্যক অশ্বারোহী প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইতেছে, সূর্য-কিরণে তাহাদের বর্ম, উষ্ণীষ, কবচাদি জ্বলিতেছে ; তীক্ষ্ণধার বর্শা-অগ্রে অপরাহ্ণ-সূর্য-কিরণ প্রতিফলিত, শীর্ণ, বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘুরিয়া বন-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কাঞ্চন যে বৃক্ষে আছেন তাহার নিকট দিয়া ব্রাহ্মণ সেনার পশ্চাৎ ভাগে আক্রমণ করিল। যাইবার সময়ে একজন বৃক্ষতলস্থ যোধবেশী ব্রাহ্মণ সৈন্যদ্বয়ের পৃষ্ঠে বর্শাঘাত করিল, তাহারা উভয়েই তরবারি নিষ্কাশন করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল ; কিন্তু তিন-চারিটি বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উভয়েই ধরাশায়ী হইল। ওদিকে ব্রাহ্মণ সৈন্যগণ সম্মুখে প্রচণ্ড অগ্নি, পশ্চাতে প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। কিন্তু তাহারা বীর— যুদ্ধে পরাজিত হইবার লোক নয়— অগ্নিদেবকে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার পূর্বক সকলে সম্মুখ ফিরিয়া অশ্বারোহীদিগকে যুদ্ধার্থ

আহ্বান করিল। তখন অশ্বে অশ্বে, অশ্বে পদাতিকে, প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাঞ্চন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। গাঢ় ধূমান্ধকারে ভালো করিয়া দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু শুনিতে লাগিলেন হ্রেষারব করিয়া— অশ্ব পড়িতেছে, বিকট হুংকার করিয়া— মনুষ্য মরিতেছে, অগ্নি-মধ্যে মনুষ্যদেহ অশ্বদেহ পুড়িতেছে— কেহই পলাইতেছে না।

কাঞ্চন এ দৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষু ফিরাইলেন; দেখিলেন যে-দুই জন লোকের ভয়ে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাহারা ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। আসিয়া দেখেন উভয়েই মুমূর্ষু; দেখিলেন বর্শাফলক তাহার বক্ষোদেশে বিদ্ধ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে। কাঞ্চন নিকটবর্তী হইলে, সে কষ্টে ক্ষীণ হস্ত জোড় করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল— দেবী ক্ষমা— তাহার আর কথা কহিতে হইল না। কাঞ্চন একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র হইতে বর্শাফলক তুলিয়া লইলে সে বাঁচিতে পারে। তৎক্ষণাৎ কাঞ্চন ধীরে ধীরে বর্শাফলক উত্তোলন করিলেন, প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল। কাঞ্চন নিজ রক্তাম্বরের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষতমুখে অর্পণ করিলেন; সম্মুখে জল ছিল না, ক্ষতমুখে ধূলিমুষ্টি প্রদান করিলেন এবং নিকটে যে-সকল লতাপাতা ছিল তাহার রস নিঙ্‌ড়াইয়া ক্ষতমুখে দিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অশ্বতর আরোহণ করিয়া এবং উষ্ট্র ও গর্দভের পৃষ্ঠে কি কতকগুলা বোঝাই দিয়া কতকগুলা লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একজন আকারপ্রকারে বোধ হইল দলাধিপতি। দেখিলেন দুইটা মানব মৃতপ্রায়: দেখিয়া দলস্থগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন। তখন কাঞ্চন কতকগুলা লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতেছেন, সেও অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া গাধার বোঝা নামাইল এবং তাহার মধ্য হইতে কি একটি ঔষধ লইয়া রোগীর সর্বাঙ্গে দিল। তখন রোগীর চৈতন্য হইল, সে সম্মুখে কাঞ্চন-মালাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি!" আগন্তুক কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা

করিল, “ইনি তোমার কে হন ?” রোগী অমনি বলিয়া উঠিল, “আমি উহার পরম শত্রু।” আগন্তুক আবার কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল, “শত্রুর সেবা করিতেছ কেন ?” কাঞ্চন বলিল, “উহার যন্ত্রণা দেখিয়া সে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।”

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দুইবার বলিয়া উঠিল, “গুরুদেব ! গুরুদেব !” কাঞ্চন বলিল, “তোমার গুরুদেব কে ?” সে বলিল, “জানি না তিনি কে। আমি পূর্বে চণ্ডাল ছিলাম ; তক্ষশিলা নগরে জল্লাদের কর্ম করিতাম। একদিন শাসনকর্তা আমাকে ও আর-একজন জল্লাদকে এক নির্জন ভূগর্ভস্থ ঘরে লইয়া গিয়া একজন ঋষির চক্ষু উৎপাটন করিতে বলিলেন। আমার সঙ্গী চক্ষু উৎপাটন করিল। কিন্তু আমি দেখিলাম ঋষি চক্ষু উৎপাটনে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেও ঐ কথাই বলিলেন। আজি আবার তোমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর কতবার তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা কোথায় যে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে খুঁজিয়া পাই নাই। তদবধি আমি আমার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা করিয়া বেড়াই। এই যে কয়েকজন লোক আসিয়াছিল ইহারা সকলেই চণ্ডাল —সকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়াছে।”

কাঞ্চন যতক্ষণ চণ্ডালের কথা শুনিতেছিলেন তাঁহার মন বড়োই ব্যাকুল হইতেছিল। এক-একবার সেই দিনের স্বপ্নের কথা মনে হইতেছিল। তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইতেছিল যে এ কুণাল ভিন্ন আর-কেহ নহে। চণ্ডালের কথা শেষ হইতে-না-হইতে তিনি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, “মহোত্তর ! তোমার গুরুদেবকে একবার দেখাইতে পার ?” সে বলিল, “দেখিতে পাইলে আমিই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতাম।”

কাঞ্চন বলিল, “তুমি আমার দুঃখে কাতর হইলে, তাই তোমায় বলিতেছি আমার স্বামী এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন। তিনি মহারানীর সেনাপতি ছিলেন। তোমার গুরুদেবকে পাইলে আমার স্বামীর অন্তত সন্ধান পাওয়া যায়। তোমার কথায় বোধ হইতেছে তিনিও পাটলিপুত্র হইতে আসিয়াছিলেন।”

এই সময়ে রোগী চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমরা দুই জনে আমার প্রাণ দিয়াছ, তোমাদের একটা কথা বলি। আমায় একদিন (পার্শ্বে দেখাইয়া দিয়া) এই মৃত চণ্ডাল দুইটি চক্ষু দিয়া বাসুকিশীল পাঠাইয়াছিল। আমি আর কিছু জানি না। এই সকল জানি।"

তখন বৌদ্ধ চণ্ডাল হিন্দু চণ্ডালের কাছে গিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ! এই সেই, এই চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল।" বলিয়াই সে চণ্ডালের গাত্রবস্ত্র-মধ্যে হস্ত পূরিয়া দিল; দিয়া কিছুই পাইল না; কেবল এক সংকেতের মোহর পাইল। সে কাঞ্চনকে বলিল, "চলো গুরুদেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়া দিব। কারাগৃহে যাইবার উপায় করিয়াছি। সেই কারায় তিনি নিশ্চয়ই আছেন।"

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মোহর পাইয়া বৌদ্ধ চণ্ডাল যুদ্ধস্থলে গেল। তথায় স্বদলবলের উপর আহত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সৈন্যের শুশ্রূষার ভার দিয়া সে কাঞ্চনকে সঙ্গে লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল।

তক্ষশিলার অবস্থা এখন বড়ো শোচনীয়। অশোকের রাজ্য অনেক দিন লোপ হইয়াছে। বার বার যুদ্ধে নগরের বড়ো বড়ো পরিবার বিধবার পুরী হইয়া উঠিয়াছে। রাজবাড়িতে লোক অতি অল্প। সমস্ত বিদ্রোহী পল্টন অশোক সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, সীমা-প্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছে। নগররক্ষী সেনাও কেহ যুদ্ধের জন্য, কেহ লুঠের জন্য, নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদের উৎপাতে নগরবাসীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। নগরের বড়ো লোকে ছোটো লোকের উপর উৎপাত করিতেছে। ছোটো লোকে একজোট হইয়া বড়ো লোকের বাড়ি লুঠ করিতেছে, কোথাও শৃঙ্খলা নাই।

তাঁহারা দুই জনে অতি কষ্টে কারাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যদিও বিদ্রোহীদিগের জন্য কারাগৃহ, তথাপি তাহাতে অধিক পাহারা নাই। যাহাও দুই-চারি জন আছে, তাহারা দ্বারের পার্শ্বে একটা ছোটো ঘরে কি একটা গোলযোগ করিতেছে, বোধ হইল। কি যেন একটা ভাগ লইয়া গণ্ডগোল করিতেছে। বৌদ্ধ চণ্ডাল পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বেশ ধরিয়া গিয়াছে। গিয়া মোহর দেখাইল। একজন বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি চাও ?"

"রাজার হুকুম তামিল করিতে চাই।"

"আজ কয় জন ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"তিন জন।"

"সব ক'টা একেবারে সারো না।"

"রাজার হুকুম।" তখন ভিতর হইতে একজন বলিল, "কি হে বাহিরে গোল করিতেছ, এখানকার কাজটা সারিয়া যাও না।"

"দাঁড়াও হে, সরকারি কাজ।"

"আর পাঁচ-সাত দিনেই সরকারি কাজ বাহির হইবে। এই যোগে কিছু করে লও।"

তখন পাহারাওয়ালা এক থোলো চাবি লইয়া বলিল, "আমরা আর ভিতরে যাইতে পারি না। তুমিও তো সরকারী চাকর— যাও— চাবিটা আমাদের দিয়া যাইও।"

স্বচ্ছন্দে একজন অপরিচিত লোককে চাবি দিয়া শাস্ত্রীরা লুঠের টাকা ভাগ করিতে বসিল। উহার সঙ্গে যে কাঞ্চনমালাও গেল তাহা দেখিলও না। উহারা দুই জনে প্রবেশ করিলে, কাঞ্চনমালা শিহরিয়া উঠিলেন— দেখিলেন ঘোর অন্ধকার— ছুঁচা, ইঁদুর ও চামচিকার আড্ডা— দুই হাত অন্তরে বস্তু দেখা যায় না। পথ দেখা যায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দ্বার দেখিতে লাগিলেন। দ্বার দেখিয়াই চাবি খুঁজিয়া দ্বার খুলিলেন, দেখেন ঘরটি অতি ছোটো; একজন কষ্টে থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে একটি লোক। ঘরে বিছানা নাই, খাবার জল নাই। কেবল কয়েদীর লোটাটি মাত্র রহিয়াছে। যাইবামাত্র কয়েদী বলিল, "আমায় মারিয়া ফেলো; জলতৃষ্ণায় প্রাণ যায়, একটু জল পর্যন্ত পাই না। যদি খুন করিতে হয়, একেবারে করো-না কেন? দগ্ধাও কেন?"

কাঞ্চন বৌদ্ধ চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাগারে এত কষ্ট?"

কাঞ্চনের স্বরে কয়েদী একটু উন্মনা হইল। চণ্ডাল বলিল, "কয়েদী ভাই! আমরা তোমাদের শত্রু নহি; তোমাদের বন্ধু, আমরা বৌদ্ধ। সত্বর তোমাদের উদ্ধার করিব। বলিতে পার, কুণাল নামে রাজপুত্র কোথায়?"

"কুণাল কোথায়? সর্বপ্রথম তাহাকে বন্দী করিয়াছে। কোথায় কিরূপ অবস্থায় রাখিয়াছে জানি না, তিনি আছেন কি না তাহাও জানি না।"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"এখানে তোমরা কে কে আছ ?"

"কেমন করিয়া জানিব ? আমি এই ঘরে আছি এইমাত্র জানি। যখন বড়ো কষ্ট হয় এক-একবার চীৎকার করি. পাশের ঘর হইতেও কে চীৎকার করে— ভ্যাঙায় কি জবাব দেয় জানি না— মানুষের কথা শুনিতে পাই না— প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।"

"তোমরা খাও কি ?"

"আগে শান্ত্রীরা খাবার দিত, এখন সাত-আট দিন দেয় না। ঐ উচ্চে ছোটো গবাক্ষটি দেখিতেছ, ঐ দিয়া কে দুইখানি করিয়া রুটি দেয়. কখনো দিনে দেয়, কখনো রাত্রে দেয়, তাই খাই। জল পাই না, কখনো ঘাম খাই. কখনো কখনো প্রস্রাব খাইতে যাই. কিন্তু সে দুর্গন্ধে প্রাণ বাহির হয়।"

কাঞ্চন কহিল—

"তবে ইহাদের একটু জল আনিয়া দিই।"

চণ্ডাল বলিল—

"মা. এমন কর্ম করিবেন না। আমিই ইহাদের উদ্ধার করিব।"

কয়েদী জিজ্ঞাসা করিল—

"মা ! আপনি স্ত্রীলোক ? আপনি কে ? মনে হয় পাটলিপুত্রে আমার পীড়ার সময় শিয়রে বসিয়া দুগ্ধ পান করাইতেন. স্বরে বোধ হয় আপনি সেই।"

"আমিও তোমার মতো বিপদগ্রস্ত।"

কয়েদী বলিয়া উঠিল—

"বুঝিয়াছি— কুণালের কথা জিজ্ঞাসা করাতেই বুঝিয়াছি, যখন আপনি আসিয়াছেন, আমাদের নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে।"

চণ্ডাল তখন আপনি জল আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যদি আসিতে না দেয়। বিশেষ একটুকু টের পাইলে ইহারা নিশ্চয় কাটিয়া ফেলিবে।

কয়েদীকে বলিল—

"কেমন হে— এখন তোমার গায়ে জোর আছে, আমাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিবে ?"

"জোর কি সবে সাত-আট দিনে যায় ? এখনো উদ্ধারের ভরসা

পাইলে দশ হস্তীর বল ধরিতে পারি। এখন কি করিতে হবে বলো।"

"কারাগারের সব ঘরের দরজা খুলিয়া দিতে হইবে।"

"এখনি"— বলিয়াই কয়েদী হর্ষে জয়ধ্বনি করিল। অমনি পার্শ্বস্থ তিন-চারিটি ঘর হইতে শব্দ হইল "জয়"।

শান্ত্রীরা বলিয়া উঠিল—

"শালারা আচ্ছা গোল করে।" বলিয়া আবার লুঠের টাকা গণিতে বসিল।

২

একজনকে উদ্ধার করিয়া তিন জন হইল। আর-একজনকে উদ্ধার করিয়া চারি জন হইল। ক্রমে পাঁচ ছয় সাত আট জন হইল। তখন চাবির থোলো ছিঁড়িয়া সকলের হাতে দেওয়া হইল, যে যে-ঘর পাও খুলিয়া দাও। ক্রমে সেই গাঢ় অন্ধকার গৃহসমূহ হইতে ১৫০ জন বৌদ্ধবীর বহির্গত হইল। তখন সমবেত কয়েদীগণ কাঞ্চনমালা দেবী তাহাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন জানিয়া আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শান্ত্রীরা এখনো কি করিতেছিল, এবারকার জয়ধ্বনিতে তাহাদের বড়ো ভয় হইল। তাহারা বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল সমস্ত কয়েদীবা ঘর খুলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে দ্বারের দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা প্রমাদ গণিয়া যাহা সম্মুখে পাইল লইয়া পলায়ন করিল। কতক ভাগ হইয়াছিল, কতক হয় নাই, কতক লইতে পারিল, কতক পড়িয়া রহিল, শান্ত্রীরা পলায়ন করিল। তখন কাঞ্চন কয়েদীদিগকে আহার ও জল দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সকলে শান্ত্রীদিগের ভাণ্ডার হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিল। কাঞ্চন পাক করিয়া স্বহস্তে সমস্ত লোকদিগকে খাওয়াইলেন।

আহারান্তে তাহারা বিশ্রাম করিলে কাঞ্চন তাহাদের নিকট হইতে কুণালের সংবাদ সংগ্রহ করিতে গেলেন। কেহই সংবাদ বলিতে পারিল না।

কুণালকে কুঞ্জরকর্ণ রানীর গুপ্ত আদেশ জানাইবার জন্য লইয়া গেল, তাহার পর আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুণালের সংবাদ

না পাওয়া গেলে সৈন্যরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন নানা কৌশলে অসন্তুষ্ট সেনাপতিদিগকে কারারুদ্ধ করিল। কাহাকেও বলিল মহারানীর আদেশ ; কাহাকেও রাজসভা হইতে কারাগারে পাঠাইল ; কাহাকেও যুদ্ধে জয় করিয়া কারারুদ্ধ করিল। এইরূপে কতক মারিয়া ফেলিয়াছে। অবশিষ্ট এই কারাগারে ছিল. কাঞ্চন দেবী উদ্ধার করিলেন।

কাঞ্চন স্বামীর কোনো সন্ধান পাইলেন না। তিনি তখন কয়েদী-দিগের মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে উহাদিগের ভার দিলেন। বলিলেন—

"আমি এইখানেই স্বামীর অন্বেষণের জন্য রহিলাম। তোমরা যেরূপে পার আত্মরক্ষা করো।"

তখন চণ্ডালের আদেশমতো সকলে এক পরামর্শ করিল ; তাহারা বলিল—

"এখানে বসিয়া আত্মরক্ষা অসম্ভব ; আইস আমরা আত্মরক্ষা না করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করি।"

কারাগার রাজবাটীর অতি সন্নিকট। তাহারা সকলে একত্রে এক-রাত্রের মধ্যে কারাগার হইতে রাজবাটী পর্যন্ত একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে ৫০ জন সুড়ঙ্গপথে রাজবাড়ির উঠানে গিয়া উঠিল এবং আর ৫০ জন রাজবাড়ির দ্বারদেশ আক্রমণ করিল। রক্ষী অধিক ছিল না. ত্বরায় রাজবাটী দখল হইয়া গেল, তখন কারাগার ত্যাগ করিয়া উহারা রাজবাটীতে বাস করিল। রাজবাটীর ভাণ্ডার উহাদের হস্তগত হইল। উহারা অশোকের নামে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা চিরদিন গোলযোগে বড়ো বিরক্ত হইয়াছিল. তাহারা উহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অশোকের সৈন্যের মধ্যে যাহারা আশেপাশে লুঠিয়া খাইতেছিল তাহারা যোগ দিল। উহাদের অনেক লোক সহায় হইল। অল্পদিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, অশোক কুঞ্জরকর্ণকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। সে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার অন্বেষণে অশোক রাজা এক জন [ দল ] সেন্য পাঠাইয়াছেন। বিদ্রোহীরা সেনাপতিশূন্য হইয়া পলাইয়া তক্ষশিলায় আসিতেছিল, দেখিল রাজবাটীতে ও দুর্গে

অশোকের পতাকা দুলিতেছে। তাহারা নিরুপায় হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইল।

বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল, আসিয়া একত্রিত হইল। কেবল দুই জনের সন্ধান পাওয়া গেল না। কুণাল কোথায় কেহ বলিতে পারিল না। আর যে প্রত্যহ কারাগারে রুটি ফেলিয়া যাইত তাহারো সন্ধান পাওয়া গেল না। কাঞ্চন হাসিতে হাসিতে একদিন বলিলেন যে, এ বৌদ্ধ চণ্ডালের কর্ম।

সে বার বার বলিল—

"এরূপ কাজ করা আমার স্বপ্নের অগোচর।"

সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। অশোক সসৈন্যে শীঘ্র তক্ষশিলা আসিবেন শুনা গেল। কিন্তু কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। স্বামীর কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না। তিনি নানা উপায়ে, যে সকল গোপনস্থানে বন্দীভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই-একজন প্রধান বৌদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে চণ্ডালের সহিত একখণ্ড নিবিড় বনভূমির মধ্য দিয়া আসিতেছেন, চণ্ডালের সঙ্গে অনেক কথা কহিতেছেন, তাহাকে অনেক ইতিহাস, অনেক ধর্মের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কাঞ্চন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কান দুটি খাঁড়া করিয়া যেন একমনে কি শুনিতে লাগিলেন।

চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল—

"কি ও?"

কাঞ্চন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সংকেত করিয়া বলিলেন—

"থামো।"

সে আশ্চর্য হইয়া কাঞ্চনের মুখপানে চাহিয়া অনেকক্ষণ রহিল।

আধ ঘণ্টার পর কাঞ্চন বলিলেন—

"কুণাল এইখানে আছেন।"

চণ্ডাল বলিল—

"কেমন করিয়া জানিলে?"

কাঞ্চন কহিলেন—

"শুনিতেছ না সেই স্বর— ও যে আমি বেশ চিনি।"

"কই স্বর ?"

"শুনিতেছ না ? আমার কর্ণ ভরিয়া যাইতেছে, ও স্বর আমার বেশ জানা আছে ; এখনো শুনিতেছ না ? আমার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে, আমি আর দাঁড়াইব না।"

"আইস" বলিয়া কাঞ্চনমালা স্বর লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি ধাবমান হইলেন। লতারাজি ছিন্নভিন্ন করিয়া, কণ্টকরাশির মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ভয় তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া, কাঞ্চন বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া এক কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "এই আসিয়াছি নাথ!" বলিয়া লাফ দিয়া সেই কূপে পড়িলেন।

চণ্ডালও আশ্চর্য হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কূপের নিকটে গিয়া শুনিল, "ধর্মং শরণং গচ্ছামি", "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি", "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি", শব্দ বাহির হইতেছে।

সে দেখিল কুণাল সর্ব-ধর্ম-মমতাবিপশ্চিৎ নামক সমাধিবলে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছেন। কাঞ্চনও কূপতলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মূর্ছিতবৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন।

## ৩

তখন চণ্ডাল উভয়কে স্কন্ধে করিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিল। উভয়েই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অনেক-ক্ষণ পরে কাঞ্চনের চৈতন্য হইল। কুণালের চৈতন্য হইল না। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কেবল ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম বাহির হইতে লাগিল ; প্রভাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি কাঞ্চনের স্পর্শ অনুভব করিলেন।

কুণাল বলিলেন—

"কাঞ্চন! তুমি এত দূর কেমন করে আসিলে ?"

কাঞ্চন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি চাহিয়া দেখেন, কুণালের চক্ষুর বিবরে চক্ষু নাই। তিনি বলিলেন— "একি ?"

"কাঞ্চন, চক্ষু না থাকায়ই আমি সমাধি করিতে পারিয়াছি। নইলে পারিতাম না।"

চণ্ডাল কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল—

"নগরে গেলে হইত না ?" তাহাতে কুণাল বলিলেন—

"আর নগরে কাজ কি ? আমি এইখানেই অবস্থান করিব। তাহাতে সমাধির বিঘ্ন হইবে না।"

তখন চণ্ডাল চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, লতাপাতায় কূপ ও তাহার চারি দিকে অতি সুন্দর স্থান হইয়াছে, কে যেন একখানি চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া সে আরো আশ্চর্য হইয়া গেল।

চণ্ডাল তখন নগর-মধ্যে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য প্রস্থান করিল, কুণাল ও কাঞ্চন নানা কথায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

## ৪

ক্রমে দুইটি একটি করিয়া লোক সংগ্রহ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত বৌদ্ধগণ আসিয়া জুটিল। অশোক রাজা রাত্রিতে তক্ষশিলায় আসিয়া পুত্রবধূর গুণে দেশে শান্তির আবির্ভাব দেখিয়া বড়োই আনন্দিত হইলেন। আজি পুত্রের সমাধি সফল হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত লোকজন সঙ্গে বন-মধ্যে উপস্থিত হইলেন। কুণাল তখন উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের অবদানসমূহের কথা বলিয়া সমবেত লোকসঙ্ঘকে মোহিনীমুগ্ধবৎ করিতে লাগিলেন।

রাজা অশোক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে এই সুধাময় কথা শুনিতে-ছিলেন। পরে আর আনন্দ রাখিতে স্থান না পাইয়া বক্তৃতার সময়েই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কুণাল সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার করিলেন। বহুকালের পর মিলনে উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। তখন অশোক টের পাইলেন যে কুণালের চক্ষু নাই।

অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কুণাল, তোমার এ দশা কে করিল ?"

কুণাল কোনো কথা বলিলেন না। কেবল বলিলেন—

"চক্ষু থাকিলে সমাধি হইত না।"

বন-মধ্যে সকলে এইভাবে আছেন, এমন সময় কুঞ্জরকর্ণকে ধরিয়া

কতকগুলি সৈন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অশোক রাজা এই-খানে আছেন, শুনিয়া উহাকে লইয়া অশোক রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। হস্তে ও পদে শৃঙ্খলবদ্ধ, চারি জন সৈনিক উহাকে লইয়া অশোকের নিকট উপস্থিত করিল।

তিষ্যরক্ষা যে চক্ষু মর্দন করিয়াছিল, তদবধি রাজার মনটা অত্যন্ত সন্দেহাকুল ছিল। কাহার চক্ষু কে পাঠাইল ইত্যাদি। আজি তাঁহার চক্ষু ফুটিল, তিনি কুঞ্জরকর্ণকে রোষভরে বলিলেন—

"নরাধম! তুই আমার পুত্রের চক্ষু উপড়াইয়াছিস?"

তখন কুঞ্জরকর্ণ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল—

"সেনাপতি অশোক! আমি তোমার হাতে আর দয়া প্রার্থনা করি না। তুমি যতদিন স্বধর্মে ছিলে, আমি তোমার ভৃত্য ছিলাম। তুমি ধর্মত্যাগ করিলে আমি তোমার শত্রু হইয়াছি। বিধিমতে তোমার শত্রুতা করিয়াছি। কখনো বৌদ্ধদের সঙ্গে একটি সত্য কথা বলি নাই। আজি আমার শেষ দিন, আজি তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলিব। ধর্মের ভয়ে বলিব তাহা নহে; বিধর্মীর কাছে মিথ্যা বলিব তাহাতে আবার অধর্ম কি? আমি সত্য বলিব, কারণ তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে। যাহাকে তুমি এত ভালোবাস, যাহাকে তুমি রাজ্যেশ্বরী করিয়াছ— সে ভ্রষ্টা, সেই তোমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে সে হিন্দু। তোমার দীক্ষার সময়ে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সেই আমায় উদ্ধার করে, সেই আমায় বিদ্রোহী হইতে বলে, আমি কুণালের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দী হইলে সে-ই বন্দিত্ব মোচন করিয়া আমায় রাজত্ব প্রদান করে। এখনো সে রাজ্যেশ্বরী; এখনো তোমার উপর হুকুম আনাইতে পারি যে, তুমি আমার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তক্ষশিলায় রাজা করিবে, কিন্তু তাহার আর জ্ঞান নাই। সে এখন পাগল হইয়াছে, তাই পারি নাই। আমার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে, নহিলে তুমি আমায় ধরিতেও পারিতে না। আমি এইখান হইতে গিয়া তোমার পাটলিপুত্রে যাওয়া বন্ধ করিতাম।"

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অবাক হইয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

কুঞ্জরকর্ণ তখন বলিল—

"আমার প্রতি কি শাস্তি দিবে ?"

"যতদিন তিষ্যরক্ষার অধিকার না যায়, তত দিন তোমায় ঐভাবে থাকিতে হইবে।"

"তবেই তুমি রাখিয়াছ। অদ্য তৃতীয় প্রহরে এ দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে।"

বলিয়া সে রক্ষীদিগকে বলিল—

"চলো।" তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে লইয়া গিয়া এক গাছতলায় দাঁড় করাইল। তথায় ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে কুঞ্জরকর্ণ দেহত্যাগ করিল।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সেই বন হইতেই অশোক রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে অদ্য হইতে আমি নিজ রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম। পরে তিনি কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে করিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন। কুণাল আর সংসারে প্রবেশ করিতে রাজি নহেন। রাজা বলিলেন, "ভগবন্ বোধিসত্ত্ব, আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন ও সুভদ্রাঙ্গীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করুন।" কুণাল সম্মত হইলেন। তখন তক্ষশিলা শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা কতিপয় মাত্র বিশ্বস্ত সৈন্য ও কুণাল এবং কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া পাটলিপুত্রে প্রস্থান করিলেন।

২

পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই তিষ্যরক্ষাকে বিচারালয়ে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা দিবার পূর্বেই তিষ্যরক্ষা তথায় উপস্থিত হইল। আর সে বেশের পরিপাটি নাই, মাথায় এককালে চুল হইয়াছে, ছিন্নবস্ত্র মাত্র পরিধান। আসিয়াই রাজাকে বলিল—

"তুমি আমার আসনে বসিও না।"

রাজা বলিলেন, "দূর হ পাপিষ্ঠা!" তখন সে ঘুষা উঠাইয়া রাজাকে মারিতে গেল। রাজা প্রহরীদিগকে ধরিতে বলিলেন। তাহারা সাহস করিয়া ধরিতে পারিল না। তখন কাঞ্চন উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন; সে কাঞ্চনের মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল, "মা! নমস্কার, তুমি আমার সংসার কেন ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? আমি তোমায়

কত খুঁজিয়াছি। কোথায় গিয়াছিলে ?" বলিয়া কাঞ্চনের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

আবার সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল—

"আমি ভ্রষ্টা না হইলে তুমিই বা রাজা হইতে কিরূপে ? আর আমিই বা তোমায় ঠকাইয়া রাজ্যেশ্বরী হইতাম কি করিয়া ? আমি কুঞ্জরকর্ণকে বলিয়াছিলাম, তুই বিদ্রোহী হ, আমি তোকে টাকা দিব। পারিস্ তো এই কাছাখোলা বেটাদের তাড়াইয়া ব্রাহ্মণদের ধর্ম বজায় করিব।"

রাজা বলিলেন—

"আর শুনিতে চাহি না। পাপীয়সি! ভণ্ডতপস্বি! তুই ক্রমাগত আমায় ঠকাইয়াছিস, তুই না আগে ভাগে বৌদ্ধ হইয়াছিলি ? তাহার পর তুই আমার প্রিয় পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিস। তোর মতলব কি জানি না। কিন্তু তোর মতলব বদ ভিন্ন ভালো হইতে পারে না, তোরে কুকুর দিয়া খাওয়াইব, দূর হ আমার সম্মুখ থেকে।"

"আহা মরি মরি কি গানই গাইছ! আবার গাও। আমি রাজসিংহাসন তোমায় দিয়া যাইব।"

কুণালের কাছে গেল। কুণালের চিবুক ধরিয়া তুলিল— "কই বাছা, তোমার সে মণি দুটি কই ?

কে নিল নয়নমণি
কহ কহ লো সজনি!

বড়ো যে আমায় দেখলেই চোখ লুকুতে ? খুব হয়েছে। এমনি করে —এমনি করে— এমনি করে— এমনি করে পায়ে পিষে ফেলেছি। কেমন এখন একবার চাও তো সোনার চাঁদ!" বলিয়া আবার কুণালের চক্ষে আঙুল পুরিয়া দিতে গেল। সকলে যেমন ধরিতে আসিল, অমনি কুণালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

রাজা উহাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"নাপিতানি! কুঞ্জরকর্ণকে কি হুকুম দিয়াছিলে ?"

"নাপিতানি ? আমি রাজরাজেশ্বরী। আমি তো রাজ্যসুদ্ধ সব কল্লু করিয়া ফেলিয়াছিলাম! আমায় বলেন নাপিতানি!"

"না তুমি সাবিত্রী, অতি ধন্যা।"

"আমি সাবিত্রী নহি, আমি ভ্রষ্টা।"

কাঞ্চনমালা রাজাকে বলিলেন—

"পিতঃ! ইনি এখন উন্মাদ— পাগল। আপনি ইঁহাকে কেন তিরস্কার করিতেছেন? ইঁহাকে শাস্তি দিলে কিছুই ফল হইবে না। আমার এক ভিক্ষা আছে; আপনি উঁহাকে আমার হাতে দিউন। আমি উঁহার উন্মাদ উপশম করিব ও ধর্মপথে উঁহার মতি লওয়াইব।"

রাজা বলিলেন—

"তুমি পারিবে না।"

কাঞ্চন বলিলেন—

"সে ভার আমার, আমি উঁহার উদ্ধারের পথ করিব। না পারি আপনি রাজা আছেন।"

রাজা বলিলেন—

"সেই ভালো, উন্মাদ উপশম হইলে আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব।"

"না মহারাজ, এ যাত্রা উঁহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এরূপ পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিলে, শাস্তি কাহাকে দিব?"

তিষ্যরক্ষা নৃত্য করিতে করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল—

"নিজে গলায় দড়ি দিয়া মরো।"

কাঞ্চন বলিল—

"সে যাহা হউক মহারাজ, আমার স্বামীর চক্ষু ইনি উৎপাটন করিয়াছেন, আমার স্বামী বোধিসত্ত্ব তিনি নালিশ করেন নাই। আমারই আবার অনুরোধ আপনি উঁহাকে ক্ষমা করুন। ধর্ম থাকেন, আমার স্বামী আবার চক্ষু পাইবেন।"

রাজা বলিলেন—

"তবে তুমি নিতান্ত ছাড়িবে না, তবে লও, ও তোমার দাসী হইয়া থাকুক।"

রাজা এই কথা বলিলে কাঞ্চন তিষ্যরক্ষার হাত ধরিলেন, সে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় উঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

৩

তিষ্যরক্ষা চলিয়া গেলে, রাজা উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, বাসুকিশীল হইতে বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। সে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কেন আসিয়াছ ?"

"আপনি বলিয়াছিলেন, অশোক রাজা হইলে আসিও, অনেক টাকা পাইবে। আমি সেইজন্য আসিয়াছি। আপনি আমায় এক লক্ষ টাকা দিন।"

"এত টাকা তুমি কি করিবে ?"

"কিছু লইয়া মরা মানুষ ফিরাইয়া আনার চেষ্টা কবিব। আর কিছুতে স্ত্রীর গহনা গড়াইব।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় এক লক্ষ টাকা দিব, আর তুমি যে আমায় আহাম্মক বলিয়া চৈতন্য দিয়াছিলে, তাহার জন্য তোমায় আমি আর এক লক্ষ টাকা দিব। আর তোমায় জিজ্ঞাসা করি তুমি যে অন্ধত্ব বিমোচন করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছিলে, তাহা সফল হইয়াছে ?"

"আমি একের চক্ষু অন্যের চক্ষে লাগাইয়া দিতে পারি। এখনো চক্ষু তৈয়ার করিতে পারি না।"

"আচ্ছা আর-কাহারো চক্ষু লইয়া ঐ অন্ধের চক্ষুতে বসাইয়া দেও দেখি।"

কেহই আপন চক্ষু দিতে সম্মত হইল না। শেষ বৌদ্ধচণ্ডাল আপন গুরুর জন্য আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল। কুণাল বারণ করিলেন, সে শুনিল না। বিজ্ঞানবিৎও সেই চক্ষু কুণালের চক্ষু-কোটরে বসাইয়া দিলেন। কুণালের যেমন চক্ষু ছিল, আবার তেমনি চক্ষু হইল।

তিষ্যরক্ষা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

"এই যে বাছার চক্ষু হইয়াছে—" বলিয়াই বেগে প্রস্থান করিল—সকলে দেখিল তিষ্যরক্ষা শাক্য ভিক্ষুকী হইয়াছে।

কুণাল চক্ষু পাইয়াই চণ্ডালকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি যে চক্ষু দান করিলে তোমার কোনোরূপ কষ্ট হয় নাই তো ?"

তখন চণ্ডাল আনুপূর্বিক আপন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। শেষ সে বলিল—

"যিনি আমার জ্ঞানচক্ষু দিয়াছেন তাঁহার জন্য চর্মচক্ষু ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলে, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ আর নাই।"

এই সত্য কথা কহায় চণ্ডালের যেরূপ চক্ষু ছিল আবার সেইরূপ হইল।

স্বামীর চক্ষু হইয়াছে শুনিয়া কাঞ্চন দেখিতে আসিলেন। রাজা বলিলেন--

"কাঞ্চন! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।"

কাঞ্চন লজ্জানম্রমুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

## ৪

তখন রাজা কুণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল! তুমি বোধিসত্ত্ব; তোমার উপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। তথাপি যদি তোমার কোনো অভীষ্ট আমার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে, বলো আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন—

"মহারাজ আপনি তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় যে কার্যের জন্য এ রাজসংসারে আসা সেই কার্যটি করিয়া দেন।"

রাজা বলিলেন--

"বলো আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন—

"তবে ঘোষণা করিয়া দিন যে, বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্মই প্রচলিত হইবে। এবং সাম্রাজ্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তক্ষশিলায় সদ্ধর্ম প্রচার হয় নাই। আর আমায় তক্ষশিলার ধর্মাধ্যক্ষ করিয়া দেন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বৌদ্ধধর্ম মগধ সাম্রাজ্যের ধর্ম হইবে।

রাজা আপন পুত্রদিগকে, কাহাকেও সিংহলে, কাহাকেও পারস্যে ধর্ম প্রচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

কুণালকে বলিলেন—

"তোমায় পঞ্চনদের ধর্মাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তা হইতে হইবে।"

কুণাল বলিলেন—

"শাসনকর্তৃত্ব আর-কাহাকেও দেন।"

রাজা বলিলেন--

"তবে কাঞ্চনের উপর সে ভার থাকুক, কাঞ্চন এবার তক্ষশিলা জয় করিয়াছে।"

কুণাল বলিলেন—

"কাঞ্চনও সাংসারিক কার্য ভালোবাসে না।" বলিয়া তিনি চণ্ডালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

চণ্ডাল বলিল—

"প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমি গুরুর পদসেবা করিব, শাসন-কার্য আমার জন্য নহে দয়াময়!"

রাজা তখন শাসনকার্যের ভার অন্য লোকের হস্তে প্রদান করিলেন।

৫ এই দিবস যে কার্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।

৬ শুনা গিয়াছে, তিষ্যরক্ষা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনার ঋদ্ধিমতী নাম সার্থক করিয়াছিল।

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

## ১. সূত্র

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের তেত্রিশ বছর পরে 'কাঞ্চনমালা' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এত দেরি কেন হয়েছিল সে প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন, "কেন, কি বৃত্তান্ত— সে অনেক কথা— বলিয়া কাজ নাই।" আর একটি মন্তব্য আছে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হরপ্রসাদের ভাষণে : "আমার সহিত তাঁহার দুই-তিন বার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন কি, তাহার জন্য আমাকে কিছুদিন বাংলা লেখা ছাড়িতে হইয়াছিল।" গোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য ও গণপতি সরকার 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন (স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৮৮, ৩৭৫-৭৬ দ্র.)। বঙ্কিমচন্দ্র অনুমোদন না করাতেই কাঞ্চনমালা গ্রন্থাকারে প্রকাশে এত দেরি হয়েছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে প্রকাশের কথা হরপ্রসাদ ভাবেন নি— এমন ধারণার ভিত্তি আছে। ফলে তাঁর সৃজনধর্মী মৌলিক রচনার ধারা ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় ও শেষতম উপন্যাস 'বেনের মেয়ে' লেখেন ১৩২৫-২৬ বঙ্গাব্দে নারায়ণ পত্রিকায়, কাঞ্চনমালা রচনার ছত্রিশ বছর পরে।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য কাঞ্চনমালার মুখবন্ধে (পরিশিষ্ট দ্র.) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire" প্রবন্ধের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, "তদানীন্তন দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই বৌদ্ধ-বিরোধী মনোভাবটিকে গ্রন্থকার বার বার সুস্পষ্টরূপে কাঞ্চনমালা গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন…।" মৌর্য সাম্রাজ্যের বিলয় কাঞ্চনমালার বিষয় নয়, বরং উপন্যাসের শেষে কুণালের অনুরোধে অশোক ঘোষণা করেন বৌদ্ধধর্মই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের ধর্ম হবে। এই ঘোষণা ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "এই দিবস যে কার্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।" (পৃ. ১৮৭ দ্র.) তবুও উপন্যাসের কাহিনীতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের সংঘাতের বিবরণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে হরপ্রসাদের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে

মনে হয়। উপরোক্ত প্রবন্ধে তিনি 'শূদ্র রাজা' অশোকের আদেশে ব্রাহ্মণদের অধিকার ও মর্যাদাচ্যুতি এবং এর ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অসন্তোষ ও বৌদ্ধ-বিরোধী মনোভাবকেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ বলেছেন। পশুবলি নিষেধ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা নীতি প্রয়োগ এবং ধর্মমহামাত্র নিয়োগের ফলে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব লোপ— প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণেরা অশোকের বিরুদ্ধে যান। তাঁর ভাষায়,

"They tolerated these indignities heaped on them as long as the strong hand of Aśoka was guiding the empire. They were sullen and discontented. As soon as that strong hand was removed, they seemed to have stood against his successors. But they were not military people. They could not fight themselves. The Kṣatriyas, who fought for them and made them great, were all extirpated by the Nandas. They began to cast their eyes for a military man to fight for them. And they found such a man in Puṣya Mittra, the Commander-in-Chief of the Maurya empire .... He was a Brahminist to the core and hated the Buddhists." (*J. A. S. B.* NS, Vol. VI, No. 5, 1910, p. 260).

এই প্রবন্ধটি থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্পর্কে ধারাবাহিক গবেষণার সূত্রপাত হয়। পরবর্তী গবেষকেরা শিলালিপির বিস্তারিত বিশ্লেষণে ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হরপ্রসাদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। মৌর্য রাজবংশ শূদ্র না ক্ষত্রিয় এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র সব ধরনের পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিচারের নীতি অভিন্ন হওয়া কাম্য বিবেচনা করে অশোক 'জনপদ হিতসুখায়ে' নিযুক্ত 'রাজূক' স্তরের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে 'ব্যবহার-সমতা' ও 'দণ্ড-সমতা' নীতি মেনে চলার নির্দেশ দেন। ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবার অধিকার হরণ এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষত প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরা এমন কোনো বিশেষ অধিকার যে কখনো ভোগ করিতেন না— তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো শিলালিপিতে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি দুর্ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণদের স্বার্থ দেখবার জন্যে ধর্মমহামাত্র নিয়োগেরও উল্লেখ পাওয়া গেছে। অশোকের শাসননীতি ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিল— হরপ্রসাদের এই সিদ্ধান্ত তাই যুক্তিযুক্ত নয়। যে-সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে তার বিবরণ ও

বিশ্লেষণের জন্য দ্র. Hemchandra Raychaudhuri, *Political History of India*, Calcutta, 1972 ; K. A. Nilakanta Sastri ed., *Age of The Nandas And Mauryas*, Delhi, 1967 ; U. N. Ghoshal, *Studies in Indian History and Culture*, Bombay, 1957 ; Nihar Ranjan Ray, *Maurya And Śunga Art*, Calcutta, 1945 ; D. D. Kosambi, *The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline*, New Delhi, 1976 ; Romila Thapar, *Aśoka And The Decline of The Mauryas*, Oxford, 1961.

১. এই বাক্যটি উদ্ধৃত করে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 'কাঞ্চনমালা'র মুখবন্ধে (পরিশিষ্ট দ্র.) মন্তব্য করেছেন, তিনি হরপ্রসাদকে এমন 'সাংঘাতিক সংস্কৃতভূয়িষ্ঠ' ভাষা আর কখনো লিখতে দেখেন নি। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'কাঞ্চনমালা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "ভাষাটি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার, কিন্তু মাঝখানে একি কক্কড়-কক্কড়-ক্কড়াৎ !" আসলে এই দীর্ঘ বাক্যটি কথকদের একটি 'চূর্ণী' হুবহু বসিয়ে দেওয়া। হরপ্রসাদ বলেন, "কথকদের চূর্ণীগুলিকে আমি বাংলা ভাষার অতুলনীয় সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। তাল ও লয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইয়া যায়, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" ('অক্ষয়চন্দ্র সরকার' প্রবন্ধের ১৭ অনুচ্ছেদ দ্র.)

## ২. বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের সূচি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা' সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন-এ বিভিন্ন খণ্ডের উপরে কখনো অধ্যায়, কখনো বা ভাগ, পরিচ্ছেদ, খণ্ড মুদ্রিত আছে। কয়েকটি খণ্ডে উপবিভাগ-নির্দেশক সংখ্যার অনুক্রম ঠিক নেই। এখানে খণ্ড বা অধ্যায়ের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলিতে উপবিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| আষাঢ়, | পৃ. ১৩১-১৩৯ | প্রথম খণ্ড | (১—৫) |
| শ্রাবণ, | পৃ. ১৪৫-১৫৯ | দ্বিতীয় ভাগ | (১—৬) |
| | | তৃতীয় খণ্ড | (১—৩) |
| ভাদ্র, | পৃ. ১৯৩-১৯৮ | চতুর্থ পরিচ্ছেদ | (১, ৩) |

চতুর্থ পরিচ্ছেদে উপবিভাগের সংখ্যা দুটি, ভুল করে দ্বিতীয় উপবিভাগের উপরে ২-এর পরিবর্তে ৩ ছাপা হয়েছিল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| আশ্বিন, | পৃ. ২৫৪-২৬৭ | পঞ্চম খণ্ড | ( ১—৫ ) |
| | | ষষ্ঠ খণ্ড | ( ১—৯ ) |
| কার্তিক, | পৃ. ৩০২-৩০৫ | সপ্তম খণ্ড | ( ১—৬ ) |
| অগ্রহায়ণ, | পৃ. ৩৬২-৩৬৮ | অষ্টম খণ্ড | ( ১—৩ ) |
| | | নবম খণ্ড | ( ১—৪ ) |
| পৌষ, | পৃ. ৩৯২-৪০২ | দশম অধ্যায় | ( ১—৩, ৫—৭ ) |
| | | একাদশ খণ্ড | ( ১, ২, ৪ ) |

দশম অধ্যায়ে উপবিভাগের সংখ্যা ছয়টি, চতুর্থ উপবিভাগের উপরে ৪-এর পরিবর্তে ৫ ছাপা হয়েছিল। একাদশ খণ্ডে উপবিভাগের সংখ্যা তিনটি। তৃতীয় উপবিভাগের উপরে ৩-এর পরিবর্তে ৪ ছাপা হয়েছিল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাঘ, | পৃ. ৪৪৩-৪৬০ | দ্বাদশ খণ্ড | ( ১—৪ ) |
| | | ত্রয়োদশ খণ্ড | ( ১, ২, ৫, ৬ ) |
| | | চতুর্দশ খণ্ড | ( ১—৬ ) |

ত্রয়োদশ খণ্ডে উপবিভাগের সংখ্যা চারটি। তৃতীয় ও চতুর্থ উপবিভাগের উপরে ৩ ও ৪-এর পরিবর্তে ৫ ও ৬ ছাপা হয়েছিল।

## ৩. পাঠ-বিন্যাস

১৩২২ বঙ্গাব্দে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থরূপে 'কাঞ্চনমালা'-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। দুটি সংস্করণেই বঙ্গদর্শন-এর পাঠ-বিন্যাস অনুসৃত, শুধু উপবিভাগের অনুক্রম নির্দেশের ভুলগুলি ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে ( বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকার তারিখ ) বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'-তে এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৬০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' দ্বিতীয় সম্ভারে কাঞ্চনমালা ছাপা হয়েছিল।

## ৪. পাঠ-প্রসঙ্গ

বর্তমান মুদ্রণে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। বঙ্গদর্শন ও প্রথম সংস্করণের পাঠের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠে বিশেষ কিছু অমিল নেই। কোথাও কোথাও দু-একটি শব্দ বা বাক্যাংশে পরিবর্তন দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি ও বর্জিত অংশ উদ্ধৃত

করে দেওয়া হল। বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দু-একটি শব্দ যোগ করা হয়েছে। এই সব শব্দের অধিকাংশ পত্রিকার পাঠ থেকে নেওয়া।

নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটিতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে ছত্র-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে :

১৩৩/২০ : 'ঋদ্ধি' শব্দটি সম্পর্কে বঙ্গদর্শন-এ টীকা আছে, "অলৌকিক কার্যকরণের ক্ষমতার নাম ঋদ্ধি।"

১৬৩/১০ : "...রোগী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে।" এর পরে বঙ্গদর্শন-এ আছে, "অতি কষ্টে তাঁহার কথা বাহির হইতেছে।"

১৬৪/৯ : "...সে রাজপুরীর সুখকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে" এর পরে বঙ্গদর্শন-এ আছে, "রাজপুরীতে বসিয়া থাকিতে হয়।"

১৭০/১২ : বঙ্গদর্শন-এ, প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণে বাক্যটির পাঠ আছে, "জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন— আজি আবার তোমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাহার কথা মনে পড়িয়া গেল।" বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী' ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' দ্বিতীয় সম্ভারে মুদ্রিত সংশোধিত পাঠ বর্তমান মুদ্রণে নেওয়া হয়েছে।

১৭৪/৪ : "ভ্যাঙায় কি জবাব দেয় জানি না— " বঙ্গদর্শন-এ এর পরে আছে, "মানুষের মুখ দেখিতে পাই না।"

## ৫. অনুষঙ্গ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৬০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' দ্বিতীয় সম্ভারের জন্য বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 'কাঞ্চনমালা'র একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন।

ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' গ্রন্থের 'কুণাল-অবদান'-এ এই কাহিনীর পৌরাণিক রূপ পাওয়া যায়।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের 'মুখবন্ধ' এবং শরচ্চন্দ্র দাস-অনূদিত 'কুণাল অবদান' পরিশিষ্টে ছাপা হল।

# বেদের মেয়ে

# বেণের মেয়ে

প্রথম নারায়ণ মাসিক পত্রে প্রকাশিত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

---

গুরুদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২০১ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩২৬।

মূল্য ২৲

বেণের মেয়ে

প্রথম নারায়ণ মাসিক পত্রে প্রকাশিত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গুরুদাস চাটার্জী এণ্ড সন্স,
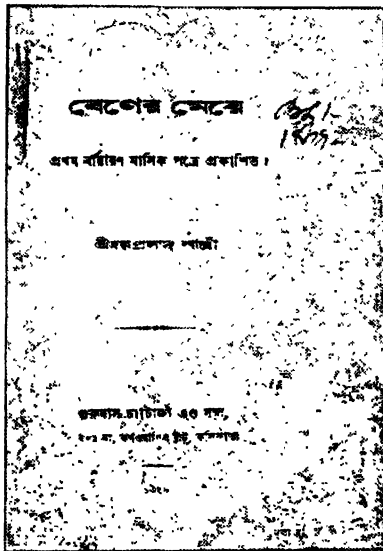
## মুখপাত

'বেনের মেয়ে' ইতিহাস নয় ; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। 'বেনের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই সে কালের, যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙালি এখন কেবল এ-কেলে "গণিকাতন্ত্রের" উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন ?

২৬, পটলডাঙা স্ট্রিট
কালকাতা
বড়দিন ১৯১৯

গ্রন্থকার

# বেনের মেয়ে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

শকাব্দ ৯২২, সংবৎ ১০৫৭, ইস্ বি ১০০০ বৎসর, মাস বৈশাখ, তিথি পূর্ণিমা, জায়গা সাতগাঁ— গাজনের ভারি ধুম লাগিয়াছে।

তারাপুকুরের রূপা বাগ্দি এখন সাতগাঁয়ের রাজা। তিনি মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌগত শ্রী শ্রী ১০৮ রূপ-নারায়ণ-সিংহ উপাধি লইয়া প্রবল-প্রতাপে সাতগাঁ-শহর ও সপ্তগ্রামভুক্তি শাসন করিতেছেন। অন্তত ১০,০০০ ( দশ হাজার ) বাগ্দি তাঁহার পল্টনে ভর্তি হইয়াছে। তাঁহার হাতি, ঘোড়া, রথ, বিস্তর আছে। তারাপুকুর গ্রামখানি কুন্তী নদীর ধারে, এখন যেখানে মগরা হইয়াছে, উহারই নিকটে। পূর্বকালে ঐখানে তারাদেবীর এক মন্দির ছিল এবং মন্দিরের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দিঘি ছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন মন্দির পড়িয়া গিয়াছে, দিঘি আছে, সেই দিঘিরই নাম তারাপুকুর। তারাপুকুর গ্রামখানি ঐ দিঘি হইতে ১ মাইল পূর্বে। সেখানেও আজ ভারি ধুমধাম। কারণ, রূপা-রাজা ঠিক করিয়াছে, গাজন তাহার বাড়ি হইতেই বাহির হইবে, বাহির

হইয়া সাতগাঁয়ের বড়ো রাস্তা দিয়া ধরমপুরের বিহারে পৌঁছিবে ও তাহার একটু দক্ষিণে বিহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

এবার বেশি ধুমের কারণ, রূপার এই প্রথম গাজন ও বিহার প্রতিষ্ঠা, রূপার জীবনে প্রধান সৎকাজ। রূপা লুই-সিদ্ধার[১] চেলা। সে এবার অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া লুই-সিদ্ধাকে ধরিয়াছে, 'গুরুদেব, এই বিহার প্রতিষ্ঠায় গাজনে আপনাকেই মূল সন্ন্যাসী হইতে হইবে।' সিদ্ধাচার্য লুই-পাদ দলবল লইয়া তারাপুকুর গ্রামে ২/৩ দিন হইতে আড্ডা লইয়াছেন। অনেক বড়ো বড়ো বৌদ্ধ পণ্ডিত, সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধাচার্যও আসিয়া জুটিয়াছে। নাঢ়[২] পণ্ডিতের সঙ্গে লুই-এর বনে না; রূপা তাঁহাকেও আনিয়াছেন। নাঢ় পণ্ডিতের স্ত্রী বা শক্তি নাঢ়ীও আসিয়াছে। এ নাঢ়ী বড়ো কম মেয়ে নয়। ইঁহার বাপের দেওয়া নাম নিগু এখন প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞানমার্গে ইঁহার বড়োই প্রতিপত্তি বলিয়া ইঁহার নাম জাহির হইয়াছে, জ্ঞান-ডাকিনী। নাঢ়া ও নাঢ়ীর সঙ্গে বহুশত নাঢ়া ও নাঢ়ী আসিয়াছে। গ্রাম তারাপুকুর ও দিঘি তারাপুকুরের মাঝখানে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। কেহ তাঁবুতে রহিয়াছে, কেহ তালপাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া রহিয়াছে, কেহ খেজুর-পাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া আছে। কোথাও বা বড়ো বড়ো বাঁশের মেরাপের উপর বড়ো বড়ো শামিয়ানা ও পাল খাটানো আছে; নীচে অসংখ্য লোক; কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ গাঁজায় দম দিতেছে, কেহ বা ধান্যেশ্বরীর উপাসনা করিতেছে। কিন্তু রূপার এমনি দবদবা যে, এত লোকেও কোনোরূপ গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা কিছুই নাই। এই সমস্ত লোকের পাহারা দিবার জন্য শএক দু'শ বাগ্‌দি বড়ো বড়ো বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লাঠির প্রত্যেক পাপেই এক-একটি গাঁট, পাকা তল্লাবাঁশে বহুকাল তেল খাওয়াইয়া লাঠি লাল করিয়া তুলিয়াছে। লাঠিয়ালও খুব জোয়ান, সাড়ে ছ'হাতের উপর লম্বা, মাথায় বাবরিকাটা বড়ো বড়ো চুল। তাহাদের লাঠি মাথার উপর আরো দেড় হাত।

হঠাৎ রাত্রি তিন প্রহরের পর চারি দিকে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কাল দুপুরে রাজগুরুর ভোজ। তারাপুকুরে এখন মাছ ধরা

হইবে। তারাপুকুরের চারি দিকে প্রকাণ্ড পাড়, সেখানে যত বনজঙ্গল ছিল, সব সাফ করিয়াছে। পাছে মাছ চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাই তারাপুকুরময় কাণ্ডসুদ্ধ হাজার হাজার বাঁশ ফেলা ছিল। আজ সমস্ত বাঁশ উঠাইয়া পাড়ের ওপারে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুন্তী নদী হইতে দুখানি দুশ-মনী নৌকা আনিয়া তারাপুকুরে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কুন্তী নদী হইতে তারাপুকুর অন্তত বিশ রশি তফাত। মোটা মোটা গরানের কাঠ ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া, নৌকা দুখানিকে কাছি দিয়া টানিয়া পুকুরে ফেলা হইয়াছে। ভোর হইতে-না-হইতেই তারাপুকুরের মাছ ধরার সরঞ্জাম সব প্রস্তুত। পুকুরটি যতখানি চওড়া, ততখানি লম্বা। একখানি জাল, জালের সুতাগুলি বহুকাল ধরিয়া গাবানোতে এমন শক্ত হইয়াছে যে, মাছের সাধ্য কি উহা ছিঁড়িয়া পালায়! জালের তলার দিকে ইট ও পাথর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরে গোছা গোছা সোলার ফাত্‌না ভাসিতেছে। দুই পাড়ের ধারে দুই নৌকায় জেলেরা জালের দাঁড় ধরিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে ভাঙা মন্দিরের ধারে হঠাৎ রূপা-রাজা দেখা দিলেন। চারি দিক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল— কেহ বলিল, মহারাজের জয়, কেহ বলিল, মহারাজাধিরাজের জয়, কেহ বলিল, রাজার জয়, কেহ বলিল, রূপা-রাজার জয়। রূপা মুহূর্তের মধ্যে 'জাল টান' হুকুম দিয়াই অন্তর্ধান হইলেন। তখন নৌকা চলিল, সোলার ফাত্‌না চলিল, জালের দাঁড় চলিল, পাড়ের উপর অগণ্য মানুষ চলিতে লাগিল। বড়ো বড়ো মাছে ঘাই দিতে লাগিল; এক-একটা মাছ দশ-পনেরো হাত লাফাইয়া উঠিয়া আবার জলের মধ্যে পড়িতে লাগিল। একটা একটা ঘাইয়ে জল তোল-পাড় হইতে লাগিল। ঘাইয়ে ঢেউগুলি গোল হইয়া ক্রমে বড়ো হইতে হইতে ডাঙায় আসিয়া লাগিতে লাগিল। একটা ঢেউয়ের পর আর-একটা ঢেউ, একটা ঘোলের পর আর-একটা ঘোল, কত শত যে বৃত্ত, বৃত্তার্ধ, বৃত্তখণ্ড জলের উপর দেখা গেল, তাহা জ্যামিতির রেখাগণিত-ওয়ালারাই বুঝিতে পারেন। ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি পৌঁছিল। তখন সূর্যদেবের রাঙা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রঙ করিয়া দিল। কিন্তু একি? জাল যে আর টানা যায় না। জলের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল

টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, রুপার মাছ বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রুপার মতো সাদা, মাজা রুপার মতো চক্‌চকে, একটার পর আর-একটা পড়িতেছে। চক্‌চকে রুপার রঙের উপর সূর্যের সোনালী রঙ পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামেশিতে এক অপূর্ব শোভা। জাল হালকা হইল, আবার জাল টানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌঁছিল। এইবার জাল গুটানো আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রুপার ঝক্‌ঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন এক-পেশে হয়ে দাঁড়াইল। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম পাড়ে কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল, সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপ্‌ঘপানি, আর-একদিকে তেমনি লোকের কলরব। একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"রাজার হুকুম— মুন্‌কের নীচে মাছ ধরিবে না।" তখন বাছিয়া বাছিয়া একমনের নীচে যত মাছ ছিল, সব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তথাপি বহু-সংখ্যক মাছ জালে বাধিয়া রহিল। এক-একটা মাছ ডাঙায় তুলিতে অনেক বড়ো বড়ো জোয়ান হিমসিম খাইয়া যাইতে লাগিল। বড়ো বড়ো শ'দুই মাছ ক্রমে তারাপুকুরের ভাঙা মন্দিরের ধারে জড়ো হইল এবং সেখান হইতে গোরুর গাড়িতে রাজ-বাড়িতে চালান হইল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে যে-সব লোক মাছ ধরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে এক-একটি ছোটোখাটো মাছ দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে পূর্ণিমার দিন সকালবেলায় মাছধরা-পর্ব শেষ হইল।

২

রাজার গুরু মাছের আঁতড়ি খাইতে ভালোবাসেন, পোঁটা ও তেল খাইতে ভালোবাসেন। সুতরাং এত যে গাড়ি গাড়ি মাছ রাজবাড়িতে গেল, সে মাছের যত দরকার থাক্ আর না থাক্, মাছের তেল, আঁতড়ি আর পোঁটার বেশি দরকার। বড়ো

বড়ো পট্‌পটি ফুটাইয়া গাদা করা হইতে লাগিল। তাহার পর এইসব জিনিস রাঁধে কে? সাতগাঁর চারি দিকে ৪/৫ ক্রোশ ধরিয়া রূপা-রাজার খুব প্রাদুর্ভাব। যে গ্রামে যিনি যে তরকারি রাঁধিতে ভালো পারেন, তাঁহাকে আনাইয়া সেই তরকারি রাঁধিবার ভার দেওয়া হইল। একজন মাছের তেল দিয়া নানা প্রকার বড়া ভাজিতে লাগিলেন, একজন মাছের তেল দিয়া ছেঁচড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন, চচ্চড়ি নানা রকমের হইল। এ-সব খাস রাজগুরুর জন্য। বাকি লোকের জন্য যে প্রয়োজন, তাহার বর্ণনা দরকার নাই।

পাত সাজানো হইলে, সন্ন্যাসীর দল বসিয়া গেল, অতিথি অভ্যাগত সব বসিয়া গেল; বসিলেন না কেবল রাজগুরু লুই-সিদ্ধা। সকলে বসিয়া গেলে, রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সব পরীক্ষা করিয়া গুরুদেবকে ভোজনের অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গুরু খোলার একধার হইতে আর-একধার পর্যন্ত দেখিয়া গেলেন, বলিলেন, "সব উত্তম হইয়াছে, তোমরা আহার করিতে বসো।" তিনি নিজেও আপনার পাতে বসিয়া গেলেন। আহারের এই বিপুল আয়োজনের জন্য সিদ্ধাচার্য রাজাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, আশীর্বাদ করিলেন, "ধর্মে তোমার মতি হউক।"

বৈকালে গাজন বাহির হইবে। তারাপুকুর হইতে সরস্বতী নদী পর্যন্ত খুব একটা চাটাল রাস্তা তৈয়ারি হইয়াছে। সমস্ত রাস্তা গোবর-গঙ্গাজলে ধুইয়া দেওয়া হইল। রাস্তার দুধারে কেবল ফুলের মালা বাঁশের থাম হইতে ঝুলিতেছে; রাস্তার উপর দিয়া ফুলের মালা বাঁশে ঝুলানো। রাস্তার মাঝে মাঝে বিচিত্র তোরণ। তোরণের উপর হইতে দিক্‌মালা চারি দিকে ছড়াইয়া ফর্‌ফর্‌-শব্দে উড়িতে লাগিল। দিক্‌মালাগুলি প্রায়ই সোলার পাতে তৈয়ারি, মাঝে মাঝে অভ্রের পাত লাগানো। অভ্রের উপর যখন পড়ন্তসূর্যের আলো পড়িল, তখন সে আলো নানা রঙ ধরিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিল। দিক্‌মালার মাঝে মাঝে কিঙ্কিণীমালা, দিক্‌মালা যতটা লম্বা, সে মালাও ততখানি লম্বা। বাতাসে ছোটো ছোটো ঘুঙুরগুলি দুলিতেছে, আর ঝুন্‌-ঝুন্‌ ঝুন্‌-ঝুন্‌ শব্দ হইতেছে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ধ্বজার উপর নানা-রকমের, নানা-রঙের, নানা-আকারের পতাকা পত-পত শব্দে উড়িতেছে; কোনোটি তেকোণা, মুখে ঝালর

দেওয়া, সমস্তটাই রেশমের তৈয়ারি ; কোনোটি চৌকোণা, সামনে ও নীচে ঝালর— কাপাসের জমির উপর রেশমের কাজ-করা ; কোনোটি ছালের কাপড়ের ; কোনোটি চামড়ার— বিচিত্র বেশে, বিচিত্র আকারে উড়িতেছে। কোথাও বা এক প্রকাণ্ড ধ্বজার চারি দিকে কেবল ছাতা, নীচেরটি সবচেয়ে বড়ো, যত উপরে উঠিতেছে, ছাতা ক্রমে ছোটো হইয়া গিয়া মটকার উপর একটি মোচার আগার মতো হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতেও ফুলের মালা দুলিতেছে। রাস্তার দুধারে বাঁশের থাম। প্রত্যেক থামের গোড়ায় পূর্ণ কলস, তাহার উপর আম্রশাখা, তাহার উপর একটি টাটকা ডাব। কলসিতে সিন্দূর, চন্দন ও হলুদের দাগ। পূর্ণ-কলসের পিছনে এক-একটি কলাগাছ।

৩

সরস্বতীর উপর সাঁকো নাই, পুল নাই, খেয়ার নৌকাও নাই। মহাজনী নৌকার ছইয়ের উপর দিয়া পারাপার হয়। কিন্তু লোক-পারাপার এক জিনিস, গাজন-পার আর-এক রকম জিনিস। সরস্বতীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত নৌকাগুলি এমন-ভাবে সাজানো যেন একটি একটি 'নৌ-সেতু' হইয়াছে। ছইয়ের উপর দিয়া মানুষ চলিয়া যাইতেছে, পাটাতনের উপর দিয়া হাতি, ঘোড়া, রথ চলিতেছে। আবার আর-এক সারি নৌকা, আবার ছই, আবার পাটাতন। নৌকার মাস্তুলগুলি নানা রঙের কাপড় দিয়া মোড়া। মাস্তুলের আগা হইতেও দিক্‌মালা ও কিঙ্কিণীমালা। আর সব নৌকাই বেশ সাজানো-গোজানো। হাতিগুলির যেমন শিঙার করে, নৌকার সেই রকম শিঙার করা হইয়াছে ; কোথাও লাল, কালো, সাদা, হলুদের বড়ো বড়ো ডোরা, কোথাও হাতি-ঘোড়া আঁকা, কোথাও বা বড়ো বড়ো অক্ষরে মহাজনের নাম লেখা— কোথাও বা লেখা— "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।"

সাতগাঁয়ের ভিতর বড়ো রাস্তার দুধারেই দুতলা, তেতলা কোঠা, কোনোটি ইটের কোঠা, কোনোটি মাটকোঠা। প্রত্যেক বাড়িতেই এক-একটি 'বাতায়ন'— একটা গোল বারান্দা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে : বারান্দায় অনেক জানালা, ইচ্ছা করিলে বন্ধ-করিয়া দেওয়া যায়। সাতগাঁয়ের ধনী বণিকগণ বাড়ির সম্মুখধার প্রাণ-

পণে সাজাইয়াছে। বাড়ির ভিতর যেখানে যে ছবি ছিল, বাহিরের দেওয়ালে লাগানো হইয়াছে। ছবিগুলি লাগানোর জন্য পঞ্চায়েত বসিয়াছিল, পঞ্চায়েত যে ছবিখানি যেখানে যেভাবে রাখিতে বলিয়াছিলেন, সেখানি সেইখানে সেইভাবেই ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সাতগাঁয়ের বড়ো রাস্তার বাহার ছবির বাহার তো নয়, বাতায়নে যুবতীদের মুখের বাহার। এক-একটি বাতায়ন যেন এক-একটি পুকুর, যেন শত শত পদ্ম ফুটিয়া ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি করিয়া আছে। সেদিন বড়ো রাস্তার উপর দোকান-পাট সব বন্ধ। বণিকেরা নূতন কাপড় পরিয়া, নূতন বেশভূষা করিয়া, আপন আপন দোকানের পাশে জটলা করিতেছেন ; সমস্ত শহর তোলপাড়। কোনো কোনো বণিক দীপমালা সাজাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বড়ো রাস্তার ধারে বৌদ্ধ-বিহারগুলির আজ অপূর্ব শ্রী। বিহারের যেখানে যা ভালো জিনিসটি ছিল, সব বাহিরে আনা হইয়াছে। বিহার-তোরণের সামনে পিতলের বড়ো বড়ো দীপ-গাছা রাখা হইয়াছে। এক-একটি গাছায় ১০০/১৫০ করিয়া প্রদীপ জ্বালানো যাইতে পারে। রাস্তার উপরের দেওয়ালে শত শত নিশান টাঙানো হইয়াছে। নিশানের মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ-দেবদেবীর প্রতিমা ঘোরালো রঙে আঁকা আছে। এখন আর সুদ্ধ বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘতে চলে না ; এখন নানা দেবদেবীর মূর্তি বৌদ্ধ বিহারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে গণেশ একটি প্রধান দেবতা। উপাসকের ইচ্ছা অনুসারে গণেশের হাত বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে। তিনি নীচের দিকে শেষ দুটি হাতে একটি জামবাটিভরা লাড্ডু লইয়া বসিয়া আছেন, আর লম্বা শুঁড় দিয়া লাড্ডুগুলি টুপ্-টুপ্ করিয়া খাইতেছেন। গণেশের কাছেই মহা-কাল— বেঁটে-খেটে, গাঁটা-গোঁটা, মুখখানি মস্ত, হাঁ-টা খুব ডাগর, কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া আছেন। একপাশে মঞ্জুশ্রী ধীর গম্ভীর, দুটি হাত— একহাতে কিরীচ আর-একহাতে পুঁথি। নিকটেই লোকেশ্বর— "সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট", "কেয়ূরবান্", "কনককুণ্ডলবান্", "কিরীটী", "হিরণ্ময়বপুঃ"— দুই হাতে দুই পদ্ম লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হিন্দুর মন্দিরও বেশ সাজানো-গোজানো হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণ নাই। চারি দিকে উৎসব, জোর করিয়াও তাতে মাতামাতি করিতে হইবে, ইচ্ছা থাক্ আর-নাই থাক্— নইলে ভালো দেখায় না। হিন্দুর

বাড়িরও দশা তাই— বাহিরচটক ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু ছেলেপুলে ছাড়া আর কেহ দরজায় নাই।

৪

সাতগাঁ পার হইয়াও ধরমপুর পর্যন্ত তারাপুকুরের মতোই সাজানো-গুজানো। তবে ধরমপুরের আলোর কারখানাটা খুব বেশি। সন্ন্যাসীদের সেখানে দু-এক রাত থাকিতে হইবে কি না, তাই এই আলোর ব্যবস্থা। সেখানেও তারাপুকুরের মতো কোথাও তালপাতার বড়ো বড়ো ঘর, কোথাও তালপাতার মেরাপ, কোথাও তাঁবু, কোথাও শামিয়ানা, কোথাও কাঠগড়া ; সব জায়গায়ই আলো ; আলো ও বিচিত্র মশালের বন্দোবস্তই বেশি। বড়ো বড়ো শামিয়ানার নীচে বাঁশের তেকোণার উপর সরা ; তাহাতে সরিষার তেল ; তেলের মধ্যে সরিষার পুঁটলি ; পুঁটলির গেরোর উপরে যে কাপড় আছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেইটা জ্বলিতেছে। কোথাও মাটির বা কাঠের বড়ো বড়ো দীপগাছা, তাহাতে বড়ো বড়ো মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে। অনেক জায়গায় তেল সাশ্রয় করিবার জন্য প্রদীপের নীচে জল রাখার একটা পাত্র আছে। কোথাও আড়ার বাঁশে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে চার-পাঁচমুখো প্রদীপ একটি মাটির ডাঁটায় চারি দিকে ঝুলিতেছে। প্রদীপের নীচে জল রাখার ডাবা।

ধরমপুরের সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি ছোটোখাটো বিহার ছিল। বিহারটি দোতলা, চকমিলানো ; এক তলায় ও দোতলায় চারি দিকে বারান্দা ; বারান্দার ওপাশে সারি সারি ছোটো ছোটো ঘর। বারান্দার দিক ছাড়া আর কোনো দিকে জানালা বা দরজা নাই। এক-একটি ঘর এক-একটি ভিক্ষুর শুইবার স্থান। রাত্রি ভিন্ন এ ঘরে কেহ বড়ো একটা থাকে না। রাত্রেও শোয়ার জন্য হয় একটা মাদুর, না-হয় একটা চেটা, না-হয় একখানা পুরানো গালিচা। খাট-চৌকি একেবারে নাই, বালিশের সম্পর্কও বড়ো একটা নাই। উঠানে একটি মন্দির ও তাহার সম্মুখে একটি নাটমন্দির। মন্দিরে একটি ছোটো চৈত্য থাকে ; কিন্তু ধরমপুরের বিহারে শাক্যমুনির একখানি প্রতিমা ছিল। মন্দির-দরজার দু-পাশে গণেশ আর মহাকাল ; ভিতরে কি আছে, সে কথা আর বলিব

না। নাটমন্দিরে প্রকাণ্ড গালিচা পাতা। লুই-সিদ্ধা ও তাঁহার বড়ো বড়ো চেলারা এইখানে বসিয়া দুপুরে ও সন্ধ্যায় তর্ক-বিতর্ক করিবেন। বিশেষত গুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন, "আমার 'অভিসময়বিভঙ্গ' লেখা হইতেছে, তাহা লইয়া আমরা কতকগুলি অন্তরঙ্গের সঙ্গে সর্বদা বাদানুবাদ করিব। সেখানে যেন অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক যায় না। উপাসকদিগের যাইবার বাধা নাই।"

৫

৩টার সময় রাজবাড়িতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ি, গোঁপ কামানো, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোটো ছোটো নানা রঙের রেশমের, পাটের, বাকলের টুকরা লাগানো। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতির হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজানো একটা হাতি, সর্বাঙ্গে শিঙার করা, বড়ো বড়ো রাঙা রাঙা সাদা সাদা কালো কালো ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারি দিক দড়ি দিয়া ঘেরা, খুব জাঁকাল, খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতিতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতি আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতির পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল; সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতিতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটি ছোকরা— তেমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র: মাথাটি মুড়ানো; বোধ হয়, প্রায়ই খেউরি করা হয়; গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রঙটি যতদূর ধবধবে হইতে পারে; চোখ দুটি পটল-চেরা; ঠোঁট দুটি পাতলা অথচ লাল; গাল দুটি বেশ গোলগাল; দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচালো হইয়া গিয়াছে; কপালখানি ছোটো, কম চওড়া; দুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুলপি হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মাথাটা খেউরি করায় কেবল একটু কালো ছায়া, কালো দাগ মাত্র আছে। ভুরু দুটি জোড়া নহে, ঠিক কামের কামানের মতো নহে, যেন দুই দিকে দুইটা ধনুক উড়িতেছে। ছেলেটির পরা কৌপীন, অন্তর্বাস

আর বহির্বাস। এমন ছেলেও ভিক্ষু হয়? ইনি গুরুর সঙ্গে হাতিতে উঠিলেন: লোক অবাক হইয়া তাঁহার চেহারা দেখিতে লাগিল। তিনি গুরুর সঙ্গে এক হাওদায় বসিলেন। হাতির মাহুত কিন্তু আর-এক রকমের। তার মাথায় সাঁচ্চার জরির তাজ, গায়ের আঙরাখায় সোনালীর কাজ-করা, গলায় মুক্তার মালা; হাতির যেমন সাজ, মাহুতের সাজও সেইরূপ জাঁকাল। ইঙ্গিতে হাতি উঠিল এবং গুরু ও শিষ্যকে বহন করিয়া দাঁড়াইল।

এইবার গাজন। প্রথম একদল বাজন্দার— ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাগারা লইয়া যাইতে লাগিল। এ দল লড়াইয়া বাজন্দার; জাতে মুচি— খুব চোটে বাজাইতে লাগিল। তাহার পিছনে একদল পদাতি সৈন্য— ছয় জন করিয়া সারি— মালকোচা মারা, মাথায় বাবরিকাটা ঝাঁকড়া চুল, তাহার উপর একটা বাঁধা-পাগড়ি, হাতে বাঁশের লাঠি। তাহার পিছনে আবার একদল মুচি বাজন্দার। পিছনে ঘোড়সওয়ার— চারি জন করিয়া এক এক সারিতে; ঘোড়ার উপর দেশী জিন— অর্থাৎ কম্বলে পটি দিয়া ঘোড়ার পেটে বাঁধা। সওয়ারদের গায়ে আঙরাখা, মাথায় মাথা-ঢাকা পাগড়ি ও হাতে লম্বা লম্বা বল্লম; ফলাগুলা খুব সানানো, চকচক্ করিতেছে, তাহার উপর আবার সূর্যের কিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দূরে গাছের মাথায় তাহার ছায়া যেন জ্বলিতেছে। তাহার পিছনে আবার বাজন্দার, তাহার পিছনে রথ, এক এক সারথি ও এক এক রথী: নীচে গুপ্ত শস্ত্রাগার; কোনোটা এক ঘোড়ায় টানিতেছে, কোনোটা দুই ঘোড়ায় টানিতেছে। এই সকল রথের পিছনে রাজা স্বয়ং— একক হাতিতে যাইতেছেন; তাহার পর তাঁহারই সব পাত্রমিত্র ও পরিবার। সঙ্গে সঙ্গে মহিষীরা আছেন, রাজকন্যারাও আছেন। ইঁহাদের পর কয়েকখান গোরুর-গাড়িতে সঙ— বানর, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, মারসেনা, মারকন্যা। তাহারো পরে কতকগুলি 'চৌপাল্লায়' নাটক। বিশেষ বেশস্তর নাটক; এই নাটক দেখিলে এখনো তিব্বতীয়-গণ উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনকার বাঙালিদের তো কথাই নাই। এ তাহাদের দেশেরই নাটক, তাহাদের দেশেই লেখা, তাহাদের দেশের লোকই সাজে। তাহার পর গুরুদেবের হাতি; তাহারো পিছনে গুরুদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ খোল-করতাল লইয়া কীর্তন করিতে করিতে

দেহতত্ত্বের গান গাইতে গাইতে যাইতেছে। তাহার পিছনে নেড়া-নেড়ীর দল— সবাই প্রকৃতি, পুরুষ এক গুরু। আর কেহই নাই। সবাই তাঁহার সেবা করিতেছেন। কেহ তাম্বূল যোগাইতেছেন, কেহ অঙ্গে চন্দন লাগাইতেছেন, কেহ ব্যজন করিতেছেন, কেহ অপাঙ্গ বীক্ষণ করিতেছেন, কেহ বা অন্য উপায়ে গুরুর সেবা করিতেছেন। এইরূপে নানা সম্প্রদায়ের গুরু চলিয়া গেলে দেবদেবী আসিলেন; সব এক এক খোলা ঘোড়ার রথে। আসিলেন গণেশ, দুর্গা, সূর্য, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, নানা রকমের সঙ। তাহারো পিছনে হই-হাই, লোকজন, রঙ্গরস, তামাসা-ফস্টি।

৬

গাজন প্রায় এক মাইল লম্বা। গাজন চলিল। রূপা-রাজার এমনই দবদবা, সবাই যে যাহার কাজ, তাহাই করিতেছে, কেহই কোনোরূপ গোলমাল করিতে পারিতেছে না। গাজন সরস্বতীর ধারে আসিল। দেখা গেল, মাস্তুলে মাস্তুলে লোক এক দৃষ্টে গাজন দেখিতেছে; মাস্তুলের মাথার কাছে মাচা বাঁধিয়াছে— সুদ্ধ গাজন দেখার জন্য— ছইয়ের উপর মাস্তুলের দড়ি ধরিয়া, নদীর পাড়ে গাছের উপর উঠিয়া, অগণ্য লোক গাজন দেখিবার জন্য কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে। গাজন নৌকায় পৌঁছিলে গাজনের ভরে নৌকা টলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম সকলে একটু ভয় পাইল, পরে বুঝিল, নৌকা টলিলেও ডুবিবার ভয় নাই। যাহা হউক, একটু ভয়ে ভয়ে রহিল। অল্প-ক্ষণের মধ্যে ছোটো নদীটি পার হইয়া আবার ডাঙায় পৌঁছিলে সকলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এবার সাতগাঁয়ের পথে গাজন। গাঁয়ের পথে ঢুকিবামাত্রই উপর হইতে খই পড়িতে লাগিল, ফল পড়িতে লাগিল, অনেক মাঙ্গল্যদ্রব্য পড়িতে লাগিল। বিশেষ যখন রাজার বা কোনো বড়ো গুরুর হাতি কোনো বড়ো বাড়ির কাছে গেল, ফুল ও খই পড়ার ধুম দেখে কে? আবার যখন মূল সন্ন্যাসীর হাতি আসে, তখন গুরু-দেবের শিষ্যটিকে একটু বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সকলেরই রোখ সেই শিষ্যটির উপর। হাতি রাম দত্ত, স্বরূপ দে, শ্যাম লাহা, যদু কুণ্ডু, মধু ঘোষ, রাম মিত্রের বাড়ির সামনে আসিল; পুরবাসিনীরা— বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন— আহা, এমন দুধের

ছেলেকেও কি সন্ন্যাসে দেয় ? অনেক যুবতী তাহাকে দেখিয়া আপন আপন পতির সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া পতিনিন্দা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ফুল ফেলার বিরাম নাই। শিষ্য বেচারা দুই বার উঠিয়া আঁজলা আঁজলা ফুল ফেলিয়া দিয়া হাওদা সাফ করিয়া ফেলিলেন। না করিলে গুরুও চাপা পড়িয়া মারা যান, আর আপনিও মারা যান। কিন্তু আবার রাশীকৃত ফুল জমিল ও তাঁহাদের হাতি বিহারী দত্তের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল— আবার পুষ্প বৃষ্টি। গুরু হাঁপাইয়া উঠিলেন। শিষ্যও হাঁপাইয়া উঠিলেন। কথাটা রূপা-রাজার কানে উঠিল। তিনি গুরুর হাওদার উপর একটা খুব শক্ত চাঁদোয়া দিতে বলিলেন। ফুলগুলা আর-সব হাওদার ভিতর পড়িতে পাইল না। সকল লোকই কিছু-না-কিছু দিয়া গাজনের পূজা করিল ; নূতন সন্ন্যাসীর পূজা করিল। বিহারী দত্তের কন্যা বিশেষ পূজা করিলেন। তিনি হাতিতে মই লাগাইয়া গুরুর গলায় মালা দিয়া গেলেন আর শিষ্যের গলায়ও মালা দিয়া গেলেন, গুরু ও শিষ্য উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। সেইখানে হাওদায় চারিটি খুঁটি লাগাইয়া উপরে একটা চাঁদোয়া দিতে দেরি হওয়ায় কন্যাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া গুরুর সেবা করিতে পারিলেন। গুরুও তাঁহাকে 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। শিষ্য যদিও কথা কহিলেন না, কিন্তু মন-প্রাণ খুলিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন।

বিহারী দত্তের মেয়েটি পরমা সুন্দরী— একেবারে নিখুঁত সুন্দরী। যেমন মুখশ্রী, তেমনি রঙ ; যেমন গঠন, তেমনই দেহ-সৌষ্ঠব। কিন্তু তাঁহার মুখে একটা বিষাদের ছায়া দেখিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই শঙ্কিত হইলেন ; আর উভয়েই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন— "এ মেয়ের যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।" যাহা হউক, সেবা ও পূজা সাঙ্গ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। গুরু একবার শিষ্যের মুখের দিকে চাহিলেন। গাজন চলিতে লাগিল। গাজন যখন ব্রহ্মপুরীর ভিতর দিয়া যায়, তখন ব্রাহ্মণীরা যথেষ্ট আদর করিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা গাজন দেখাও দোষ মনে করিয়া বাড়ির ভিতর রহিলেন। ক্রমে গাজন রাত্রি নয়টার পর ধরমপুর সঙ্ঘারামে পৌঁছিল। যাহার যে নির্দিষ্ট স্থান, সকলকে সেইখানে পৌঁছিয়া দিয়া রূপা-রাজা সেই রাত্রেই ঘোড়ায় চড়িয়া তারাপুকুর প্রস্থান করিলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভোর হইলে সকলে উঠিয়া দেখিল যে, যেখানে তাহারা রাত্রি কাটাইয়াছে, তাহার দক্ষিণে একখণ্ড চৌকস চৌরস জমি পড়িয়া আছে। জমি-খানি প্রায় একশত বিঘা হইবে। তাহাতে কোথাও একটি ছোটো বা বড়ো গাছ নাই। সমস্তটা ঘাসের জমি। বোধ হইল, যেখানে ঘাস ছিল না, সেখানেও সম্প্রতি ঘাস জমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জমিখানির চারি দিকে কোদালি দিয়া দাগ কাটা ও তাহার চারি কোণে চারিটা খোঁটাখুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে ধ্বজা ও পতাকা দেওয়া। দেখিয়া বোধ হয়, অনেক দিন ধরিয়া এই জমিখানি শোধন করা হইয়াছে, এবং শীঘ্রই এখানে সম্যক-সম্ভোজন হইবে। উদ্যোগও তাহারই কতক কতক হইয়াছে ও হইতেছে।

এ শোধন করা জমিখানা, তাহারা যেখানে রাত্রি কাটাইয়াছে তাহার দক্ষিণে, পূর্ব পশ্চিমে লম্বা। উহার দক্ষিণ-সীমা হইতে কিছু দূরে একটা খাত। খাতের ওপারে মাটির পাঁচিল। খাতের মাটি তুলিয়া খুব চটালো করিয়া পাঁচিল দেওয়া হইয়াছে। তাহার উত্তর দিকটা বেশ ঢালু হইয়া খাতের মাথায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আর সেই পাঁচিলের ঠিক মাঝখানে একটা দোর— পাঁচ তলা-সই উঁচু, কপাট দুখানাই প্রায় চার তলা। কপাটের দুই পাশে চারি তলা ঘর ও কপাটের উপর আর-একতলা। কপাট দুখানি খুব মোটা কাঁটালের তক্তায় তৈয়ারি। আরো মোটা তক্তার বাতা বসানো এবং উহার সমস্ত গায় মোটা মোটা পিতলের গুলা বসানো। উহা নূতন তৈয়ারি হইয়াছে, এখনো চক্‌চক্‌ করিতেছে। কপাটের পাশে ও মাথায় যে সব ঘর আছে, তাহাতে রক্ষী-পুরুষেরা থাকিবে; সেইখান হইতে তাহারা শত্রুপক্ষের গতিবিধি দেখিবে

ও কপাট বন্ধ করিয়া দিবে। শত্রুসেনা নিকটে আসিলে বুকসমান পারা-পেট দেওয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া তীর ছুঁড়িবে, তাহারো বন্দোবস্ত আছে। আজ, কিন্তু, সেখানে রক্ষীপুরুষও নাই, তীর, ধনু, ঢাল, তলোয়ারও নাই। আছে কেবল বাজন্দার ও বাজনা— ঢাক, ঢোল, কাঁসি, দামামা, দগড়া, সানাই, সিঙা, ঝাঁজ— বিশেষ কাহল।

কপাটের দুই ধারে দুইটা ভীষণ আঙ্‌টা ; তাহার ভিতর দিয়া দুই শিকল ; শিকলে একখানা প্রকাণ্ড লোহার পাত টানিয়া খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। আঙ্‌টার নীচে মাটির উপর একটা ঘোরাইবার কল আছে। কল ঘোরাইলে লোহার পাত উঠিয়া পড়ে, আর ছাড়িয়া দিলে পাত পড়িয়া যায়। এখন লোহার পাত খাড়া করাই আছে।

২

যত ফরসা হইতে লাগিল, তাহারা আরো দেখিতে পাইল যে, শোধন করা জমিতে কপাটের দুই পাশ হইতে কিছু দূর গিয়া দুইটা রেখা টানিয়া তাহার ওপারে পূর্বে ও পশ্চিমে কতকগুলি প্রজ্ঞা-মূর্তি ও অনেকগুলি উপায়-মূর্তি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধদের প্রথম ছিল— বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্ন। কিন্তু মহাযানে যখন দর্শনশাস্ত্রের বড়োই আলোচনা, তখন তাহারা বুদ্ধকে বোধির উপায় বলিয়া মনে করেন এবং ধর্মকে প্রজ্ঞা বলিয়া মানিয়া লন, সঙ্ঘ বোধিসত্ত্ব হন। কোনো কোনো মতে ত্রিরত্ন ছিল বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ ; আবার কোনো কোনো মতে ছিল ধর্ম, বুদ্ধ, সঙ্ঘ। মহাযানীরা শেষ মতের লোক ; সুতরাং তাঁহারা প্রজ্ঞাকেই প্রথম রত্ন বলিয়া মনে করিত এবং এখানে পুবের দিকে প্রজ্ঞা-মূর্তিই রাখিয়াছে। কোনো কোনো প্রজ্ঞা-মূর্তি দাঁড়ামূর্তি— সর্বাঙ্গ সুন্দর, দুই হাত দুই পা, সর্ব-অলংকার-ভূষিত। সেই-গুলিই দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিতে সকলের আগে পাওয়া যাইত। তাহার পর বসামূর্তি ; তাহার পর তারামূর্তি ; তাহার পর পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তি —লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্যতারিকা। তাহার পর, বজ্রতারা, বজ্রবারাহী— শুওরের মতো মুখ : তাহার পর বজ্রযোগিনী ; তাহার পর বজ্রধাত্বীশ্বরী। সব মূর্তিই তামায় তৈয়ারি, আর সোনার খুব পাতলা পাতে মোড়া। ইহাতে কখনো মরিচা পড়ে না, সর্বদাই চক্‌চক্ করে।

পশ্চিমের সারিতে প্রজ্ঞাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—উপায়-মূর্তি, অথবা বুদ্ধমূর্তি। কোনো জায়গায় বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন: কোনো জায়গায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন; কোনো জায়গায় এক হাত মাটিতে দিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে এক-একটি প্রজ্ঞার সম্মুখে এক-একটি উপায়-মূর্তি। মূর্তিগুলি সব সাতগাঁ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিহার হইতে আনাইয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্যক্-সম্ভোজনে তাঁহারা যে সুদ্ধ সাক্ষিমাত্র তাহা নহে, তাঁহারাও এই সম্ভোজনে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে ভিক্ষা লইবার জন্য চাদর বিছানো। যে বিহারে যে ভালো চাদরখানি ছিল, আনিয়া মূর্তির সম্মুখে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রজ্ঞা-মূর্তিগুলির পিছনের সারিতে অনেক দেবীমূর্তি,—ক্রোধমূর্তি, শান্তমূর্তি, করুণামূর্তি ইত্যাদি এক এক দেবীরই কত মূর্তি আছে। আর উপায়-মূর্তিগুলির পিছনের সারিতে বোধিসত্ত্ব-মূর্তি, বিশেষ লোকেশ্বর-মূর্তি। কোনো মূর্তির দুই হাত, কোনোটির চারি হাত, কোনোটির দশ হাত, কোনোটির ছত্রিশ হাত, কোনোটির আবার একশ হাত; সাধকের বাসনা-অনুসারে দেবতার হাত, পা ও মাথা যত ইচ্ছা হইতে পারিত। মঞ্জুশ্রী-মূর্তির এক হাতে তলোয়ার ও আর-এক হাতে পুঁথি— বীরমূর্তি অথচ শান্ত এবং হাস্যবদন। তাহার পর গগনগঞ্জ, আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ ইত্যাদি নানা বোধিসত্ত্ব। তাহার পর বজ্রসত্ত্ব চণ্ডমহারোষণ ইত্যাদি অর্ধ-দেব, অর্ধ-অসুর ও অর্ধ-বুদ্ধমূর্তি। সব সোনার পাত মোড়া। সকল দেবদেবীরই মাথায় এক এক প্রকাণ্ড ছাতা, লম্বা সোনায় মোড়া ডাণ্ডার উপর উলটানো সানকের মতো বড়ো বড়ো ছাতা—কোনোটা রেশমের, কোনোটা পশমের; সব ছাতা হইতেই ঝালর ঝুলিতেছে: ঝালরে মুক্তা দুলিতেছে। প্রত্যেক সারিতেই চাদর বিছানো। সকলেই রূপা-রাজার ভিক্ষা লইতে আসিয়াছেন।

৩

এই সকল মূর্তির পিছনে পশ্চিম ও পুবে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা চাদর বিছাইয়া বসিয়া আছেন। পশ্চিমে ভিক্ষুই বেশি, ভিক্ষুণী কম। পুবে ভিক্ষু কম, ভিক্ষুণী বেশি। নাড় পণ্ডিত নিজেই পূবের দিকে আছেন, তাঁহার ভিক্ষুণী নাড়ীও

তাঁহার সঙ্গে আছেন। আর তাঁহাদের দল নাড়ানাড়ীরাও অনেক আছে।

এখনো কার্য আরম্ভ হয় নাই। শোধন করা জমির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে প্রচুর খাবার জিনিস রাশি রাশি রহিয়াছে। হুকুম হইলেই তৎক্ষণাৎ বিতরণ করিবার জন্য অনেক লোকজনও উপস্থিত আছে।

## ৪

একটু বেলা হইলে রাজাধিরাজের আগমন হইল। হঠাৎ নহবৎ বাজিয়া উঠিল, রাজা আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞা ও উপায়-মূর্তির সারির উত্তর মুড়ায় ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। একখানি গরদের কাপড় পরা, একখানি গরদের উড়ানি গায়— তিনি নামিয়াই সমস্ত বুদ্ধ ও ধর্মমূর্তিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সারির মধ্য দিয়া দক্ষিণ মুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিছনে সিদ্ধাচার্য লুই ও তাঁহার চেলা। তাহার পিছনে পুরোহিত সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র; তাহার পিছনে সাতগাঁয়ের বড়ো বড়ো রহীস, বড়ো বড়ো বণিক্ ও বড়ো বড়ো লোক।

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধমূর্তির মধ্য দিয়া যখন তাঁহারা ও মুড়ায় গিয়া পৌঁছিলেন তখন দেখা গেল, সেখানে একটা প্রকাণ্ড শামিয়ানার নীচে এক প্রকাণ্ড গালিচা পাতা; সেই গালিচার উপর বসিয়া সকলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র সমস্বরে তারাদেবীর স্রগ্ধরা-স্তোত্র গান করিলেন। তাহার পর আরো কয়টি স্তোত্র পাঠের পর প্রধান পুরোহিত সাধুগুপ্ত মহারাজাধিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আজ প্রজ্ঞোপায়স্বরূপ, যুগনদ্ধমূর্তি শ্রীহেরুকের নামে এই মহাবিহার নির্মাণ করাইয়া ইহা কলিযুগপাবন সাক্ষাৎ গৌতমবুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধাচার্য শ্রীশ্রী ১০৮ লুইদেবকে দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আপনার সে সংকল্প সাধু!" চারি দিক হইতে প্রতিধ্বনি হইল "সাধু সাধু!" চারি দিক হইতে বাজনা বাজিয়া উঠিল "সাধু সাধু!" বিহার-দ্বার হইতে বাজনা বাজিয়া উঠিল "সাধু সাধু!" সাধুবাদ শেষ হইয়া গেলে পুরোহিত আবার বলিলেন, "আপনি সাধুসংকল্পসিদ্ধির জন্য ইহার

নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য, সর্ব-বুদ্ধ-সর্ব-দেব-দেবী-বোধিসত্ত্ব, সর্ব-যক্ষ-কিন্নর-মহোরগ, সর্ব-ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়, সমস্ত উপাসক-উপাসিকাবর্গের অনুমতি গ্রহণ করুন, যেন আপনার সাধু সংকল্প সুসিদ্ধ হয় !” রাজা সমস্ত বোধিসত্ত্ব-দেবদেবীগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করজোড়ে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি সংকল্প করিয়াছি, শ্রীহেরুকের নামে যে মহাবিহার নির্মাণ করাইয়াছি, তাহা আমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ সিদ্ধাচার্য লুইদেবকে দান করিব ; আপনারা প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন, যেন আমার সংকল্প সুসিদ্ধ হয়।” তখন সকলে “করুন” বলিয়া অনুমতি দিলেন, আবার বাজনা বাজিয়া উঠিল।

গালিচা হইতে নামিয়া রাজা, সাধুগুপ্ত ও সিদ্ধাচার্য তিন জনে একটু দক্ষিণ দিকে গিয়া তিনখানি গালিচার আসনে বসিলেন। রাজা পূর্ব মুখে, তাঁহার বামে সাধুগুপ্ত পূর্বমুখে এবং সিদ্ধাচার্য উত্তরমুখে বসিলেন। পুরোহিত দানের উদ্যোগ করিতেছেন, এই অবসরে রাজা বিহারদ্বারস্থ লোকদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা লোহার পাতখানি আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে নামাইয়া মাটিতে লাগাইয়া দিল। সেখানি একটি তোলা ফটক। তখন দ্বারের ভিতর দিয়া মহাবিহারের অনেক অংশ দেখা যাইতে লাগিল। পুরোহিত রাজাকে বলিলেন, “আপনি বাম হস্তে ঐ লোহার পাতখানা ধরুন।” রাজা তাঁহাকে একটু দেরি করিতে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মেঘ গম্ভীর স্বরে গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “গুরুদেব, আপনি জগতেব যে উপকার সাধন করিয়াছেন, স্বয়ং বুদ্ধ গৌতমও তাহা পারেন নাই। তাঁহার নির্বাণ বহুজন্মব্যাপী বহু-আয়াসসাধ্য ধ্যান-ধারণা, তপ-জপ ও কঠোর সাধনার ফল। কিন্তু আপনার নির্বাণ অতি সহজ, আমার মতো মহাপাপীও আপনার উপদেশে অনায়াসে নির্বাণ-পথের পথিক হইতে পারে। আপনার উপদেশে আমার পুনর্জন্মলাভ হইয়াছে, আমি পবিত্র হইয়াছি, বিশুদ্ধ হইয়াছি ও ধন্য হইয়াছি। প্রজার মঙ্গলই রাজার সকলের আগে দেখা উচিত। তাই আমি আমার প্রজারা যাহাতে বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিত্র হইয়া নির্বাণ-পথের পথিক হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এবং— আপনার উপদেশ যাহাতে চিরস্থায়ী হয়— সেই উদ্দেশ্যে, এই মহাবিহার নির্মাণ করিয়াছি। ইহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য ও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের

সেবার জন্য ৫০ খানি গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি এইগুলি গ্রহণ করিয়া আপনার সেবকানুসেবক এই অকিঞ্চনকে কৃতার্থ করুন।" বলিয়াই রোদন করিতে করিতে গুরুদেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার চোখের জল নিজের উত্তরীয়ে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "উপাসক, আমি ভিক্ষু, আমার এত দান লইবার কি প্রয়োজন ? তুমি ইহা সঙ্ঘকে দান করো।" রাজা বলিলেন, "প্রভু, দয়াময়, আমি সঙ্ঘের কিছু জানি না, আমি আপনাকেই জানি, আমি আপনাকেই দিতেছি, আপনি সঙ্ঘকে দান করুন আর যাই করুন, সে আপনার ইচ্ছা।" তখন গুরুদেব বলিলেন, "তবে সহজ সঙ্ঘের মঙ্গলকামনায় আমি তোমার দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম।" চারি দিক হইতে সাধুবাদ হইতে লাগিল।

৫

তখন রাজা বাম হস্তে লোহার পাতখানা ধরিলেন। পুরোহিত ভাষায় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন, "এই যে মহাবিহার, ইহাতে যাহা-কিছু আছে— জল, স্থল, গাছপালা, ঘরবাড়ি, ইহার উপরে বা নীচে যাহা আছে, সে সমস্ত ও সেইসঙ্গে ইহার সংলগ্ন পঞ্চাশখানি গ্রাম, আমার ইষ্টদেব সিদ্ধাচার্য শ্রীশ্রী ১০৮ লুইদেবকে দান করিলাম।" এই বলিয়া তিনি রাজার হাতে মন্ত্রপূত জল দিলেন, রাজাও সেই জল গুরুদেবের চরণে ফেলিয়া দিলেন। আবার সাধুবাদ, আবার বাদ্য-নির্ঘোষ।

দানকার্য যথাবিধি সমাপ্ত হইলে গুরুদেবের দক্ষিণা ও পুরোহিত দুজনের দক্ষিণা দিয়া রাজা তাঁহার এক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন, সে একটি থলিয়া সোনা লইয়া রাজার পিছু পিছু যাইতে লাগিল। রাজা এক এক খণ্ড সোনা লইয়া প্রজ্ঞা-দেবীদের চাদরে দিতে লাগিলেন। প্রজ্ঞা-দেবীদের পর উপায়-দেবগণকেও এক এক টুকরা সোনা দিলেন, তাহার পর কর্মচারীদিকে ইঙ্গিত করিলে, "তোমরা দানের সামগ্রী সব বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব দেবদেবী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের দান করো।" নিমেষমধ্যে চারি দিকে লোক ছুটিল, সকলের চাদরই ভরিয়া গেল। তাহার পর যেখানে যেখানে যত সহজবৌদ্ধ ছিলেন, সকলকেই দান করিতে আরম্ভ

করিলেন। দান চলিল— সমস্ত দিন চলিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিল। ভিক্ষুরা সেইখানে বসিয়াই আহার করিল এবং স্তবপাঠ ও গান করিতে লাগিল ; ছড়া কাটাইতে লাগিল এবং নানারূপ গোল করিতে লাগিল।

৬

রাজা দান আরম্ভ করিয়া দিয়াই গুরুদেবের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন এবং গুরুদেবকে মহাবিহারে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের আগে গুরুদেব, পিছনে তাঁহার চেলা, তাহার পর দুজন পুরোহিত, তাহার পর রহীস ও বণিকেরা, তাহার পর বিহারের বড়ো মিস্ত্রী, মন্দিরের বড়ো মিস্ত্রী, বড়ো ভাস্কর। সকলের শেষে রাজা। কিছু দূর গিয়া গুরুদেব প্রধান মিস্ত্রীকে দেখিতে চাহিলেন, সে রাজার অনুমতি লইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারের সীমা কতদূর ?"

মিস্ত্রী বলিল, "উত্তর দিকে যেমন খাত দেখিয়াছেন, ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমেও তেমনি খাত আছে। আর ঐ যে চারি দিকে ঘাসের চাবড়া দেওয়া পাঁচিল দেখিতেছেন, ঐ ইহার সীমা।"

"বিহারবাড়ি কই ?"

সে বলিল, "বিহারবাড়ির কথা আমার নয়, তাহার জন্য আর-এক-জন মিস্ত্রী আছে।"

গুরুদেব তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিবার সময় সেই মিস্ত্রীকে পাঠাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। সে রাজার কাছে গেল, রাজা তাহার মাথায় শালের ফেটা বাঁধিয়া দিলেন এবং একগাছ সোনার হার তাহার গলায় দিয়া দিলেন।

বিহারবাটীর মিস্ত্রীকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারে কতগুলি ঘর আছে ?"

সে বলিল, "উপর নীচে চারি শত।"

"মাঝ উঠানে কি আছে ?"

"হেরুক-মন্দির— তাহার সম্মুখে বুদ্ধ-মন্দির ও নাট-মন্দির।"

"নাট-মন্দিরে কত লোক বসিতে পারে ?"

"চারি শতই বসিতে পারে।"

"মূর্তি সব প্রস্তুত ?"

"সে কথা ভাস্কর বলিবে।"

গুরুদেব তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন ও ভাস্করকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। সেও ফেটা পাইল, হার পাইল।

ভাস্কর আসিয়া প্রণাম করিলে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীহেরুকের কোন্ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছ ?"

সে বলিল, "যুগনদ্ধ-মূর্তি।"

"বুদ্ধ-মন্দিরে কি আছে ?"

"অশোক রাজার একটি ছোটো চৈত্য।"

"কোথায় মিলিল ?"

"মহারাজের প্রতাপেই।"

"শাক্যসিংহের মূর্তি কোথায় ?"

"নাট-মন্দিরের বাহিরে।"

"উপরে আচ্ছাদন আছে ?"

"আছে।"

"তোমরা কোথাকার ভাস্কর ?"

"বরেন্দ্রভূমের।"

"বেশ বেশ ! সবই ভালো হইয়াছে। এ সকল মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ?"

"এখন আপনি প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহারাজ তো দান করিয়া দিয়াছেন।"

"সাধু সাধু" বলিয়া গুরুদেব ভাস্করকে বিদায় করিয়া দিলেন ও বলিলেন, "বেলা কত ?"

সে বলিল, "দুপর গড়াইয়া গিয়াছে।"

"তবে বেশ হইয়াছে, আজ আমি সংযত হইয়া থাকিব, কালই প্রতিষ্ঠা করিব।"

বৌদ্ধধর্মের নিয়মানুসারে দুপর গড়াইয়া গেলে, গুরুদেব আহারে বসেন না। আজ সেজন্য আহারে বসিবেন না, ফলের রস পান

করিয়া থাকিবেন। গুরু আর-সকলকে বিদায় দিয়া সমস্ত বৈকাল-বেলাটা বিহার দেখিয়া বেড়াইলেন— দেখিলেন, সবই মনের মতন হইয়াছে। তিনি, নূতন বিহারে তাঁহার জন্য যে ঘর রাখা হইয়াছিল, তাহাতে বিশ্রাম করিতে গেলেন। তখনো নগরবাসীদের দান বাহিরে চলিতেছে।

## তৃতীয়
## পরিচ্ছেদ

গুরুদেব তাহার পর দিন হইতেই প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন। মন্দিরটি ত্রিমালা। প্রথম দিন এক মালার প্রতিষ্ঠা হইল, দ্বিতীয় দিন আর-এক মালার, তৃতীয় দিন আর-এক মালার। ক্রমে হেরুকমন্দির, বুদ্ধমন্দির, নাটমন্দির, পুষ্করিণী, আরাম— সব প্রতিষ্ঠা করিয়া হেরুকমূর্তি, চৈত্য, শাক্যসিংহমূর্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইল ; প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক দিন লাগিল। প্রতিষ্ঠার জন্য যথাশাস্ত্র আয়োজন হইত ও প্রতিদিন একটি একটি সঙ্ঘের ভোজন হইত। আজ সপ্তগ্রাম-বিহারের সঙ্ঘ, কাল বাসুদেবপুর-বিহারের সঙ্ঘ, পরশ্ব শিবপুর-বিহারের সঙ্ঘ, তাহার পর দিন সঙ্ঘনগব-বিহারের সঙ্ঘ। এক এক বিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে, তাহাদের খাওয়াইলে, সঙ্ঘ ভোজন করানো হয়। গুরুদেবের শেষ সংকল্প —শিষ্যের অভিষেক ও তাঁহারই উপর ধর্মপুর-মহাবিহারের ভার-অপণ।

এই গল্পের সব ব্যাপার ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে, চারি-পাঁচ বছর পূর্বের একটি ঘটনা বলা আবশ্যক। ঐ সময়ে সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত সকলের চেয়ে বড়ো বেনে ছিলেন। বিহারী দত্ত বড়োঘরওয়ানা হইলেও তাঁহার পৈতৃক বিত্ত বেশি ছিল না। তিনি নিজেই অনেকবার বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্র পার হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে নানা-রূপ রান্নার মসলা, পানের মসলা আমদানি করিয়া খুব বড়োমানুষ হইয়াছিলেন। এমন-কি— জাবা, বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যত জাহাজ যাইত, সবই তাঁহার ছিল। সেখানকার সব মাল তাঁহার এক-চেটিয়া ছিল। বেনেদের ভিতর তখন চারিটি আশ্রম ছিল— ছত্তিক-আশ্রম, দেশ-আশ্রম, সঙ্ঘ-আশ্রম ও রাউত-আশ্রম। যাহারা ভিক্ষুদের ধূপধুনা অগুরুচন্দন বেচিত, তাহাদিগকে সঙ্ঘ-আশ্রম বলিত। যাহারা

ছাউনিতে আতর, গোলাপ ও অন্যান্য শখের জিনিস বেচিত, তাহাদের আশ্রম রাউত-আশ্রম। যাহারা দশগাঁয় গিয়া রান্নার মসলা ও পানের মসলা বেচিত, তাহাদিগকে দেশ-আশ্রম বলিত। আর যাহারা নগরে বসিয়া ছত্রিশ জাতিকে নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্য বেচিত, তাহাদের আশ্রমের নাম ছত্তিক-আশ্রম। এই চারি আশ্রমের বেনেরাই বিহারী দত্তকে প্রধান বলিয়া মানিত। জাতি ও ব্যাবসার সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলে, তাহারা বিহারী দত্তের কাছে যাইত ও তাঁহার কথা মাথা পাতিয়া লইত। বিহারী যদিও নিজের জোরেই বড়োমানুষ হইয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য এক্কাবাহাদুরের মতো দাম্ভিক বা অহংকারী ছিলেন না। ধরিলে, তিনি লোকের খুব উপকার করিতেন। সাতগাঁয়ের বেনেরা ও ব্যাবসাদারেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

সাতগাঁয়ের বড়ো রাস্তার উপর বিহারী দত্তের খুব বড়ো বাড়ি ছিল এবং সাতগাঁয়ের দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গার ধারে গোলীন গ্রামে তাঁহার এক প্রকাণ্ড গুদাম ছিল। সেখানে অনেক লোক কাজ করিত, মসলাপাতি সেইখানেই গুদামজাত থাকিত। গোলীনের ঘাটেই বিহারী দত্তের শত শত ডিঙা বাঁধা থাকিত। দরকার হইলে বিহারী এখনো সমুদ্রে যাইতে রাজি ছিল। বিহারী দেখিতে অতি সুপুরুষ[1] নেপালে উদাস[৩] বলিয়া এক জাতি আছে। উদাসদিগের শরীর-সৌষ্ঠব সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাহাদের নাক বড়ো, পাতলা, ঠিক বাঁশিটির মতো ; চোখ ডাগর, উজ্জ্বল, পটল-চেরা। তাহারা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাহাদের রঙ খুব উজ্জ্বল নয়, কাশ্মীরী বা আর্মানীদের মতো দুধে-আলতার রঙ নয়, রঙ আর্মানীদের চেয়ে অনেক মাট, লালের আভা খুব কম, সাদা রঙ যেন মাজা। বিহারীকে দেখিলেই উদাস বলিয়াই মনে হইত। বিহারী নিজে খুঁজিয়া একটি পরমা সুন্দরী বেনের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের সময় সে দেখিয়াছিল রূপ, আর দেখিয়াছিল বংশ। বিবাহ করিয়া অবধি স্ত্রীর সহিত তাহার কখনো ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য হয় নাই। সে আপনার স্ত্রীকে বড়োই ভালোবাসিত। বেনেরা প্রায়ই বিদেশে গিয়া একটু এদিক ওদিক করে। বিহারী কখনো সে কাজ করে নাই। সে একেবারে "স্বদার-সন্তোষী" ছিল। বিহারীর ধর্ম কি ছিল, তাহা ঠিক বুঝানো যায় না। শুধু বিহারী কেন ?— সে কালের বেনেদের

যে কি ঠিক ধর্ম ছিল, বলা যায় না। তাহারা ব্রাহ্মণ দিয়া দশকর্মও করাইত, আবার বুদ্ধের মন্দিরে ধূপ-ধুনাও দিত। তাহারা ব্রাহ্মণ আসিলে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া পায়ের ধুলা লইত ; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আসিলেও তাঁহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিত। দুই ধর্মের লোককেই তাহারা যথেষ্ট দান করিত। বিহারীর বৌদ্ধধর্মের দিকেই টান বেশি ছিল। কেননা, সাতগাঁ-বিহারের মহাস্থবির শান্তশীলের আশীর্বাদে তাহার একটি সন্তান হইয়াছিল। সেইটি তাহার একমাত্র সন্তান— সেটি একটি মেয়ে। মেয়েটিকে সে বড়োই ভালোবাসিত। সমস্ত দিন কাজকর্ম করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রী ও মেয়ের কাছে বসিয়া সে সমুদ্রের বর্ণনা করিত। সমুদ্রের ওপারে যে সব দেশ আছে, তাহার বর্ণনা করিত— দারুচিনির গাছ, লবঙ্গের গাছ কেমন, বুঝাইয়া দিত, ঐ সব দেশের লোকের কথা বলিত। কতবার কত বিপদে পড়িয়াছিল— তাহার গল্প করিত, একবার তাহার ডিঙা ডুবিয়া যায়— সে গল্প করিত, একবার রাক্ষসেরা তাহাকে খাইতে আসিয়াছিল। কত বড়ো বড়ো গাছ দেখিয়াছে, কত বড়ো বড়ো ফুল দেখিয়াছে, কতবার কত লড়াই-ঝগড়া করিয়াছে, সে এই সব কথা বলিত। কেমন করিয়া দেশী সামান্য সামান্য জিনিস দিয়া বিদেশী মহামূল্য জিনিস কিনিয়া আনিয়াছে, তাহারো গল্প করিত। স্ত্রী কখনো শুনিত, কখনো শুনিত না ; ঘরকন্নার কাজ দেখিতে চলিয়া যাইত। তাহাকে অতিথ-পথিক দেখিতে হইত, রাতভিখারীদের ভিক্ষা দিতে হইত, চাকর-চাকরানীদের দেখিতে হইত, একটু অবসর পাইলে তবে সে স্বামীর গল্প শুনিতে পাইত। মেয়েটি কিন্তু খুব মন দিয়া বাবার গল্প শুনিত, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত, মাঝে মাঝে 'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে সমুদ্রে যাব' বলিয়া আবদার করিত। বিহারী সে আবদার রাখিতে পারিত না, মেয়েকে অন্য কথা পাড়িয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু মেয়ের যত বয়স হইতে লাগিল, সমুদ্র দেখিবার জন্য জেদও তাহার বেশি হইতে লাগিল। বিহারী ভাবিয়াছিল, তাহাকে তো আর সমুদ্রে যাইতে হইবে না, ব্যাবসা এখন লোকজন দিয়াই যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে। সুতরাং মেয়ে হতে তার আর ভয় নাই। সে না গেলে তো আর মেয়ে সমুদ্রে যাইতে চাহিবে না। এ বিষয়ে সে একরূপ নিশ্চিন্তই ছিল।

২ ৯৯৫ সালে সে দেখিল, ৩/৪ খেপে তাহার লোকসানই হইয়াছে, লাভ হয় নাই। কেন এরূপ হয় সে ভাবিয়া পায় না। যে ব্যবসায়ে শতকরা ২০০৲ মুনফা হয়, সে ব্যবসায়েও লোকসান! এ কেমন কথা? সে সন্ধান লইতে লাগিল। সন্ধান পাওয়াও কঠিন। ব্যাপারটা হয় সাগরের ওপারে। যাহারা যায়, তাহারা সব কথা ঠিক বলে না। কারিন্দার দোষে হয়? কি মাঝিদের দোষে হয়? কি, সে দেশের লোক চালাক-চতুর লইয়া উঠিয়াছে বলিয়া হয়? কিছুই বুঝিতে পারিল না। শেষে স্থির করিল, সে একবার সেখানে নিজেই যাইবে; কিন্তু সে মেয়েকে এ কথা কিছুতেই জানিতে দিবে না। সে গোলীনের ঘাটে ডিঙা, নৌকা সাজাইতে লাগিল, লোকজন ঠিক করিতে লাগিল, মাঝি-মাল্লা নিযুক্ত করিতে লাগিল। সে এখন বড়োমানুষ হইয়াছে, নিজে সমুদ্রপারে যাইবে, তাই খুব সাজ-সরঞ্জাম চলিতে লাগিল। পূর্বে সেখানে সে সাত-আট-বার গিয়াছে, কিসে সুবিধা হয়, কিসে অসুবিধা হয়, সে বেশ জানে। কোন্ লোকটা সমুদ্রে ভয় খায়, কোন্ লোকটার সাহস আছে, কোন্ লোকটার হাতটান আছে, কোন্ লোকটা সে দেশে গিয়া একটু বেচাল করে, সে দেশে কোন্ জিনিস পছন্দ করে, কোন্ জিনিস করে না, কোন্ জিনিসটি পাইলে তাহার বদলে বেশি জিনিস দেয়— এ সকল সে বেশ বুঝে, এবং সেইরূপ বন্দোবস্তও করিতে লাগিল।

এ সব সে কেবল লুকাইত মেয়েকে, আর মেয়েকে লুকাইতে গেলে সকলের আগে স্ত্রীকে লুকাইতে হয়, সে স্ত্রীকেও লুকাইত। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এমন একটা ঘটনা লুকাইয়া রাখা অতি কঠিন; বিশেষ বেনেবৌ বহুকাল হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে যে, সে আর স্বামীকে সমুদ্রে যাইতে দিবে না। যে কাজে এত বিপদ, এত প্রাণের আশঙ্কা, এত জন্তু-জানোয়ারের ভয়, ঝড়-ঝাপ্টার ভয়, সে কাজে আর সে স্বামীকে যাইতে দিবে না, স্থির করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পাছে স্বামী আবার যান, তাই সে সর্বদাই সতর্ক থাকিত। সতর্ক থাকার ফলে, সে সব জানিতে পারিল, স্বামীকে চাপিয়া ধরিল, "তুমি কিছুতেই যাইতে পাইবে না।" মেয়েও ধরিয়া বলিল [ বসিল ], "বাবা, এবার আমিও যাব।" বিহারী প্রমাদ গনিল। উদ্যোগপর্ব প্রায় শেষ হইয়াছে, এখন

ফিরিবার জো নাই। সেও খুব শক্ত লোক। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, অনেক কান্নাকাটির পর মেয়েকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিল, তখন স্ত্রীর পরাজয় হইল। তখন স্ত্রী বলিল, "ও মা, আমি মেয়ে ছেড়ে থাকিব কিরূপে ? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটিমাত্র মেয়ে"— বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিহারী অনেক বুঝাইল— "তুমি গেলে, আমার গৃহস্থালি কে দেখিবে ? ঠাকুর-দেবতার পূজা কে দেখিবে ? অতিথ-পথিকের সেবা কে করিবে ? গৃহিণীর গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া উচিত নয়।"

কিন্তু এবার বেনেবৌ নাছোড়বান্দা— "তুমি যাবে, মেয়ে যাবে, আমি কি নিয়ে ঘরে থাকিব ?"

বিহারীর বক্তৃতায় কোনো ফলই হইল না, অনুরোধ-উপরোধেও কোনো ফল হইল না ; শেষে স্থির হইল, তিন জনেই যাইবে। বড়ো বড়ো বেনেরা আসিয়া ধরিয়া বসিল— "পরিবার সঙ্গে বিদেশে যাওয়া ! এ তো আমাদের দেশে কখনো নাই ! গেলে ভারি নিন্দা হবে।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আচার্য মহাশয় আসিয়া দিন দেখিয়া দিলেন, সেই দিন— কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথি— বিহারী মেয়ে ও পরিবার সঙ্গে লইয়া ডিঙা ভাসাইলেন।

৩

বিহারী দত্তের ডিঙা ভাসিল। ডিঙা একখানা নয়, দুইখানা নয়, এক এক সাঙ্ঘায় সাতখানি করিয়া ডিঙা— এমন সাত সাঙ্ঘা ডিঙা ভাসিল। প্রত্যেক সাঙ্ঘায় এক এক জন বুড়া পাটনি। আর মধুকর নামে যে ডিঙায় বিহারী দত্ত ও তাঁহার পরিবার ছিল, তাহার পাটনি এই সকল সাঙ্ঘার কর্তা। প্রত্যেক সাঙ্ঘার এক-একখানি ডিঙায় ১০০ জন করিয়া জোয়ান পুরুষ তীর, ধনুক, ঢাল, তরবাল লইয়া ডিঙারক্ষা করিবার জন্য আছে। সব নৌকার খোলে মাল বোঝাই, এসব বিক্রির মাল— ভালো কাপড়, বারাণসী শাড়ি, ঢাকাই মস্‌লিন, খেলনা, গাঁজা, সিদ্ধি, চন্দনকাঠ, পাট, থলে, রেশম, তসর, গরদ, ক্ষীরোদ, এণ্ডী।

প্রত্যেক সাঙ্ঘার এক-একখানা নৌকায় কেবল খাবার জিনিস- চাল, ডাল, আটা, লবণ, নারিকেল, চিড়া, ছাতু, তেল, ঘি, চিনি।

শীতবস্ত্রের বড়ো দরকার ছিল না। বিছানা-মাদুর যার যেমন ইচ্ছা, তেমনই লইল। লোহার ও মাটির উনুন অনেক লইল। কাঠ, কয়লা, চকমকি, সোলা, টিকাও অনেক লইল।

নৌকাগুলির আকার একরূপ নয়। কতকগুলি হালের দিকে খুব উঁচা, অপর দিকে তত উঁচা নয়। এগুলি প্রায় গোল। ইহাদের খোল ফাঁদালো ও গভীর— অনেক মাল ধরে— প্রায় আগাগোড়া ছইয়ে ঢাকা। ছইগুলি শরকাঠির উপর সরু সরু বাখারির ঘন ঘন বাতা দিয়া বাঁধা। চারি পাশেও ঐরূপ শরকাঠির উপর বাখারির বাঁধন। এক-একখানি ছইয়ের নীচে অনেকগুলি কামরা। প্রত্যেক কামরায় লম্বায় দুটি করিয়া জানালা ও আড়ে একটি করিয়া দুয়ার। এই আকারের নৌকা যে সাঙ্ঘায় ছিল, তাহারই একখানিতে বিহারী দত্ত সপরিবারে বাস করিতেন। সেই ছইয়ের উপর একটি প্রকাণ্ড মাচা, মাচার উপর একটি ঘর। বুড়া পাটনি রাতদিন সেই মাচার উপর হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিত। হালখানি দেখিতে মাছের লেজের মতো, গভীর জল পর্যন্ত গিয়াছে। হালের মাথায় একটি লোহার শিক বাঁধা। মাঝির হাতে সেই শিক। প্রত্যেক নৌকার দুই ধারে পিতলের দুইটা করিয়া বড়ো বড়ো চোখ। মাঝখানে বড়ো বড়ো বেনের নাম লিখা।

আর-এক সাঙ্ঘার নৌকাগুলি লম্বা ছাঁদের। তাহাতেও ঐরূপ ছই, ঐরূপ অনেকগুলি কামরা, ঐরূপ চোখ ও বেনের নাম লেখা। এক এক নৌকায় ৩০/৪০ খানি করিয়া দাঁড়, প্রকাণ্ড মাস্তুল ও অনেকগুলি করিয়া পাল।

নদীর ভিতর নৌকা চালানো বিশেষ কঠিন, কেননা, মাঝে মাঝে চড়া আছে। মাঝিদের সে সব জানা-শুনা। তাহারা অনায়াসেই নদী বাহিয়া সমুদ্রে পড়িল। সমুদ্রের কিনারায় ডিঙা লাগাইয়া সমুদ্রের পূজা দিল। সেদিন তীরে আহারাদি করিয়া খাবার জল তুলিয়া লইল। প্রত্যেক নৌকায় অনেকগুলি করিয়া জালা ছিল। এখন সেইগুলি মিষ্টজলে পরিপূর্ণ করিয়া লইল। তখন সকলে বরুণদেবের সারিগান ধরিল, ক্রমে ডিঙা সমুদ্রে আসিয়া পৌঁছিল।

যত দূর নদীর জল যায়, জল ঘোলা ; তাহার পর খানিক সবুজ জল ; তাহার পরই 'কালাপাণি'— জল সিউ-কালির মতো কালো।

তাহাতে ছোটো ছোটো ঢেউ খেলিতেছে। আর ঢেউয়ের উপর মুক্তার মতো সাদা জলের কণা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ডানাওয়ালা মাছ লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে, দুই-চারিটা ডিঙার উপরেও পড়িতেছে। এইরূপে একটি মাছ পাইয়া বিহারী দত্তের মেয়ে তো আহ্লাদে আটখানা। তখনই রসুইদারকে ডাকাইয়া মাছটি ভাজাইয়া লইল ও তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিল। মাঝে মাঝে সমুদ্রের উপর অনেক জলজন্তু ভাসিয়া উঠিত। এমনি তো সে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাকে বিব্রত করে ; সমুদ্রের মাঝে যে সে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তাহার ঠিকানা নাই। ভোর হইতে-না-হইতেই সে ছইয়ের উপর গিয়া মাঝির কাছে বসে আর মাঝিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে ; দুই-এক দিনেই সে বুঝিল যে, সমুদ্রের কথা তাহার বাবার চেয়ে মাঝিই ভালো জানে।

## ৪

একদিন ভাত খাইবার সময় সে বাবাকে বলিল, "বাবা— বাবা, আজ ভোরবেলায় মাঝির কাছে মাচার উপর বসিয়াছিলাম ; দেখি কি, সূর্য জলের ভিতর থেকে উঠছে! সূর্য উঠবার আগে আলোগুলো বাহির হইতে লাগিল— ঠিক যেন দাঁড়। দেশে যে দেখি, সূর্যের হলুদ রঙ, দেখিতেও খুব ছোটো ; কিন্তু এখানে দেখি যেন একটা প্রকাণ্ড রাঙা জালা। দাঁড় দিয়ে কে যেন জালাটাকে উপরে টেনে তুলছে। সূর্য জল থেকে যখন বাহির হইল, তখন ক্রমে ক্রমে রাঙা রঙ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল, আর আমাদেরই দেশের মতো চকচকে হলুদ রঙ হয়ে দাঁড়াল। আমার চোখও ঝলসে যেতে লাগিল। আমি আর তাকাতে পারিলাম না।"

আবার একদিন মেয়েটি বলিল, "হাঁ বাবা, মাস্তুল ধরে যখন ছইয়ের উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, দেখি কি না, জলটা যেন গোল হয়ে গিয়াছে, আর তাহার ওদিকের জল যেন নামিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন একটা খুরা-দেওয়া বাটি উবুড় করিয়া রাখিয়াছে।"

আবার একদিন বলিল, "আজ সূর্যকে ডুবিতে দেখিয়াছি। রাঙা জালাটির মতো আস্তে, আস্তে, আস্তে জলের ভিতরে পড়িয়া গেল।"

দুই-চারি দিন তো বেশ আমোদে কাটিয়া গেল। ক্রমে যত টাটকা তারিতরকারি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, শুধু নারিকেল-ভাজা, ডাল আর ডালের বড়া সম্বল হইল, জলখাবারের মধ্যে কেবল হইল শুকনা চিড়া, শুকনা গুড় ; তখন ডাঙা দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ো আকুল হইয়া উঠিল। মাঝিকে তখন মেয়েটি কেবল জিজ্ঞাসা করে— "ডাঙা কত দূর ?"— আর চারি দিকে চাহিয়া দেখে, গাছপালা দেখা যায় কি না।

পাঁচ-সাত দিনের পর একদিন দূরে দেখা গেল, একটা কালো দাগ যেন জলের ভিতর থেকে উঠছে। মেয়ে অমনি জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কী ?" মাঝি বলিল, "ওটা রাক্ষসের দ্বীপ। ওখানে যারা থাকে, তারা কাঁচা মানুষ খায়।" মেয়ে অমনি পাইয়া বসিল, "তাদের তুমি কেমন করিয়া দেখিলে ? দেখিলে যদি, তোমায় তাহারা খাইল না কেন ? তাহারা মানুষ রাঁধিয়া খায়, না কাঁচাই খায় ইত্যাদি ইত্যাদি।" মাঝি যাহা যাহা জানিত, সব বলিল। বলিল, "ওদেশে তাহারা প্রায়ই যায় না। ও জায়গাটা তাহারা বাঁয়ে ফেলিয়া সরাসর দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়। একবার গিয়াছিল : ঝড়ে নৌকা বাঁধিবার জন্য গিয়াছিল। অনেক রাক্ষস আসিল। তাহারা একেবারে নেংটা থাকে, কেউ কেউ একটা পাতার কাপড় পরে। যেমন শালপাতায় কাঁটা দিয়া খাবার পাত্র হয়, সেই রকম পাতায় কাঁটা দিয়া কাপড় করে, তাই পরে। তাও সকলে নয়। তারা মাছ ধরিয়া খায়, শিকার করিয়া মাংস খায়, আর একলা-দোকলা মানুষ পাইলেও খাইয়া ফেলে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল, সেই ভয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই। কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া চলিয়া যায়।" মাঝি সে দিকে নৌকা চালাইল না। মেয়েরও রাক্ষসের দেশ দেখার বড়ো ইচ্ছা ছিল না। সেও নামিয়া আসিয়া বাবাকে রাক্ষসের দেশের গল্প শুনাইতে লাগিল।

৫

ক্রমে ডিঙাগুলি গিয়া বালীদ্বীপে পৌঁছিল। সেই জায়গাটাকে বড়ো আড্ডা করিয়া বিহারী সমস্ত দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও সব জায়গাই এক-

একবার ঘুরিলেন। কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করিলেন। হিসাব দেখিলেন। বাহাল-বরখাস্ত করিলেন। দেশের লোকের সঙ্গে ব্যবসায়ের পথ ফালাও করিলেন। এইরূপে চারি-পাঁচ মাস থাকিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবার ব্যবসায়ে অনেক লাভ হইল ; কারণ, যে সব জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সবই বিকাইয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন, তত ভাল জিনিস, আর তত বেশি জিনিস আর কখনো পান নাই ; সুতরাং তিনি খুব খুশি, তাঁহার সংস্কার, মেয়ের পয়েই তাঁহার লাভ বেশি হইয়াছে ; সুতরাং মেয়ের উপর তাঁহার ভালবাসা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েও খুব খুশি ; বিহারীর সঙ্গে যাহারই কারবার ছিল, সকলেই মেয়েকে খুব আদর করিয়াছে, নানা জিনিস দিয়াছে। রাজারা মেয়েকে কোলে করিয়া তাহাকে খাবার দিয়াছেন, গহনা দিয়াছেন ; সে যাহা দেখিতে চাহিয়াছে, সব দেখাইয়াছেন। সব মন্দিরে সে গিয়াছে। সব জায়গায় পূজা দিয়াছে, সময়টা তার খুব সুখেই কাটিয়াছে। তথাপি দেশে ফিরিবার নামে তাহার বড়োই আনন্দ। দেশের এমনি টান, আবার সাঁতগাঁ যাইবে, আবার পুরানো খেলুড়িদের সঙ্গে খেলা করিবে, গঙ্গায় স্নান করিবে, ঠাকুরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিবে, তাহার ভারি আহ্লাদ।

ক্রমে ক্রমে ঊনপঞ্চাশখানা ডিঙা আসিয়া বালীদ্বীপে জুটিল। যার যা মেরামতের ছিল, মেরামত করা হইল। সব ডিঙা আবার বাংলার দিকে চলিল। অনেক বাঙালি বহুদিন ধরিয়া বিদেশে বিহারীর কাজ করিতেছিল, তাহারা অনেকে ছুটি লইয়া, অনেকে ইস্তফা দিয়া, অনেকে বৃত্তি বার্ষিক লইয়া, অনেকে আবার বরখাস্ত হইয়া দেশে ফিরিল। সবাই বিহারীর অতিথি, বিহারী অতিথিদের সৎকারে মুক্তহস্ত। বিহারীর স্ত্রী এইসব অতিথিদের সেবায় খুব মন দিয়াছেন। তাহাদেব কাহারো কোনো জিনিসের দরকার হইলে তৎক্ষণাৎ যোগাইতেছেন। আর বিহারীর মেয়ে সবারই সব, সর্বদাই সবার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহাকেও দাদা মহাশয়, কাহাকেও কাকা, কাহাকেও মামা, কাহাকেও ভাই বলিয়া সকলেরই কাছে যাইতেছে, সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর সকলেরই কোলে উঠিতেছে, সকলেরই আদর পাইতেছে। সেই বুড়া মাঝি কিন্তু তাহার প্রধান সঙ্গী, সে

ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই কাছে যাইতেছে। এক মেয়েতে ডিঙাগুলিকে মাত করিয়া রাখিয়াছে।

সব ডিঙা ভাসিল. কেহ বলিল জয় কালী. কেহ বলিল জয় সাত-গাঁয়ের কালী। কেহ বলিল, জয় গঙ্গামার জয়. কেহ বলিল, জয় বরুণ-দেবের জয়, কেহ বলিল, জয় সমুদ্রের জয়। বেশ আমোদে দিন কাটিতে লাগিল। যাবার সময় স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া পাল তুলিয়া আসিয়াছে। আসার সময়ও ঠিক সেই ভাব। বিহারীর আনন্দ ধরে না। সে এক-একবার ছইয়ের উপর উঠিয়া ডিঙা গনে দেখে, সব ডিঙাই চোখের সামনে আছে। মনে মনে লাভালাভ কষে, আর দেখে যে, এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর-কখনোই হয় নাই!

## ৬

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। একদিন সকালে উঠিয়া দেখিল, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালো মিসমিসে একখানা মেঘ উঠিয়াছে। মাঝি বলিল, "দত্ত মহাশয়, আজ বড়ো সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন, ওখানা ভালো নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে। আপনারা আপন আপন কামরায় যান, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বেশি নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।" বলিতে বলিতে ঝড় উঠিল, প্রথম বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ. তাহার পর ঝাপ্‌টা. এক-এক ঝাপ্‌টায় নৌকাগুলা যেন উল্টাইয়া পড়ে, কিন্তু বাংলার পাটনি মাঝি বড়ো শক্ত মাঝি। হাল চাপিয়া ধরে আর নৌকা ঠিক থাকে। ঝাপ্‌টা আসার পূর্বে মাঝির হুকুমে সব পালগুলি গুটানো ও নামানো হইয়াছিল; সুতরাং পালসুদ্ধ নৌকা গুঁজড়াইয়া অতল জলে ডুবিবে, সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝড়-ঝাপ্‌টা, ঝড়ের ধাক্কা, গোঁগোয়ানি, এ সকলের চেয়ে আর-এক ঘোর বিপদ আসিয়া পৌঁছিল, সে হইল সমুদ্রের ঢেউ। জোর বাতাসে ঢেউগুলি জোরে জোরে উঠিতে লাগিল। সিকি মাইল, আধ মাইল, এমন-কি, এক মাইল লম্বা এক-একটি ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতে লাগিল। নৌকা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। ছইয়ের উপর দিয়া ঢেউ গিয়া নৌকার ওপারে পড়িতে লাগিল। ঢেউয়ের মাঝখানে নৌকা পড়িলে,

চড়ন্দারেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সকলে ইষ্টদেবতার নাম করে; ভাবে, আর রক্ষা নাই। এক মুহূর্ত পরে আবার ঢেউ সরিয়া গেলে, আবার তাহাদের মনটা একটু সুস্থ হয়। কিন্তু সে সুস্থভাব কতক্ষণ? আবার ঢেউ, আবার ঢেউ। যেন রাশি রাশি, বস্তা বস্তা তুলা— পিঁজা তুলা সমুদ্রের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাতাসে জল প্রথম ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। দশ হাত, কুড়ি হাত, ত্রিশ হাত পর্যন্ত জল ফুলিয়া উঠে; সেই ফোলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মতো উঠিয়া পড়ে; তাহার পর সেই ফোলা জলের মাথাটা ফাটিয়া ফেনা বাহির হয়। ফেনা গড়াইতে থাকে, ফেনা গড়াইতে গড়াইতে দু ক্রোশ, পাঁচ ক্রোশ, দশ ক্রোশ যাইয়া আবার জলে মিশিয়া যায়। থাকে কেবল দুধের মতো সাদাটুকু। কবির বড়ো আমোদ, তিনি খুব বর্ণনায় সুবিধা পান; কিন্তু যাহারা সেই ফেনার মধ্যে পড়ে, তাহাদের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে। চড়ন্দারেরা মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া করে, "তোরা আপনার দোষে আমাদের ডুবাইলি দেখিতেছি।" তাহারা মাঝিদের গালি পাড়ে। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণে নৌকা রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের গলদ্‌ঘর্ম হইতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? তাহারাও গালি পাড়ে; আর বলে, "আমরা কি করিব? তোমাদের বলিতেছি, চুপ করিয়া বসিয়া থাকো, নড়িলে চড়িলে নৌকা রাখা ভার হইবে।" তাহারা বলে, "হাঁ রে বেটারা, আমরা কি গুড়ের নাগরি যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের কি প্রাণের ভয় নাই? তোদের কি? তোরা পরের প্রাণ লইয়া খেলা করিতেছিস।" তাহারা বলে, "আমাদের বুঝি প্রাণ নয়? তোমাদেরও যেমন প্রাণ আমাদেরও তেমনি। আমাদের প্রাণ থাকিলে তো তোমাদেরও প্রাণ থাকিবে।" একজন বলিল, "বেটারা জানিস, এই সাঙ্গায় বিহারী দত্ত আছে। সে যদি ডুবে, বাংলা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে।" তাহারা বলিল, "হাঁ হাঁ, জানি; কিন্তু আমাদের নিজের প্রাণটা আমাদের কাছে শত শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশি দরকারী। বিহারী মরিলে তাহার ধন আছে, দৌলত আছে, তাহার পরিবারদের দেখিবার অনেক লোক হইবে। আমাদের স্ত্রীপুত্রকে

দেখিবার কে আছে, বলো দেখি ?” আবার ঢেউ আসিল। সব ঝগড়া-বিবাদ, সব চেঁচামেচি বন্ধ হইয়া গেল। আবার ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়িয়া গেল।

৭

এদিকে বিহারীর নৌকায় ঢেউ দেখিয়া মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দাঁতকপাটি লাগিয়াছে। বিহারীরা স্ত্রী-পুরুষে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সে কিছুতেই সমুদ্রের গোঁগোঁয়ানি সহিতে পারিতেছে না, আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময় বিহারীর স্ত্রীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল, মাঝিরা একখানা কাঠের সেঁউতি আগাইয়া দিল। বেনেবৌ তাহাতে বমি করিতে লাগিলেন, বমি থামে না। একটু সুস্থ হন, আবার বমি, নৌকা যত দোলে, বমি ততই বেশি হয়। বোধ হয় যেন, পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে কাতরভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, আর বমি করে। কথা কহার সামর্থ্য নাই, শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। বেনেবৌ অসাড় হইয়া পড়িল। মেয়ের ও স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া বিহারী স্থির থাকিতে পারিল না। বার বার বড়ো মাঝিকে ডাকিতে লাগিল। মাঝি আসে না। সে বলে, “এখন আমি হাল ছাড়িলে রক্ষা থাকিবে না।” তখন বিহারী পাগলের মতো হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিল, “আমার স্ত্রীর এই অবস্থা, আমার মেয়ের এই অবস্থা, আমায় রক্ষা করো।” সে বলিল, “রক্ষাকর্তা আমি নহি, সে ভগবান্ ! ভগবানের শরণ লও।” বিহারী বলিল, “আমি যে ভগবান্‌কে ডাকিব, সে শক্তি নাই। সম্মুখে আমার সর্বস্ব স্ত্রী ও কন্যা মারা যায়, আমার মনে সে জোর কোথায় যে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি ? তুমি রক্ষা করো।” মাঝি বলিল, “তোমার স্ত্রীর যে ব্যারাম হইয়াছে, জলের ক্ষোভ হইলে অনেকেরই ওরূপ হয়। জল স্থির হইলে উহা আর থাকিবে না। তুমি একটু শান্ত হও। এতবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছ, তুমি উতলা হও কেন ? তোমার মেয়ের প্রাণের কোনো ভয় নাই। সে ঢেউ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, ঢেউ থামিলেই সুস্থ হইবে।” বিহারী

বলিল, "আমার আর সয় না, তুমি ইহার একটা বিহিত করো, নহিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব : ঐ শুন, আবার বাতাস গোঁ-গোঁ করিতেছে, আবার ঝাপ্‌টা আসিবে। আবার পর্বতপ্রমাণ ঢেউ আসিয়া নৌকা-খানাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিবে।" মাঝি বলিল, "মশাই, আমি এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আপনার ৭/৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে, সহিতে পারিবেন তো বলুন।" বিহারী বলিল, "আমার যথাসর্বস্ব যায়, সেও আচ্ছা, আমার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়।" "আচ্ছা, তবে আপনি ঘরে যান, আমি যাহা জানি, করিয়া ফেলি।" বলিয়া মাঝি আর-একজন মাঝিকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিল। সে নৌকার খোলের ভিতর গেল আর সমস্ত মাঝি-মাল্লা ডাকিয়া ৫০টা গর্জন তেলের পিপা বাহির করিয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড় যখন খুব জোরে আসিতেছে, তখন সেই পিপার সমস্ত তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অনেক কষ্টের সংগ্রহ করা তেলের পিপা-গুলি এইরূপে নষ্ট করায় বিহারীর মনে একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তেল যত দূর যাইতে লাগিল, সমুদ্র স্থির হইতে লাগিল ; বাতাসের যে জোর, সেই জোরই রহিল, কিন্তু সমুদ্রে আর ঢেউ উঠে না। সমুদ্র দর্পণের মতো স্থির হইল : নৌকা জোরে চলিতে লাগিল, কিন্তু টলে না। বেনেবৌ একটু সুস্থ হইল, তাহার বমি থামিয়া গেল। মেয়েও সুস্থ হইল; বেনেরও মনটা ঠাণ্ডা হইল, সে মাঝিকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবে স্বীকার করিল। মাঝির উপর তাহার বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল। ঝড় তখনো সমানে বহিতেছে ! মাঝি দত্ত মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইল। বেলা তখন দুপর। বিহারী মাঝির ঘরে বসিয়া দেখিল, তাহার নৌকা স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর-পশ্চিমমুখে যাইতেছে। তাহার সব ডিঙাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে। মাঝি বলিল, "ঝড়ে আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় ৭/৮ দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সন্ধ্যার পূর্বেই হউক বা একটু পরেই হউক, গঙ্গার মোহানায় গিয়া পৌঁছিব।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাঝি যাহাই বলিল, তাহাই হইল। সন্ধ্যার একটু আগে, চাকি ডুবডুব সময়ে বিহারীর সাঙ্ঘার ৭ ডিঙা গঙ্গার মোহানায় আসিয়া পৌঁছিল ও একটা প্রকাণ্ড বালির চড়ায় নোঙর করিল। চড়াটা অনেক উঁচা হইতে ক্রমশ ঢালু হইয়া জলের ভিতর চলিয়া গিয়াছে ; যেখানটা খুব উঁচা, সেইখান হইতে ওদিকে নিবিড় বন। সুন্দরী-গাছই বেশি ; সোঁদাল, পাঁও প্রভৃতি গাছও আছে, দুই-চারিটা বড়ো গাছও আছে। আর তলায় বেতবন, গোলপাতার গাছ, আর নানা রকম লতাগুল্ম। নোঙর করা হইলে অনেক মাঝি ও অনেক চড়ন্দার মহা-আনন্দে নামিয়া অনেক দিনের পর বাংলার মাটি ছুঁইয়া গেল।

বিহারীর স্ত্রী ঝড় থামিলেই ঘুমাইয়া পড়িল। সে বড়োই কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটা কিন্তু ঝড় থামিলেই আবার যে সেই হইয়া দাঁড়াইল, তাহার ভয় ভাঙিয়া গেল। সে আবার মাঝির হাল-ঘরে গিয়া বসিল। "বাংলার মাটি" ছুঁইবার ইচ্ছা তাহারো হইয়াছিল, কিন্তু মাঝি তাহাকে যাইতে দিল না। কিন্তু সে কেবল দেখিতে লাগিল যে, বালির উপর কত রকমের ঝিনুক ও কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে— ছোটো, বড়ো, লাল, সাদা, ডোরা দেওয়া, দাগ দেওয়া। সে যে কত তাহার ঠিকানা নাই। ঝিনুক কুড়াইবার সাধ তাহার বড়োই হইয়াছিল ; কিন্তু মাঝি বলিল, "সন্ধ্যার সময় এখানে ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমির থাকে। তোমার যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না।" বলিতে বলিতেই কতকগুলি লোক "শিয়াল শিয়াল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আর দেখা গেল, একটা বাঘ ছুটিয়া পলাইতেছে। সুতরাং মেয়ের আর যাওয়া হইল না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, সে আপনার ঘরে গেল

ও ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও সে ঝিনুক স্বপ্নে দেখিয়াছিল। ঝিনুকের উপর তাহার ভারি টান হইয়াছিল।

ভোর হইল। দু-একজন মাঝি উঠিল, উঠিয়া নৌকার সিঁড়ি মাটিতে দিল, নৌকা হইতে নামিল। ডাঙায় উঠিয়া তাহারা নিজের কাজে গেল। বিহারী তখনো ঘুমাইতেছিল। তাহার স্ত্রীও আগের দিনের কষ্টে একান্ত কাতর হইয়া ঘুমাইতেছিল। মেয়ে কিন্তু সিঁড়ি পড়ার শব্দ পাইয়া আস্তে আস্তে উঠিল, আস্তে আস্তে ঝাঁপ খুলিল, আস্তে আস্তে অন্য কামরা পার হইয়া সিঁড়ির কাছে গেল, সিঁড়ি বাহিয়া মাটিতে নামিল, নামিয়া ঝিনুক খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে নৌকা হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের একেবারে কিনারায় সে অনেক ঝিনুক দেখিতে পাইল। সাদা সাদা, ছোটো ছোটো ঝিনুক কুড়াইবার জন্য সে একটি ঝাঁপি আনিয়াছিল। সেগুলি ঝাঁপির মধ্যে রাখিল। তাহার পর রঙিন ঝিনুক কুড়াইতে আরম্ভ করিল। খুঁটিয়া খুঁটিয়া কোনোটি ডোরা, কোনোটি দাগওয়ালা, কোনোটি দু-রঙা, কোনোটি তিন-রঙা, কোনোটি পাঁচ-রঙা ঝিনুক কুড়াইয়া ঝাঁপি প্রায় আধ-পুরন্ত করিয়া ফেলিল। বুড়া লোকও সমুদ্রের ধারে বালির চড়ায় ঝিনুক কুড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না ; বেনের মেয়ের তো ৯/১০ বছর বয়স, সে যে সে লোভ সামলাইতে পারিবে, এরূপ মনে করাও অন্যায়। যাহা হউক, সে একেবারে তন্ময় হইয়া ঝিনুক কুড়াইতে লাগিল। এই ঝিনুক দিয়া সে বাবার গায়ের ঘামাচি মারিয়া দিবে, এই ঝিনুক সে তাহার ব্রাহ্মণ-সখীকে দিবে ; এই সব ঝিনুক লাগাইয়া যে ঠাকুরের পিঁড়ি করিয়া দিবে, এইরূপ ভাবিতেছে, আর কুড়াইতেছে।

২

বিধাতা যে এই সময়ে তাহার ঘোর বিপদ আনিয়া দিবেন, সে তাহা মনেও করিতে পারে নাই। সে ঝিনুকই কুড়াইতেছে। এমন সময় দূর থেকে একটা কি গোলমাল শুনা গেল। সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। তাহার পরই "শিয়াল শিয়াল" শব্দ শুনা গেল, তখন তাহার আগের দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল, তবে তো বাঘ এসেছে ! সে একবার চারি দিক চাহিল, যেমন পিছন

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ফিরিবে, অমনি দেখিল, প্রকাণ্ড বাঘ ! দেখিয়াই তো সে আড়ষ্ট ; পরক্ষণেই মূর্ছা । দূরে অনেক লোক ছুটিয়া আসিতেছে ; কিন্তু বালির উপর দিয়া ছোটা আর স্বপ্নে ছোটা একই রকম । যতই ছোট, আগাইয়া যাওয়া যায় না । যাহারা ডাঙায় নামিয়াছিল, সকলেই মেয়েকে রক্ষা করার জন্য ছুটিতেছে— উত্তর, পশ্চিম, পুব হইতে ছুটিতেছে ; কিন্তু কেহই নিকটে আসিয়া পৌঁছাইতে পারিতেছে না। "গেল গেল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে । "বিহারী দত্তের মেয়েকে বুঝি বাঘে নিলে ! আমাদের মায়াকে বুঝি বাঘে নিলে !" শব্দটা বেহারীর কানে গেল । সে উঠিয়া দেখিল, মায়া বিছানায় নাই । চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, এই পড়ে তো এই পড়ে করিয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া ডাঙায় পড়িল, সিঁড়ি কোথায়, তাহার খোঁজও লইল না । বিহারীর বৌ লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া স্বামীর পিছনে পিছনে ছুটিল। ছুটিয়া কি করিবে ? বালিতে কি পা উঠানো যায় ? প্রাণপণে ছুটিতেছে অথচ যেখানকার, প্রায় সেখানেই আছে । বাঘ ধীরে ধীরে মেয়ের কাছে গিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাবা গাড়িয়া বসিয়া রহিল । আর রক্ষা নাই । লোকে কতই চেঁচামেচি করিতে লাগিল, বাঘের তাহাতে লক্ষ্যই নাই ; সে একদৃষ্টে মেয়ের দিকে চাহিয়া আছে ।

৩

চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দূরে একখানি পানসি দেখা গেল, পানসি তীরবেগে যেখানে বাঘ, সেই দিকে আসিতেছে । ডাঙা হইতে দশ-বারো হাত তফাতে হঠাৎ থামিয়া গেল । আর এই পানসি হইতে একটা প্রকাণ্ড তীর আসিয়া বাঘের সামনের দিকে এমন জোরে বিঁধিল যে, বাঘের বুকে বিঁধিয়া পিঠের দিকে তাহার ফলা বাহির হইয়া পড়িল । বাঘ ভয়ংকর শব্দ করিয়া ফিরিল । দাঁড়াইবামাত্র যে দিকে তীরের পাখা, সেই দিকটা মাটিতে লাগিয়া যাওয়ায় বাঘ প্রথম পলাইতে পারিল না । পরে এমন জোরে লাফ দিল যে, শরের তীর বৈ তো নয়, তীরটা ভাঙিয়া গেল, বাঘ হালুম হালুম করিয়া ছুটিল । বালি অতিক্রম করিতে তাহারো খুব কষ্ট হইয়াছিল এবং দেরিও হইয়াছিল । তথাপি লোকে তাহার কাছে

পৌঁছিবার পূর্বেই সে বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে তাহার আর-এক বিপদ উপস্থিত হইল। কতকগুলা বানর একটা গাছে ঝুলিতেছিল, বাঘ ঐ অবস্থায় গাছের তলায় আসিলে তাহারা গাছ হইতে লাফ দিয়া তাহার পিঠে পড়িল, আর কেহ বা তাহার লোম ছিঁড়িতে লাগিল, কেহ বা ডাল ভাঙিয়া তাহাকে মারিতে লাগিল, কেহ বা সেই তীরের ফলাটা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বাঘ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িয়া গেল, অমনি সে মরিয়া গেল। তীরের আঘাতে একটা বানরও জখম হইল। বানরের এক বিষম রোগ আছে। সে নিজের রক্ত দেখিতে পারে না। সে দেখিল, তাহার গা দিয়া রক্ত পড়িতেছে; অমনি এক হাত দিয়া রক্ত মুছে, হাতটা দেখে আর ছুটে—এইরূপে বনের ভিতর একটা মহা-কাণ্ড হইয়া গেল।

বাঘ ও বানরের খেলা কিছু এ গল্পের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং মায়া ব'লে বিহারী দত্তের যে মেয়ে ছিল, আমরা চলুন, তাহারই কাছে যাই। সে তো এখনো নিঃসাড়, নিস্পন্দ। পানসিখানা তীরে লাগিয়াছে, আর তাহার উপর থেকে একটি ১৮/১৯ বছরের ছোকরা লাফাইয়া তীরে পড়িয়াছে; তীর-ধনুক ফেলিয়া দিয়াছে এবং দৌড়িয়া আসিয়া মেয়েটিকে কোলে করিয়া, তাহার যাহাতে জ্ঞান হয়, তাহাই করিতেছে: নাকের গোড়ায় হাত দিয়া দেখিতেছে— নিশ্বাস পড়িতেছে কি না; লোনাজল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইতেছে, তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। ক্রমে বিহারীর দল আসিয়া পৌঁছিল, কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। বিহারীর স্ত্রী ছেলেটির কোল থেকে মেয়েটিকে নিজের কোলে লইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। জাঁতি আনিয়া দাঁতকপাটি খোলা হইল। ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে মেয়ের চক্ষু খুলিল। চক্ষু খুলিয়া সে মাকে দেখিল না, দেখিল সেই ছেলেটিকে, তাহার দিকে চাহিয়া সেও বলিল, "কেমন, আমায় চিনিতে পারো, মায়া?" সকলেই এতক্ষণ মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সে ছেলের দিকে কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। ছেলেটি কথা কহিল। সকলেই আশ্চর্য হইয়া দেখিল, সে ছেলেটি সাতগাঁয়ের প্রসিদ্ধ বেনে সাধু ধনীর একমাত্র পুত্র জীবন ধনী।

৪ সাতগাঁয়ের বেনেদের ভিতর ধনীবংশ অতিপ্রাচীন, তাহারা সঙ্ঘ-আশ্রমের বণিক। এই বেনেরা সঙ্ঘের নিকট গন্ধদ্রব্য ও পূজার উপকরণ বেচিয়া জীবন নির্বাহ করে। মধু তাহারাই বেচিত, মধুর বিস্তর কাজ ছিল। সঙ্ঘের লোকে প্রায়ই কবিরাজী করিত। ঔষধপত্রে তো মধুর বড়ো দরকার। আরো অনেক কাজে মধু লাগিত। মোমবাতিও সঙ্ঘে লাগিত, মন্দিরে বাতি দেওয়া তখন একটা ধর্মকর্মের মধ্যে ছিল। ধুনা, গুগ্‌গুল, ধূপের কাঠ, নানা রকম তৈয়ারি ধূপ, চন্দনকাঠ, সাদাচন্দন, রক্তচন্দন, হরিচন্দন, কর্পূর, গন্ধতৈল, অনেক রকম পানের ও রান্নার মসলা সঙ্ঘ-আশ্রমের বেনেরা বেচিত। এই আশ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ধনীবংশ। সাধু ধনী, তাহার উপর, সুন্দরবনে বছর বছর মহাল করিতে যাইতেন। কালুরায় ও দক্ষিণরায় তাঁহার পূজায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, বাঘে ও কুমিরে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। সুতরাং সুন্দরবনের সর্বত্রই সাধু ধনীর গতিবিধি ছিল। তিনি সুন্দরবন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁটিয়া বেড়াইতেন এবং বাঘের ছাল, বাঘের নখ, কুমিরের হাড়, চামড়া, সুন্দরী-কাঠ, গড়ান-কাঠ, গোলপাতা, মেলান্দার মাদুর, একচাটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার মতো তীরন্দাজ তখন আর-কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার টিপ অদ্ভুত ছিল, এক রকম অব্যর্থ। ছেলে অল্প বয়স হইলেও প্রায় বাপের মতোই তীরন্দাজ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার তীরে কেমন করিয়া বিহারী দত্তের মেয়ে মায়ার জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। সাধু ধনী ও তাহার ছেলে সুন্দরবনে মহাল করিতে গিয়াছিল। ঝড়ের সময় তাহারা এক নিরাপদ স্থানে ছিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা ঐ বালির চড়ার আর-একপার্শ্বে নোঙর করিয়াছিল। নিকটে আর-কয়েকটি সাঙ্ঘার ডিঙা রহিয়াছে দেখিয়া সাধু ছেলেকে খবর লইবার জন্য পাঠাইয়াছিল। ছেলেও বালির উপর দিয়া শীঘ্র যাইতে পারিবে না বলিয়া পানসি করিয়া আসিতেছিল। দূর হইতে বাঘে একটা মেয়েকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া, সেই দিকে পানসি চালায় ও বাঘকে একটা তীর মারে।

মেয়ে একটু সুস্থ হইলে বিহারী জীবনের কাছে আসিয়া তাহার সঙ্গে নানা কথা কয় এবং জানিতে পারে যে, সাধু ধনী নিকটেই আছে।

সে মেয়েকে নৌকায় লইয়া যায় এবং তাহার সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। জীবনকেও আপনার নৌকায় বসাইয়া তাহাকে যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করে। "তোমার বাবা যে তোমার জীবন নাম রাখিয়াছিল, আজি তাহা সফল হইল। তুমিই আজ আমার মায়ার জীবন দিয়াছ। তোমার ঋণ আমি কখনো শোধ করিতে পারিব না।" বেনেবৌও জীবনকে খুব করিয়া খাওয়াইলেন এবং অনেক করিয়া আদর করিলেন। মেয়েটাও জীবনকে দেখিবার জন্য বড়োই ব্যাকুল হইল। সে আর জীবনকে কি বলিবে, কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, আর চোখের চাহনিতে আপনার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। জীবনের জন্য তাহার প্রাণে যে একটা বিষম টান হইয়াছে, সে তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

৫

বিহারী নিকটে আছেন, লোকমুখে খবর পাইয়া সাধু ধনী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সব সংবাদ শুনিয়া সেও আহ্লাদে আটখানা হইল। "আমার ছেলে বিহারীর মেয়ের জীবন রক্ষা করিয়াছে।" বিহারীর সঙ্গে তাহাদের তো খুব আত্মীয়তা ছিলই, তাহার উপর এই ঘটনায় সেই আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় আসিয়া দাঁড়াইল। দুই-তিন দিন ধরিয়া চড়ায়ই খুব ধুমধামে খাওয়া-দওয়া, আমোদ-প্রমোদ হইল, তাহার পর দুই বণিকের সব সাঙ্গা একত্র হইয়া সাতগাঁয়ের দিকে চলিল। দু-তিনখানা ছিপ আগেই গিয়া সাতগাঁয়ে সব ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। মহা-ধুমধামে আমোদ-প্রমোদে বণিকেরা আসিয়া গোলার ঘাটে সাঙ্গা বাঁধিল। এইবার যে যাহার গোলায় যাইবে। সকলেই বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত। বিহারীর লোকজন, যাহারা বহু-কাল বিদেশে ছিল, তাহারা আগেই নামিয়া আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেল। বিহারীও মালপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মায়ার কিন্তু মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সেও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, জীবন সঙ্গে গেলে ভালো হইত! মাও মেয়ের মন বুঝিলেন; জীবনকে

বলিয়া দিলেন, "তোমার মার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আমার ওখানে আসিও। তোমার, তোমার বাবার ও তোমার মার নিমন্ত্রণ রহিল।" তখন মেয়ে একটু সুস্থ হইল, এবং হৃষ্টচিত্তে মা ও বাপের সঙ্গে সাতগাঁর বড়ো রাস্তার উপর তাহাদের যে বড়ো বাড়ি ছিল. সেইখানে চলিয়া গেল।

আর অধিক বলিতে হইবে না। ক্রমে যাওয়া-আসায় দুই পরিবারে বেশ সৌহার্দ্য জন্মিয়া গেল, এবং ছেলে ও মেয়ের বেশ প্রণয়-সঞ্চার হইল। অল্পদিনের মধ্যেই সাধু ও বিহারী বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইলেন এবং মায়ার সহিত জীবনের বিবাহ হইয়া গেল। সাতগাঁ শহরসুদ্ধ লোক খুশি। দুইটা বড়ো বড়ো ঘর এক হইয়া গেল। দিনকতক কেবল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিতে লাগিল।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঐ ঘটনার ৪ বৎসর পরে যে দিন রূপা-রাজার গাজন বাহির হয়, সেই দিন মায়া আসিয়া রাজার গুরু ও গুরুপুত্রের গলায় মালা দিয়া গেল, তখন তাহার মুখে বড়োই বিষাদের ছায়া। কারণ, সে সময় তাহার স্বামী জীবন ধনী অত্যন্ত পীড়িত। শ্বশুর পূর্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ধনীবংশের বড়ো ঘরে একটি জীবনমাত্র ভরসা ; সেও অত্যন্ত পীড়িত। তাহারই জীবনের উপর আবার দত্ত-বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাই তাহার মুখ ম্লান। সে মালা দিবার সময়ে মনে মনে প্রার্থনা করিল, "হে গুরুদেব, আপনি তো অন্তর্যামী, আমার মনের কথা বুঝিয়া, আমার স্বামী যাহাতে জীবন পান, আশীর্বাদ করুন।" গুরুপুত্রের গলায় মালা দিবার সময় তাঁহারো কাছে সেই প্রার্থনা করিল। দুজনেই আশীর্বাদ করিলেন, সে যেন হাতে হাতে ফল পাইলাম মনে করিয়া হাতি হইতে নামিল। তাহার পর সে সকল দেবতার কাছেই মানত করিত, "ঠাকুর, আমায় বিধবা করিও না, আমার স্বামীর জীবন দাও।" পূর্ণিমা-অমাবস্যায় ব্রাহ্মণবাড়ি সিধাভোজ্য পাঠাইয়া এই কামনাই করিত। বুদ্ধ-মন্দিরে দীপ দিয়াও এই কামনাই করিত। ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিয়াও এই কামনাই করিত। স্বামীর সেবায় তাহার বিরতি ছিল না। যে চিকিৎসক যাহা বলিয়া দিতেন, সে অকাতরে পরিশ্রম করিয়া তাহাই করিত। যে দৈবজ্ঞ যেরূপ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা দিতেন, সে কোনো বিষয়ের ত্রুটি না করিয়া তাহাই করিত। বিহারীরও যত্নের ত্রুটি ছিল না। দেশদেশান্তরের সঙ্ঘ হইতে বড়ো বড়ো বৈদ্য আনাইতেন ; দেশদেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ-ভিষক্ আনাইতেন। নিজে প্রায়ই জামাতার গঙ্গাতীরস্থ গোলায় যাতায়াত

করিতেন ; সব কাজ নিজের চোখে তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জীবন ধনী দুই বৎসরকাল ভুগিয়া ভীষণ যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগ করিল। বিহারীও জামাইয়ের শোকে কেমন যেন জড়ভরত হইয়া গেল। যাহার এত উদ্যম এবং অধ্যবসায়, সে যেন কেমন হইয়া গেল। বেনেবৌ তো সেই অবধিই শয্যা নিলেন। মেয়েটা স্বামীর পরলোকের জন্য যাহা করা আবশ্যক, সব করিয়া, স্বামীর জুতা, স্বামীর খড়ম, স্বামীর কাপড়চোপড় একটা সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া তাহারই পূজা করিত, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত, "ভগবান্, আমায় শীঘ্র করিয়া স্বামীর কাছে লইয়া যাও। একা সেখানে তাঁহার বড়ো কষ্ট হইতেছে। সেই বাঘ মারার দিন হইতে তিনি তো আমায় ছাড়া থাকেন নাই। এখন তাঁহার বড়োই কষ্ট, আমায় তাঁহার কাছে লইয়া যাও।" সে ঘরের বাহির প্রায়ই হইত না। কেবল ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য যাইত। ঠাকুরের কাছে তাহার এক-মাত্র প্রার্থনা, "আমায় তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও।" মহাবিহারেও সে পূজা দিতে গিয়াছে। সেখানেও তাহার সেই প্রার্থনা ; হেরুকমূর্তির কাছেও তাহার সেই প্রার্থনা ; বুদ্ধমূর্তির কাছেও তাহার সেই প্রার্থনা ; বিষ্ণুমূর্তির কাছেও তাহার সেই একই প্রার্থনা ; শিবের মন্দিরেও তাহার সেই একই প্রার্থনা। সে আর বাড়ি বড়ো যাইত না, গোলাতেই থাকিত। গোলা গঙ্গার ধারে। সে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত আর সেই এক প্রার্থনা করিত। কোনো ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখিলেই তাহার সেই প্রার্থনা ; ভিক্ষু দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা ; যোগী দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা ; সিদ্ধপুরুষ দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা ; সিদ্ধাচার্য দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা— কেমন করিয়া আবার পরলোকে স্বামীর সহিত গিয়া মিলিব। সে তো এইরূপে কায়মনচিত্তে মৃত স্বামীর সেবায় নিযুক্ত, ওদিকে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

## ২

মায়া বিধবা হওয়ার পর হইতেই কয়েক জন ভিক্ষুণী সর্বদাই তাহার বাড়ি আনাগোনা করিত। তাহাদের কেহ বুড়ী, কেহ আধাবয়সী, কেহ কেহ বা যুবতী ছিল। বুড়ী যিনি,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

তাঁহার গাল তুবড়াইয়া গিয়াছিল, চক্ষু কোটরগত, মাথাটি প্রায়ই নেড়া, যে দু-চার গাছা চুল উঠিত, তাহাও শণের নুড়ির মতো কোঁকড়া আর পাকা। হাড়গুলি প্রায় গনা যায়, হাতগুলি নলি-নলি, পা সরু সরু, পেটটি কিন্তু গজেন্দ্রের মতো নহে, যেন খোলে পড়িয়া আছে। চামড়া প্রায় কুঁচকাইয়া আসিয়াছে। বুড়ী টুক্‌নি হাতে করিয়াই আসিত— মুষ্টিভিক্ষা লইবার জন্য। সে কিন্তু যেখানে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানেই যাইত না, একেবারে যেখানে মায়া আপনার মনের দুঃখে একাকী বসিয়া থাকিত, সেইখানে গিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িত। সে হাড় কখানাতে কিন্তু ধপাস্ শব্দ না হইয়া ঠক্-ঠক্ শব্দই হইত। সে বসিয়াই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িত আর বলিত, "আহা মা, এত কাঁচা বয়সে তোর এ দশা হল, দেখলে পাষাণও গলিয়া যায়। আহা, রক্ত-মাংসের শরীর তো বটে, কেমন করে সারা জীবনটা এইভাবে হাহুতাশ করে কাটবে ? তোর কথা মনে হলে, মা, আমি চোখের জল সামলাইতে পারি না।" বলিয়াই বুড়ী আঁচল দিয়া— আহা, সে কাপড়ের কি আঁচলই আছে ছাই— আপনার চোখদুটি মুছিয়া ফেলিত ; জানাইত, মায়ার দুঃখেই সে কাঁদিতেছে। মায়া কথা কহিত না। তার যে দুঃখ, তা তো আর কথার দুঃখ নয় যে, সে কথা কহিয়া প্রকাশ করিবে। বুড়ী বলিয়া যাইত, "এ অবস্থায় কেবল ধর্মকর্ম। ধর্মকর্মে মন দিলে অনেকটা ভুলিয়া থাকা যায়, সারবার তো আর নয়, কেবল ভুলে থাকার জন্য। ধর্মকর্ম নানা রকম আছে, যেমন— সংসারে থাকিয়াই দানধ্যান করো, পূজা-পার্বণ করো, স্বামীর স্বর্গার্থে শ্রাদ্ধ তর্পণ করো, ব্রাহ্মণ খাওয়াও, সম্যক সংভোজন দাও, সঙ্ঘভোজন করাও, পুকুর খোঁড়াও, রাস্তা বাঁধাও, মন্দির তৈয়ার কর, কত কাজই আছে। তা মা, তোর ধন-দৌলত আছে, তোর তা করিলেই সাজে। কিন্তু আমি বলি মা, এ সবও তো সংসার, এ সবও তো মায়ার বন্ধন, এর চেয়ে সঙ্ঘে যাওয়া ভালো। ভিক্ষুরা কেমন নিশ্চিন্ত থাকিয়া ধর্ম করে। সংসারের টান তাদের একেবারেই নাই। আপনার মনপ্রাণ ভগবানেই সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকে। ভিক্ষুণীরাও তো তাই করে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, সংসার অসার, সংসারে থাকিয়া, মৃত্যুর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, নির্বাণ লাভই শ্রেয় ও তাহাই প্রেয়। তা মা, আমার যদি কথা শোনো, সঙ্ঘের আশ্রয়
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

লও। আপনার যা কিছু আছে, সর্বসাধারণকে দান করিয়া নিঃসম্বল, নির্বিকার, নির্মল চিত্তে সঙ্ঘের এক নিভৃত কক্ষে বাস করো ; শান্তি পাবে ; নির্বাণ আর-কিছুই নয়, কেবল শান্তি। দীপ যেমন নির্বাণলাভ করিলে, পৃথিবীতেও থাকে না, অন্তরীক্ষেও থাকে না, কোনো দিকেও যায় না, বিদিকেও যায় না, কেবল তৈলক্ষয় হেতু শান্ত হইয়া যায়, মানুষও তেমনি নির্বাণ পাইলে পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, কোনো দিকেও যায় না, বিদিকেও যায় না, ক্লেশক্ষয় হয় বলিয়া কেবল শান্ত হইয়া থাকে। তা মা, যদি শান্তি চাস, এ সংসারে আর তোর কপালে সুখ নাই, এখন সেই শান্তিলাভের জন্য সঙ্ঘের আশ্রয় লও।"

অনেকক্ষণ এইরূপ ঘ্যানর-ঘ্যানর করিয়া বুড়ী উঠিয়া যাইত— মায়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। যাবার সময় বুড়ী বলিত, "দেখ মা, তোর জন্য ভেবে ভেবে আমি তো আর পাঁচ দোরে যেতে পারলাম না, আমার পেটটার মতো চারটি চাল আজ তুই দে মা।" মায়া তার টুকনি ভরিয়া চাল দিত, সেও আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যাইত। বলিয়া যাইত, "সুগতে তোর ভক্তি হউক।"

৩

যিনি আধাবয়সী, তিনি আসিয়া বলিতেন, "তোর তো আর ধন-দৌলতের অভাব নাই, ধর্মে মন দে। ধর্মের সার ধর্ম— সুগতের ধর্ম ; তাহার একটি একটি কথা একটি রাজার ধন। সাত রাজার ধন এক মাণিক— এমন কত মাণিকই যে সুগতের কথায় আছে, তার কি ঠিক আছে ? লোকে বলে, সুগত সংসার ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি মায়াই ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তুই উপাসিকা, এখনকার লোক কলির লোক, সব ক্ষীণজীবী, এখন কি আর কেউ ভিক্ষু হতে পারে, না, ভিক্ষুণী হতে পারে ? পুরুষ বরং ভিক্ষু হতে পারে, তাদের মনের জোর আছে ; আমরা অসার মেয়েমানুষ, আমাদের ভিক্ষুণী হওয়া বৃথা। উপাসিকা হ, আপনার ঘরে বসে সৎসঙ্গ কর, কথা দে, কীর্তন দে, তীর্থযাত্রা কর, ভগবান্ যেখানে যেখানে পদধূলি দিয়া গিয়াছেন, সেই পবিত্র দেবালয়ে গড়াগড়ি দে, মন্দির দে, ধর্মশালা

দে, ঔষধশালা দে, আর সিদ্ধপুরুষের সেবা কর, সিদ্ধাচার্যদের সেবা কর। হয়তো কোনো সিদ্ধপুরুষ তোকে শক্তি করিয়া লইবেন। তুই দেবতা হইয়া যাইবি, ঐ দেখ, আমড়াতলায় ঘোষেদের মেয়ে নিগি নাড়-পাণ্ডতের শক্তি হয়েছে, তাকে এখন সকলে নাড়ী বলে। যে নাড়-পাণ্ডতের পূজা করে, সে নাড়ী পাণ্ডতেরও পূজা করে। নাড়ীর মন্দির হয়েছে, তার মন্দিরেও দীপ জ্বালে, ধূপ দেয়, তারা সংসারী হয়েও সংসারী নয়, ভিক্ষু হয়েও ভিক্ষু নয়, তারা একেবারে দেবতা হয়ে গিয়েছে।"

এইরূপে হাত নেড়ে নেড়ে মাগী কত কথাই বলিত। মায়া শুনিতও না, অন্যমনস্কে বসিয়া থাকিত। হয়তো শুনিতে শুনিতে অন্য কাজে চলিয়া যাইত। সে কিন্তু বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিত ; আবার মায়া আসিলে বক্তৃতা জুড়িয়া দিত। সেও যাবার সময় টুকনি ভরিয়া চাল লইয়া যাইত।

## ৪

এক-একদিন সেই যুবতী ভিখারিণী আসিয়া মায়াকে কতমত বুঝাইত, সে খঞ্জনি বাজাইত, গান করিত, নাচিত ; [ বলিত, ] "গুরু ভিন্ন গতি নাই। বজ্রগুরু ভেদাভেদ দেখাইয়া দেন। গুরুর উপদেশ অমৃত-রস। যে হাবা, সে তাহা বুঝিতে পারে না, পান করিতে পারে না, সে তৃষ্ণায় মরে, সে তৃষ্ণায় মরে। শাস্ত্রের অর্থ করিতে গিয়া মরুভূমে তৃষ্ণায় মরে। তুমি গুরু কাড়ো, গুরুর উপদেশ লও। সংসার সে উপদেশের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তুমি দেখিবে, সব শূন্য, সব করুণা, পাপ নাই, পুণ্য নাই, সব সমান। তখন সমাজের বন্ধন থাকে না। লোকে 'ভব আর নির্বাণ' 'ভব আর নির্বাণ' করিয়া আপনাকে বদ্ধ করে, কিন্তু গুরুর উপদেশে দেখিতে পাইবে, ভবও নাই, নির্বাণও নাই। সংসারে যাহা পাপ ও পুণ্য, গুরুর অমৃত উপদেশের পর তাহার কিছুই থাকে না। গুরুর উপদেশের পূর্বে পঞ্চকামোপভোগ বড়োই দোষের। কিন্তু গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চকামোপভোগে দোষ তো নাই-ই, বরং উহা মহাসুখময় সহজধামে লইয়া যায়। গুরুর উপদেশে দেখিবে, সহজ সমস্ত ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছে। 'অহরহ সহজ

ফরন্ত।' সহজতরু প্রকাণ্ড তরু; আকাশে আকাশে তাহার ডাল উঠিয়াছে, তাহার ফুল যখন হয়, তখন সব প্রভাস্বরময় হইয়া যায়। আবার যখন সে ফুল ফোটে, তখন ত্রিভুবন মহাসুখে মত্ত হয়। সে গাছের ফল অমৃতফল। সে ফলের নাম পর-উপকার। মায়া, করুণা করো, করুণা করো, পর-উপকার করো। গুরু কাড়ো, গুরুর কাছে উপদেশ লও, দেখিবে সব শূন্য, সব ফক্কা, আছে কেবল করুণা, আর পর-উপকার। ভগবান্ তোমায় ধর্মে মতি দিন। তুমি সহজ পথের পথিক হও। তোমার সব যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে, তুমি মহাসুখে থাকিবে।" বলিয়াই সে গান ধরিল—

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতি আই ॥
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥[৪]

ভাব পদার্থ তো হইতেই পারে না। কোথায় জানিলে, কেমন করিয়া জানিলে, ভাব বলিয়া পদার্থ আছে। ভাবকে পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখ, পিণ্ড নাই, অণু নাই, কিছুরই উপলব্ধি হয় না। অভাব তো নাই-ই। যে অসৎ, সে কেমন করিয়া থাকিবে। এ-কথা সহজে কি লোকে বিশ্বাস করিতে চায়? জ্ঞান আর আনন্দে সুন্দর যে আমাদের গুরু সিদ্ধাচার্য লুই, তিনি বলেন, এ-সব জ্ঞান বড়োই দুর্লভ। যে সে ইহার ধারণাই করিতে পারে না। কায়, বাক্, চিত্ত কোথায়, কিছুই বুঝা যায় না। যাহার বর্ণনা নাই, চিহ্ন নাই, রূপ নাই, তাহা দিয়া কেমন করিয়া আমি আগম ও বেদ বুঝাইয়া দিব? যেমন জলের ভিতর যে চাঁদ থাকে, সে সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু বুঝাইবার জো নাই, তেমনি এ-সব কথাও বুঝাইবার জো নাই। করুণাময় গুরু আমাদের বুঝাইতে চান— সব ফাঁকা, সব ফাঁকা, সব ফক্কা। এই তো লোকে 'চিত্ত চিত্ত চিত্ত' করে, কিন্তু চিত্তটাই বা কি? তলাইয়া বুঝিতে গেলে চিত্তই নাই। সুতরাং গুরুর উপদেশ লও, ধ্যান করো, শুধু মহাসুখ— মহাসুখ আর মহাসুখ। শূন্যও মহাসুখ, বিজ্ঞানও মহাসুখ, সবই এক মহাসুখ।

মহাসুখই করুণা, মহাসুখই সহজ, আর সকলেরই এক ফল পর-উপকার। মায়া, গুরুর শরণ লও, তিনিই সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন।"

সেও টুক্‌নি ভরিয়া চাল লইয়া চলিয়া গেল। মায়া মহা-ভাবনায় পড়িল। সবাই বলে, সঙ্ঘে যাও ; সবাই বলে, গুরুর শরণ লও। এ কেন ? এরা কি কোনো মতলবে ফেরে, না আমায় নিঃস্বার্থ উপদেশ দেয় ? সরলা শেষ কথাই ঠিক ধরিয়া লইল। নিঃস্বার্থ উপদেশই ইহারা দিতেছে।

৫

মায়া অনেক দিন ধরিয়া ভিখারিণীদের এই গায়ে পড়ে উপদেশ দেওয়া সহ্য করিল ; কিন্তু ক্রমে তাহার বিরক্তি ধরিতে লাগিল। পরামর্শের মাত্রাও চড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম তিন জন ভিখারিণী মাত্র আসিত। এখন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। অনুগ্রহও ঘনঘন হইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ভিখারী মহাশয়েরাও যোগ দিতে লাগিলেন। মায়া তো কোথাও যাইত না ; কেবল মন্দিরে পূজা দিতে, মানত করিতে যাইত ; বৌদ্ধ-মন্দিরে গেলে ভিক্ষুরা, পুরোহিতেরা, ভক্তেরা সবাই পরামর্শ দিত। মায়া মহা-বিপদে পড়িল : ক্রমে বিহারের কর্তারাও আরম্ভ করিলেন। শেষ মহাবিহারের কর্তা রাজার গুরুপুত্রও মায়াকে একদিন মহাবিহারে পাইয়া নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তখন মায়ার মনে একটা সন্দেহ হইল। কেন এত লোকে এই পরামর্শ দেয় ? ইহার ভিতরে কিছু গূঢ় রহস্য আছে। মায়া যতই হউক, বালিকা তো। সমাজবোধ তাহার নাই বলিলেই হয় ; কিন্তু সন্দেহ হওয়ার পর তাহার একটু ভয় হইল। "আমি বেনের মেয়ে, আমি ঘরে বসিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণের সেবা করিব। আমি কেন সঙ্ঘে যাইতে যাইব ? সঙ্ঘে যে-সকল মেয়েমানুষ যায়, লোকে তো তাহাদের ভালো বলে না। তাহাদের স্বভাব ভালো থাকে কি না সন্দেহ। তাহারা অনেকটা মদ্দা মদ্দা হইয়া যায়। মেয়েদের মতো লজ্জাসরম তাহাদের একেবারেই থাকে না। আমি কেন সঙ্ঘে যাইতে যাইব ? তবে এত লোকে আমার গায়ে পড়ে এ পরামর্শ দেয় কেন ?"

যখন সন্দেহটা ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে একদিন তাহার বাবাকে সব কথা বলিয়া ফেলিল। শুনিয়াই বাবা মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। বিহারী যদিও জামাইয়ের শোকে কতকটা জবুথবু হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি এখনো একটা দেশব্যাপী ব্যাবসা চালাইতেছেন; মেয়ের বিষয়-আশয় সব দেখিতেছেন; মেয়ের ব্যাবসা-বাণিজ্য উঠাইয়া কতকটা আপনার কাজের সামিল করিয়া লইয়াছেন, কতকটা ধনীদের দিয়া দিয়াছেন। মেয়ের স্থাবর সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন। মেয়ের ধর্মকর্মে যাহাতে মন হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাহার পূজা-অর্চায় যাহাতে মন যায়, তাহা করিতেছেন। দেবতা-ব্রাহ্মণে যাহাতে ভক্তি হয়, করিতেছেন। কিন্তু সব যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আগের যে আগ্রহ, যে তেজ, যে জোর, সে যেন নাই। তবে কিনা, এ-সব চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্যই এখনো করিতেছেন। দাঁড় বন্ধ করিয়া দিলেও যেমন নৌকা খানিকটা আপনি চলে, তেমনি বিহারীর কাজও বিহারী নিজে দমবন্ধ হইয়া গেলেও যেন কতকটা আপনি চলিতেছে, কলে চলিতেছে। লোকে বিহারীকে ভয় করে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে। সুতরাং বিহারী যে সে বিহারী নাই, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। ভাবিতেছে, শোকে বিহারীর খানিকটা কষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সে যা ছিল, তাই আছে। সুতরাং তাহার কাজ-কর্মের লাভভাবের বড়ো ক্ষতি আজও হয় নাই।

## ৬

মেয়ের কথা শুনিয়া বিহারীর চমক ভাঙিল। সে মেয়েকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। কে আসে? কে কি বলে? ভিখারিণীরা কোন্ দলের? বিহারের কোন্ অধ্যক্ষ কি বলিয়াছেন? গুরুপুত্রের সঙ্গে কয়বার দেখা হইয়াছিল? কোন্‌বারে তিনি কি বলিয়াছেন? সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিহারী গোলা হইতে সাতগাঁয়ে নিজের বাড়ি গেলেন। মেয়ের দরোয়ানদের বলিয়া গেলেন, যেন ভিখারী বা ভিখারিণী বাড়ির ভিতর যাইতে না পারে। এই ব্যাপারে বিহারীর পূর্বভাব ফিরিয়া আসিল। আসন্ন বিপদ দেখিলে

অনেকেরই উৎসাহ বাড়ে, মনে দৃঢ়তা জন্মে, শরীরে যেন মত্ত হস্তীর বল হয়। বিষাক্ত ঔষধ খাইলে শরীরে যেমন রক্ত সঞ্চালন বেশি হয়, কন্যার এই বিপদে বিহারীরও তাহাই হইল। তাহার সব উৎসাহ, সব উদ্যম, সব রোখ, সব ঝোঁক ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সে কিছুই প্রকাশ করিল না। বাড়ি ফিরিল। বেশিক্ষণ ভাবিল না, চিন্তিল না। আপনার মোকামে মোকামে বিশ্বাসী লোক দিয়া কি খবর লইতে লাগিল। কি খবর, আমরা জানি না, সে অতি গোপন কথা।

তবে আমরা জানি, বিহারী রাউত আশ্রমের বেনে। ছাউনিতে ছাউনিতে মসলা বেচা তাহার পৈতৃক ব্যাবসা। বাংলায় তখন অনেক রাজা। সকলেরই দশ-বিশটা ছাউনি। বিহারীর মোকামও সব ছাউনিতে। তার বড়ো গোলা সাতগাঁয়ের গঙ্গার ধারে। সেখানে সে পাহারা বাড়াইয়া দিল, গোলার পাঁচিল মেরামত করাইল। খাদে যাহাতে জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিল। পশ্চিম হইতে বড়ো বড়ো চৌহান, রাঠোর, পাঁওয়ার আনাইয়া সাতগাঁয়ে ও মোকামে মোকামে দরোয়ান রাখিল এবং তলায় তলায় খবর লইতে লাগিল, ব্যাপারখানা কি ? তাহার বেশ ধারণা হইল, মায়াকে সঙ্ঘে লইয়া যাইবার জন্য বৌদ্ধদের ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র হইতেছে; কিন্তু বিহারীর ভয়ে তাহারা আপনাদের মতলব হাঁসিল করিতে পারিতেছে না। তাদের ভিতরেও আবার দলাদলি আছে। মহাযান, বজ্রযান ও সহজিয়া সকল দলেরই চেষ্টা, মায়া তাহাদের দলে আসে : সেজন্যও তাহাদের মতলব হাঁসিল করিতে দেরি হইতেছে। আর মায়া— সে আপনার স্বামী ছাড়া আর-কাহারো কথা মনেই স্থান দেয় না। যা কিছু করে— স্বামীর স্বর্গার্থ— পরলোকে স্বামীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহারই জন্য। অন্য কথা সে ভাবে না।

## ৭

মায়া ভয় পাইল কেন ? বিহারীই বা ভয় পাইল কেন ? কতকগুলি ভিখারী আর ভিখারিণী মায়াকে ভিখারিণী করিয়া সঙ্ঘে লইয়া যাইতে চায়, না গেলেই হইল। তাতে আবার ভয় কি ? আর এত উদ্যোগই বা কেন ? বিহারী যেন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত— এ-সব কেন ? ইহার কারণ কি ? হিন্দুরা

যখন কেহ সন্ন্যাসী হয়, তখন লোকে মনে করে, সে মরিয়াছে, সে মরিলে তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা দখল করে। সে যদি ফিরিয়া আসে, তাহার সমাজে স্থান হয় না ; সুতরাং সে বিষয়ও ফিরিয়া পায় না। কিন্তু বৌদ্ধদের তাহা হয় না। যে ভিখারী বা ভিখারিণী হয়, সে সমস্ত সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার-স্বত্বাদি লইয়া সঙ্ঘে যায়। সঙ্ঘ তাহার সমস্ত বিষয় সাধারণের কার্যে নিযুক্ত করে। এইজন্য তাহারা হিন্দুর সন্ন্যাসকে সন্ন্যাস বলিয়াই মনে করে না। বলে, ওটা উত্তরাধিকারীদের বিষয় দিবার ফন্দি মাত্র। আমি যদি সন্ন্যাস লইলাম, সাধারণের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করিলাম। আমার সম্পত্তি গৃহস্থেরা লইবে কেন ? সে তো সর্বসাধারণে লইবে। তা এখন যদি মায়াকে সঙ্ঘে টানিতে পারে, মায়ার স্বামীর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্ঘে তো যাইবেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিহারীর উত্তরাধিকারও সঙ্ঘে যাইবে ; সুতরাং ধনীদের আর দত্তদের দুটা বড়ো বড়ো বিষয়ই সঙ্ঘে যাইবে। তাই, সব দলের ভিখারী-ভিখারিণীরাই লাগিয়াছে মায়াকে সঙ্ঘে লইবার জন্য। যার দলে মায়া যাইবে, তাদেরই জয়-জয়কার হইবে। বিহারী সে কথা বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহার এত ভয়, এত উদ্যোগ। বিশেষ সাতগাঁয়ে এখন বৌদ্ধ রাজা। রাজাও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিবেন না, রাজার সঙ্ঘে উহাকে লইবার জন্য তিনিও যে চেষ্টা করিবেন না, সে কথা কে বলিতে পারে ? তাই বিহারীর যুদ্ধের উদ্যোগ। বিহারী ইচ্ছা করিয়া এত বড়ো দুটা সম্পত্তি ভিখারীদের দিতে রাজি নহেন ; সুতরাং তাঁহার এত ভয় এবং এত উদ্যোগ ; কিন্তু বিহারী প্রকাশ্যভাবে কোনো উদ্যোগ করিতে পারেন না, পাছে তাঁহাকে রাজার কোপে পড়িতে হয়। ভিখারীরাও বিহারীকে ভয় করে, কারণ, তখনকার ছোটো ছোটো রাজাদের চেয়ে বেনেরা যে কম ছিল, তাহা নহে। কারণ, বেনেদের কারবার সকল রাজার দেশেই ছিল, তাহারা ইচ্ছা করিলে এক রাজার দেশ হইতে অনায়াসে অন্য রাজার দেশে চলিয়া যাইতে পারিত এবং গেলে যে দেশ হইতে যাইত, তাহার বিশেষ ক্ষতি হইত। ইচ্ছা করিলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিত। তাহারা বড়ো কম ছিল না। তাই সাতগাঁয়ের রাজা বা ভিখারীর দল প্রকাশ্যে বিহারীর মেয়ের উপর জোর-জবরদস্তি করে নাই বা করিবার চেষ্টা করে নাই।

তাহারা চেষ্টা করিতেছিল যে, যদি মায়াকে লওয়াইয়া সঙ্ঘে ঢুকাইতে পারে, তাদের মতলব হাঁসিল অতি সহজেই হইয়া যাইবে। তাই ভিখারিণীরা এত ঘন ঘন মায়ার কাছে যাইত। মায়া নিজে যদি যায়, তবে বিহারীর আর বলিবার কোনো কথা থাকে না ; অথচ বৌদ্ধেরা এত বড়ো দুটা বিষয় অধিকার করিতে পারে। তখনকার সঙ্ঘে ব্যাবসা-বাণিজ্যও করিত। ভিক্ষুরা ব্যাবসা-বাণিজ্য দ্বারাও ধন উপার্জন করিয়া কতক নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, কতক বা সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য খরচ করিত ; সুতরাং তাহারা যে শুদ্ধ স্থাবর আর অস্থাবর বিষয়ই চাহিত, তাহা নহে, ব্যাবসা-বাণিজ্যও হাত করিতে চেষ্টা করিত। বৌদ্ধেরা বুঝিয়াছিল, এটা তাহাদের মাহেন্দ্রক্ষণ। তাদের ভিতর ভিতর খুব উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভুরসুট নগর দামোদরের একটা শাখার উপর। জায়গাটি একেবারে সমতল, ঠিক যেন দর্পণের মতো। ঠিক মধ্যস্থলে একটি গড়। গড়ের ভিতর ৬০ বিঘা জমি। গড়ে গভীর জল। দামোদরের সঙ্গে সংযোগ থাকায় বর্ষার সময় এত জল পুরিয়া রাখা হইত যে, সব সময়েই খাইয়ে জল থাকিত। গড়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বাস নিষেধ। গড়ের মধ্যে লাঙল চালানো নিষেধ। অন্য জাতির লোকের হাঁড়ি চড়ানো নিষেধ। কাজের জন্য বিদেশ থেকে অন্য জাতির লোক এলে, তাহাদের হয় ব্রাহ্মণবাড়ি প্রসাদ পাইতে হইবে, না-হয় গড়ের বাহিরে গিয়া রাঁধিয়া খাইতে হইবে। গড়ের ভিতর বাড়ি-ঘর-দোর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাগানগুলিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে বোধ হয়, এখানকার মেয়ে ও পুরুষ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্যই জন্মিয়াছিল। তাহাদের যেন অন্য কাজ নাই, অন্য চিন্তা নাই। বাড়িগুলি সবই চালা। কেবল মন্দিরগুলিই পাকা, একেবারে চুন, সুরকি, ইট ও পাথরে তৈয়ারি। সব বাড়িতেই একটি-না-একটি মন্দির আছে। সকলের চেয়ে বড়ো মন্দিরটির নয়টি চূড়া— "নবরত্ন" বলে। মন্দিরটির সর্বত্র ইট ও পাথরের উপর নক্সা কাটা। দরজার দুপাশে দুটি সাপ আঁকা— আঁকাবাঁকা হইয়া উঠিয়াছে, আর দরজার ঠিক মাঝখানে মাথার উপর দুইটি ফণা মিলিয়া আছে। এই সর্প মুখোমুখি করিয়া রাখার নাম কুলকুণ্ডলিনী। দরজার উপরে যে কার্নিস আছে, তাহাতে দুইটা হাঙর আঁকা। হাঙর দুইটা লেজ জড়াইয়া দুই দিকে মুখ করিয়া আছে। মন্দিরে রোজ পূজা হয়, দেবীর নাম ভবানী।

ঐ মন্দিরের সম্মুখে খানিক দূরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ। দেখিলে

বোধ হয়, কোনো সম্পন্ন লোকের বাড়ি। চণ্ডীমণ্ডপটির উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক মাটির দেওয়াল দিয়া ঘেরা— বড়ো বড়ো পাট ; নয়-দশ পাট উঠিয়া পাট শেষ হইয়া গিয়াছে। মাটির দেওয়ালের উপর খুব যত্ন করিয়া খড়িটি করা। তুষ, পাটের কুচা, আর কাদা খুব মিহি করিয়া ছানিয়া তাই দু আঙুল পুরু করিয়া দেওয়ালের উপর বসানো, আর বেশ করিয়া পিটিয়া দেওয়া। খড়িটিকরা দেওয়ালের উপর রোজ আগা-গোড়া নিকানো হয়— দেখিতে তক্‌-তক্‌ করে। চণ্ডীমণ্ডপটির দক্ষিণ-দিকেও দুই ধারে দুই হাত করিয়া দেওয়াল দেওয়া। মাঝে যেটুকু ফাঁক, সেটুকুতে দুইটা মোটা মোটা শালের খুঁটি, তাহার উপর বিচিত্র কাজ করা। কাঠের উপর নক্সা করিতে ভুরসুটের লোক সিদ্ধহস্ত ছিল। খুঁটি দুটির উপর দুইখানি আড়া, আর দক্ষিণের দেওয়াল দুটির উপর দুইখানি আড়া, এই চারি আড়ার উপর চারি খানি প্রকাণ্ড চালা। আড়ার শাল কাঠেও কাজ করা। আড়ার ওপর তীর, তার উপর আবার আড়া, তাহার উপর মাঝখানে একটি তীরের উপর মাথালির বাঁশ। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, বারান্দার দক্ষিণ দিকে সব শালের খুঁটি, পুব-পশ্চিম সব খোলা। বারান্দার পূর্ব-পশ্চিম দিকের শেষে দুটি মাটির তাকিয়া করিয়া দেওয়া আছে। কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাতে হেলান দিয়া বসিতে পারেন। চালগুলি পরিষ্কার করিয়া শণের সুতালি দিয়া ছিটানো। রোয়াগুলি নানারূপ রঙ করা আর শলাগুলিও বেশ মাজা-ঘষা ও রঙ করা।

ভোর হইল। একজন চাকর আসিল, সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপ বেশ করিয়া নিকাইয়া দিল, তাহার পর ঝাড়ু দিল, তাহার পর কয়েকটি বালান্দা পরগনার মাদুর বিছাইল, মাদুরের উপর একখানি শতরঞ্জ বিছাইল, শতরঞ্জের উপর একখানি গালিচা বিছাইল, গালিচার মাঝখানে এক-খানি পিতলের কোণ-লাগানো পিঁড়ি কাত করিয়া দিল, আর তাহার নীচে উৎকৃষ্ট রেশমের ছোটো একখানি গদি পাতিল, সেইখানে কতক-গুলি খুব মিহি মাজা ও পাকানো তালপাতা, একটি দোয়াত ও কলম রাখিল ও সেখান হইতে চলিয়া গেল।

২ কিছুক্ষণ পরে ভবানীর মন্দির হইতে একজন সুপুরুষ বাহির হইলেন। তাঁহার দেহ বেশ দীর্ঘচ্ছন্দ। রঙটি দুধে আলতার মতো। মুখটি প্রসন্ন, তিলফুলের মতো নাকটি, চোখ দুটি পটলচেরা, কপালে চন্দনের তিলক। অস্ফুট-স্বরে ভবানীর স্তব পাঠ করিতে করিতে মন্দির হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পায়ে কাষ্ঠপাদুকা ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতেছে। বারান্দায় কাষ্ঠপাদুকা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গালিচার উপর দিয়া [ উঠিয়া ] সেই ছোটো রেশমের গদিটিতে বসিলেন এবং পিঁড়িখানিতে ঠেসান দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন: কিন্তু তাঁহাকে বেশিক্ষণ ভাবিতে হইল না। তাঁহার পদশব্দ শুনিয়াই যেন চারি দিক হইতে লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দা ভরিয়া গেল। সর্বপ্রথমে আসিলেন এক গৌর-কান্তি পাতলা ব্রাহ্মণ। ইঁহার পৈতার খুব বাহার। সরু পৈতা, অনেক দণ্ডী, নিরন্তর পরিষ্কার করায় ধপ্-ধপ্ করিতেছে, আর রোজ জিবলি আটা দিয়া মাজায় চক্‌চক্ করিতেছে। ইনি আসিয়াই বারান্দা হইতে গালিচায় উঠিলেন, আর একেবারে গদির কাছে গিয়া বসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই গদির উপরিস্থিত ব্রাহ্মণটি বলিলেন, "কি শ্রীধর,[৫] আজ তুমি যে সকলের আগে ?" শ্রীধর বলিলেন, "পাণ্ডু কাকা, কয়দিন ধরিয়া আমাদের কণাদ-সূত্রের সঙ্গে প্রশস্ত-পাদের ভাষ্য মিলাইতে-ছিলাম। একটা আশ্চর্য [ জিনিস ] দেখিলাম, তাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।" পাণ্ডুকাকা বলিলেন, "কি বলো দেখি, তুমি নহিলে এত খাটে কে কাকা ?" শ্রীধর বলিলেন, "৫২টি সূত্রের নামও ভাষ্যকার করেন নাই।"

পাণ্ডু। এতো বড়ো চমৎকার! ভাষ্যকারেরা তো প্রায়ই সূত্র ধরিয়াই ভাষ্য করেন। প্রশস্তপাদ তাহা করেন নাই। তিনি যেন নিজের মতলব মতো ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সূত্র তুলিয়াছেন। কখন যে কোন্ সূত্র তুলিবেন, বুঝা যায় না। তাই আমি ভাবিতাম যে, কেহ যদি মিলাইয়া দেখে, কোন্ কোন্ সূত্র তোলা আছে, তা হলে বড়ো ভালো হয়। তা তুমি বাবা মিলাইয়া দেখিয়াছ। বলো দেখি কি রকম ?

শ্রীধর। আমি ভাষ্যে যত সূত্র পাইলাম, সূত্রপাঠে সেগুলি সব দাগ দিলাম ; দেখিলাম, ৫২টি সূত্র তিনি একেবারেই ধরেন নাই !

পাণ্ডু। বলো কি ? বাহান্নটা ?

শ্রীধর। আজ্ঞা হাঁ।

পাণ্ডু। তবে কি প্রশস্তপাদ কণাদ-সূত্রের টীকা করেন নাই ?

শ্রীধর। তা কেমন করিয়া বলিব ? যেগুলি ধরিয়াছেন, সবই তো সূত্রপাঠে আছে।

পাণ্ডু। আচ্ছা, তবে কি নানা রকমের কণাদ-সূত্র আছে না কি ? বৌদ্ধদের কাছে শুনিয়াছি, তাহাদের বৈশেষিক নাকি দশপদার্থী—

শ্রীধর। দশপদার্থী !! সেও তো নূতন কথা। এ সকল ব্যাপারে প্রবেশ করাই কঠিন।

পাণ্ডু। তা বাবা, দেখ তো, কে একটা লোক ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে।

শ্রীধর। সত্যিও তো। এ তো আমাদের দেশের লোক নয়। কাপড়চোপড় দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন রাজপুত।

৩

লোকটা ভবানী-মন্দিরের নিকটেই ঘোড়া হইতে নামিল, ভবানীমন্দির প্রদক্ষিণ করিল, মন্দিরের সম্মুখের সিঁড়িতে ভবানীর উদ্দেশে নমস্কার করিল, তাহার পর সটান চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় উঠিল। সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার পথ ছাড়িয়া দিল। বারান্দার মেঝে হইতে মণ্ডপের মেঝে একটু উঁচা। রাজপুত সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল ও কোমরপাটা হইতে একখানি চিঠি লইয়া হাত বাড়াইয়া দিল। শ্রীধর চিঠিখানি তাহার হাত হইতে লইয়া পাণ্ডু কাকার হাতে দিলেন। পাণ্ডু কাকা চিঠিখানি হাতে লইয়া মন দিয়া মোহরটি পড়িলেন। বলিলেন, "বা ! এ তো বিহারী দত্তের মোহর দেখিতেছি।" তাহার পর তিনি মোহর ভাঙিলেন, জড়ানো তালপত্র খুলিলেন ও আসল পত্র বাহির করিলেন— পড়িলেন ; একবার পড়িলেন, দুই বার পড়িলেন, তিন বার পড়িলেন। তাহার পর পত্রখানি শ্রীধরের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ো, দেখো, অদ্ভুত ব্যাপার !"

শ্রীধর পাড়িতে লাগিলেন, আর পাণ্ডুদাস রাজপুতের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, "তুমি কোন্ দেশের লোক ?"

রাজপুত। হমি কনৌজয়া পাঁড়িহার রাজপুত হোঁ।

"এখানে কোথায় থাকো ?"

"ভুরসুটমে বিহারী দত্ত বানিয়াকা মোকাম মে।"

"ভুরসুটে বিহারী দত্তের মোকামে থাকো ? তোমায় আমার কাছে কে পাঠাইয়াছে ?"

"মোকামদার ত্রিভুবন।"

"এ চিঠি কে লিখেছে ?"

"মোকামদারনে লিখা, লেকিন হুকুমসে লিখা।"

"এ তো মোকামদারের পত্র নহে, এ যে সাক্ষাৎ বিহারীর হাতের লেখা।"

"সো মৈঁ নহি জান্তা।"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীধর বলিলেন, "ব্যাপারখানা বুঝিয়াছেন কি ? বিহারী দত্ত ব্রাহ্মণপন্থী হইতে চায়, সুতরাং সর্বপ্রযত্নে আমাদের উচিত তাকে সাহায্য করা। সে গন্ধবেনেদের চাঁই, সে এ দিকে এলে ঐ জাতটা বৌদ্ধ ধর্ম ছেড়ে দেবে। আমাদের দল পুরু হবে।"

"হঠাৎ কেন এমন হল বলো দেখি ?"

"তা বলতে পারি না।"

"তবে কেমন করিয়া জানিলে, সে ব্রাহ্মণপন্থী হতে চায় ?"

"দেখলেন না, সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, চতুর্বর্ণের মধ্যে তাদের স্থান কোথায় ?"

"এ কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে কেন ?"

"বাগ্দি রাজা গোল বাধাইয়াছে, অথবা বৌদ্ধদের সঙ্গে তাহার ঝগড়া হইয়াছে।"

"বেশ তো, তা যদি হয়, তাকে এই দিকে আনো।"

কিন্তু হঠাৎ জবাব দেওয়া উচিত নয় ; সব খবর না জেনে যদি একটা জবাব দেওয়া হয়, পরে তাহার জন্য কার্য নষ্ট হইতে পারে।"

"তবে এক কাজ করো, তাহাকে বলো যে, এত বড়ো একটা কাজে আমি হঠাৎ জবাব দিতে পারি না। তুমি সিদ্ধল গ্রামের ভবদেব

উপাধ্যায়[৬], বাঁড়ুড়ী গ্রামের বাচস্পতি মিশ্র, মুখুটী গ্রামের রামধন, আর কাঞ্জিবিল্বী ধনুর্ধর, আর মহিন্তা মাধবাচার্য এই কয় জনকে একত্র করো, আমার এখান হইতেও দুই-এক জনকে লও। ইহারা সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা বলিয়া দিবে, তাহার উপর কথা কহিবার লোক থাকিবে না। ভবদেব হরিবর্মদেবের[৭] প্রধান মন্ত্রী ও সর্বশাস্ত্রবিৎ। বাচস্পতি মিশ্র স্বনামধন্য ব্যক্তি, তিনি ভবদেবের প্রশস্তি লিখিয়াছেন। আর মহিন্তা মাধবাচার্য 'রাঢ়দ্বয়ে দণ্ডধৃক্।' তাহার পর সময় পাইয়া সব খবর লইয়া 'ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে'।" এইরূপ স্থির হইলে পাণ্ডুদাস কায়স্থকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এই মর্মে বিহারীকে পত্র লিখিতে বলিলেন এবং পাড়িহার রাজপুতকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। তখন অন্যান্য লোকের কথা শুনিতে লাগিলেন।

## ৪

কত লোকের কত প্রকার মামলাই হইতে লাগিল। একটা চোরের শাস্তি হইল। দেনার দায়ে একজনকে কয়েদ করা হইল। তাহার আত্মীয়েরা দেনা শোধ করিয়া দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া হইয়া [ লইয়া ] গেল। বাগ্‌দানের পর বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া একজন বলিল, "ও মেয়ের জাতিগত দোষ আছে।" দোষ প্রমাণ না হওয়ায় তাহার বিবাহ স্থির করিয়া দেওয়া হইল। একজনকে অপালনকৃত গোবধের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া হইল। ব্যবসায়ার্থ ম্লেচ্ছদেশ-গমনের জন্য বৈধ গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করা হইল। একজন ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধমঠে আশ্রয় লইয়া তিন রাত্রি বাস করার জন্য জাতিচ্যুত করা হইল। বৌদ্ধ পণ্ডিতের কাছে রূপাবতার ব্যাকরণ[৮] পড়ার জন্য একজন ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া হইল; বলিয়া দেওয়া হইল, অনুকল্প গোদান বা কাড়িদান করিলে হইবে না; তাহাকে প্রত্যহ এক-এক গ্রাস অন্ন কমাইয়া অমাবস্যার দিন নিরম্বু উপবাস করিতে হইবে। তাহার পর প্রত্যহ এক-এক গ্রাস বাড়াইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণমাত্রায় পনেরো গ্রাস আহার করিলে সে নিষ্পাপ হইবে। গড়ভবানীপুরের একজন বেনে অগুরুচন্দন বলিয়া অন্য কাঠ বেচায় তাহার দশগুণ দণ্ড দেওয়া হইল। যাহার কাজ হইয়া যাইতেছে, সে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কত যে

এল, আর কত যে গেল. তাহার ঠিকানা নাই। এমন সময় বসন্তপুরের রমাই আর তাহার ছেলে নবাই মহাকোলাহল করিতে করিতে পাণ্ডু-দাসের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই গালিচার [ উপর ] গদির দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। ছেলে বসিল ডান পাশে ও বাপ বাম পাশে।

ছেলে নবাই অমনি বলিয়া উঠিল, "দেখলে তো বাবা, পাণ্ডুকাকার কাছে অবিচার হওয়ার জো নাই। আমায় দিলেন ডাইনে বসিতে, আর তোমায় বামে। তবেই বুঝা গেল, উনি কাহাকে বড়ো বলেন।"

বাপ বলিলেন, "বটে— তাই বুঝি, তুই ডাইনে গিয়ে আপনি বসিলি, আমি তোর কাছে না বসিয়া বামে বসিলাম। তাতে আবার ছোটো বড়ো কি রে? যে বাপের চেয়ে বড়ো হতে চায়, তার মতো ছোটো আর কে আছে? শাস্ত্র বলে, 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ'— তুই কি না সেই বাপের চেয়ে বড়ো হতে চাস?"

"দেখ বাবা, তুমি যে আমার বাপ, তা তো আমি অস্বীকার করি না, তুমি যে পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্, তোমার যে আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণের আট গুণ আছে, তাহা আমার চেয়ে আর কে জানে? তোমার প্রতি পিতৃভক্তির কোনো অভাব কোনো দিনও আমার দেখিয়াছ কি? তবে কি না, যেটা সত্য, সেটা বলিতেই হইবে। তোমার পিতা আবৃত্তিটা করেন নাই— পাল্‌টি ঘরে বিবাহ করেন নাই। তোমার মা ছোটো বামনের মেয়ে ছিলেন, আর আমার মা যাঁর কন্যা, তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলমেরু, লোকে কুলাচল বলে, তিনি একেবারে কুলমেরু। আমার মাতা-মহের নাম করিলে মুখ উজ্জ্বল। আর তোমার মাতামহ? তাঁর নাম কে জানে? যেও বা জানে, সেও বলিবে 'বামন তত ভালো নয়'।"

এইরূপে দুই জনে পাণ্ডুকাকার পার্শ্বে বসিয়াই ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডুকাকা বলিলেন, "বলি, ব্যাপারটা কি? এতদিন না ততদিন— বাপব্যাটায় আজ জাতি লইয়া ঝগড়া কেন?"

বাপ। কেন জান? রাম শেঠের বাড়িতে তার বাপের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সভা হয়, সভায় আমরা দুজনেই উপস্থিত ছিলাম। মালা-চন্দনের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা আমার গলায় মালা দিতে আসিল। হতভাগা ছেলে আপত্তি করিয়া বলিল, "আমি থাকিতে

বাবার গলায় মালা দিলে আমার মাতামহের অপমান করা হয়।”

ছেলে। হয় না কাকা? সে অপমান করা কি উঁহার উচিত? তিনিও তো উঁহারই শ্বশুর। বয়স হয়েছে কিনা, তাই শ্বশুরের অপমানটা দেখিতেই পান না।

পাণ্ডু কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, “শেষ রাম শেঠ করিল কি?”

বাপ বলিলেন, “সে আর কি করিবে, বাপ রেখে ছেলের গলায় মালা দিবে?”

ছেলে বলিলেন, “সে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে আমার গলায় ছুঁইয়ে বাবার গলায় মালা দিলে। কিন্তু কাকা, এ রকমটা আর যাতে না হয়, আপনি করিয়া দিন, আমরা বিচারপ্রার্থী। আমার মাতামহের যদি এই-রূপ অপমান হয়, আমি আর এ দেশে থাকিব না, মাতামহের দেশে গিয়া বাস করিব।”

পাণ্ডুদাস বলিলেন, “আমি ইহার কি বিচার করিব? ইহার বিচার তোমার মার হাতে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।”

ছেলে বলিল, “কাকা, আপনিও এই কথা বলিলেন? তাহা হইলে আমার দেশত্যাগই শ্রেয়, কেননা, শাস্ত্রে বলে, 'দেশত্যাগেন দুর্জনঃ'?”

পাণ্ডুদাস এইবার পথ পাইলেন: বলিলেন, “দেখ নবাই, তোমার বাবাকে বড়োই শ্রদ্ধা করি, উঁহাকে দাদার মতো দেখি, তাই এবার তোমায় মাপ করিলাম; নহিলে ভুরসুটের অধিপতি পাণ্ডুদাসকে মুখের উপর দুর্জন বলিয়া গালি দিয়া পার পায়, এমন লোক এ দেশে নাই। যাইতে হয় তুমি যাও, তাহাতে ভুরসুটের কোনো ক্ষতি হইবে না।”

নবাই তখন বলিলেন, “আমি কি আপনাকে বলিতেছি— আমি কি আপনাকে বলিতেছি?”

পাণ্ডুদাস বলিলেন, “আমায় যদি না বলিতেছ, তবে তোমার বাপকে বলিতেছ, বড়ো পৌরুষই প্রকাশ করিতেছ!”

নবাই গজ্-গজ্ করিতে করিতে উঠিল। এমন সময়ে কায়স্থ বিহারী দত্তের পত্রের জবাব লইয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডুদাস চিঠি পড়িলেন; শ্রীধরকে দেখিতে দিলেন। তিনি দেখিয়া একটু হাসিলেন। পাণ্ডুদাস স্বাক্ষর করিয়া দিলেন এবং পড়িহার রাজপুতকে ডাকাইলেন। সে পত্র লইয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভুরসুট গ্রামের নামে রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঁঞী হইয়াছিল। রাঢ়ীয় শ্রেণীর পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রে শুভ নামে এক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণরাঢ়ের রাজা ভুরিসৃষ্টিকা ভুরিশ্রেষ্ঠিক গ্রাম দান করেন। তাহা হইতেই ভুরিগ্রামী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বল্লাল হইতে ভুরিগ্রামীর প্রাধান্য লোপ হইয়াছে। বল্লালের পূর্বে এই ব্রাহ্মণেরা বড়োই পণ্ডিত ও বড়োই দাম্ভিক ছিলেন। একজন ভুরসুটের ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "আমি এক-দিন ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আপন ঊরুদেশ গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া তাহার উপর আপন উত্তরীয় বিছাইয়া আমায় সেখানে বসিতে দিলেন।" যেমন ভুরসুট হইতে ভুরিগ্রামীর উৎপত্তি, তেমনি সিদ্ধল বা সিধ্‌লা গ্রাম হইতে সিদ্ধলগ্রামীর উৎপত্তি! সিদ্ধল-গ্রামীরা, যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বড়োই প্রবল। ঐ গ্রামের ভবদেব ভট্ট হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী। সিদ্ধল গাঁখানা সাতগাঁ রাজ্যের সীমার বাহিরে রাঢ়দেশের মধ্যে। দেশটি অতি পবিত্র। তবে রাঢ়দেশে বড়ো বড়ো মাঠ ; ছোটো ছোটো গ্রাম। মাটি এঁটেলা, বর্ষায় চলাফেরা বন্ধ। গ্রীষ্মে রৌদ্র নিবারণের জন্য বড়ো বড়ো অশ্বত্থ গাছ ও বড়ো বড়ো বটগাছ মাঠের মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সাতগাঁয়ের সীমানা ছাড়াইলেই এই সমস্ত দেখা যাইত। সব গ্রামেই বড়ো বড়ো পুষ্করিণী আর বড়ো বড়ো বাগান, আম-কাঁঠালের গাছ, মাঠের মাঝেও বড়ো বড়ো বাগান। সেকালের লোক পুষ্করিণী ও বাগান প্রতিষ্ঠা বড়ো পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মধ্যে আবার ভবদেব ভট্ট একটু বিশেষ [ করিয়াছিলেন ]। তিনি সিদ্ধল গ্রামের চারি দিকে ১০/১২ ক্রোশ ধরিয়া যত গ্রাম ছিল, সর্বত্রই পুকুর ও বাগান দিয়াছিলেন। সিদ্ধল

গ্রামের চারি দিকটাই একটা বড়ো বাগানের মতো হইয়াছিল। রাঢ়দেশ বলিয়াই বোধ হইত না। তাহারই ঠিক মাঝখানে সিদ্ধল গ্রাম, কেবল ব্রাহ্মণের বাস। এই ব্রাহ্মণেরা সাবর্ণ গোত্র। এই গোত্রের ব্রাহ্মণেরা শত শত গ্রাম পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সিদ্ধলই সকলের চেয়ে বড়ো গ্রাম। এই গ্রামের যিনি গ্রামীণ, তাঁহার উপরই গ্রাম-শাসনের ভার। পাণ্ডুদাস যেমন ভুরসুটের অধিপতি বা গ্রামীণ, এখানেও একজন সেইরূপ গ্রামীণ ছিলেন। কিন্তু ভবদেব ভট্ট সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার যেমন পদমর্যাদা, যেমন অগাধ বিদ্যা, তেমনি তিনি সজ্জন, তেমনি তিনি দাতা, তেমনি তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। যে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নি অগ্নিশালায় সর্বদাই জ্বলিত। তিনি তাহা নিভিতে দিতেন না। হয় নিজে, না-হয় প্রতিনিধি দ্বারা প্রত্যহ সায়ংপ্রাতে হোম করাইতেন; অমাবস্যায় দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে পৌর্ণমাস যাগ করাইতেন। এ সকল কিন্তু শ্রৌত-যাগ নহে, এ সকল স্মার্ত-যাগ। ইহাতে তিন অগ্নির দরকার হইত না। আর আর অনুষ্ঠান তাঁহার বাড়িতে ঢের হইত।

সম্প্রতি তিনি কলিঙ্গের রাজধানী তোষলি নগরের ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটে অনন্ত বাসুদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাহারই পাশে বিন্দুসরোবর নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুষ্করিণীর ঠিক মাঝখানে নারায়ণের বাসার্থ একটি দ্বীপের উপর একটি মন্দিরও করিয়াছেন। এই সকল কার্যের জন্য তাঁহাকে অনেক দিন একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজা দেশটা দখল করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার শাসন করাও তাঁহার আর-এক কাজ ছিল। তিনি সেই সকল কাজ সারিয়া সম্প্রতি কিছুদিন বিশ্রাম করিবার জন্য সিদ্ধল গ্রামে বাস করিতেছেন, আর কয়েক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের সঙ্গে বসিয়া স্মৃতিপুস্তক ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতি রচনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নিজের যে রাজ্য বালবলভী বা বাগড়ী, তাহা প্রতিনিধি দ্বারা শাসন করাইতেছেন। ঐ রাজত্বটি গঙ্গা ও পদ্মার মাঝখানে, উহার আকার 'ব'কারের মতো, উহার দক্ষিণ দিকটা প্রায়ই জঙ্গল— সুন্দরবন। উত্তর দিকটায় কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মানুষের বসবাস হইয়াছে। হরিবর্মদেব ঐ দেশ জয়

করিয়া আপন প্রিয় সচিব ভবদেব ভট্টকে শাসন করিতে দিয়াছেন। এই ব্যাপার হইতে ভবদেবের উপাধি হইয়াছে "বাল-বল্লভী-ভুজঙ্গ" অথবা বাগড়ীর রাজা।

২

ভবদেব যখন সিদ্ধল গ্রামে থাকিতেন, তখন তিনি অন্দরেও থাকিতেন না, বাহিরেও থাকিতেন না। ইহার মাঝখানে একটা ঘেরা জায়গার ভিতরে, তাঁহার এক অগ্নিশালা ছিল, সেইখানে তিনি বসিতেন। সে এক প্রকাণ্ড ঘর। সেই ঘরের এক পাশে একটু আল দিয়া আগুন রাখা হইত। ইহারই নাম স্মার্ত-অগ্নি। তিনি এই অগ্নি নিভিতে দিতেন না। আলের বাহিরে প্রকাণ্ড গালিচা পাতিয়া ও চাঁদোয়া টাঙাইয়া তিনি নিজে বসিতেন ও পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করিতেন। গালিচার বাহিরে থাকিত রাশীকৃত তালপাতা। তালগাছের মাজ-পাতা কাটিয়া ছয় মাস পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহার নাম 'পাকান'। পরে এই পাতা দুধে সিদ্ধ করা হইত, শাঁখ দিয়া ডলা হইত, তাহার পর কাঠি বাদ দিয়া পাতাগুলিকে সমান করিয়া কাটা হইত, তাহার পর তালপাতার আড়-দীঘ্ বুঝিয়া কোনোটির ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র করা হইত ; ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু পাকানো দড়ি চালাইয়া দেওয়া হইত, সেই দড়িতে তালপাতাগুলি বাঁধা হইত। যদি পাতাগুলি লম্বায় বেশি হইত, তবে দুই জায়গায় দুইটি ছিদ্র করা হইত, আরো বেশি লম্বা হইলে তিনটি ছিদ্র করা হইত। পুস্তকবিশেষে ঠিক মাঝখানে ছিদ্র না করিয়া একটু বামের দিকে ছিদ্র করা হইত। বৌদ্ধেরা প্রায়ই বামের দিকে ছিদ্র করিত। পুথি লেখা হইলে, পাঠের পুথির দড়িতে একটি তালপাতের ময়ূর লাগাইয়া রাখা হইত। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে হইলে, ময়ূরটি পাতায় দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে হইত, নতুবা কোথায় থাকিল, ঠিকানা পাইবে কিরূপে ? গালিচার নিকটে মাটির দোয়াতে কালি, তাহাতে ন্যাকড়া দেওয়া। দোয়াতটি একটি কাঠের ফ্রেমে আঁটা। ফ্রেমটি হাতখানেক লম্বা। যতটুকুতে দোয়াত আছে, তাহার বাহিরে কলম রাখিবার জায়গা। কলম অনেকগুলি— কোনোটি কঞ্চির, কোনোটি

বাকারির, কোনোটি শরের, কোনোটি অস্থির, কোনোটি কলমিডগার। সবগুলিই বেশ করিয়া পাকানো, আর সরু করিয়া কাটা। লিখিতে লিখিতে কলমের মোচ খারাপ হইয়া গেলে, তাহাকে ফের কাটিয়া লইবার জন্য, একখানি ইস্পাতের ছুরিও কলমদানিতে থাকে। দোয়াতদান ও কলমদানের পাশে বালিদান। তাহাতে খুব সরু মিহি বালি থাকিত। সেকালে এই বালিতেই ব্লটিঙের কাজ হইত। ভবদেব অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার সহকারী পণ্ডিতেরা লিখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আপত্তি তুলিয়া বিচার করিতেছেন।

আজ ভবদেব সামান্য-বহ্নিস্থাপনের পদ্ধতি লিখিতেছেন— বালি ঢালিয়া, বালিটাকে চৌকোণা করিয়া, একুশ আঙুল, বারো আঙুল কুশ দিয়া রেখা টানিবার ব্যবস্থা করিতেছেন ; মাঝে মাঝে অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া বালি লইয়া উৎকর প্রক্ষেপের ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন সময় অগ্নিশালার দরজায় যে দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত কার্যার্থী।" পাছে ভবদেব দরোয়ানের কথা শুনিতে না পান, তাই একজন সিদ্ধল ব্রাহ্মণ গালিচার উপরে উঠিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "খুড়ামহাশয়, শুনিয়াছেন— সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত কার্যার্থী।"

ভবদেব। বিহারী দত্ত— নিজেই আসিয়াছে ?

ব্রাহ্মণ। হাঁ।

ভবদেব। বোধ হয়, ব্যাবসা-বাণিজ্যের কোনো সুবিধা করিয়া লইবে, তার জন্যই এসেছে। (খানিক ভাবিয়া) নাঃ— তা হলে নিজে আসিবে কেন ?— তুমি বলিতে পার, তাহার সহিত কয় জন লোক আসিয়াছে ?

"পাঁচটি ডুলি-বেহারা, তিনটি চাকর।"

"এই আটটি মাত্র লোকের সঙ্গে বিহারী দত্ত এসেছে! ব্যাপার গুরুতর দেখিতেছি। আচ্ছা, তাঁহাকে বেনেদের অতিথিশালায় লইয়া যাও। তাঁহাকে বলিয়া দাও, অদ্য অপরাহ্ণে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।"

ভবদেব ঠাকুর সেদিনকার মতো কাজকর্ম বন্ধ করিয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন, পণ্ডিতেরাও উঠিলেন। যে ব্রাহ্মণ বিহারীর সংবাদ আনিয়াছিল, সে বিহারীকে লইয়া, বেনেদের অতিথিশালায় লইয়া চলিল।

বিহারীর ব্রাহ্মণ-বাড়িতে আতিথ্যস্বীকার বোধ হয় এই প্রথম। সে অতিথিশালায় গিয়া দেখিল— সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনো জায়গায় একটু ধুলা বা ময়লা নাই। কত কাল যে এই অতিথিশালায় অতিথি আসে নাই ( বেনেরা তো বড়ো একটা অতিথি হয় না ), তাহার ঠিকানা নাই। তবু সব ঝর্-ঝর্ তর্-তর্ করিতেছে। একখানি কাঁঠালের তক্তাপোশের উপর শতরঞ্জ বিছাইয়া বিহারীকে বসাইয়া, পরে ব্রাহ্মণ বলিল, "আপনি এইখানে বসিয়া বিশ্রাম করুন, আমি ডুলি-বেহারাদের দেখিয়া আসি।" এই কথা বলিতে বলিতে ডুলি লইয়া তাহারা অতিথি-শালার ভিতর আসিল। ডুলি একখানি পরিষ্কার দোচালায় রাখিতে বলিয়া ব্রাহ্মণ বেহারাদের বলিল, "তোমরা ঐ যে অশ্বত্থগাছের তলায় একখানি দোচালা— ঐখানে বিশ্রাম করো। আর এই মালায় তেল লইয়া যাও। ঐ অশ্বত্থগাছের পশ্চিমে দিঘি আছে, তাহাতেই স্নান করো।" আর বিহারীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি কি তোলাজলে স্নান করিবেন ?— না গরমজলে স্নান করিবেন ?— না পুকুরেই স্নান করিবেন ?" বিহারী পুষ্করিণীতেই স্নান করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সেখানে একখানি জলচৌকি, তেল, গামছা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। বিহারীর চাকরেরা তাঁহাকে তেল মাখাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অন্দরে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ব্রাহ্মণ স্নানাহ্নিকের পর বিহারীর জলযোগের জন্য ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ও রাঁধিবার জন্য চাল, ডাল, ময়দা, ঘি, তরিতরকারি ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। বিহারী বলিল, "ও কি করেন মহাশয়! আমি ভবদেব ভট্টের বাড়িতে অতিথি হইয়াছি, আমি তাঁহার বাড়িতে প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইব! চাল-ডাল কেন ?"

"কি তা জানো ভাই! সকল বেনেদের তো ব্রাহ্মণের উপর এমন ভক্তি নাই, তাই বেনেদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা আছে।"

"যার নাই, তার নাই, আমার তো যথেষ্ট আছে। আমি প্রসাদই পাইব।" বিহারী স্নান আহ্নিক সারিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। বেলা ঠিক আড়াই প্রহরের সময় একখানি গালিচার আসন আসিল, একখানি কলার পাত আসিল, একটি মাটির ভাঁড় আসিল, সঙ্গে সঙ্গে একজন পাচক ব্রাহ্মণ অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আসিল।

ভবদেব পইতার ঘর হইতেই হবিষ্য করিয়া আসিতেছেন, এবং

প্রতিজ্ঞা— আজীবন হবিষ্য করিবেন। পাচক ব্রাহ্মণ একদলা ভাত সর্বপ্রথমে কলার পাতে রাখিয়া বলিল, "ভবদেব ভট্টের প্রসাদ" ; তাহার পর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত কলার পাতে সাজাইয়া দিল ; কলার খোলার ঠোঙায় করিয়া ডাল, ঝোল, অম্বল, পায়স— সব দিল ; বিহারীকে বলিল, "আপনি বসুন।" বিহারী আগ্রহ সহকারে প্রসাদ মুখে দিল, দেখিল, উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চালের ভাত, তাহাতে সেই দিনেরই তৈয়ারি ঘি মাখানো, উৎকৃষ্ট সরু মুগের ডাল ভাতে দেওয়া। খাইতে খাইতে বিহারী বার বার বলিতে লাগিল, "আমি সত্য সত্যই অমৃত ভোজন করিতেছি, এমন রান্না আর-কখনো খাই নাই।"

৩

চারি দণ্ড বেলা থাকিতে ভবদেব ঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বার দিলেন। কার্যটি গুরুতর বিবেচনা হওয়ায়, আর-কাহাকেও তিনি সঙ্গে আসিতে দিলেন না। বিহারীও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল ও চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিল। ব্রাহ্মণবাড়ির রান্না যে অমৃত, সে কথা বিহারী বার বার বলিতে লাগিল। সে বলিল, "আজ ঠাকুরের বাড়িতে অতিথি হইয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও রাখাকেই ব্রাহ্মণত্ব বলে। আপনার দেশটা সব দেখিলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোনোখানে কিছু ময়লা নাই। আপনাদের ভিতরটাও বোধ হয়, এমনই পরিষ্কার। আর ঐ ওদের— দেখুন দেখি? রূপা-রাজা এমন একটি মহাবিহার করিয়া দিলে! পড়িলে সিন্দূর তোলা যায়। কিন্তু এই কয় দিনের মধ্যেই ভিখারীরা কি করিয়া তুলিয়াছে— চারি দিকে ময়লা আর দুর্গন্ধ। কেবল তাহারা নিজের শরীরটিকে পরিষ্কার রাখে, আর শুইবার জায়গাটিও পরিষ্কার রাখে। বাকি কিছুই দেখে না, তাহাদের বিহারের ত্রিসীমানায় যাইতেও ঘৃণা হয়।"

ভবদেব ভাবিয়াছিলেন, বিহারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তাই বাড়িতে তাহাকে ভাত না দিয়া, অতিথিশালাতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নহিলে যাহারা ব্রাহ্মণপন্থী, তাহাদিগকে বাড়ির মধ্যে যাইতে দিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তাহারা পাত কুড়াইয়া লইয়া যাইত— এইমাত্র।

খানিকক্ষণ এইরূপ [ আলাপ ] শিষ্টাচারের পর ভবদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারী, তুমি যে স্বয়ং আসিয়া হাজির ! ব্যাপারখানা কি, খুলিয়া বলো দেখি।"

"আজ্ঞা— ব্যাপার গুরুতর ! আমি আমার জাতি-কুল মান-ধন সবই হারাইতে বসিয়াছি। আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তাই আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি"— বলিয়াই বিহারী একেবারে দণ্ডবৎ হইয়া বারান্দায় পড়িল। ভবদেব ঠাকুর বিহারীকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া ক্রমে আস্তে আস্তে বিহারীর মুখ হইতে সব ঘটনা শুনিলেন।

সিদ্ধল হইতে সাতগাঁ বেশি দূর নয়। ভবদেব প্রায়ই সেখানে যাইতেন, ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতেন। কিন্তু তিনি রূপা-রাজার প্রাদুর্ভাবের পর হইতেই আর সে-মুখো হন না। বিহারী ও সাধুধনীর সঙ্গে ইঁহার বেশ জানাশুনা ছিল। জীবনকেও তিনি জানিতেন, তবে তাহাকে খুব ছোটো দেখিয়াছিলেন।

ভবদেব ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিবে মনে করিতেছ ?"

"সেই পরামর্শের জন্যই তো আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি যাহা পরামর্শ দেন, তাহাই করিব। তবে আমি এই জানি, আমরা পুরুষানুক্রমে সৎপথে থাকিয়া যে সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছি, কতকগুলি লম্পট, ভণ্ড ভিখারীরা সেই সমস্ত লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, ইহা আমি প্রাণ থাকিতেও সহিতে পারিব না। আর আমার মেয়ের কথা"— বিহারী কাঁদিয়া ফেলিল।

ভবদেব বিহারীকে আশ্বস্ত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আর-কাহারো পরামর্শ লইয়াছিলে ?"

"আপনি তো এ দেশে ছিলেন না, তাই ভুরসুটের গাঞী পাণ্ডু-দাসের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছেন, এই তালপাতাখানি দেখুন, সব লেখা আছে।"

ভবদেব তালপাতাখানি একবার, দুই বার, তিন বার পড়িয়া দেখিলেন, পরে বলিলেন, "তুমি তাহাকে সব কথা খুলিয়া বল নাই ?"

"আজ্ঞা না। পত্রে সব কথা খুলিয়া বলিতে আমার ভরসা হয় নাই।"

"তুমি বোধ হয় লিখিয়াছিলে, চতুর্বর্ণে তোমাদের স্থান কোথায় ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"পাণ্ডু তোমাকে ঠিক পরামর্শই দিয়াছেন। তুমি এই সকল লোক একত্র করো। কোথায় করিবে, বলো দেখি ?"

"আজ্ঞা, সে বিষয়ে তো আপনারই বুদ্ধি-স্ফূর্তি হয়। আমি বেনে, আমার তো ও বিষয়ে কোনো বোধসোধই নাই।"

"দেখো, তোমার রাজার যেটুকু দেশ, তা আমরা ম্লেচ্ছের দেশ বলিয়া মনে করি। সেখানে আমরা তো যাইব না। আমার এখানে সকলে আসিয়া জুটিতে পারেন। কিন্তু আমি এখানে বেশি দিন থাকিতে পারিব না। আমাকে শীঘ্রই বাগড়ী যাইতে হইবে। আমার যদি মত লও, তাহা হইলে বাগড়ীতে দেবগ্রামে বাচস্পতি মিশ্রের টোলে সভা হইলেই ভালো হয়। পাণ্ডুর আসার পক্ষে একটু কঠিন হইবে বটে। কিন্তু তোমার তো ছিপ আছে। যাটদাঁড়ী একখানি ছিপ দিয়া একরাত্রির মধ্যেই তাঁহাকে সাতগাঁয়ের রাজত্বটা পার করিয়া দাও। সেইখানে বসিয়া আমরা তোমাকে ঠিক শাস্ত্রসংগত, যুক্তিসংগত এবং সুখসাধ্য পরামর্শ দিব। আমরাও কিছুদিন ভাবি।"

ভবদেব আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আচ্ছা— তোমরা বলিতে পারো, বিক্রমণিপুরের সেই রাজার ছেলেটা কোথায় গেল ? আমার রাজারও সেইজন্য বড়ো চিন্তা, আমারও একটু চিন্তা আছে। রাজাকে মারিয়া তো দেশটা দখল করিয়াছি। কিন্তু রাজার ছেলেটা গেল কোথায় ?"

"ঠাকুর, আমি ফাঁকা ফাঁকা শুনিয়াছি— সেটা সঙ্ঘে গিয়াছে। কোন্ সঙ্ঘে— তা তো ঠিক বলিতে পারি না। লুই-সিদ্ধার এক চেলা আছে। রূপা-রাজা তাহাকে বড়োই মানে। সে দেখিতেও ঠিক রাজপুত্রের মতো, খুব পণ্ডিত, খুব বুদ্ধিমান্।"

ভবদেব একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা হবে— তা হবে।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা— বিহারী, বলো দেখি, তোমার অবর্তমানে তুমি তোমার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিতে চাও ?"

"ঠাকুরের যে রায় হইবে, আমার রায়ও তাই। আপনারা যাহা বলিবেন, আমি নিঃসঙ্কোচে ও নিঃসন্দেহে তাহাই করিব। সদ্ধর্মী

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

একেই তো ভণ্ড ও লম্পট। তার উপর লুই-সিদ্ধার যে দল হইয়াছে, তাহারা বেশ্যাবৃত্তিকেও হারাইয়া দিয়াছে। তাহারা যে বেনেদের এত বড়ো দুটা সম্পত্তি খাইবে, এটা আমি একেবারেই সহিতে পারিব না! আপনারা বলেন তো আমি সমস্ত সম্পত্তি নারায়ণে সমর্পণ করিয়া দিয়া যাইব। আপনারা বলেন তো দুধের সাধ ঘোলে মিটাইব— দুটি বেনের ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইব। তাহাদের হাতেই দুটি সম্পত্তি তুলিয়া দিয়া যাইব।”

ভবদেব। না, আমরাও তোমাকে ভণ্ড-লম্পটদের হাতে সম্পত্তি দিতে দিব না।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহাবিহারের সব প্রতিষ্ঠা-কর্ম শেষ হইয়া গেল। লুই-সিদ্ধা আপন শিষ্যের হাতে মহাবিহারের সব ভার দিয়া প্রায় সমস্ত কীর্তনীয়ার দল লইয়া প্রস্থান করিলেন। অধিকাংশ খোল-করতাল আর খঞ্জনিওয়ালা তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। তিনি দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সহজ-ধর্ম ও মহাসুখবাদের মর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দল খুব বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার ডাক হইতে লাগিল। তিব্বত, পেগু, আরাকানেও তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল। গুরুপুত্রের জন্য কেবল ২/৪ জন ভালো ভালো কীর্তনীয়া মহাবিহারে রহিয়া গেল। তাহারা রোজ রোজ গুরুপুত্রকে বৈকালে কীর্তন শুনাইতে আসিত। তাঁহার অবসরমতো তিনি শুনিতেন।

গুরু চলিয়া গেলে গুরুপুত্র কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি নিজেই কর্তা, তাঁহার হুকুম সকলেই মানে। রাজা তাঁহার কাছে জোড়হস্ত। অথচ তাঁহার নিজের কোনো বিষয়েই কোনো জ্ঞান নাই। কি করিলে কি হয়, তিনি তাহা বুঝেনই না। অথচ তাঁহার পড়াশুনা আছে।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥[১]

এ কথা তাঁহার বেশ জানা আছে। যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে তাঁহার নিজের কোনোই হাত ছিল না। সুতরাং অবিবেকিতাটা যাহাতে না আসিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বেশ যত্ন আছে। তিনি বরং কোনো কার্য না করেন সেও ভালো; কিন্তু হঠাৎ কোনো কাজ করিয়া বিবেচনার ত্রুটি দেখাইবেন না। তাঁহার আরো মুশকিল হইয়াছে, তাঁহাকে পরামর্শ

দিবার লোক নাই। এক গুরু ছিলেন, তিনি দেশান্তরে। আর-যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের গুরু তিনি। তিনি তাহাদিগকে চালাইবেন, তাহারা তাঁহাকে চালাইতে পারে না। গুরুপুত্রটি খুব স্থির, খুব ধীর, নানা-শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, অনেক পোড় খাইয়া, অনেক দিন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া, তিনি বেশ আত্মসংযম করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহাকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিতে পারে এমন লোক অতি বিরল ; কিন্তু তাঁহার পূর্বাশ্রমের কথা মনে হইলে বড়োই কষ্ট হইত। কি ছিলাম কি হইলাম, ভাবিয়া তিনি অধীর হইতেন। অতি নির্জনে— অতি গোপনে কেহ কেহ তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেও দেখিয়াছে। তাঁহার গোপনে আরো এক ভাবনা— সে সেই হাতির উপরে মেয়েটির মুখখানি। যদিও বিষাদভরা, তথাপি তাহাতে এমন মোহ ছিল যে, গুরুপুত্র আজও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়, তাহার তলায় সে ছবিখানি গুরুপুত্র সর্বদাই দেখিতে পান ; কিন্তু নিজে সন্ন্যাসী, ও-সকল কথা তাঁহার ভাবিতেই নাই। তিনিও ভুলিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন কই ? তার মুখখানি ভাবা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক-একবার ভাবেন, "ভাবিই না, ও তো আর-কেহ দেখিতে পাইবে না, আপনার মনে আপনিই ভাবিব তাহাতে দোষ কি ?" আবার ভাবেন, "ভাবিতে ভাবিতে যদি আকার-ইঙ্গিতে আর-কেহ টের পায়, আমি কি ভাবিতেছি, তাহা হইলে তো ফাঁক হইয়া পড়িবে।"

যাহা হউক, গুরুপুত্র খুব সংযমী। মনের ভাব, মনের কথা বেশ গোপন রাখিয়া গেলেন। পরে শুনিলেন, মেয়েটি বিধবা হইয়াছে। আর সেই সময়ে তিনি বোধিসত্ত্ব-দীক্ষা সমাপন করিয়া বজ্রাচার্য-দীক্ষা লইয়াছেন। সহজ-ধর্মে তাঁহার প্রবেশলাভ হইয়াছে, সেটা তাঁহার গুরুর কৃপায়। সহজ-ধর্মের অনেক চর্যা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, সৌগতমতের নির্বাণ— বুদ্ধত্বলাভ— সব বৃথা। নির্বাণ যদি শূন্য হয়, সে তো পাথর হওয়া অপেক্ষাও খারাপ। সুখ-দুঃখ বোধ থাকিবে না, ধর্মাধর্ম কিছু থাকিবে না, এমন কি, কোনো বুদ্ধিও থাকিবে না। সে শূন্য কাহাকেও মজাইতে পারে না।

২

শূন্যের উপর যদি বিজ্ঞান মানো, সে আবার কি? সে কেবল শূন্য বুঝাইয়া দিবার জন্য— ভয়ানক অন্ধকারকে আরো ভয়ানক করিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য। শূন্য বুঝিয়া কি হইবে? তাহাতে আমার কি? শুনিলাম সবই শূন্য, বুঝিলাম সবই শূন্য, হৃদয়ংগম হইল সবই শূন্য। লাভ কি, আমি আছি শূন্য হইয়া, তুমি আছ শূন্য হইয়া— এ কথাও বলা যায় না; কারণ জগৎ অদ্বয়— আমি তুমি দুই-ই নাই, তুমিও শূন্য, আমিও শূন্য, অথচ আমরা দুই নই। আমিই শূন্য, তুমিই শূন্য, দুই শূন্য। শূন্য থেকে শূন্য পৃথক্ করা যায় না। সুতরাং সব এক— কেবল বুঝি সব শূন্য— এ অবস্থাটা বড়োই খারাপ— বড়োই ভয়ের কারণ। তাই আধুনিক আচার্যেরা একটি নূতন কথা আনিয়াছেন— সেটা মহাসুখবাদ।

গুরু চলিয়া গেলে গুরুপুত্রের চর্যা খুব কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, এত লোক আমায় দেখিয়া, আমার উপদেশ লইয়া শিখিবে, সুতরাং আমার খুব সাবধান হইতে হইবে। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠেন। তাঁহার ঘরটি বেশ পরিষ্কার, কিন্তু তাঁহার শয্যার কিছুই আড়ম্বর নাই; উঠিয়া আবশ্যক কার্য সমাধা করিয়া, তিনি গঙ্গাস্নানে যান। আগে আগে মহাবিহারের পূর্ব দিকের ফটক দিয়া সহজেই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন। এখন কিন্তু উত্তর-ফটক দিয়া বাহির হন, আর ধর্মপুরের পুরানো বিহারের ধার দিয়া পূর্বমুখে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরিয়া, যেখানে বেনেদের অনেক গোলা আছে, সেইখানে যাইয়া স্নান করেন। সঙ্গে কেহ প্রায় থাকে না। অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তরমুখ হইয়া গুরুপুত্র কি দেখিবার জন্য চাহিয়া থাকেন, তাহাব পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডুব দিয়া চলিয়া আসেন। সেখানে অনেকগুলা গোলা। সব বেনেদের। বড়ো বড়ো গোলা। দুই গোলার মাঝখানে প্রায় একটি গলি। গুরুপুত্র যে কোন্ দিন কোন্ গলি দিয়া, কোন্ ঘাটে যান, তাহার স্থিরতা থাকে না। স্থির কেবল এক জিনিস— সেই দীর্ঘনিশ্বাসটি।

৩ স্নান করিয়া আসিয়া গুরুপুত্র প্রথমেই যুগনদ্ধমূর্তি হেরুকের মন্দিরে যান, সেখানে স্বহস্তে ধূপ জ্বালেন, দীপ জ্বালেন, ফুল দেন, মালা দেন, প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব পাঠ করেন। তখন তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত গীতধ্বনির ন্যায় স্তবের ধ্বনিতে লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর দণ্ডবৎ হইয়া হেরুককে প্রণাম করেন। তাহার পর শাক্যমুনির প্রতিমার কাছে স্তব পাঠ করেন। এইরূপে পূজা শেষ করিয়া পাঠে বসেন ; সে পাঠ তাঁহার নিজের জন্য, পরের উপদেশের জন্য নহে। হয় নাটমন্দিরে, না-হয় দোতলার বারান্দায়, না-হয় নিজের ঘরের মধ্যেই বসিয়া পাঠ করেন, অনেক সময় পাঠ করিতে করিতে বারান্দায় পাইচারি করেন। তাঁহার শোবার ঘরে এক কোণে একখানা চৌকির উপর কতকগুলি তালপাতার পুঁথি সাজানো থাকে, পুঁথিগুলি খুব ভালো ছোবানো রেশমের কাপড়ে বাঁধানো, আর রেশমের দড়ি দিয়া বাঁধা। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন তিনি বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পাইচারি করিতে লাগিলেন— একটু অস্ফুট, সুতরাং অত্যন্ত মনোহর স্বরে পড়িতে লাগিলেন—

জয়তি সুখরাজ এষ কারণরহিতঃ সদোদিতো জগতাং
যস্য চ নিগদনসময়ে বচনদরিদ্রো বভূব সর্ব্বজ্ঞঃ।[১০]

ঠিক কথা— এই সুখরাজই সারবস্তু, সর্বজ্ঞ এ সুখরাজের কথা বলিতে গিয়া বচন-দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ তাঁহার কথা বাহির হইল না। এ কথা ঠিক, শাক্যসিংহ এ কথা বলেন নাই ; তাঁহার এরূপ ধারণাই ছিল না। তিনি জন্ম-জরা-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার হইবার জন্যই চেষ্টা করিতেন। তাহার পর কি হইবে, সে কথা তাঁহার ভাবনার অতীত ছিল। তাই তাঁহার নিন্দা না করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, “বচনদরিদ্রো বভূব সর্ব্বজ্ঞঃ” এই যে মহাসুখবাদ, ইহাতে পরকাল সত্যই মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। অদ্বয় হইলাম, শূন্য হইলাম, শূন্য বুঝিলাম, আমিও শূন্য— বুঝিলাম ; কিন্তু যখন বুঝিলাম, সেই শূন্য মহাসুখময়— তখন, শূন্যটাও যেন ভরা ভরা হইয়া উঠিল। শূন্যের শূন্যত্ব, শুষ্কত্ব শেষ হইয়া গেল। মহা-উৎসাহে দ্বিগুণ মনের বেগে সহজ ধর্মের চর্যায় নিযুক্ত হইলাম। শূন্যতা তখন দেবী, আমি

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

তখন ভৈরব, আমরা দুজনে এক হইয়া সুদ্ধ যুগনদ্ধ অবস্থায় নহে—লবণে ও জলে যেমন এক হইয়া যায়, তেমনি শূন্যে ও আমায় এক হইয়া গিয়া, মহাসুখে অনন্তকাল রহিলাম। এই মহাসুখময় ধর্ম, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম আর কি হইতে পারে?

৪

গুরুপুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া পাইচারি করিতেছেন। হঠাৎ সেই মুখখানি, সেই বিষাদমাখা মুখখানি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। পা-চালি ধীর হইয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, "এ মুখ আমার মনে পড়ে কেন? আর মনে পড়িলেই এত আনন্দ হয় কেন? আনন্দ না হইলেই বা সে মুখখানি দেখিবার জন্য এত অধীর হই কেন? এত দীর্ঘনিশ্বাস কেন? ইহাকেই কি আচার্যেরা বলিয়াছেন স্বসংবেদ্য সুখ— যে সুখ নিজেই বুঝা যায়, অপরকে বুঝানো যায় না। এই সুখ, এই ধ্যানই কি তবে মহা-সুখ-সমাধির আরম্ভ? এই সুখকে 'বিগলিত-বেদ্যান্তর আনন্দ' বলে— যে আনন্দ উঠিলে আর কোনো বস্তুর জ্ঞান থাকে না। এ আনন্দ উদয় হইলে বোধ হয় যেন, ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া যায়, চক্ষু বলো, কর্ণ বলো, [ নাসিকা বলো, ] জিহ্বা বলো, ত্বক্ বলো— সব আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। অধোদেশে বলো, ঊর্ধ্বদেশে বলো, [ সম্মুখে বলো, ] পার্শ্বে বলো, কেবল আনন্দ —কেবল আনন্দ— কেবল আনন্দ। আচ্ছা— মন দিয়া যখন আমরা কাব্য পড়ি বা নাটক দেখি বা গান শুনি, তখনো এইরূপ বিমল, বিশুদ্ধ, স্বসংবেদ্য, 'বিগলিত-বেদ্যান্তর' আনন্দের উদয় হয়। তবে কেন আমি এই মুখখানিকেই কাব্য করি না? এই মুখখানিকেই নাটক করি না? এই মুখখানিকেই গানের তাল-লয় করি না? কাজ কি সে আসল মুখে? যে মুখ আমার হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি কেন মহা-সুখসমাধিতে ডুবিয়া যাই না? তাই ঠিক। আমি সেই মুখই ভাবিব, সেই মুখই ধ্যান করিব, সেই মুখখানি লইয়াই থাকিব। আমি আর বেনেদের গোলার ঘাটে যাইব না। আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িব না। যাহা চাই, তাহা আমার নিজেরই

কাছে আছে। কেন পরের জিনিসে লোভ করি? কেন তাহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হই?" গুরুপুত্র যে এইভাবে কতক্ষণ রহিলেন, বলিতে পারি না।

৫ তারাপুকুরের রাজবাড়ির একটি নির্জন কুঠরিতে রূপা-রাজা বসিয়া আছে। সামনে সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র—গোপনে তাঁহাদের কি একটা পরামর্শ চলিতেছে— ভারি গোপন; কুঠরির সব দরজা বন্ধ।

শ্রীফলবজ্র। মেয়েটাকে সঙ্ঘে আনিতেই হইবে। ঐ [ একটা ] মেয়েকে আনিতে পারিলে, মহাবিহার বড়োমানুষ হইয়া যাইবে। ভিখারিণীরা এত চেষ্টা করিতেছে— তাহারা তো পারে নাই। বরং কথাটা একটু ফাঁস হইয়া গিয়াছে। সেটা ভালো হয় নাই। এখন কিরূপে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়?

সাধুগুপ্ত। বলপ্রয়োগ।

শ্রীফলবজ্র। তাহাতে হইবে না। বিহারী দত্ত বেশ সতর্ক হইয়াছে। এখনো বিহারী একাই একশো। বলপ্রয়োগে মহা-অনিষ্ট হইবে। কৌশল চাই। কিন্তু সে কিরূপ কৌশল?

রাজা। আপনারা সম্পত্তিটা হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার কিন্তু সে মেয়েটিতে আরো একটি প্রয়োজন আছে। তারই জন্য আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

সাধুগুপ্ত। ( আগ্রহের সহিত ) আপনার আবার কি প্রয়োজন?

রাজা। প্রয়োজন আমার নিজের নাই, সহজ-ধর্মের। গুরুদেব আমায় বার বার বলিয়াছেন, "এই ছেলেটি হইতেই সহজ-ধর্মের চরম উন্নতি হইবে। সেই সহজ-ধর্মের ঠিক মর্ম বুঝিতে পারিবে ও সহজ-সমাধিতে সিদ্ধ হইবে।" কিন্তু সে যোগে একটি যোগিনী চাই। আর আমার বোধ হয়, বিহারী দত্তের মেয়েই আমার গুরুপুত্রের উপযুক্ত যোগিনী। উহাকে তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই।

শ্রীফলবজ্র। তাহা হইলে মহারাজেরও যে কথা, আমাদেরও সেই কথা— মেয়েটাকে সঙ্ঘে আনা। তাহা হইলে আপনি যে বড়ো কথা

বলিতেছেন, তাহাও হইবে : আর আমরাও যে সামান্য অর্থের কথা ভাবিতেছি, তাহাও হইবে। [কিন্তু] কি কৌশলে তাহাকে আনা যায় ?

৬

তাঁহাদের কি পরামর্শ স্থির হইল, কেহই জানিল না। রাজারাজড়ার বাড়িতে গোপনে পরামর্শ— কার সাধ্য জানিতে পারে। বিশেষ সেকালে মন্ত্রগুপ্তির বড়োই আদর ছিল। কিন্তু রাজা ঘন ঘন মহাবিহারে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। গুরুপুত্রকে তিনি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার ভক্তির মাত্রা আরো বাড়িয়া উঠিল। আহারাদির পর যখন গুরুপুত্র উপদেশ দিতে বসিতেন, রাজা প্রায়ই সে সময় উপস্থিত থাকিতেন ও মনোযোগের সহিত সে উপদেশ শুনিতেন। প্রায়ই বড়ো বড়ো লোক তিনি সঙ্গে লইয়া আসিতেন এবং যাহাতে গুরুপুত্রের উপর তাহাদেরও ভক্তি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। বেনেদের অনেককেই তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহাদেরও মধ্যে অনেকেই গুরুপুত্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া আসিত। বাগ্‌দিদের মধ্যে অনেক বড়ো লোক রাজার প্রিয় হইবার জন্য গুরুপুত্রের কাছে দীক্ষাও গ্রহণ করিল। বিদেশ হইতে কোনো বড়ো লোক আসিলে, রাজা তাহাকে গুরুপুত্রের উপদেশ শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন ও নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন। গুরুপুত্র কোনো ভালো কথা বলিলে, লোকের মুখে মুখে যাহাতে তাহার বহুদূর প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। মোট কথা, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহার গুরুপুত্রের পসার ও প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া উঠে।

একে তো গুরুপুত্রের রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তপ আছে, জপ আছে, পূজা আছে, পাঠ আছে, শীল আছে, বিনয় আছে, ক্ষান্তি আছে, ধ্যান আছে, বীর্য আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতি-শক্তি আছে, বক্তৃতাশক্তি আছে, তাহার উপর তিনি বড়ো মানুষ, পঞ্চাশ-খানি গ্রামের উপস্বত্ব তিনি পান, তাহার উপর পূজাপার্বণে প্রণামী পান, পালি-পার্বণেও যথেষ্ট আয় আছে। তিনি নিজের জন্য কিছু খরচ করেন না। তাঁহার টাকা নিরন্নকে অন্নদানে খরচ হয়, বিবস্ত্রকে বস্ত্র-

দানে খরচ হয়, দুঃখীর দুঃখমোচনে খরচ হয়, রোগীর চিকিৎসায় খরচ হয়। তিনি অনাথের নাথ, পুত্রহীনের পুত্র, মাতৃহীনের মাতা, পিতৃহীনের পিতা, তাঁহার মিষ্ট কথায় রোগীদের রোগ শান্তি হয়, ভীতের ভয় শান্তি হয়, পাপীর পাপ শান্তি হয়। যাহার সংসারে কোনো শান্তি নাই, সেও যদি একবার দুদণ্ড তাঁহার কাছে বসে, তাহার সব শান্তি আসিয়া যায়। গুরুপুত্রের পসার প্রতিপত্তি যত বাড়িতে লাগিল, তাঁহার স্বভাবও ততই সুন্দর হইতে লাগিল, উপদেশও গভীর হইতে লাগিল। রাজারও তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ততই বাড়িতে লাগিল : শেষ এমনি দাঁড়াইল, যেন রাজাই তিনি, রাজা তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্যমাত্র। রাজার কিন্তু এখনো ধারণা যোগিনী না থাকিলে গুরুপুত্র সিদ্ধ হইবেন না, আর সে যোগিনী ঐ বিহারী দত্তের বিধবা কন্যা মায়া। গুরুপুত্র নিজের মনের তলায় যে মন, তাহাতে মায়াকে মহামায়া করিয়া তুলিতেছেন ; কিন্তু রাজা মায়াকে যোগিনী করিবার চেষ্টায় আছেন।

৭

কিছুদিন পরে শহরে গোল উঠিল যে, একজন মস্করী আসিয়াছেন। তিনি ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া গান করিয়া বেড়ান। তাঁহার বেশের ঠিক নাই। কখনো সন্ন্যাসীর বেশ, কখনো রাজার বেশ, কখনো ব্রাহ্মণের বেশ, কখনো চণ্ডালের বেশ। কখনো পাগলের বেশ। কখনো ডাকাতের বেশ। কিন্তু যখন যে বেশেই থাকুন, তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য অতুলনীয়, তাঁহার গলা অতি মিষ্ট, গান গাহিলে বীণা হারিয়া যায়। তাঁহার কথাও বড়ো মিষ্ট। তিনি থাকেন কোথা কেহ জানে না। কোনো দিন তাঁহাকে ধরমপুরের পুরানো বিহারে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনো কোনো দিন মহাবিহারেও দেখা যায়। তিনি বেনেদের গোলায়ও কখনো কখনো উদয় হন। কখনো কখনো ব্রাহ্মণ পল্লীতেও উদয় হন। কিন্তু কোনো-না-কোনো ছবি তাঁহার হাতে থাকেই। মানুষের ছবিই বেশি, বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের ছবিও আছে, তবে কম। কখনো কখনো কালী-দুর্গার ছবিও থাকে। তাঁহার হাতে ছবি দেখায় ভালো। সময়ে সময়ে মনে হয়, যেন ছবির সত্য সত্যই প্রাণ আছে। সে সব ছবি কে লেখে জানা যায় না। কিন্তু

পাকা চিত্রকরের হাতের ছবিও বুঝি এত ভালো হয় না। সাতগাঁয়ে সব জায়গায়ই মস্করীকে দেখা যায়।

একদিন জীবন ধনীর গোলায় সে ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। এক দাসী গিয়া মায়াকে বলিল, মস্করী ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিতেছে। মায়া ছবি দেখিতে আসিল। সেদিন মস্করীর হাতে সাতগাঁয়ের এক ব্রাহ্মণের ছবি ছিল। মায়া ব্রহ্মণকে চিনিত। ছবি সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। দেখিল, ব্রাহ্মণ যেন কথা কহিতে যাইতেছে। মস্করীর উপর মায়ার বড়ো ভক্তি হইল। মায়া তাহাকে বাবার ছবি দেখাইতে বলিল। দুই-তিন দিন পরে মস্করী বিহারী দত্তের ছবি আনিল। বিহারী সমুদ্র হইতে আসিয়া গোলায় উঠিতেছে। ঠিক সেই অবস্থার ছবি। ছবি দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ঠিক হুবহু বিহারী দত্তের ছবি। যেন নৌকা হইতে নামিয়া গোলার দুয়ারের দিকে যাইতেছে। একটি পা উঠিয়াছে আর একটি নড়িতেছে।

মায়া একা থাকে, সর্বদাই এক জিনিস ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায়। এবারও তাহার মনে হইল— মস্করী নাই, ছবি নাই। গোলার দরজায় সে আর তার বাবা। কতক্ষণ এইভাবে থাকিল। তাহার পর মায়ার যেন সব ফিরিয়া আসিল। তখন সে লজ্জিত হইল। মস্করী বলিল, "আচ্ছা— আমি আর-একদিন তোমায় আর-এক ছবি দেখাইব।"

এবার সে জীবন ধনীর ছবি আনিল। তীর-ধনুক লইয়া জীবন বাঘ মারিয়া বেড়াইতেছে— সেই ছবি দেখাইল। সেই দীর্ঘাকার ছোকরা, আঠারো বছর বৈ বয়স নয়। বুক চটালো, বড়ো বড়ো চোখ, চওড়া কপাল। মায়া দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল ; আকার ইঙ্গিতে তাহাকে সমুদ্রের ধারের সেই ছবি দেখাইতে বলিল— যেভাবে জীবন বাঘের মুখ হইতে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সে আর-একদিন সে ছবিও দেখাইল। মস্করীর উপর মায়ার খুব ভক্তি হইল, খুব বিশ্বাস হইল। সে মায়াকে বলিল, "যে ছবি তুমি রোজ ধ্যান কর, সেই ছবিখানি যদি আমায় দিতে পার, তা হলে আমি তাহাতে প্রাণ দিয়া দিতে পারি।"

# নবম
# পরিচ্ছেদ

একদিন রাত্রে গঙ্গার দু-ধারের লোক চকিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দ শুনিতে শুনিতে কোথায় মিশাইয়া গেল— দক্ষিণ হইতে আসিল, উত্তর দিকে গেল। এই পর্যন্ত জানিতে পারিল। কি শব্দ, কে শব্দ করিল, কিছুই বুঝা গেল না। পরদিন সকালে সকল গাঁয়ের লোকই শব্দের কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু কেন, কি বৃত্তান্ত— কেহই বলিতে পারিল না। একজন বলিল, ছিপ— ছিপ। অনেক দাঁড়ের ছিপ। আর-একজন বলিল— না না, কোনো জানোয়ার জলের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আর-একজন বলিল— না— হে না, ঘূর্ণিজল; চলিতে চলিতে শব্দটি মিলাইয়া গেল দেখিলে না। ছিপ হইলে শব্দটা থাকিত না? একেবারে কি কখনো ছিপের শব্দ বন্ধ হয়? আমরা কিন্তু জানি, শব্দটি ছিপেরই। যেখানে সরস্বতী গঙ্গায় পড়িয়াছে, তাহারো দক্ষিণ হইতে, অর্থাৎ সাতগাঁর রাজার এলাকার বাহির হইতে ছিপ আসিয়া এক রাত্রের মধ্যেই সাতগাঁ রাজ্যটা পার হইয়া বিক্রমণিপুরের পাশে দেবগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। ছিপে ছিল আমাদের পুরানো বন্ধু শ্রীধর ভূরি। তিনি গাঞী পাণ্ডুদাসের প্রতিনিধি হইয়া দেবগ্রাম যাইতেছিলেন। আগে বিক্রমণিপুর, তাহার পর দেবগ্রাম। ছিপ গিয়া দেবগ্রামে পঁহুছিল, শ্রীধর ঘাটে নামিলেন। একদল আধা-বয়সী ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। গাঁ-খানি নূতন বসানো, গঙ্গায় একটি বাঁওড় পড়িয়াছিল, তাহারই পূর্বে দেবগ্রাম। বিক্রমণিপুরের ভাঙা বাড়িগুলা ভাঙিয়া তাহারই মালমসলা দিয়া কতক পরিমাণে দেবগ্রাম বসানো। সুতরাং মঞ্জুশ্রীর মূর্তি সরস্বতীমূর্তি বলিয়া পূজা হইতে লাগিল। লোকেশ্বরের মূর্তি সূর্যমূর্তি বলিয়া পূজা হইতে লাগিল।

বাঁওড়ের নাম হইল দিঘি। অনেক ব্রাহ্মণের বাস হইল। আগে যেমন হইত, এক গ্রামে একই গোত্রের ব্রাহ্মণ— এখানে তাহা হইল না। নানা গোত্রের ব্রাহ্মণ একত্র বাস করিতে লাগিল। গাঞী আর গ্রামের কর্তা নহেন, গ্রামের কর্তা স্বয়ং শ্রীভবদেব শর্মা সিদ্ধল। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহারই আশ্রিত, তাই মিশ্র মহাশয়কে তিনি একটি প্রকাণ্ড চৌবাড়ি করিয়া দিয়াছেন। অসংখ্য ছাত্র চৌবাড়িতে পাঠ করে।

ছাত্রেরা খুব আদর করিয়া শ্রীধরকে চৌবাড়িতে লইয়া গেল। চৌবাড়ির চারি দিকে চারিখানি টোল-ঘর। টোল-ঘরগুলির দাওয়া খুব উচ্চ— প্রায় তিন হাত হইবে। প্রত্যেক টোল-ঘরে প্রায় ৫০টি করিয়া দরজা আছে। দুই দরজার মাঝখানে পিল্‌পা। যে দেয়ালে দরজা আছে, তাহার বিপরীত দিকের দেয়ালে একটিও জানালা বা দরজা নাই। দরজার ঠিক সামনেই একটি একটি কুলঙ্গিমাত্র; কুলঙ্গির নীচে, মেঝেতে এক-একটি উনান কাটা। যেখানে পিল্‌পা, ঘরের মাঝে সেইখানেই এক-একটি বেদী— প্রায় এক হাত উঁচু। বেদীর উপর দুইটি বিছানা হইতে পারে। এক-এক বিছানায় এক-একটি ছাত্র বাস করে। তাহারা মেঝের উনানে রাঁধে, কুলঙ্গিতে হাঁড়ি রাখে, বেদীতে শোয়; আড়ায় চালি দেওয়া আছে, তাহাতে আপন আপন জিনিসপত্র, পুঁথি-পাঁজি, কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল রাখে। প্রায় সমস্ত দিনই দাওয়ায় বসিয়া তাহারা পড়ে, অথবা চণ্ডীমণ্ডপ বা আটচালায় থাকে, রান্নার সময় এবং শোবার সময় ঘরের ভিতর আসে। রান্নাও যাহাদের পরস্পর ভোজ্যান্নতা আছে, তাহারা এক-এক জনে পালা করিয়া রাঁধে, আর সকলে একত্র খায়। যাহার অন্যের সহিত ভোজ্যান্নতা নাই সে নিজেই রাঁধে। অধ্যাপক চাউল আর কাঠ যোগান, অন্য সামগ্রী তাহারা নিজেই সংগ্রহ করে। অধ্যাপক আরো যোগান এক-একজন পেটেলী, অর্থাৎ পাট করিবার জন্য চাকরানী। সে উনান গোবর দেয়, ঘর নিকায়, উনান ধরাইয়া দেয়। ছাত্রেরা আপনার কাপড় আপনি কাচে। শরীর অসুস্থ হইলে, পেটেলী সে কাজটাও করিয়া দেয়।

২ বাচস্পতি মিশ্রের চৌবাড়িতে এইরূপ চারি পোতায় চারিখানি টোল-ঘর আছে। মাঝখানটা একটা প্রকাণ্ড উঠান। তাহার ঠিক মাঝখানে একখানা বারদুয়ারী আট-চালা। তাহাতেই বসিয়া অধ্যাপক পাঠ দেন। এক-এক পাঠে দশ-বারোটি, কখনো কখনো ৫০টি ছাত্রও বসে। পুরানো ছাত্রেরা বার-দুয়ারীর দাওয়ায় বসিয়া নূতন ছাত্রদের পাঠ দেয়, অথবা নিজে বসিয়া পুঁথি দেখে। চৌবাড়িতে প্রায় ৪০০ ছাত্রের স্থান আছে। ইহা ছাড়াও ভদ্রলোকের বাড়িতে অনেকে স্থান পাইয়াছে। ছাত্রদের স্থান দেওয়া, খরচ যোগানো, বেনেরা নিত্যকর্ম বলিয়া মনে করে। সুতরাং দেবগ্রাম একটা প্রকাণ্ড বিদ্যাস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীধর উপস্থিত হইলে বাচস্পতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। পড়ুয়াদের শিষ্টানধ্যায় হইল। অনেকে হো হো করিয়া বেড়াইতে লাগিল. অনেকে শ্রীধরের সেবায় নিযুক্ত হইল, অনেকে তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীধরও কাহারো বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ বলিয়া, কাহারো বেশ পড়াশুনা আছে বলিয়া, কাহারো বাক্‌চাতুর্য বেশ আছে বলিয়া, খুশি করিয়া দিতে লাগিলেন।

৩ এইরূপে দুই-তিন দিন গেলে মহাসভার তো অধিষ্ঠান হইল। বাচস্পতি মিশ্রের চৌবাড়ির বারদুয়ারী আট-চালায় অধিষ্ঠান হইল। শ্রীধর যেমন বাচস্পতির অতিথি হইয়াছেন, অন্যান্য অধ্যাপকগণ তেমনি কেহ বা ভবদেবের, কেহ বা দেবগ্রামের কোনো শুদ্ধ ব্রাহ্মণের অতিথি হইয়া আছেন। অধিষ্ঠানের দিন সকলে আসিয়া বারদুয়ারীতে বসিলেন। সভাপতি হইলেন ভবদেব। বাচস্পতির প্রধান ছাত্র ত্রিবিক্রম প্রতিনিধি হইলেন। বিহারী দত্তের প্রধান কর্মচারী দাওয়ায় বসিয়া তাঁহাকে সব কথা বলিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান কথা চাতুর্বর্ণ্যসমাজে বেনেদের স্থান কোথায়? ত্রিবিক্রম সেই কথা পরিষদে নিবেদন করিলেন। পরিষদ্‌ বিচার করিতে বসিলেন। প্রথম কথা তাহারা সদাচারী কি না?

চাতুর্বর্ণ্যসমাজে তাহাদের স্থান হইতেই পারে কি না। তাহারা দশবিধ সংস্কারে শুদ্ধ হয় কি না? সে সকল কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইল, ত্রিবিক্রমকে অনেকবার বাহিরে আসিয়া বিহারীর লোকের নিকট হইতে খবর লইয়া যাইতে হইল। স্থির হইল, তাহারা সদাচারী বটে, তাহারা দশবিধ সংস্কারও লয়। কেহ কেহ দশবারই সংস্কারের উদ্যোগ করে। কেহ কেহ বা অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও বিবাহের সময় অন্যান্য সংস্কার লইয়া দশ সংখ্যা পূরণ করে। একজন বলিলেন, উহারা বোধমার্গী কি না? তাহাতে আপত্তি করিয়া ভবদেব বলিলেন, সে কথা আমাদের শুনার কিছুই দরকার নাই। সম্প্রদায়ভেদের কথা এ সভায় উঠিতেই পারে না। বৌদ্ধভিক্ষু বাড়ি আসিলে আমরাও ভিক্ষা দিয়া থাকি, বেনেরাও দেয়, তাহাতে ক্ষতি কি? প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযোগী বাড়ি আসিলে তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করা সবারই উচিত। আর মানতের কথা— রোগী, আর্ত, পীড়িত সকল লোকের কাছে, সকল দেবতার কাছেই, শান্তির আশা করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের সমাজের কোনো ক্ষতি হয় না। আসল কথা, গৃহ্যসূত্রোক্ত সংস্কারের। সেগুলি রীতিমতো হইলেই চাতুর্বর্ণ্যসমাজে সে স্থান পাইবে। একজন আপত্তি করিয়া বলিলেন, এখন অনেক পাষণ্ডমতাবলম্বীরাও তাদের মনের মতো একরকম সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাতে ভবদেব বলিলেন, গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানে সংস্কার হওয়া চাই। প্রতিনিধি বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংস্কার করায় কে? উত্তর হইল ব্রাহ্মণে। তখন বেনেদের চাতুর্বর্ণ্যসমাজে স্থান আছে, ঠিক হইয়া গেল।

## ৪

এখন কথা হইল, তাহারা কোন্ বর্ণ? এইবার ঘোর বাদানুবাদ চলিল। ত্রিবিক্রম বার বার গাঁথাঘর (গ্রন্থাগার) হইতে পুঁথি আনিয়া খুলিয়া পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন, "নন্দান্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ"[১১] ক্ষত্রিয়েরই লোপ হইয়াছে। বৈশ্যের তো লোপ হয় নাই। বেনেরা বৈশ্যবৃত্তি করে, সুতরাং তাহারা বৈশ্যই। বৈশ্য হইলে সে তো ত্রৈবর্ণিক হইবে। তাহার বেদে অধিকার থাকিবে। তাহাদের তো অনেক

দিন বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ লোপ হইয়াছে। এখন তাহাদের বেদে অধিকার দিতে হইলে বড়োই মুশকিলের কথা। তাহাদের বাড়িতে সকল ব্রাহ্মণকেই অন্তত ফলাহার করিতে হইবে। তখন ত্রিবিক্রম মহা ফাঁপরে পড়িলেন, রাশি রাশি পুঁথি আনিতে লাগিলেন, কিন্তু বচন পাওয়া যায় না। শেষ এক বচন বাহির হইল, "কলাবাদ্যশ্চ অন্ত্যশ্চ" কলিতে আদি ও অন্ত্যবর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ নাই। সুতরাং বিহারী দত্ত ও তাহার জাতি-ভাই সকলেই শূদ্র।

তাহার পর প্রশ্ন হইল, বিহারীর দেহান্তে তাহার ধন কে পাইবে? তাহার এমন কি নিকট সপিণ্ড-জ্ঞাতিও নাই। তখন ভবদেব বলিলেন —সে কথা আমি অনেকদিন স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সে পোষ্যপুত্র লউক। তাহার একটি শ্যালক আছে, এখনো তাহার বিবাহ হয় নাই। সে সেইটিকেই পোষ্যপুত্র লউক।

"আর তাহার কন্যা?"

"সাধু ধনীর পুত্রবধূ? সেও ধনী বংশের কোনো একটি ছেলেকে পোষ্যপুত্র লউক; ধনী বংশের ছেলের অভাব নাই।"

এই দুই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। স্থির হইল, বেনেরা শূদ্র; বিহারী শালাকে পোষ্যপুত্র লউক, আর তাহার মেয়ে ধনী বংশের কোনো ছেলেকে পোষ্যপুত্র লউক। ত্রিবিক্রম এই মর্মে ব্যবস্থা লিখিয়া আনিল, সকলে স্বাক্ষর করিলেন। ব্যবস্থাপত্র লইয়া ত্রিবিক্রম বিহারীর কর্মচারীর হস্তে দিল। কর্মচারী তৌলবট স্বরূপ প্রত্যেক পারিষদকে হাজার করিয়া টাকা দিলেন, আর ত্রিবিক্রমকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন। সভা-ভঙ্গ হইল। অধ্যাপকগণ দু-চার দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আপন আপন দেশে চলিয়া গেলেন। শ্রীধরের জন্য আবার ছিপের বন্দোবস্ত হইল।

## দশম
## পরিচ্ছেদ

মস্করী, তুমি করিলে কি ?— তুমি কি জাদুবিদ্যা জান ? তুমি যে মায়াকে বড়োই বশ করিয়াছ, সে যে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে— কখন তুমি আসিবে, কখন তুমি তাহার স্বামীর ছবি দেখাইবে। সে ছবি দেখিয়া সে যে শিহরিয়া উঠে— তাহার ভ্রম হয়, স্বামী তাহার জীবিত। তুমি ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া তাহার অতিপ্রিয় স্বামীর ছোটো ছবিখানি আত্মসাৎ করিয়াছ। সে ছবি পাবার জন্য মায়া বড়ো ব্যস্ত। সে কখনো সে ছবি হাতছাড়া করে নাই। তুমি কোন্ মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া তাহার অতি গোপনীয় ধন সে ছবিখানিও বাহির করিয়া লইয়াছ। সে ছবি লইয়া তুমি করিবে কি ? আহা ! সে তাহার প্রাণের প্রাণ, তাহাকে সেখানি ফিরাইয়া দাও। তাহা দিয়া তোমার কোনো কাজ হইবে না। কেন এত ভালোবাসার জিনিসটি হইতে বেচারাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। দাও দাও— তাহার স্বামীর ছবি তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

ও কি !— তুমি মায়াকে কি বলিতেছ ? ঐ দেখো, সে কান খাড়া করিয়া শুনিতেছে। তুমি বলিতেছ, ওই ছবিখানা তুমি একজন শিল্পীকে দিয়াছ। সে ঐ ছবি দেখিয়া একটি মূর্তি গড়িবে, তুমি তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাকে কথা কহাইবে। তোমার এ কথায় আর তো কেহ বিশ্বাস করিবে না— মানুষে নাকি মরিয়া গেলে কথা কহে! মূর্তিতে নাকি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় ! প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে নাকি মূর্তি সজীব হয় ! প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে সত্য, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে অনেক লোকে ভাবে, প্রতিমা সজীব হয় ; প্রতিমা নড়ে, প্রতিমার ঘাম হইতে দেখা যায়, কিন্তু মানুষের মূর্তির সেরূপ হয় কি ? কখনো তো এ কথা কেহ ভুলেও বলে না যে, মানুষের মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে সে কথা কহে,

তাহা হইলে কত পুত্রহীন পিতা, কত পুত্রহীনা মাতা, কত বিধবা মূর্তি গড়িয়া রাখিত, কথা কহাইতে চেষ্টা করিত ! লোকে যাই ভাবুক, মায়া তোমার কথায় খুব বিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু তাহার দেরি সহে না। তুমি তাহাকে পাগল করিয়াছ— উন্মাদ করিয়াছ। সে চায়, এখনি তুমি তাহার স্বামীর মূর্তি আনিয়া দাও— এখনি তাহাকে কথা কহাও। তুমি যত দেরি করিতেছ, সে ততই ব্যাকুল হইতেছে। তুমি ক্রমে তাহাকে এমন বশ করিয়া ফেলিয়াছ যে, তুমি যাহা বলিবে, সে তাহাই করিবে, এবার তুমি কি বলিবে ? বলিবে, যদি বিলম্ব না সহে, আমার সঙ্গে চলো। যেখানে মূর্তি গড়িতেছে, সেইখানে তোমায় লইয়া যাই, সেইখানেই তোমায় এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইব।

ও কি মায়া !— তুমিও যে রাজি ! তুমি কুলকন্যা, কুলকামিনী, তোমার কি এই পরপুরুষের সঙ্গে যাওয়া উচিত ? লোকে যে কলঙ্ক রটনা করিবে ! তোমার যে ভারি নিন্দা হইবে। আমরা জানি, তুমি নির্দোষ। তুমি স্বামীকে দেখিবার জন্যই যাইতেছ, কিন্তু দুষ্ট লোকে তো সে কথা শুনিবে না— জানিবে না। তাহারা মনে করিবে ও বলিয়া বেড়াইবে— যে কারণে অন্য পাঁচটা বালবিধবা ঘরের বাহির হইয়া যায়, তুমিও সেইরূপ যাইতেছ ; অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করো। যাইতে হয়, বাবাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও ; মাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও। তোমার সংসারে মান-মর্যাদা আছে, অর্থ-সামর্থ্য আছে ; উপযুক্ত সাজসজ্জা করো, লোক-জন সঙ্গে লও তবে যাও। একলা যাইও না— যাইও না।

এ কথায় মায়া রাজি নয়। বাবাকে বলিলে তিনি যাইতে দিবেন না। মাকে বলিলে তিনি যাইতে দিবেন না। সুতরাং সে স্থির করিল, তাহার নিজের ধাই-মা ও জীবন ধনীর ধাই-মা, এই দুজনকে সে সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহাদের দুজনের মায়া-অন্ত প্রাণ। মায়ার সঙ্গেই তাহারা থাকিবে। মায়ার মায়া তাহারা এড়াইতে পারিবে না— তাহারা যাইবে। কাজ সারিতে বেশি দিন লাগিবে না। মায়া যেদিন বলিবে, সেই দিনই মস্করী তাহাকে তাহার বাড়ি পৌঁছিয়া দিয়া যাইবে। মস্করীর আচার ব্যবহার আমরাও অনেক দিন জানি। সে কোনো কু-মৎলবে যে মায়াকে লইয়া যাইবে, তাহা তো বোধ হয় না। আর যদি তাই

হইত, ধাই-মা দুটাকে লইয়া যাইবে কেন ? সুতরাং যে কু-মৎলবে মেয়ে-ছেলেকে ঘরের বাহির করে, এখানে সেটা নাই। অন্য কিছু আছে কি না, ভগবান্ জানেন।

২

একদিন রাত্র দুপরের পর একখানা বড়ো নৌকা আসিয়া ধনীদের গোলার ঘাটে লাগিল। ধীরে ধীরে মায়া আসিয়া নৌকায় উঠিল, ধাই দুজন নৌকায় উঠিল, মস্করী উঠিলেন, আরো দু-একটি লোক উঠিলেন, মায়ার দু-একটি বিশ্বাসী চাকরও উঠিল। দুই জন ধাই-ই জিজ্ঞাসা করিল, কতদূর যাইতে হইবে ? মস্করী বলিলেন, "দেখো মা— সাতগাঁয়ে তো বড়ো ঘন বসতি, ওখানে তো বড়ো কারখানা থাকিতেই পারে না। সাতগাঁ হইতে ২/৪ ক্রোশের মধ্যেই একখানি গাঁ আছে, সেখানে অনেক ভালো ভালো কুমার আছে। তাদের উপরই মূর্তি গড়ার ভার দিয়াছি। গেলেই দেখিতে পাইবে, আমার কথা কতদূর সত্য।" সমস্ত রাত্রি বাহিয়া নৌকা গঙ্গা ত্যাগ করিয়া সরু একটা নদীর ভিতর ঢুকিল। ৫/৭ ক্রোশ বাহিয়া গিয়া সেই ছোটো নদীটা দুই ফাঁক হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের নদীটা সাতগাঁয়ের উত্তর সীমায়। আর একটি নদী— আরো উত্তরে গিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে, সেই নদী ধরিয়া নৌকা চলিল। নৌকায় আহারাদির সব ব্যবস্থা ছিল, কাহারো কোনো কষ্ট হইল না। সন্ধ্যার সময় নৌকা একটা গ্রামে উঠিল, সকলে নামিল। নিকটেই একটি বিষ্ণু-মন্দির ছিল। তাহার পাশেই একটি একতলা পরিষ্কার বাড়িতে মায়ার বাসের স্থান দেওয়া হইল। মায়া দেখিল, নিকটেই একটা কুমারের কারখানা। তাহার জানালার নীচেই একজন কুমার তাহার স্বামীর সেই ছবি সামনে রাখিয়া এ'টেলা মাটিতে মূর্তি গড়িতেছে। মূর্তিটি এদিক ওদিক করিয়া ঘুরাইতেছে ; ছবি দেখিতেছে, আর পাতলা বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া এ'টেলা মাটি চাঁচিতেছে। কখনো বা চাঁচিতেছে, কখনো বা কোথাও মাটি দিতেছে, আবার চাঁচিতেছে। মূর্তির দিকে বার বার চাহিতেছে। কখনো তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন হইতেছে ; কখনো সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতেছে। আবার চেঁচাড়ি ধরিতেছে, একবার ছবিখানি দেখিতেছে, আবার মাটির মূর্তির দিকে

চাহিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে কারখানার ঘরটি বন্ধ করিয়া ছবিখানি একটি বাক্সের মধ্যে পুরিয়া চলিয়া গেল।

জানালায় বসিয়া মায়া সব দেখিলেন। ধাই দেখিল, ধনীর ধাই দেখিল, তাহাদের বিশ্বাস হইল, মস্করী যাহা বলিয়াছিল, সব সত্য। সত্য-সত্যই মূর্তি গড়া হইতেছে, সত্য-সত্যই মূর্তিতে প্রাণ আসিবে, সত্য-সত্য মূর্তি কথা কহিবে। ঘর হইতে চলিয়া আসায় তাহাদের মনের যে উদ্বেগ হইয়াছিল, দেখিয়া শুনিয়া তাহার অনেকটা দূর হইল।

পরদিন মায়া কুমারকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, সে যত শীঘ্র মূর্তি করিয়া দিতে পারিবে, ততই তাহারা খুশি হইবে এবং তাহাকে বেশ দু পয়সা বকশিশ দিবে। কুমার বলিল, "আমার যতদূর সাধ্য আমি শীঘ্র শীঘ্রই করিব। কিন্তু এ সব তো কলের কাজ নয়। হাঁড়ি গড়া নয় যে চাকা ঘুরাইয়া দিলাম, আর হাঁড়ি গড়া হইল। কত যে ছোটো ছোটো জিনিস দেখিতে হয়, কত যে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কত যে চাঁচিতে হয়, তাহার ঠিকানা নাই। আর আমরা যে মূর্তি গড়ি, কোনো জায়গায় যদি এতটুকুও দোষ থাকে, আমাদের ঘুম হয় না। যতক্ষণ মূর্তিটি ঠিক না হয়, ততক্ষণ আমাদের ছাড়িয়া দিবার হুকুম নাই। প্রতিমা গড়াও সহজ, কেননা তাহার মাপ আছে, অঙ্কপাত আছে, অনুপাত আছে। মানুষের মূর্তিতে তো মাপ পাইবার জো নাই। তারপর যদি মানুষ দেখিয়া মূর্তি গড়া হয়, সে একরকম হয়, যেমন দেখি তেমনি গড়ি। এ ছবি দেখিয়া গড়া, এ আরো কঠিন। ছবিতে কেবল আড় ও দীঘ্ আছে। মূর্তির আবার একটা বেধ আছে। সেটা ছবি দেখিয়া ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের অনেক কষ্ট করিয়া সেটি অনুমান করিয়া লইতে হয়। তা মা তুমি এখানে আছ, আমায় সময়ে সময়ে সাহায্য করিও। শুনিয়াছি, আমি যাঁহার ছবি গড়িতেছি, তিনি তোমার স্বামী। যদি সময়ে সময়ে মূর্তিটি পরীক্ষা করিয়া আমায় উপদেশ দাও, কাজ একটু শীঘ্র হইতে পারে।" মায়া কিন্তু যতবার উপদেশ দিতে যান, ক্রমেই আরো দেরি হইয়া যায়। অনেক সময় কুমার তাহার কথার ভাব ঠিক বুঝিতে পারে না, উল্টা করিয়া ফেলে; আবার সেটা শোধরাইতে সময় যায়। এইরূপে মায়া স্বামীর মূর্তি-নির্মাণে সাহায্য করুন, ওদিকে সাতগাঁয়ে কি হইতেছে আমরা দেখিতে যাই।

৩

মায়ার চলিয়া যাইবার কথা দু-এক দিনের মধ্যেই সাতগাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, কড়ে রাঁড়ী বেরিয়ে গিয়েছে। অনেকেই বলিল, বৌদ্ধেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়েছে। তাহারা একটা খুব দাঁও পাটিয়েছে, একবার ভিক্ষুণী সাজাইতে পারিলেই অনেক টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ব্যাবসা-বাণিজ্য হাতে আসিয়া পড়িবে। অধিকাংশ লোকই এই কথা বিশ্বাস করিল। যাহারা বৌদ্ধ নয়, তাহারা বৌদ্ধদের উপর খেপিয়া উঠিল। রাজা যে বৌদ্ধ, তাহা জানিয়া শুনিয়াও তাহারা বৌদ্ধদের গালাগালি দিতে বিরত হইল না : এবং তাহাদের রাগ আরো বাড়িয়া গেল। যাহাদের দুনৌকায় পা ছিল, অর্থাৎ কতক বৌদ্ধ ও কতক হিন্দু যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দুর দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। সাতগাঁয় ঘোর আন্দোলন— যেখানে যাও, ঐ কথা। বৌদ্ধরা টাকার লোভে বিহারী দত্তের মেয়েটাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিহারী দত্তের লোক এখনো দেবগ্রাম থেকে ফিরে নাই। ইহারই মধ্যে এই ঘটনা! বিহারী তাঁহার সমস্ত নৌকা সজ্জিত করিলেন ও তাহাদিগকে সাতগাঁয়ের সীমানায় হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সব বেনেরাই বিহারীর মতো করিতে লাগিল। দুই-তিন দিনের মধ্যে অত যে সাতগাঁয়ে নৌকা ছিল, সব যে কোথায় গেল, কেহই বলিতে পারিল না। পূর্বে নাউপালা, উত্তরে অম্বিকা, দক্ষিণে সরস্বতী-সঙ্গম— এই সব জায়গায় বেনেদের নৌকা জড়ো হইতে লাগিল, আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হইতে লাগিল, গোলায় পল্টন বসিল। সাতগাঁয় বাজার হাট বন্ধ হইল। বেগোছ দেখিয়া অনেক লোক সাতগাঁ ছাড়িয়া পলাইল। রাজাও চুপ করিয়া রহিলেন না। রোজ বাগ্‌দিদের কুচ-কাওয়াজ হইতে লাগিল। তীর-ধনু তলওয়ার রাশি রাশি তৈয়ারি হইতে লাগিল। ঠন্ ঠন্ শব্দে সাতগাঁ পুরিয়া গেল। অধিকাংশের ধারণা, বৌদ্ধেরা চুরি করিয়াছে, রাজাও এর ভিতর আছেন। তাঁহার পরিষদ্, সভাসদ্ সবাই জানে। কেহ বলিল, রাজার এই ব্যবহার! গৃহস্থ ঝি-বৌ লইয়া ঘর করিতে পারিবে না! রাজা প্রচার করিয়া দিলেন, বৌদ্ধেরা এ কাজ করে নাই, মেয়েটাই পলাইয়াছে! বৌদ্ধেরা কেহই তাহার বাড়ির দিকে যায় নাই— প্রায় দুই বৎসর। এ কাজ বৌদ্ধদের নহে। কিন্তু কে শুনে? লোকের মনে একটা ধারণা হইয়া

গেলে তাহা দূর করা বড়ো শক্ত। রাজা যতই বৌদ্ধদের নির্দোষ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, লোকে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর ঘরে কে রে ?" "আমি তো কলা খাই নি !" প্রজা-বিরাগ বড়োই প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাতে বেনেদের নৌকা না থাকায় বিদেশী জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না। জিনিস-পত্র দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। প্রজা-বিরাগ আরো বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তবে হাহাকার পড়িল না, কারণ, ধান-পান সকলেরই ছিল, গোলা-মরাই সকলেরই ছিল, পেটের ভাতটায় আর কাটি পড়ে নাই।

কেহ বলিল, মায়াকে মহাবিহারে লুকাইয়া রাখিয়াছে। গুরুপুত্রের অনেকদিন ধরিয়া মেয়েটার উপর ঝোঁক ছিল, এ তারই কাজ। গুরুপুত্র এই কথার সূচনা শুনিয়া বিহারী দত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমরা আসিয়া সমস্ত মহাবিহার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যদি তোমার মেয়েকে পাও, তৎক্ষণাৎ লইয়া যাও। আর আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আমি বলিতেছি— মহাবিহারের লোকে এ কাজের জন্য দায়ী নহে।" তিনি স্বয়ং বিহারীর বাড়ি গিয়া তাহাকে এ কথা বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাজা বুঝাইয়া দিলেন— সেটা নীতিসঙ্গত হইবে না। বিহারী তাঁহাকে আটক করিতে পারে, অপমান করিতে পারে। গুরুপুত্র বলিলেন, "ভিখারীর আবার মান-অপমান কি ? একটা প্রলয়ের সূচনা দেখিতেছি। যত শীঘ্র মিটিয়া যায়, ততই ভালো।" কিন্তু রাজার কথা এবার তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইল। তিনি গেলেন না, কিন্তু বিহারীকে স্বয়ং বা লোকদ্বারা মহাবিহার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে অনুমতি দিলেন। যে ভয়ে রাজা গুরুপুত্রকে যাইতে দিলেন না, বিহারীর বন্ধুবান্ধবেরা ঠিক সেই কারণেই বিহারীকে মহাবিহারে যাইতে দিল না। উভয় পক্ষই উত্তেজিত হইয়া রহিল। এমন-কি, যুদ্ধের উদ্যোগই চলিতে লাগিল।

## ৪

সাতগাঁয়ে তো এইরূপ প্রজার বিরাগ হইল, রাজার উপরও রাগ হইল, সদ্ধর্মীদের উপরও রাগ হইল। মাঝে মাঝে ঝগড়া মারামারিও হইতে লাগিল। বাহিরে কি হইল—

সকলেই ছিছি করিতে লাগিল। ছেলেমেয়ে চুরির জন্যই বৌদ্ধধর্ম লোপ হইবে বলিতে লাগিল। শত শত লোকে বিহারীর বাড়ি আসিয়া, বিহারীকে পত্র লিখিয়া জানাইতে লাগিল যে, তাহারাও তাঁহার দুঃখে দুঃখী, তাঁহার ব্যথায় ব্যথী : কেহই তো ছেলেমেয়ে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারিবে না। চুরি করিলেই সঙ্ঘের লাভ, তাহারা উত্তরাধিকার পাইবে। সুতরাং এ পাপ-সঙ্ঘ যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহাই করিতে হইবে। কেবল একজন জ্যোতিষী, তাঁহার নাম যোগ্লোক,[১২] তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "বিহারী, তোমার ভয় নাই ; ইহার ফল বড়ো ভালো হইবে। তোমার বিশেষ চিন্তার কোনো কারণ নাই।"

হরিবর্মার রাজসভায় এ কথা উঠিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারী কোন্ ধর্মাবলম্বী ?" ভবদেব বলিলেন, "তিনি দশবিধ সংস্কার করেন, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করেন, তিনি হিন্দু, জাতিতে বৈশ্য হইলেও এখন খাঁটি শূদ্র।" তখন হরিবর্মা বলিলেন, "তবে তো উহাকে সাহায্য করা আমাদের আবশ্যক। বাগ্দি রাজা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিবে, আমরা সহ্য করিতে পারিব না।" ভবদেব বলিলেন, "সে কথা সত্য বটে। কিন্তু বাগ্দিরা বড়ো রণবঙ্কা। উহাদের সংখ্যাও দশ-পনরো হাজার— ভয়ানক যোদ্ধা!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার নৌকা কত আছে ?"

"জানি না। তবে সাতগাঁয়ে বেশি নৌকা বেনেদের। তাহারা সব সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং যাও আছে, তাহাও সরাইবে।"

"আমাদের সাতগাঁয়ে যাবার রাস্তা— ?"

"জলপথে তো আমরা সব জায়গা দিয়াই যাইতে পারি। স্থলপথে যমুনার ধার দিয়া, বিক্রমণিপুর হইতে গঙ্গার ধার দিয়া যাইতে পারি। আর উৎকল হইতেও আসিতে পারি। কাঁকড়া অনেকগুলা দাড়া দিয়া জন্তু জানোয়ার ধরে, আমরাও তেমনি করিয়া চারি দিক হইতে সাতগাঁকে ধরিতে পারি।"

"মাঝে দক্ষিণ-রাঢ়ের শূর রাজা কি করিবে ?"

"কি আর করিবে ? মহারাজও যে দিকে যাইবেন, তিনিও সেই দিকে যাইবেন। তিনি বহু বিষয়ে আপনার নিকট উপকৃত, আপনার মিত্রতায় মুগ্ধ এবং আপনার একান্ত অনুরাগী। বিধর্মীদের উপর আপনার

যেমন রাগ, তাঁহারো তেমনি। আপনি না থাকিলে বাগ্‌দিরা তাঁহারো ছোটো রাজ্যটি গ্রাস করিয়া ফেলিত।"

"আপাতত কোনো কথায় কাজ নাই, কেবল নৌকাগুলাকে সাজাইয়া সাতগাঁ রাজ্যের পাশে পাশে রাখিয়া দাও। পরে দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় মরে।"

দক্ষিণ রাঢ়েও এ কথা প্রচার হইলে, রাজা রণশূর[১৩] তন্ন তন্ন করিয়া সব খবর লইলেন এবং হিন্দুদের সাহায্য করাই উচিত বোধ করিলেন। তিনি ভুরসুটের বামুনদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন— গঙ্গার উপর, বিশেষ ঠিক ত্রিবেণীতে একটা বাগ্‌দি— তায় বিধর্মী রাজা থাকে, সেটা ঠিক নহে। যেরূপে হউক, উহার বিনাশসাধন করিতেই হইবে।

মহীপাল[১৪] যখন শুনিলেন, সাতগাঁয়ের বিহারী দত্তের মেয়েকে সদ্ধর্মীরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি যে বিশেষ খুশি হইলেন তাহা নহে, বলিলেন, "এরূপ বোকামিটা এখন না করিলেই হইত। নূতন রাজা, নূতন রাজা, এখন কি এত বড়ো একটা লোককে চটাতে আছে! ওর মোকাম সব দেশে আছে, সব রাজার সঙ্গে ওর কারবার আছে। এক মুহূর্তে বিহারী একটা অনর্থ বাধাইয়া তুলিতে পারে। কাজটা নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। যাই হোক, আমাকে বাগ্‌দি রাজার দিকেই থাকিতে হইবে এবং বিশেষ উদ্যোগও করিতে হইবে।"

## ৫

সাতগাঁয়ে একদিন মন্ত্রণাগৃহে বসিয়া নিভৃতে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাতগেঁয়ের উপর মামদোবাজি করিল— এ মস্করীটা কে হে? ওটাকে তো আমরাই লাগাইয়াছিলাম। মেয়েটাকে লইয়া হয় কোনো বিহারে, না-হয় তারাপুকুরে আনিবে। কিন্তু সে এ কি করিল?— মেয়েটাকে লইয়া সে কোথায় চলিয়া গেল? ভাগ্যিস্ মস্করীর কথাটা লোকে বড়ো জানে না, নহিলে আমরাও হাতে-নাতে ধরা পড়িতাম। শ্রীফলবজ্র, তুমিই না উহাকে আমার কাছে আনিয়াছিলে?"

"হাঁ মহারাজ, আমিই উহাকে আনিয়াছিলাম। লোকটা তৈয়ার বলিয়াই আনিয়াছিলাম। এখন দেখছি, আমাদের উপর এক কাটি!

লোকটা বিহারে বিহারে বেড়াইত, রাত্রে বিহারেই থাকিত, সাজসজ্জা বিহারেই করিত। আমরা জানিতাম, আমাদেরই লোক।"

"কোথায় খাইত বলো দেখি?"

"কোনো দিন খাইতে দেখি নাই।"

"আমার সন্দেহ হয়, ওটা বামুনদের চর।"

সাধুগুপ্ত বলিলেন, "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, আমারও সেই সন্দেহই হইতেছে। কোনো দিন উহাকে কোথাও খাইতে দেখি নাই। তাতে বোধ হচ্ছে বেটা বামুন। কিন্তু বামুনরা মেয়েটাকে নিয়া কি করিবে?"

রাজা। বামুন বেটারা বড়ো ঝুনো, মেয়েটাকে তারা এখন লুকিয়ে রাখিবে, লোকেরা সন্দেহ করিবে আমাদের উপর। প্রজারা চটিবে আমাদের উপর, আর সদ্ধর্মীর উপর। এমন একটা বোড়ের চালে কিস্তিমাত কখনো কি কেহ শুনিয়াছে? যাই হোক, এখন ভিখারিণীদের বলিয়া দেও, তাহারা সাতগাঁয়ের সব জায়গায় ঘুরিয়া মস্করীর সন্ধান লউক। 'সে কার বাড়ি খাইত?' 'কে তাহাকে আশ্রয় দিত?' 'কেমন করিয়া সে মেয়েটাকে সরাইল?' এ সব খবর পেলে কোনো-না-কোনো উপায় করা যাইতে পারিবে। আর যদি চরমেই দাঁড়ায়, রাজা মহীপালের কাছে লোক পাঠানো যাক। তাঁহাকে বলা যাক, তিনি যেন দরকার হলে আমাদের পক্ষে দাঁড়ান। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, বোধ হয়, বাংলায় গুভাজু আর দেবভাজুতে শীঘ্রই লড়াই হইবে। সব গুভাজুরা এক না হইলে রক্ষা নাই, সদ্ধর্ম বাংলা হইতে লোপ হইবে।— আবার একটু ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন, "অজ্ঞাতকুলশীল লোকের উপর গুরুতর কাজের ভার দিয়া কি অন্যায়ই হইয়া গিয়াছে। শ্রীফলবজ্র, তুমি যে এত কাঁচা, তাহা আমি জানিতাম না। লোকটার পূর্বাপর কোনো সংবাদ না জানিয়া তাহাকে লাগানো ভালো হয় নাই। অথবা গতস্য শোচনা নাস্তি। আচ্ছা, শ্রীফল— তুমি উহাকে কোথায় প্রথম দেখিয়াছিলে?"

শ্রীফল বলিল, "আজ্ঞে তাহা আমার ঠিক মনে হয় না। তবে ধরমপুর সঙ্ঘারামেই প্রথম দেখি মনে হইতেছে। ও যে গৃহী, সন্ন্যাসী নয়, সে কথা আমার এখনো মনে লইতেছে না। ছবি হাতে করিয়া ভিক্ষা করিত, সব জায়গায় যাইত।"

শ্রীফলের কথায় রাজা বেশ একটু চটিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়া একলা পাইচারি করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, "বামুনদের লোক— তা হলে সে সাতগাঁয় নাই, সাতগাঁয়ের বাহিরে কোথায় রহিয়াছে ও মেয়েটাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীফল তো লুই-সিদ্ধার দলের উপর চটা ; ওই এ কাণ্ডটা বাধায় নাই তো ? কিন্তু ঘরের ভিতর আর বিবাদ বাধাইবার সময় নাই। ওর তো বিহারেই জন্ম, বিহারেই কর্ম, বিহারেই লেখাপড়া শিখিয়াছে, পণ্ডিত হইয়াছে। রাজনীতির কোনো ধারই ধারে না। লোকটা নির্বোধও বটে। যাই হোক, এখন যা দেখিতেছি, যুদ্ধ হইবেই। বেনেগুলাকে আটক করা যাক।" বলিয়া কোটালকে ডাকিয়া বেনেদের উপর বেশ নজর রাখিতে বলিলেন— সে বলিল, "মহারাজ, বিহারী দত্ত তো সাতগাঁয় নাই। সে দুই-তিন দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে, দেবগ্রামে যাইব।"

রাজা। বিহারী দেবগ্রামে গিয়াছে— সেটা ভবদেবের রাজ্য না ? কি সর্বনাশ ! তবে তো আর ভাবিবার অবসর নাই। আচ্ছা কোটাল, তুমি বাকি বেনেদের উপর নজর রাখো। তাহারা যেন খাবার সামগ্রী সরাইয়া না লইয়া যায়।

"বেনেদের নৌকা সব চলিয়া গিয়াছে, আর আসিতেছে না, যাহা লইবার লইয়া গিয়াছে। আর আসিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, আমি সেটা বেশ দেখিতেছি।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কোটালকে কয়েকটি হুকুম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

মায়ার কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না ; মস্করীর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না ; ধাইদের কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। খুঁজিতে উভয় পক্ষের কেহই ত্রুটি করিল না। বিহারীও চারি দিকে লোক লাগাইল ; বৃপা-রাজাও চারি দিকে লোক লাগাইল। তাহারা ডাঙা দিয়া গেল, কি জল দিয়া গেল, তাহাই ঠিক হইল না। পালকিতে গেল, কি ডুলিতে গেল, কি নৌকায় গেল, কিছু স্থির হইল না। যে নৌকায় তাহারা যায়, মস্করী সে নৌকা দূরদেশ হইতে [ আনিয়াছিল ] অমনি অমনি ঐখান হইতেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। সাতগাঁয়ের লোকের সাধ্য কি, তাহার কোনো সন্ধান পায়। মায়া বেশ মনের আনন্দে আছে। মূর্তি তৈয়ার হইলেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। মূর্তি নড়িবে-চড়িবে, কথা কহিবে। সে ক্রমাগত দেখিতেছে— মূর্তিটি দেখিতে ক্রমেই তাহার স্বামীর মতো হইতেছে। তাহারো মনে বেশ স্ফূর্তি হইতেছে। সে বাপ-মা, সাতগাঁ, গোলা সব ভুলিয়া গিয়াছে। ঐ এক চিন্তায়ই সে মগ্ন আছে।

কিন্তু তার জন্য সারা বাংলা তোলপাড় হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সব খেপিয়াছে। প্রলয়কাণ্ড হইবেই হইবে। কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। গুরুপুত্র মিটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা মিটামিটির বিরোধী। গুরুপুত্র বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত। লুই-সিদ্ধার এখন খবর নাই। তিনি যে কোথায় আছেন, কেহ জানে না। তবে তিনি বাংলায় নাই। রাজারা সব এক-একদিকে যোগ দিয়াছে ; হিন্দুরা হিন্দুর দিকে, বৌদ্ধেরা বৌদ্ধের দিকে। ব্রাহ্মণেরা সর্বত্রই হিন্দুর পক্ষে, নানা শান্তি, নানা স্বস্ত্যয়ন, নানা উপায়, নানা চেষ্টা করিতেছেন ; সাম,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

দান, ভেদ, দণ্ড সকল রকমেই পরামর্শ দিতেছেন ; সময়ে সময়ে যুদ্ধের জন্যও সজ্জিত হইতেছেন ; ব্যূহ-রচনা অভ্যাস করিতেছেন ; যুদ্ধবিদ্যার পুস্তক পড়িতেছেন ; মহাদেবের ধনুর্বিদ্যা, বিক্রমাদিত্যের ধনুর্বিদ্যা, চতুরঙ্গবলবিদ্যা পাঠ করিতেছেন। কিসে সদ্ধর্মের বিনাশ হয়, তাহার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে লাগিয়াছেন। নিজে অস্ত্র-বিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন, দুর্গ নির্মাণ করিতে শিখিতেছেন। বিহারওয়ালারা সব বৌদ্ধদের পক্ষে, কিন্তু তাহাদের ঘরে ঘরে ঐক্য নাই। আসল মহাযানীরা তো আর-সকলকেই উপেক্ষা করে। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান সব আপন আপন উন্নতিই খোঁজে। সকলে এক হওয়ার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তবে এবার ব্রাহ্মণ প্রবল, সকল বৌদ্ধেরই সামাল সামাল পড়িয়া গিয়াছে ; সুতরাং মনের দ্বেষ মনেই চাপিয়া সকলে কতকটা পরস্পরের সাহায্য করিতেছেন। তার-মধ্যে আবার রূপা-রাজা একেবারে ভয়ানক সহজপন্থী, অন্য পন্থা তাঁহার ভালোই লাগে না। যা হোক, এবার যেন সব সদ্ধর্মী এক হইয়া উঠিয়াছে।

তারাপুকুরে যুদ্ধসভা বসিয়াছে। রাজা বলিতেছেন, "এই যে বেনেদের বিদ্রোহ, আমি সে বিষয়ে নিরপরাধ। কে যে বিহারী দত্তের মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু সকলেই আমাদের উপর দোষ চাপাইতেছে, আর আমার দেশটা লণ্ডভণ্ড করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যখন দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, নৌকা, কিস্তি, মালপত্র সব সরাইয়াছে, তখন আর তাহাদের সঙ্গে মিটামিটির সম্ভাবনা নাই। আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।"

বাগ্দি সেনাপতি বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য। আত্মরক্ষার জন্য আমরা সততই প্রস্তুত ; কিন্তু দেখুন, আমরা নিরপরাধ। তাহারাই অত্যাচার করিতে প্রস্তুত ; সুতরাং আমাদের উচিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা না করিয়া, অগ্রসর হইয়া আমরা শত্রুর দেশ আক্রমণ করি।"

রাজা। কিন্তু কে শত্রু, কে মিত্র, এখনো তো সে কথা জানা যায় না।

সেনাপতি। মহারাজ, হিন্দুই শত্রু, বৌদ্ধই মিত্র, এই মনে করিয়া, আসুন আমরা হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করি। হরিবর্মা বড়ো রাজা ; তিনি বেঙ নদীর ধারে তাঁবু গাড়িয়া বসিয়া আছেন। আসুন, আমরা তাঁহাকে

আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিই। তিনি গেলেই হিন্দুদের দাঁত ভাঙিয়া যাইবে।

অনেক বাদানুবাদের পর তাহাই সিদ্ধান্ত হইল। রাজা পাঁচ হাজার বাগ্‌দি লইয়া তারাপুকুর রক্ষা করিবেন। সেনাপতি দশ হাজার বাগ্‌দি লইয়া বেঙ নদীর দিকে যাইবেন। প্রান্তপালগণ প্রান্ত-দুর্গ সজাগ হইয়া রক্ষা করিবেন।

২

বাগ্‌দিরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেইজন্য রূপা-রাজার সেনায় কেবল বাগ্‌দি ; বাগ্‌দির সংখ্যাও খুব বেশি. দরকার হইলে এক লক্ষ বাগ্‌দি যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম দিলেন, "সব বাগ্‌দি সাজো।" বাগ্‌দিরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ, আর ঘোড়সওয়ারও ডোম। দশ হাজার বাগ্‌দি সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল. ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে<br>
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।<br>
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া,<br>
সাড়া গেল বামনপাড়া।

ডোমদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে সাড়া ক্রমে হরিবর্মার তাঁবুতে পৌঁছিল। তাঁহার লোকের— চরের অভাব ছিল না। তিনি চর পাঠাইলেন : শুনিলেন— দশ হাজার বাছা বাছা বাগ্‌দি-যোদ্ধা ও পাঁচ হাজার ডোম লইয়া রূপা-রাজার সেনাপতি মেঘা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি জনকতক বিশ্বাসী লোককে বৌদ্ধ ভিক্ষু সাজাইলেন। তাহারা মেঘার তাঁবুতে ভিক্ষা করিতে গেল। মেঘা তাহাদের পাইয়া আহ্লাদে আট-খানা। তাহাদের সেতো করিয়া লইলেন, অর্থাৎ তাহারা তাঁহাকে গুপ্ত পথ দিয়া বেঙ নদীর তাঁবুতে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু মস্করীর ব্যাপারের

পর, বাগ্‌দিরা আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না। সুতরাং মেঘাও এই ভিক্ষুদের উপর দুজন বাগ্‌দিকে চর লাগাইয়া দিলেন। দুই-তিন দিনের পর তাহারা খবর দিল যে, এরা ভিক্ষু নয়, ও পক্ষের চর। মেঘা আর-কিছু না বলিয়া একদিন ভোরে তাহাদের ডাকাইয়া বলিয়া দিল, "তোমরা এই দণ্ডেই যদি আমার তাঁবু ত্যাগ করিয়া না যাও, তোমাদের আটক করিব ও বধ করিব।" তাহারা ভয় পাইল না ; বরং ঝগড়া করিতে লাগিল। মেঘা তখন শূল আনাইল, তাহাদের শূলে চড়াইব বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদের বাসা-ঘর, কাপড়-চোপড় ঝাড়া দিতে লাগিল। দিতে দিতে দেখা গেল যে, তাহারা ভিক্ষু নহে। তাহারা ভিক্ষুর কাচ কাচিয়াছে মাত্র ; তখন তাহাদের আটক করিয়া কয়েকজন চতুর রক্ষীসৈন্যের অধীনে সাতগাঁয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মেঘা মনে করিয়াছিল, হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হরিবর্মার ছাউনি ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে ; কিন্তু সে শুনিল, তিনি সব খবর রাখেন, আর বেশ প্রস্তুতও আছেন। তখন বাগ্‌দিরা তাঁহার দেশ লুঠিতে লাগিল। প্রজারা গিয়া হরিবর্মাকে জানাইল। হরিবর্মা ভৈরব নদীর ধারে আসিয়া তাহাদের সামনা হইলেন। আর ভৈরব নদী দিয়া অনেক নৌকা আসিয়া ক্রমাগত লোক নামাইতে লাগিল। মেঘা বেগোছ দেখিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিতে লাগিল এবং পিছনে যাহা কিছু পাইল, ধ্বংস করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু সকল নদীতেই হরিবর্মার নৌকা আর বেনেদের নৌকা। নৌকায় কেবল লোক আর অস্ত্র-শস্ত্র। নদী পার হওয়া মেঘার পক্ষে বড়োই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাগ্‌দিদের সাহস অসীম, তাহাদের সম্মুখে কেহ আসিতে সাহস করে না— এলেই সর্বনাশ। এক-একবার তাহারা তাড়াইয়া যায়, আর হিন্দুদের কিছু সৈন্য ক্ষয় করিয়া দেয়। যাহা হউক, তাহারা ক্রমে আসিয়া যমুনার ধারে দাঁড়াইল। হিন্দুরাও সেইখানে দাঁড়াইল। কেহই কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। মেঘা রূপা-রাজাকে আরো সৈন্য পাঠাইতে লিখিতে লাগিল। সৈন্যও আসিতে লাগিল। একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাগ্‌দিদের নৌকা বেনেদের নৌকা তাড়াইতে লাগিল। বেনেরা তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। বাগ্‌দিরা অনেক খাবার পাইল এবং সেগুলা

ডাঙায় তুলিয়া তাঁবুর মধ্যে আনিয়া ফেলিল। কেননা, তাহারা ঠিক জানিত, হরিবর্মার নৌকা আসিয়া জুটিলে তাহারা হারিয়া যাইবে; হইলও তাহাই। হরিবর্মার নৌকা আসিলে নাউপালা হইতে ৫ ক্রোশ পূর্বে বাগ্‌দিরা মহা-তেজে তাহাদের আক্রমণ করিল। তাহারা হরিবর্মার অনেক নৌকা ডুবাইল, অনেক ক্ষতি করিল; কিন্তু দুই-তিন দিনের পর হারিয়া পলাইয়া গেল ও নাউপালায় যাইয়া আরো নৌকা সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং সাতগাঁর সীমানায় না আসে, তার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। ডাঙায় যুদ্ধের আগে অন্য জায়গায় কি হইতেছে, তাহার খবর লওয়া যাক।

## ৩

ওদিকে মহীপাল উত্তর-রাঢ় হইতে ৫০০০-এর অধিক সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন না; কারণ কাশীরও অনেক পশ্চিমে তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি যে সৈন্য পাঠাইলেন, তাহাও নূতন, তাহাদের শিক্ষাও ভালো হয় নাই। এদিকে দক্ষিণ-রাঢ়ের রণশূর রাজা বাউরি, শুকলি, কোল প্রভৃতি জংলা জাতি লইয়া প্রকাণ্ড একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি সেই সৈন্য লইয়া উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের সন্ধিস্থলে যোগাদ্যার মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করিতেছিলেন। উত্তর-রাঢ়ের সৈন্য নিকটে আসিয়া পৌঁছিলে, তিনি অতর্কিতভাবে উহাদের আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। উত্তর হইতে তখন আর কোনো ভয় রহিল না। তখন ত্বরিত-গতিতে তিনি খড়ী নদী ও বল্লুকা নদী পার হইয়া পড়িলেন। নারিকেলডাঙায় মনসা-মন্দিরের নিকট বাগ্‌দিরা তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু হটিয়া গেল। মানাদের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রণশূর জয়লাভ করিলেও আর আগাইয়া যাইতে পারিল না। কারণ, বাগ্‌দিরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, আর ক্রমেই তাহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের বাগ্‌দি রাজা যদি রণশূরের রাজ্য আক্রমণ করেন, তবে সাতগাঁ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা নাবালক, আর তাঁহার অভিভাবকগণ আপনাপন লাভের চেষ্টায় আছেন। সাতগাঁয়ের সাহায্য করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। রণশূর এই সময়ে এক চাল

চালিলেন। তিনি পশ্চিমমুখে গিয়া দামোদর-ধারে পৌঁছিলেন। বাগ্‌দিরা তাড়া করিয়া আসিল। তাহারা বেশি লোক আনে নাই। তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করিলেন। বাগ্‌দিরা কিন্তু মানাদের সব সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। কারণ, ওদিকে নাউপালার খবর ভালো নহে। বরং রাজা পশ্চিম হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া তারাপুকুর রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। রণশূর যখন দেখিলেন, বাগ্‌দিরা চারি-পাঁচ দিন আর আক্রমণ করিল না, তখন তিনি অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে আসিয়া তারাপুকুরের উত্তর কুন্তী-নদীর উত্তরে তাম্বু গাড়িলেন। নদী পার হওয়া বিষম কঠিন। কারণ, ওপারে বাগ্‌দিদের অগণিত সেনা, রূপা-রাজা নিজে ও মেঘা দুর্গ রক্ষা করিতেছে। হরিবর্মা কিন্তু এখনো আসিয়া পৌঁছান নাই। বাগ্‌দিরা হারিয়া আসিলেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে আর নৌকা ও লোক না আসিলে, তিনি আর আসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে উড়িষ্যায় বেশ শান্তি ছিল। ভুবনেশ্বরে হরিবর্মার যে সৈন্য ছিল, তাহারা আসিয়া সহসা রণশূরের সঙ্গে যোগ দিল। রণশূর কুন্তী পার হইলেন এবং তারাপুকুরের উত্তর দ্বার অবরোধ করিয়া তাহা ভাঙিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; চেষ্টা বিফল হইল। শেষে বারুদ দিয়া রণশূর দ্বার উড়াইয়া দিলেন। দ্বার চাপা পড়িয়া রূপা-রাজা মারা গেল। মেঘা তখন তারাপুকুর ছাড়িয়া সাতগাঁ রক্ষা করিতে গেল। যেখানে প্রজাবিদ্রোহ, সে জায়গা রক্ষা করা দায়। সে পারিল না। রণশূর অনায়াসেই সাতগাঁ দখল করিলেন। মেঘা তখন মহাবিহারে আশ্রয় লইল।

মেঘা দুই-তিন মাস ধরিয়া সদর্পে মহাবিহার রক্ষা করিল। রণশূর ধরমপুর বিহার অধিকার করিয়া, তাহার চারি দিকে তাম্বু গাড়িয়া, উত্তর-দ্বার আটকাইয়া বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু সে খাই পার হইতে পারিলেন না। দুই-তিন মাসের পর হরিবর্মা যখন সদলবলে গঙ্গা বাহিয়া পূর্ব-দ্বার আটকাইলেন, তখন মেঘা মহাবিহার শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া বিষ্ণুপুর প্রস্থান করিল। গুরুপুত্র মহাবিহারের চাবি হরিবর্মার হাতে দিলেন। হরিবর্মা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, ভবদেব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ধর্মস্থানে কোনো অত্যাচার না হয়, সেটা আপনার

দেখা উচিত। আপনি জানেন, আপনার পনরো-আনা প্রজা বৌদ্ধ। এটা তাহাদের ধর্মস্থান। চাবি গুরুপুত্রের হাতে ফিরাইয়া দিন। গুরুপুত্র এতদিন রূপা-রাজার রাজ্যে বিহারের অধিকারী ছিলেন : এখন তিনি আপনার রাজ্যে বিহারের অধিকারী ; বিহারের ভার তাঁহার হাতে যেমন ছিল, তেমনি থাকুক।"

## ৪

এদিকে মায়া সব ভুলিয়া জীবন ধনীর যে মূর্তি তৈয়ার হইতেছে, তাই দেখিতে লাগিল ও তাহাতেই তন্ময় হইয়া রহিল। ক্রমে পক্ষ মাস অতীত হইয়া গেল, মূর্তি ঠিক জীবন ধনীর জীবন্ত মূর্তির মতো দেখাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার গায়ে রঙ দেওয়া হইল। রঙটি ঠিক জীবন ধনীর যে রঙ ছিল— তাই। কেমন করিয়া কুমার সে রঙ ফলাইল, সেই তো চমৎকার। মায়াও বলিল, "এই রঙ", ধাইরাও বলিল, "এই রঙ"। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হইতে একটু মাট রঙ। যখন রঙ ফলানো হইল, চুল বসানো হইল, মূর্তি ঠিক হইল, তখন উহাতে ঘাম-তেল দেওয়া হইল। মূর্তি যেন ঘামিয়াছে।

একদিন মস্করী আসিলেন। মস্করী বেশ ত্যাগ করিলেন ; দেখা গেল, তিনি একজন বেশ সুপুরুষ। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। শরীর বিলক্ষণ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি ব্রাহ্মণ, গলায় পইতার গোছা ধব্ ধব্ করিতেছে। পুরুষটি একটু দীর্ঘচ্ছন্দ। গোঁফ-দাড়ি একেবারে কামানো। তাঁহার সঙ্গে আর-একজন আসিয়াছেন— তাঁহার বয়স আরো অধিক। মাথায় একগাছিও কালো চুল নাই। শরীরের লোমগুলি পর্যন্ত পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া এখনো লোল হয় নাই। চক্ষুর দীপ্তি যুবা-পুরুষের মতো, তবে চক্ষু দুটি একটু বসা। ইঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইবে। তান্ত্রিক-কর্মে ইনি অদ্বিতীয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তাই মস্করী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। বিশেষ এটি তো শূদ্রের কার্য। মস্করী ভালো ব্রাহ্মণ, সে তাহা করিবে কেন ? তাই তিনি একজন সাতশতী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছেন। ইনি মায়ার পৌরোহিত্য করিবেন। ব্রাহ্মণের নাম বিধুভূষণ। ইঁহার সাতশতী-গাঞী-এর নাম ফর্‌ফর্ ; পুরা নামটি বিধুভূষণ ফর্‌ফর্। লোকে ইঁহাকে ফর্‌ফর্ ঠাকুর

বলিয়াই ডাকে। নব্বই বৎসর বয়স হইলেও ইনি ভারি হন নাই; ফর্‌ফর্‌ করিয়াই বেড়ান। ইহার কাজ করিবার ক্ষমতার কিছুই হানি হয় নাই।

মস্করী ইঁহাকে আনিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, জীবন ধনীর যে প্রতিমা গড়ানো হইয়াছে, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে, তাহাকে কথা কহাইতে হইবে, ব্রাহ্মণও তাহারই উদ্যোগে আছেন। প্রথমত কত জিনিসপত্র চাই, তাহার হিসাব হইল। সব জিনিস বিধু-ফর্‌ফর্‌ নিজে দেখিয়া লইতে লাগিলেন, কোনো জিনিসে কোনো ত্রুটি থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেছেন। গব্যঘৃত হোমের জন্য টাট্‌কা আনানো হইল। বিল্বদলগুলিতে দাগ থাকিবে না, ছেঁদা থাকিবে না, সবগুলিই ত্রিপত্র হইবে, বেশি পাকা হইবে না, বেশি কাঁচও হইবে না। এমন বিল্বদল বাছিয়া বাছিয়া এক হাজার সংগ্রহ করা হইল। যজ্ঞডুমুরের এক হাজার আগডাল সংগ্রহ করা হইল। প্রত্যেকটিকে ঠিক বিতস্তি-প্রমাণ করিয়া কাটিয়া লওয়া হইল, আর তাহার আগায় দু-একটি কাঁচ পাতা রহিল। পুষ্পপাত্রে ফুল সাজান হইল। তিন-চারি রকম চন্দন ঘষা হইল। বেলকাঠ ও তুলসীকাঠ ঘষিয়া চন্দন করা হইল। আলো-চাল, যব, তিল, আপাঙের গাছ, আপাঙের শিকড়, আপাঙের শিষ সংগ্রহ করা হইল।

প্রথম দিন বিধুভূষণ প্রাতঃকাল হইতেই পূজায় বসিলেন: শিবের ও কালীর পূজা করিলেন। সর্বত্রই পূজা নিরুদ্বেগে শেষ হইল। কোনো বাধা-বিঘ্ন বা অভাব হইল না। বেলা দুপরের পর ব্রাহ্মণ হোমে বসিলেন, একটি একটি করিয়া গণিয়া সমস্ত ত্রিপত্রগুলি গাওয়া ঘিয়ে ডুবাইয়া আহুতি দিতে লাগিলেন। এক হাজার আহুতি শেষ হইলে তিনি যজ্ঞডুমুরের পল্লব ধরিলেন। সেগুলি একটি একটি করিয়া গণিয়া হোম করিলেন। যখন সব শেষ হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ মহা-আনন্দে উঠিয়া পূর্ণাহুতি দিলেন এবং তারপর মায়ার কপালে হোমের ফোঁটা দিয়া নিজে জলযোগ করিলেন।

আশায়, আনন্দে, ভয়ে, ভরসায় মায়ার দিনটি কাটিয়া গেল। পর-দিন প্রাতঃকাল হইতে মূর্তির সম্মুখে পূজা আরম্ভ হইল। ষোড়শ উপচারে হর-পার্বতীর পূজা হইল। তাহার পর জীবনের প্রতিমার পূজা

আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ ষোড়শোপচারে জীবনের পূজা করিল; তাহার পর তাহার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিল। সে দিন এই পর্যন্ত।

৫

তাহার পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাগারা বাজিতে লাগিল। স্নান-আহ্নিক করিয়া ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিলেন, ২/৩ দণ্ড নিশ্চল-নির্বিকারভাবে ধ্যান করিয়া জপে বসিলেন। জপ শেষ হইলে রাশি রাশি ধূপ-ধুনা আগুনে দিতে বলিলেন। ধূপ ও ধুনার গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল, ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দীর্ঘদেহ গরদের কাপড়ে ঢাকিয়া জীবন ধনীর মূর্তির বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ —

মায়া নিকটেই বসিয়া ছিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিমা নাড়িতেছে।

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিল—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ জীব ইহ স্থিতঃ --

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন —ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণাঃ সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা— বলিয়া ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িল। মায়ার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি জীবিত। মায়ার ইচ্ছা, তাহার স্বামী কথা কন। সে ব্রাহ্মণকে কথা কহাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মস্করীর দিকে চাহিল। মস্করী ইশারা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল: প্রতিমার মুখে হাত দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। ধূপ-ধুনার ধোঁয়ায় ও গন্ধে ঘর পূরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্র পড়া হইল। প্রতিমার ঠোঁট দুটি তখন খুলিয়া গেল। বোধ হইল যেন, কথা কহিবার চেষ্টা

করিতেছে। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, "এই মায়া তোমার স্ত্রী, এ পতি বৈ আর জানে না। তোমার পূজায়, তোমার স্মরণে জীবন ধরিয়া আছে। ইহাকে কিছু উপদেশ দাও, যাহাতে ও জীবনের অবশিষ্ট অংশ সুখে থাকিতে পারে।" ঠোঁট আরো নড়িতে লাগিল— শেষে স্পষ্ট শুনা গেল, "মায়া, পোষ্য-পুত্রে ভালো হবে।" ঠোঁট দুটি বুজিয়া গেল। ধাইরা বলিল, ঠিক যেন জীবনের স্বর, তবে যেন একটু নাকি সুরে কথা কহিল। মায়া তো মূর্ছিত— সংজ্ঞাহীন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল,"স্বামীর কথা মাথায় করিয়া লইলাম।" সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আবার বলিল, "তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য।" মায়া এমন স্থিরভাবে এই কথাগুলি বলিল, বোধ হইল যেন, তাহার বুকে একটা পাথর বসানো ছিল, সেটা সরিয়া গেল ; যেন তাহার মাথায় একটা প্রকাণ্ড বোঝা ছিল, সেটা নামিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর সকলে চলিয়া গেলে মস্করীকে ডাকিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছেন, আর-একটিবার একটু কষ্ট করুন। এটি মাটির মূর্তি— এইরূপ একটি অষ্ট-ধাতুর মূর্তি করিয়া দিন, আমি তাহা আমাদের গোলাবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করিব ও স্বামীর আজ্ঞামতো একটি পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে লালন-পালন করিব।" হঠাৎ যেন মায়ার মুখ থেকে সেই পুরানো বিষাদের ছায়াটা সরিয়া গেল। তাহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে যেন একটা নূতন স্ফূর্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

মস্করী বলিল, "আচ্ছা, আমি তাহাই করিয়া দিব। কিন্তু এখানকার তো কার্য শেষ হইয়া গেল ; এখন আমরা গোলাবাড়ি ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিব।"

মায়া বলিল, "অষ্ট-ধাতুর মূর্তি কবে হবে ?"

মস্করী বলিল, "সেইখানেই হবে।"

৬ মহাবিহারের পূর্ব দিকে গঙ্গার উপর একটা প্রকাণ্ড পরিষ্কার ঘাসের জমিতে একটা প্রকাণ্ড পাল খাটানো হইয়াছে। পালের নীচে দক্ষিণ দিকে ঠিক মাঝখানে একখানা সোনার সিংহাসন, তাহার উপর চাঁদোয়া ; আর দুই পাশে দুইখানা রুপার সিংহাসন। সিংহাসনের নীচে ও তাহার সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গালিচা পাতা, গালিচারও উত্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতরঞ্জি পাতা, তাহারো উত্তরে মাদুর, চট ইত্যাদি পাতা। চারি দিকে পাহারা ; ঢাল-তলবার লইয়া অনেক লোক পাহারা দিতেছে। বেলা তিনটার সময় তথায় পাহারা-ওয়ালা ভিন্ন আর-একটিও লোক ছিল না। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল, অসংখ্য লোক নানা দিক হইতে আসিয়া কেহ গালিচায় কেহ শতরঞ্জে কেহ বা মাদুরে বসিতে লাগিল। বহু-সংখ্যক নৌকা গঙ্গার ও-দিকের কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা নানারূপে ঘোরালো রঙ দিয়া সাজানো। সবগুলিতেই ধ্বজা, পতাকা উড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি বড়ো নৌকা পার হইয়া মহাবিহারের ঘাটে লাগিল। ঘাটে সকলের নীচের ধাপ পর্যন্ত লাল বনাত পাতা ছিল। নৌকা হইতে সিঁড়ি বহিয়া তিনজন লোক নামিয়া বাঁধা ঘাটের ধাপে উঠিলেন। অমনি চারি দিক হইতে "মহারাজের জয়" "মহারাজ হরিবর্মার জয়" "বঙ্গাধিপের জয়"— ধ্বনি উঠিল। তাহাতেই বুঝা গেল যে, যাঁহার মাথায় মুকুট ও যাঁহার গায়ে নানা হীরা-মোতি জড়ওয়া-গহনা, ঘোরালো রঙের রেশমী কাপড়, তিনি মহারাজ হরিবর্মা। তাঁহার সহকারী একজন গরদের ধুতি ও চাদর পরিয়া আসিতেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব-পরিচিত ভবদেব ভট্ট। আর-একজন রাজবেশধারী— তিনি দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা।

রাজা সিঁড়ির ধাপে উঠিবামাত্র সৈন্যগণ দুই ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। ভাটেরা রাজার যশোগান করিতে লাগিল। সকলেই মাথা নোয়াইয়া রাজার অভ্যর্থনা করিল। ঘাটের উপরের চাতালে সাতগাঁ-বাসীরা সকলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়াছিল— সকলে রাজাকে নমস্কার করিল। রাজা কাহারো সঙ্গে একটি কথা কহিলেন, কাহাকেও "ভালো আছেন" জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকেও একটু হাসিয়া আপ্যায়িত করিলেন, কেহ বা প্রণাম করিতে আসিলে তাহার পিঠে হাত দিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহারী দত্তকে দেখিতে পাইয়া রাজা হাত বাড়াইয়া

দিলেন, সে তাঁহার হাত ছুঁইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। এইরূপে সকলকে সম্ভবমতো আপ্যায়িত করিয়া রাজা স্বর্ণ-সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। ভবদেব ও রণশূর দুইখানি রূপার সিংহাসনে বসিলেন। রাজা ভবদেব ভট্ট মহাশয়কে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। ভবদেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—

"মহারাজাধিরাজ হরিবর্মদেব এবং তাঁহার মিত্রবর্গ এই সাতগাঁ রাজ্য যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ দেবের রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের মহারাজাধিরাজ প্রজাদিগকে অভয়দান করিতেছেন যে. যদি তোমরা শান্তভাবে থাকিয়া আপন আপন জীবন যাপন করো. তোমাদের ধন, মান, দেহ, মন তিনি প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। যে সকল বাগ্‌দিরা যুদ্ধ করার জন্য ভূমি ভোগ করে, তাহারা যদি নূতন রাজার সহিত সেই বন্দোবস্তে চলে. তাহাদের ভূমিতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যাঁহারা যে ধর্মেই থাকুন. যদি রাজার রাজবিধি মানিয়া চলেন, তাঁহাদের ধর্মেকর্মে নূতন রাজা হস্তক্ষেপ করিবেন না। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ যে মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন. তাহার ভার যাঁহাদের উপর আছে. তাঁহাদের উপরেই থাকিবে। তাঁহারা যেমন রূপনারায়ণের অধীনে থাকিতেন. আমাদের মহারাজের অধীনে তেমনই থাকিবেন। তাঁহারা যে ৫০টি গ্রাম ভোগ করিয়াছিলেন [করিতেছিলেন], তাহাই করিবেন : তবে তাহার মধ্যে ৩০টি গ্রাম আমাদের পাট্টা করিয়া দিতে হইবে। আমরা তাহার যথাযোগ্য রাজস্ব মহাবিহারের অধ্যক্ষকে দিব। আর যতদিন মিত্রবর্গের মধ্যে সাতগাঁ রাজ্য ভাগ না হয়, ততদিন শ্রীযুত বিহারী দত্ত এই রাজ্যের রাজকার্য নির্বাহ করিবেন। তাহার পর ভাগ হইয়া গেলেও, আমাদের মহারাজাধিরাজ যে অংশ পাইবেন, তাহার সম্পূর্ণ ভার বিহারীর উপরই দেওয়া থাকিবে। এখন হইতেই তোমরা বিহারী দত্তকে রাজার প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিবে এবং তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান করিবে। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার মিত্রবর্গ টিকা লইবার জন্য শ্রীযুত বিহারী দত্তকে আহ্বান করিয়াছেন [করিতেছেন]।"

পরে কয়েকজন ভাট গিয়া যশোগান করিতে করিতে বিহারীকে দুজন রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রথমে হরিবর্মদেব ও রণশূরদেব উহার কপালে কুঙ্কুম ও চন্দনের টিপ পরাইয়া দিলেন।

৭ বিহারীর রাজ-পদলাভে বেনেরা মহা-আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল। সাতগাঁয়ের সকল লোকই তাহাতে যোগ দিল। সাতগাঁ ভাটেদের প্রধান জায়গা। তাহারাও মহা-আনন্দে তাহাতে যোগ দিল।

এমন সময় খবর আসিল যে, বিহারী দত্তের কন্যা মায়া তাহাদের গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। খবর শুনিয়া বিহারীর তো আনন্দ ধরে না। তিনি মহারাজাধিরাজ, মহারাজ ও ভবদেব ভট্টের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! মঙ্গলই মঙ্গলের অনুবন্ধী। এত দিনের পর আমার কন্যা আপন বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদি অনুমতি করেন, আমি গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।"

ভবদেব বলিলেন, "সে তো সাতগাঁয়েরই মেয়ে, এই উৎসবের সময় তাহাকে এখানে আনিতে দোষ কি ?" সকলেই অনুমতি দিলে মহা-রাজাধিরাজ তাহাকে সভাস্থলে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সেই মস্করী। মস্করীকে দেখিয়াই ভবদেব তাহাকে চিনিলেন। সে চতুর্থ-খণ্ডের পাড়া, পিশাচ-খণ্ডের গাঞী। মস্করীকে ডাকিয়া তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, মস্করী বলিল, "ভিখারিণীরা মায়াকে ভুলাইয়া যখন সঙ্ঘে লইবার চেষ্টা করিতেছে, রূপা-রাজা উহাকে গুরুপুত্রের শক্তি করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর বিহারী ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছে, সে সময়ে আমি সাতগাঁয়ে আসিয়াছিলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। সে একান্ত পতিপ্রাণা। পতির ছবি সে প্রত্যহ পূজা করে, পতির কাপড়, চাদর, জুতা সে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। আমি মস্করী সাজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পাছে সন্দেহ করে, তাই বিহারে বিহারেই থাকিতাম। মায়াকে স্বামীর সহিত দেখা করাইব, কথা কহাইব বলিয়া তাহাকে লইয়া পিশাচ-খণ্ডে লুকাইয়া রাখি। তথায় ভালো ভালো কুমার আনাইয়া তাহার স্বামীর প্রতিমা নির্মাণ করাই; তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাই। কথা কহিয়া বলে, 'মায়া, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করো'। স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি মায়ার বেশ স্ফূর্তি হইয়াছে। আমি এমন পতিভক্তি দেখি নাই!"

মস্করী অথবা পিশাচ-খণ্ডের গাঞীর মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই

মায়াকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। স্থির হইল, বিহারী সাতগাঁ রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পরই নিজে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবে, মায়াকেও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাইবে। পোষ্যপুত্র গ্রহণ ভবদেব ভট্টের পদ্ধতি মতে হইবে। প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে সভা-ভঙ্গ হইল। রাজারা নৌকায় উঠিলেন, চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কেহ বলিল, "মহারাজ হরিবর্মার জয়", কেহ বলিল, "রণশূরের জয়", কেহ বলিল, "বিহারী দত্তের জয়", কেহ কেহ বলিল, "ভবদেবের জয়", কেহ কেহ বলিল, "জয় মায়া দাসীর জয়!"

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহাবিহার ও গঙ্গার মধ্যস্থলে মহাসভা হইয়া গেল, রূপা-রাজার বৌদ্ধরাজ্য নাশ ও হরিবর্মার হিন্দুরাজ্য স্থাপন হইয়া গেল। বিহারী সাতগাঁ রাজ্যের সমস্ত ভার পাইল, লোকে খুব খুশি হইল ; কিন্তু অনেকের আবার এই সকল ব্যাপারে মর্মান্তিক হইল। বৌদ্ধ যাহারা ছিল, তাহাদের তো রাজ্য গেল, রাজা গেল, দেশে যে দব্‌দবা ছিল, সেটি গেল, মহাবিহারও গতপ্রায়, তাহারা বড়ো খুশি হইতেই পারে না।

এখন আবার এক সভা হইবে। সেটা রাজার খাস সভা, তাহাতে সাতগাঁ রাজ্য বাঁটোয়ারা হইবে। যাঁহারা হরিবর্মার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজ্যের যাহাতে সুশৃঙ্খলা হয়, তাহা করিতে হইবে। আর মোট কথাটা, বৌদ্ধেরা যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক লেখাপড়া চাই, অনেক সন্ধান লওয়া চাই, অনেক পরামর্শ চাই, অনেক বিবেচনা চাই। সুতরাং কিছুদিন সকলকে সাতগাঁয়ে থাকিতে হইবে। এই কিছুদিনের মধ্যে তারাপুকুরের কেল্লাটা নূতন করিয়া গড়া চাই। ছাউনি, রাউত-পাড়া সব নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করা চাই। চারি দিকে লোক লাগিয়া গেল। সাতগাঁ বেশ সরগরম রহিল।

এই দীর্ঘকাল মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা, যদিও বয়স হইয়াছে, মাছ ধরা, কুমির মারা, হাঙর ধরা, শিকার করা, বাজ পাখির খেলা করা, এই সব লইয়াই রহিলেন। সাতগাঁ ও মহাবিহারের সম্মুখে গঙ্গা খুব চওড়া, একটা সমুদ্রের খাড়ি মতো, মাঝে মাঝে বালির চড়া। দু-একটা চড়ায় মাটি আছে, আর তার উপর নিবিড় জঙ্গল ; আস্‌শেওড়া, পটপটি, বন-ঝাউ, নানা রকমের লতা, কাঁটাগাছ, কাঁটানটে, কণ্টিকারি, কাল-

কাসন্দা, চাক্‌চাকন্দা, শ্যালকাঁটা, ফেণী-মনসা, গোয়ালে-লতা। এই সবের মধ্যে পা-বাড়ানো যায় না। আবার ওপারে দূরে সুন্দরবন— সুঁদরি গাছ, বেত গাছ, গোলপাতার গাছ, সঙ্গে সঙ্গে নোনা, ভাটুই, গম্ভীরা, জীবন, জিউলি— সেও খুব ঘন, তার নীচেও আবার ঘন বন। মহারাজাধিরাজের ভারি আমোদ— বালির চড়ায় কুকুর ছাড়িয়া দেন, তাহারা খরগোশ, শজারু, গোসাপ, গন্ধগোকুলা ধরিয়া লইয়া আসে। খরগোশও ছোটে, পিছু পিছু কুকুরও ছোটে— দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না। আবার দুমিনিট পরে কুকুরটা খরগোশটিকে দাঁতে ধরিয়া মহারাজাধিরাজকে পুরস্কার দেয়। মহারাজাধিরাজ কুকুরের গায়ে হাত দিয়া তাহাকে আদর করিলেন, সে আবার আর-একটা কি দেখিয়া ছুটিল। তাহার আদর দেখিয়া আর-পাঁচটা কুকুরও আপন আপন বাহাদুরি দেখাইবার জন্য ছুটিল। একবার পাঁচ-সাতটা কুকুরে একটা নেকৃড়ে বাঘকে তাড়া করিয়াছে, সে চারি দিকে ছুটিতেছে। কোথাও পরিত্রাণ নাই দেখিয়া, যেদিকে রাজা ছিলেন, সে সেই দিকে ছুটিল। রাজা ও শিকারীরা তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম লইয়া প্রস্তুত হইলেন ; কিন্তু দূর হইতেই মহারাজাধিরাজের এক তীরেই তাহার জীবন শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গার উপর দিয়া নানা রকমের পাখি ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায় ; কত রকম শব্দ করে, গান করে, খেলা করে : আকাশ যেন ছাইয়া ফেলে। মহারাজাধিরাজ এক-একদিন ঐ সকল পাখি লক্ষ্য করিয়া পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইত, বাজ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিত, চিল্ চিল্ চিল্ চিল্ শব্দ করিত, এক-একটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিত, আবার আর-একটার উপর ধাওয়া করিত। নীচে লোক পাখি কুড়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিত। মরা পাখি কতক মাটিতে পড়িত, কতক জলেও পড়িত, কিন্তু একটিও নষ্ট হইত না। কাছে হইলে লোকে জলে পড়িয়া সাঁতার দিয়া ধরিয়া আনিত, আর দূরে হইলে ডিঙি তো ছিলই।

সকালবেলা নদীর ওপার জঙ্গলের নীচে চড়ার উপর বাতি-শাল-কাঠের মতো কি পড়িয়া থাকিত। যাহারা জানে না, তাহারা মনে করে, বাহাদুরী কাঠ ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, সেগুলা কুমির, নানাজাতীয় কুমির। মহারাজাধিরাজ কুমির শিকারের জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

বর্শা, বল্লম, কোঁচা আর চতুর কয়েকজন শিকারী। কুমিরের গায় বল্লম বসে না। তাহাদের চোখে না-হয় মুখে বিঁধিতে হয়। রাজা অনেক ধস্তাধস্তির পর কুমিরের মুখে বর্শা চালাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড কুমির এক মোচড়ে বর্শা ভাঙিয়া দিয়া ঝুপ্ করিয়া জলে পড়িল ; কিন্তু ভাঙা বর্শা বাধিয়া থাকায় তাহার নড়াচড়ার পক্ষে বড়োই উৎপাত হইতে লাগিল। একটু চাড় পাইলেই মুখে লাগে আর যন্ত্রণায় কুমির অস্থির হয়। শেষে সে ভাসিয়া উঠিল— অমনি প্রকাণ্ড কাছি আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর টানিয়া ডাঙায় তুলিল। কুমির মহাশয় মরিলেন, পেট চিরিয়া তাঁহার নাড়িভুঁড়ি বাহির করা হইল, পেটের মধ্যে তুলা ও বিচালির কুচি পূরিয়া দেওয়া হইল, আবার সেলাই করা হইল। তিনি বহুকাল ধরিয়া রাজবাড়ির দেউড়িতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শব্দভেদী বাণের তখন খুব চলন ছিল। আর রাজা হরিবর্মা শব্দভেদী বাণে খুব দক্ষহস্ত ছিলেন। নৌকায় বসিয়া যেই শুনিলেন, একটা শুশুক কি ঘড়েল ভুস করিয়া উঠিল, অমনি রাজার বাণ চলিল। সে বাণ অব্যর্থ। শুশুককে মরিতেই হইবে। আর শিকারীরা যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে রাজার সামনে আনিয়া উপস্থিত করিবে। শুশুকের তেল বাতের বড়ো ঔষধ ছিল।

হাঙর এক ভয়ানক জন্তু। দেখিতে বড়ো আড়মাছের মতো, মুখের গোড়া থেকে দুখানা হাড় বাহির হইয়াছে, হাড় দুখানার দুধারে দুসারি করিয়া দাঁত ; উপর-নীচের চারি সারি দাঁত একত্র হইলে চারখানা করাতের কাজ করে। হাঙরে কাটিলে তাই করাত-কাটার মতো পরিষ্কার কাটা দেখা যায়। রাজাধিরাজের শব্দভেদী বাণে অনেক হাঙর, আপন হাঙরলীলা সংবরণ করিয়া, বহু-সংখ্যক নিরীহ মনুষ্য ও জীবজন্তুর বাঁচিয়া থাকার কারণ হইয়াছিল।

নৌকার বাচখেলা মহারাজের আর-এক আমোদ ছিল। বড়ো বড়ো জাহাজ লইয়া বাচখেলা হইত। এ নৌকা পলাইতেছে, আর-একখানা তাহার পিছন লইয়াছে। আর-একখানা প্রথমখানাকে রক্ষা করার জন্য যাইতেছে। একখানা ঘুরিয়া মহাবেগে আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়খানার মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রথমখানার পলাইবার পথ করিয়া দিতেছে। জল তোলপাড় হইয়া যাইতেছে। জলজন্তু সব ভয়ে পলাইতেছে ও ভাসিয়া

যাইতেছে। জলজন্তুর পিছনে আবার ডিঙি, পান্‌সি, বর্শা, বল্লম লইয়া ধাওয়া করিতেছে।

এইসব লইয়া মহারাজাধিরাজের দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু তিনি রাজকার্যে অবহেলা করিতেন না। যে কেহ দেখা করিতে আসিত, তাহাকেই আপ্যায়িত করিতেন, তাহার কি বলিবার আছে, শুনিতেন। অনেক সময় ডাঙায় উঠিয়া সিপাহিদের কুচ-কাওয়াজ দেখিতেন। একদিন তারাপুকুরে মেরামত দেখিতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সর্বদাই সাতগাঁয়ে অলিগলি কুচ করিয়া যাইত। শুধু যে সৈন্যরাই যাইত, এমন নহে। নৌকার মাঝিরা, খালাসিরাও সাজিয়া কুচ করিতে যাইত। যখন ভবদেব আসিতেন, মহারাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেন।

মহারাজ রণশূর সর্বদাই মহারাজাধিরাজের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি অতি বলিষ্ঠ, সুপুরুষ ও বেশ মিষ্টভাষী। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। শিকারে তিনিও খুব মজবুত; কিন্তু সে মজবুতি সাকরেদি— ওস্তাদি নয়। মহারাজাধিরাজ, রণশূরকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি কাছে থাকিলে খুশি থাকিতেন। দুজনের বেশ ভাব হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ যেখানে যাইতেন, রণশূরও সেইখানেই যাইতেন। যে সব খেলার কথা বলা হইল, সর্বত্রই দুজনে থাকিতেন। জলে খেলা রণশূরের বড়ো একটা অভ্যাস ছিল না: কিন্তু তাহাতেও তিনি বেশ পাকিয়া উঠিলেন; তাঁহারো বাজ পাখি ছিল, শিকারী কুকুর ছিল। তিনিও তীর-ধনুক লইয়া শিকার খেলিতেন, বর্শা-বল্লম ব্যবহার করিতেন।

## ২

আর ভবদেব কি করেন? তিনি একখানি বড়ো বজরা লইয়া ত্রিবেণীর পাশে সপ্তর্ষিঘাটে বসিয়া থাকেন। বজরায় একটি আপিস; একজন বৃদ্ধ কায়স্থ, তাহার নীচেও অনেকগুলি কায়স্থ, সবাই নিরন্তর ঘাড় গুজিয়া লেখাপড়া করিতেছে। ভবদেবের কাছে দিনরাত্রি লোক আসিতেছে। বিহারী প্রায়ই আসিতেছেন ও পরামর্শ করিতেছেন। গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কোনো কাজেই ভবদেব বজরা হইতে নামেন না। কেবল একদিন নামিয়া-

ছিলেন ব্রহ্মপুরীতে নিমন্ত্রণ খাইবার জন্য, একদিন বিহারীর বাড়ি পায়ের ধুলা দিবার জন্য, আর-একদিন মহাবিহারের ঠাকুর দেখিবার জন্য। ভবদেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, হেরুক ও বজ্রবারাহীর মূর্তি অত ভয়ানক, তাই স্বচক্ষে দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিয়া "নগ্নদর্শন" অর্থাৎ নেংটা লোক দেখিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত করেন। স্মৃতিকারেরা বলেন, নগ্ন বলিতে বৌদ্ধও বুঝিতে হয়।

যাহার যাহা বলার আছে, সকলেই ভবদেবের কাছে বলিয়া যাইতেছে। ভবদেব সব কায়স্থের দ্বারা লিখাইয়া রাখিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বড়োই মুশকিল। অধিকাংশ কায়স্থই বৌদ্ধ। অনেকেই বজ্রযান ও সহজযানের বই লিখিয়াছেন। সুতরাং নিজের কায়স্থ লইবার সময়ে ভবদেবকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ের ব্রাহ্মণগাঞীদের গ্রাম হইতে অতি গরিব কায়স্থ আনিয়া মুহুরি করিয়াছিলেন। যাহাদের অন্যরূপে জীবিকা-নির্বাহের কোনোরূপ সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের একেবারে লয়েন নাই। ইহারাও প্রাণপণে তাঁহার কর্ম করিয়াছে, কখনো গুপ্তকথা ব্যক্ত করে নাই। উঁহাকে তাহারা আপনাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা বলিয়া মনে করিত। উঁহা হইতেই তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবন নির্বাহ করিতে পায়, ভবদেব তাহাদের এরূপ অর্থ দিতেন না।

ভবদেবের কাছে ব্রাহ্মণেরা আসিতেন বৃত্তির জন্য, দক্ষিণার জন্য, ভাটেরা আসিত ত্যাগ পাইবার জন্য, আচার্যেরা আসিতেন পূর্ণপাত্রের জন্য, বেনেরা আসিত ব্যাবসার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, সৈন্যেরা আসিত জমি ও জায়গিরের জন্য, যুগি-জোলা-তাঁতিরা আসিত কাপড় বোনার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, তেলিরা আসিত ঘানির ব্যবস্থা করিবার জন্য, বৌদ্ধেরা আসিত তাহাদের উপর অত্যাচার না হয় —সেইটা প্রার্থনা করিবার জন্য। তিনি যাহার সঙ্গে যেমন করা উচিত, তেমনি ব্যবহার করিতেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইত যে, ভবদেব তাহাকে ভালোবাসেন।

ভবদেবেরও দিনরাত অবসর ছিল না। ত্রিসন্ধ্যা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাই করিতেন। নইলে তাঁহার খাওয়া-শোওয়ার অবসর

ছিল না। যখন অন্য কেহ থাকিত না, তখন তিনি, কায়স্থেরা দিনভর কি লিখিয়াছে, তাহাই শুনিতেন ও তাহার উপর আপনার যা বলার ছিল, লিখাইয়া রাখিতেন।

বিহারীরও অবসর বড়ো কম। তাহার কাছেও ঢের লোক। তাহার পোষ্যপুত্র লওয়া হইতেছে না। আগামী খাস-দরবারের জন্য সে সর্বদাই ব্যস্ত। তাহার একটা বেশি কাজ ছিল, তাহাকে ঘুরিয়া খবর যোগাড় করিতে হইত। কেননা, রাজা ও ভবদেব তাহার কথাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

## ৩

পঁচিশ-ছাব্বিশ দিনের পর হরিবর্মার বড়ো নৌকায় সভা বসিল। মহারাজাধিরাজ, মহারাজ, ভবদেব ও বিহারী এই চারি জনেই সভা। আর লোক আবশ্যক মতো আসিতেছে, আপনার কাজ করিয়া দিয়া যাইতেছে। প্রথম উঠিল রাজ্য-ভাগের কথা।

হরিবর্মা বলিলেন, "রণশূরের সম্পোষ্যমতো দামোদরের ওপারের যত গ্রাম উনি চান, দিয়া দাও। কেমন হে ভায়া, তাতে তোমার মত হবে তো ?"

রণশূর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত গ্রাম আছে ?"

উত্তর হইল, "২৩৮খানা, তাহার মধ্যে তোমাকে ১৫০খানা গ্রাম দেওয়া যাইতেছে। কেবল কয়েকটা ঘাটি আগ্‌লাইয়া রাখিবার জন্য ৮৮খানা গ্রাম আমি রাখিতেছি। তোমার সঙ্গে আবার ঘাটি কি ? কিন্তু উত্তরে ১১টা ঘাটি আছে। ফি ঘাটিতে আটটা করিয়া ৮৮খানা গ্রাম আমি রাখিলাম। নহিলে জান তো, বিষ্ণুপুর আছে, মহীপাল আছে, এরা যদি ঘাটি খোলা পায়, আমারও ক্ষতি করিবে, তোমারো ক্ষতি করিবে।"

রণশূর ইহাতে বেশ খুশি হইয়া গেলেন। তাহার পর রূপা-রাজার পরিবারবর্গের প্রতিপালন। সে একটি বৈ বিবাহ করে নাই, তাহারো সন্তানসন্ততি হয় নাই। রাজা তাহাকে হাজার টাকা মাসিক দিবেন, আর তাহাকে গঙ্গার ওপারে চাকদহের কাছে বাস করিতে দিবেন। সে সেখানে ইচ্ছামতো ধর্মকর্ম করিতে পারে।

ভবদেব বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে মহারানী অধিরানীর আপত্তি আছে। তিনি বলেন— তিনি কোনো বৌদ্ধক্ষেত্রে বাস করিবেন।"

"বেশ তো, তিনি নালন্দা, বিক্রমশীল, বুধগয়া, কুশীনগর, ঋষিপত্তন, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন।"

"রানী বলিয়াছেন, তিনি আপাতত হরিহরপুরে থাকিবেন। পরে সেখান হইতে পুরী যাইবেন।"

"বেশ তো, তাহাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না।"

তাহার পর ব্রাহ্মণদের পুরস্কার।

"তাঁহারা সকলেই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন। অনেকেই যুদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে পরিশ্রম করিয়া ব্যূহরচনা, দুর্গসংস্কার প্রভৃতি শিখিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহার বিলক্ষণ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

"কতজন পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছ ?"

"একশত পনরো জন।"

"বেশ, এক-একজনকে এক-একখানি গ্রাম দাও।"

"মহারাজ, তাহাতে তো আমার কোনোই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপনি পাইলেন কি যে, এত দান করিবেন ? দেখুন, দামোদরের ওপারে ৮৮খানা গ্রাম রহিল, তাহাতেও ঘাঁটি আগ্‌লাইবার খরচ কুলাইবে না। আর এপারে যে সব গ্রাম, তাহার তো ৫০খানি মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ মহাবিহারকেই দান করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া প্রত্যেক বিহারই তো ৫/৬ খানা গ্রাম ভোগ করে। আপনি তাহার উপর আবার ১১৫খানা ছাড়িলে এক সাতগাঁ বন্দর ছাড়া আর-কিছুই থাকিবে না।"

"তুমি কি বলো ?"

"আমি বলি, যিনি যেরূপ কার্য করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ ১০ বিঘা হইতে ১০০ বিঘা পর্যন্ত ভূমি দেওয়া হউক। আর যেখানেই ব্রাহ্মণের ভূমি দিবেন, তাহার একটা সীমানা যেন একটা বৌদ্ধবিহার বা তাহার জমির সঙ্গে লাগাও থাকে, এরূপ করিলে ১১৫টা গ্রামের বদলে ১৫/২০টা দিলেই চলিবে। আর ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও সম্ভাবনা

থাকিবে। কারণ, বৌদ্ধধর্ম এখন আর উঠতি-মুখে নাই, উহা ক্রমেই পড়িয়া যাইতেছে।"

"বুঝেছি— তোমার মতলব বুঝেছি। বৌদ্ধদের জমিগুলা ব্রাহ্মণ-সাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু পুরাণে লিখেছে যে, দেবোত্তরের কাছে কাহাকেও ব্রহ্মোত্তর দিবে না।"

"সে মহারাজ, আমাদের দেবতাদের কথা। বিধর্মীদের দেবতা আমরা দেবতা বলিয়া মানি না। এই সেদিন মহাবিহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখিতে গিয়াছিলাম, কামশাস্ত্রের ছবিতেও অত অশ্লীল-মূর্তি কখনো দেখি নাই। এই মূর্তি আমি তো দেবতা বলিয়া মানিতে পারি না। তবে যে ভাঙি না, সে কেবল মিছে একটা গোলযোগ বাধানো দরকার কি বলিয়া। নহিলে হেরুক-মূর্তি দেখিয়া আমার সেদিন হইতেই রাগ হইয়াছিল।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে, বৌদ্ধধর্মের উন্নতি নাই, ক্রমেই অধোগতি হইবে?"

"মহারাজ, এতদিন সমাজ হইতে ভিক্ষু সংগ্রহ হইত, সঙ্ঘ পূরিত, এখন উল্টা হইয়াছে। এখন সঙ্ঘ হইতে সমাজে লোক আসিতেছে —সমাজ তাহাদের লইতে পারিতেছে না। মহা-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। যতদিন সঙ্ঘের আঁট ছিল— সঙ্ঘে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে পারিত না, ততদিন সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনে, তেলি সঙ্ঘে গিয়াছে। সমাজ সঙ্ঘের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু এখন কি হইতেছে? সঙ্ঘে সকলেই শক্তি লইতেছে। বলে— শক্তি নহিলে সাধনা হয় না। সাধনা যত হউক-না-হউক, হইতেছে ছেলে-মেয়ে। প্রথম প্রথম সেগুলাকে দশশীল আওড়াইয়া সঙ্ঘে লইত, এখন এত বেশি হইয়াছে যে, সঙ্ঘে আর ধরে না, সেগুলার জন্য নূতন বিহারও আর হইতেছে না। সুতরাং সেগুলা সমাজে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়? আমাদের চাতুর্বর্ণ্য-সমাজে তো তাহাদের স্থান নাই। বৌদ্ধ-সমাজে চাতুর্বর্ণ্য নাই। সেখানে তাহারা স্থান পাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ব্যবসায় কি হইবে? সকলেরই তো একটা একটা ব্যবসায় আছে। নূতন যাহারা আসিতেছে, তাহারা দাঁড়ায় কোথায়? তাই একজন বড়ো রাজা তাহাদের যুগি উপাধি

দিয়া তাহাদের মোটা কাপড় বুনিতে দিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, এখন আর সমাজ সঙ্ঘ পোষণ করে না। সঙ্ঘের লোক [ সমাজে ] আসিয়া ভিড়িতেছে। এই তো ধ্বংসের অবস্থা। ভিক্ষুদের ভিক্ষা সমাজের লোকে দিতে চায় না। তাহাদের যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেও কুলায় না। সুতরাং কাপড়ের ব্যাবসা যদি জাঁকিয়া উঠে, সব সঙ্ঘের লোক সেই দিকে ছুটিবে, বিহার পড়িয়া থাকিবে। সে বিহার জঙ্গল হইয়া যাইবে। জঙ্গল না হইয়া যদি ব্রাহ্মণের ভোগে আসে, ক্ষতি কি তাহাতে ?"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন, "এ যুদ্ধ বেনেদের জন্য, জয়ও বেনেদের হইতে। বেনেরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে ?"

কি পুরস্কার দেওয়া উচিত, বিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "বেনেরা জমি-জমিদারি চায় না, ত্যাগ-দক্ষিণা চায় না। তাহারা চায় বাণিজ্যের একটু সুবিধা। তাহাও তাহারা ভুঁসি মালের ব্যাবসা করে না, দেশী মালেরও ব্যাবসা করে না। বিদেশী মাল, বিশেষ সাগরপারের মাল, যাহাতে অবাধে বিনা মাশুলে সাতগাঁ পৌঁছিতে পারে, এইটুকু করিয়া দিলে বেনেদের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। সাতগাঁ-ই এ সকল মালের প্রধান আড্ডা। এখানে যা মাশুল আদায় হয়, তাহার উপর ৩/৪টা মুনাফা চড়িয়া মাল মহার্ঘ করিয়া দেয়। যদি এ মাশুলটা এক-টাকা কমে, তবে মালের দাম দুই টাকা কমিবে, সারা-বাংলার উপকার হইবে। সারা-বাংলার অর্ধেক তো মহারাজাধিরাজের উঁহার প্রজাদের অনেক সুবিধা হইবে।"

মহারাজাধিরাজ। তাহাতে রাজার যে বিস্তর লোকসান হে! এত লোকসান দিয়া রাজা রাজ্য চালাইবে কিরূপে ?

বিহারী। প্রজার দুই টাকা লোকসান করিয়া রাজার একটাকা লাভ— বড়ো ভালো কথা নয়। সে দুটা টাকা প্রজার ঘরে থাকিলে প্রজাও দশের জন্য, দেশের জন্য দশ টাকা খরচ করিতে পারিবে। রাজাও দরকার হইলে মাঙ্গন-মাথট করিয়া যথেষ্ট আয় করিতে পারিবেন।

সকলেই বিহারীর কথায় সায় দিল।

তাহার পরে কথা উঠিল কাপড়ের। ভবদেব বলিলেন, "ব্রাহ্মণেরা বাকলের অথবা রেশমের কাপড় পরেন, তুলার কাপড় অশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা পূজা-অর্চনা করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, রাঁধাবাড়া করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, খাওয়া-দাওয়াও করেন রেশমের কাপড় পরিয়া। তবে অন্য সময়ে অনেকে তুলার কাপড় পরেন বটে ; কিন্তু তাহাও পরা যায় না। কারণ, সব কাপড়েই ভাতের মাড়। নীচ জাতির এঁটো ছুঁয়ে অশুচি হইতে হয়। তাই আমরা রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের গ্রামে জাত-তাঁতি বসাইয়া কাপড়ে খই-এর মাড় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যুগির কাপড় একেবারেই পরি না, স্পর্শও করি না। এখন তো হিন্দুর দেশ হইল। এখন এই কাপড়ের যাহাতে দেশে চলন হয়, তাহাই করিতে হইবে। জাত-তাঁতির হাত খুব সাফ। তাহারা খুব সরু কাপড় বুনিতে পারে। সে কাপড়ে খই-এর মাড় যত পরিষ্কার দেখায়, ভাতের মাড় তেমনটা হইতেই পারে না।"

মহারাজাধিরাজ। আমি তাহার কি করিতে পারি ? সে হাত আপনাদের আর সে হাত বিহারীর। আপনারা যদি মনে করেন, শুচি কাপড়ই চলিবে, অশুচি কাপড় চলিবে না, যাহারা যুগির কাপড় পরিয়া জল আনিবে, তাহাদের জল আপনারা লইবেন না বা স্পর্শও করিবেন না, ইহাতেই তাঁতির কাপড় চলিয়া যাইবে।

ভবদেব। ব্রাহ্মণেরা তেলের ব্যবহার খুবই কম করেন। অনেকে সরিষার তেল মাখেন। কিন্তু অধিকাংশই তৈলস্নান করেন না। যাঁহারা তেল মাখেন, তাঁহাদের বড়োই অসুবিধা। এখানে ঘানির মুখে চামড়া দেওয়া থাকে, চামড়ার ঠোঙা বাহিয়া তেল একটি কলসিতে পড়ে। চামড়ার স্পর্শে সে তেল অশুচি হয়। সে তেল কিছুতেই মাখা উচিত নয়। আমরা ব্রাহ্মণের গ্রামে বন্দোবস্ত করিয়াছি, একটা কাঠের কেট্‌কোর ঠিক মাঝখানে ছিদ্র করিয়া ঘানিটি তাহাতে খুব আঁট করিয়া বসানো হয়। ঘানি বাহিয়া তেল কেট্‌কোয় পড়ে ; কেট্‌কো ভরিয়া গেলে, নারিকেলের মালা করিয়া তেল একটি কলসিতে তুলিয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপে পবিত্রভাবে তেল তৈয়ারি করিবে, আমরা তাহাদেরই জল-আচরণ করিব। চর্ম-তৈলের ব্যবহার এইরূপে কমিয়া যাইবে।

৪

ভবদেব বলিয়া যাইতেছেন. "যাহারা ফুলের ব্যবসায় করে, তাহাদের আমরা সজ্জাতি বলিয়া লইতে পারি, তাহাদের জল ব্যবহার করিতে পারি, তাহাদের কাছে ফুল লইয়া ঠাকুর-দেবতাদের দিতে পারি ; কিন্তু এই বৌদ্ধদেশে একটা বড়োই বিপদ দেখিতেছি। এখানকার মালিরা মালঞ্চে শুধু যে ফুলগাছ পোঁতে, তা নয়, মুরগিও পোষে. আর মুরগির ডিমগুলাকে ফুলের সঙ্গে ফুল বলিয়া বিক্রয় করে। বৌদ্ধদের পুষ্পপাত্রে যেমন সারচন্দনের বাটি, রক্তচন্দনের বাটি থাকে, তেমনই মুরগি-ফুলেরও একটি বাটি থাকে। এ ফুলও অন্য ফুলের সঙ্গে তাহারা ঠাকুরের উপর চড়ায় এবং অনেক সময় ডিম ভাঙিয়া ভিতরকার তরল পদার্থ ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দেয়। এই সকল মালিদের আমরা অনাচরণীয় বলিয়া মনে করিব। উহাদের সহিত আমাদের কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের যে সকল গ্রাম দেওয়া আছে, সেখানে আমরা মালিদের মুরগি পুষিতে দিই না। মুরগির ডিম ছুঁইতেই দিই না। আমরা তাহাদের জল ব্যবহার করি, তাহাদের ফুল দেবতাদের অর্পণ করি। তাহারা বিবাহের টোপর ও ময়ূর তৈয়ার করে ; ফুলের, শোলার ও তালপাতার গহনা তৈয়ার করে ; ব্রাহ্মণীরা ও ব্রাহ্মণকন্যারা সেই গহনা পরিয়া থাকে।

"সেকালে যে সকল নাপিত বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডে খেউরি করিত, বিবাহের সময় তাহারা নানা কাজ করিত। সে জাতি আর বাংলায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রাঢ়দেশের জঙ্গলে একদল খেউরি করা লোক আছে, তাহাদের দ্বারাই বাঙালি বৌদ্ধেরা কাজ চালাইয়া লইয়া থাকে। ভিক্ষুরা চেষ্টা করে নিজে নিজে কামাইতে, কিন্তু সব সময়ে পারিয়া উঠে না। এই নাপিতেরা তাহাদেরও খেউরি করিয়া থাকে। কিন্তু এক বিষম সমস্যা আছে— এই নাপিতেরা সকলেই কাকের মাংস খায়। সুতরাং উহাদের স্পর্শ করিতে নাই, জল আচরণ করিতে নাই, উহাদের হাতে কোনো কাজ লওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নয় ; সুতরাং নাপিত আনাইতে হইয়াছে। এই নাপিতের বংশ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। সাতগাঁয় উহাদের জন্য একটা জায়গা দিতে হইবে। ক্রমে আমাদের নাপিতেরা বাংলা ছাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা কাক-খাদক নাপিতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

"বাংলায় বড়ো বড়ো গোঠ আছে। গোরু চরাইবার এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের জমি আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এখানকার গোয়ালারা খুব প্রবল, দলেও খুব পুরু ; কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার ভালো নয়। অনেকেই গোরু দাগে, দামড়া করে, নানারূপে গোরুকে যন্ত্রণা দেয়, ফুকা দিয়া দুধ বাহির করে, গাই দিয়া লাঙল টানায়। এই সকল কদাচারী গোয়ালার দুধ খাওয়াও নিষেধ। কারণ, তাহাদের স্বভাব এত খারাপ যে, তাহারা দুধে জল না দিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের জল-আচরণ করা ব্রাহ্মণের কোনোমতেই উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গ্রামে সেইজন্য আমরা সদ্‌গোপ নামে আর-একটি গোপজাতির সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এ সকল কদাচার নাই। তাহারা অনেকটা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে শিখিয়াছে, ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার শিখিতেছে। অন্য গোয়ালারা যাহাতে এই দলে মিশে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

"বাংলা তো নদীর দেশ, জলের দেশ। মাছ ধরাই এখানকার অর্ধেক লোকের জীবন। নানা জাতির লোক মাছ ধরে— যেমন কৈবর্ত, তিওর, জেলে, মালা ইত্যাদি। ইহারা সকলেই নামে বৌদ্ধ, বলে, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', কিন্তু কাজে কিছুই নয়। বৌদ্ধদের প্রথম শিক্ষা, 'প্রাণীহিংসা করিও না।' তা তো ইহারা দিনরাত করে। সেইজন্য বৌদ্ধ-স্মৃতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের কোনোরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তবে যদি ইহারা জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করে, লাঙল চালায় বা অন্য ব্যবসায় করে, তবে বৌদ্ধেরা উহাদিগকে শিক্ষা দিতে রাজি আছে। এইরূপে শিক্ষা পাইয়া অনেক জেলে হেলে হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে আমাদের দলে লইয়া আসা কিছু কঠিন। কারণ, ইহাদের সঙ্গে কোনোরূপ আচার-ব্যবহারই আমাদের চলিবে না। কিন্তু বৌদ্ধদের হাত হইতে উহাদের উদ্ধার করিতে হইবে। নইলে বৌদ্ধেরা এই হেলেদের লইয়াই প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া বসিবে।"

মহারাজাধিরাজ তাঁহার সকল কথাতেই সায় দিলেন। ভবদেব বিহারীকে বলিয়া দিলেন, "তুমিও এইমতো চলিবে।"

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবদেব ভট্ট বারংবার মস্করীর কথা তুলিতেছেন। মস্করীকে কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে? মস্করী প্রায়ই উপস্থিত থাকিত। সে বলিত, "আমার কথা সকলের শেষে। আপনাদের সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কথা, আমার কথার পর আর কথা থাকিবে না।" মহারাজাধিরাজ ও ভবদেব তাহাতেই রাজি হইলেন। এইখানে মস্করীর একটুকু পরিচয় দিয়া রাখি।

রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা পাঁচ গোত্র। আদিশূর রাজা ৭৩২ খৃঃ অব্দে কনোজের রাজা যশোবর্মার কাছে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কারণ, তাঁহার রাজবাড়ির চূড়ায় বাজপাখি বসিয়াছিল। সেটা তখন বড়ো অলক্ষণ, উৎপাত বা অদ্ভুত বলিয়া লোকে মনে করিত। সুতরাং ঐ অলক্ষণের শান্তি না হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া আদিশূর রাজা যশোবর্মার কাছে শান্তিযজ্ঞের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। অনেকে মনে করিতে পারেন, যজ্ঞে তো তিন জন ঋত্বিক্ হইলেই হয়। না-হয় একজন ব্রহ্মা বেশি থাকিলেন। পাঁচ জন কেন হইবে? এ সম্বন্ধে একটা ভারি কথা আছে। দক্ষিণদেশে এখনো তিন জনে যজ্ঞ হয়; কিন্তু আর্যাবর্তে যাজ্ঞবল্ক্য পাঁচ জন ঋত্বিক্ ভিন্ন কার্য হইবে না, ব্যবস্থা করিয়া যান। যজুর্বেদকে শুক্ল ও কৃষ্ণ করিয়া দুই বেদ ধরিলে ও অথর্ববেদকে বেদের মধ্যে ধরিলে পাঁচখানা বেদ হয়। পাঁচখানা বেদে পাঁচ জন ঋত্বিক্ লইয়া যজ্ঞ হইত। তাই আদিশূর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চান; যশোবর্মাও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পাঠান। রাজারা এই পাঁচ জনের সন্তান-সন্ততিকে অনেক গ্রাম দেন। বাৎস্য গোত্রের রাহ্মণদের একজন কাঞ্জিবিল্বী নামে একখানি

গ্রাম পান। সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের বংশ-বিস্তারও হয়, বিদ্যাবুদ্ধির যশও খুব হয়। আবার রাজারা সেই গ্রামের নিকটে নিকটে ঐ ব্রাহ্মণদের আরো চারি-পাঁচখানি গ্রাম দেন। গ্রামগুলির নাম তালবাড়ি, চতুর্থ-খণ্ড ( চোটখণ্ড ), পিশাচখণ্ড, রাণডলা ও হিজলবন। এই সকল গ্রামেই কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস হইয়াছিল। যিনি পিশাচখণ্ড পাইয়াছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র হয়। এক পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন, আর-একজনের পুত্র আমাদের মস্করী। মস্করী গ্রামের গ্রামীণ বা গাঞী ; সুতরাং তাঁহার অর্থের অসদ্ভাব নাই। গ্রামে কতকগুলি কুমার, গোয়ালা ও শুঁড়ির বাড়ি। তাহাদের কুলকর্তা মস্করী। মস্করীর পৈতৃক সম্পত্তি বেশ ছিল। আর একখানি গ্রাম তাঁহার নিজের। রাজাকে কর দিতে হয় না, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ রাজার। সমস্ত গ্রামের উপস্বত্বই মস্করীর। মস্করী পাণ্ডিতও খুব ভালো, শাস্ত্র ও কাব্য দুয়েতেই তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। তাহার উপর নাচ-গান, এমন কি, চৌষট্টি-কলায় তাঁহার মতো নিপুণ লোক খুব কমই দেখা যাইত। তবে তিনি কিছু শ্রাদ্ধানন্দী। গ্রামের মধ্যে অথবা নিকটে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহাদের বড়ো আনন্দ। তাঁহারা সর্বদা শ্রাদ্ধের খোলায় উপস্থিত থাকেন ; পরামর্শ দেওয়া, সাহায্য করা, খাটা-খাটনিতে তাঁহাদের বিশেষ আনন্দ। সেইজন্য লোকে তাঁহাদের শ্রাদ্ধানন্দী বলে। শব্দটার অর্থ ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। পরের কাজে, বিশেষ আমোদ-প্রমোদের কাজে যাঁহার আনন্দ, লোকে তাঁহাকেই শ্রাদ্ধানন্দী বলে। অতি প্রাচীনকালে বড়ো বড়ো শহরে নাগর বলিয়া একদল লোক থাকিত। তাহারা পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিত, উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিত, নানা কলায় চতুর হইত, নাচ-গানের আসরে কর্তৃত্ব করিত ; বৈঠকখানা সাজাইত। তবে নাগরেরা একটু স্ত্রীলোক-ঘেঁষা ছিল। তাই এখন নাগর বলিতে একটু লচ্‌পচে স্বভাবের লোক বুঝায়। মস্করীর কিন্তু সে দোষ একেবারেই ছিল না। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও স্বদার-সন্তোষী। তাঁহার মেয়ে নাই, ছেলে নাই, ঢেঁকি নাই, কুলা নাই। তিনি পরের কাজ করিয়াই বেড়ান। যেখানে পাঁচ জন, সেইখানেই আমাদের মস্করী।

সব কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজাধিরাজ মস্করীকে স্মরণ করিলেন। অমনি মস্করী উপস্থিত।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"মস্করী, তুমি কি চাও ?"

"মহারাজাধিরাজ, আমি এই চাই, আপনি রাজসভা করেন।"

"এখন তো আমরা রাজসভাই করিতেছি।"

"এ মন্ত্রীসভা— মন্ত্রণার সভা—রাজকার্যের সভা— "

"তুমি আবার কিরূপ সভা চাও ?"

"আমি চাই, মহারাজাধিরাজ সভাপতি হইয়া বসিবেন; দেশবিদেশ হইতে শাস্ত্রে ও কাব্যে পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আপনি তাঁহাদের কাব্য এবং গ্রন্থ পরীক্ষা করিবেন ও তাঁহাদের পুরস্কার দিবেন। পণ্ডিতদের সঙ্গে সঙ্গে কলাবতেরাও আসিবেন এবং নানা কলায় আপনাদের নিপুণতা দেখাইবেন, মহারাজাধিরাজ তাঁহাদের কারিগরি পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দিবেন।"

"সে তো আর একদিনে হয় না।"

"না মহারাজাধিরাজ, একদিনে হয় না; অন্তত এক বৎসর লাগিবে। আগামী বৎসরে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগাঁয়ে— এই চড়ার উপরে রাজসভা হইবে। সমস্ত গুণীজন আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মহারাজাধিরাজ সকলের কার্য দেখিয়া পুরস্কার দিবেন। 'গুণীজন-খানা' নামে এক নূতন খানা হইবে। তাহাতে নিঃস্ব গুণী-জনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরীক্ষায়, মহারাজ, হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আচারী, অনাচারী কোনো প্রভেদই থাকিবে না; কেবল গুণের বিচার হইবে। পূর্বে পূর্বে বড়ো বড়ো রাজারা এইরূপ রাজসভা করিতেন। এইরূপ সভা হইতেই কালিদাস পুরস্কার পাইয়া বড়ো হইয়াছিলেন; পাণিনি-পিঙ্গলও বড়ো হইয়াছিলেন। মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগেরও আপনার সভায় পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন, "তথাস্তু"। ভবদেব বলিলেন, "পিশাচ-খণ্ডী, তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণের মতো দান চাহিয়াছ।"

## ২

বৌদ্ধদের অধঃপাতে গুরুপুত্রের বড়োই মর্মান্তিক হইয়াছে। রূপা-রাজার মৃত্যুতে তিনি যেন আর-একবার পিতৃহীন হইয়াছেন। মেধা যখন সব সৈন্য লইয়া মহাবিহারে আশ্রয়

লয়, তখন গুরুপুত্র প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। বড়ো বড়ো গোলা-ভরা ধান ছিল, সব মেঘাকে দিয়া দিয়াছিলেন ; নিজে যুদ্ধেও নামিয়াছিলেন। দুই মাস তাঁহার আহার-নিদ্রা ছিল না। কিন্তু যখন দেখিলেন, আর রক্ষা হয় না, তখন মেঘাকে বলিলেন, "তুমি পশ্চিম দ্বার দিয়া পলাও, আমি পূর্ব দ্বারে গিয়া হরিবর্মার হাতে দুর্গ সমর্পণ করি।" দুর্গের চাবি পাইয়া হরিবর্মা কি করিয়াছিলেন, পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। গুরুপুত্র এখন মহারাজাধিরাজ হরিবর্মার বিশাল সাম্রাজ্যে মহাবিহারের অধিকারী। রাজা বিধর্মী। তিনি বিহার রক্ষা করেন বটে, কিন্তু বিহারের উপর তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা নাই। একটি মুখের কথায় ৩০খানি গ্রাম কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সে ৩০খানি গ্রামের জন্য মহারাজাধিরাজকে খাজনা কিছু দিতে হয় বটে, সে কিন্তু নামমাত্র। বিহারে আর তেমন গোলা-ভরা ধান থাকে না। ডাল-তরকারি, দুধ-মাখনের যে প্রচুর যোগাড় হইত, তাহাও আর হয় না। শিষ্যদের মধ্যে সকলেই শ্রীহীন হইয়াছে। বেনেরা একেবারেই তাঁহাদের হাত-ছাড়া। অন্যান্য জাতির ধনী মানী লোক সব ব্রাহ্মণদিগের দিকেই গড়াইয়া পড়িতেছে, বৌদ্ধদিগের দিকে আর বড়ো কেহ আসিতে চায় না। সুতরাং মহাবিহারের আয়ের পথ চারি দিক হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যয়ের ভাগ বরং বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুমাত্র কমে নাই। কেননা, বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো দাতা ছিলেন, মহা-বিহারও তার মধ্যে একজন, এখন মহাবিহারই একমাত্র দাতা, তাঁহাকে সকল দিকই দেখিতে হয়। যখন মহাবিহারের সম্মুখে মহাসভা হয়, তখন সেই প্রকাণ্ড পালের নীচে ব্রাহ্মণদের বাম দিকে ব্রাহ্মণদের গালিচা হইতে তিন হাত তফাতে, ঘাসের ওপিঠে, বৌদ্ধভিক্ষুদের বসিবার স্থান হয়। বলিতে হইবে না, সেখানে গুরুপুত্রের আসন সকলের আগে। তিনিও নিপুণ হইয়া সেদিনকার ব্যাপার সব দেখিতেছিলেন। যখন ভবদেব বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, রূপনারায়ণের রাজ্য লোপ হইয়া গেল," তখন গুরুপুত্রের মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিল। যখন মহাবিহারের গ্রামগুলি হিন্দুরা দখল করিয়া লইল, তখন রাগে, ক্ষোভে গুরুপুত্র অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাহার পর মায়া যখন মহাসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল,

গুরুপুত্র তাহাকে দেখিলেন। তাহার মুখে পূর্বে যে বিষাদের ছায়া দেখিয়াছিলেন, এখন আর তাহা নাই। তাহার মুখ এখন আরো উজ্জ্বল, হাস্যময়, আনন্দময়। গুরুপুত্র এতদিন তাহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি মায়ার জন্য আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের আরশিতে মায়ার যে ছবি ছিল, তিনি সে ছবিতে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। এখন হইতে বিহারী দত্তের মেয়ে মায়া আবার তাঁহার জপমালা হইল। কিন্তু হায়, সেকাল আর একাল! তখন তিনি রাজার গুরুপুত্র, এমন-কি, গুরু বলিলেও হয়। আর বিহারী একজন সামান্য প্রজা। বিহারীর মেয়ে তার চেয়েও সামান্য। এখন বিহারী রাজা, বিহারীর মেয়ে রাজকন্যা। আর তিনি— এক বিধর্মী, ঘৃণিত, পদদলিত সম্প্রদায়ের গুরু। এখন তাঁহার পক্ষে মায়ার কামনা বামন হইয়া চাঁদে হাত। কিন্তু যৌবনের উদ্দাম বাসনার গতি কে রোধ করিতে পারে? তিনি জানেন, তিনি ভিক্ষু এবং এ-সকল কামনা ভিক্ষুর উচিত নয়। কিন্তু ভিক্ষু হইলেও এখন তো সকলেই শক্তি লয়। শক্তি ভিন্ন তো সাধনাই হয় না। সুতরাং আমারও শক্তি চাই, উপযুক্ত শক্তি চাই। বলপূর্বক শক্তি লওয়া চাই। ইচ্ছাপূর্বক যে আসিবে, তাহাতে আমার শক্তির বিকাশ কই? পরকীয়া শক্তি ভিন্ন শক্তিই হয় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরিয়া না আনিলে, সে শক্তির দ্বারা সাধনা হইবে কিরূপে?

## ৩

মায়াদের গোলা গঙ্গার এক বাঁকের মাথায়। যে দরজা দিয়া গোলায় ঢুকিতে হয়, সেটা খুব উঁচা। লোকে হাতির পিঠে গোলার ভিতর ঢুকিবে, এইমতো করিয়া দরজা হইয়াছে। দরজার মাথার উপর দুই তলা ঘর আছে। প্রথম তলার সামনে গঙ্গার দিকে একটি ঝরকা আছে। ঝরকাটি দেওয়ালের বাহিরে। সেখানে বসিলে তিন দিক দেখা যায়। মায়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া এইখানে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। আবার সন্ধ্যার সময়েও এইখানে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড নদী, সমুদ্রের একটা হাতের মতো ডাঙায় আসিয়া ঢুকিয়াছে। মায়া গোলায় ফিরিয়া আসিয়া অবধি

দুবেলাই দেখিতেছে. এই প্রকাণ্ড সমুদ্রের খাড়ি নৌকায় ছাইয়া রাখিয়াছে। তাহার মনে হইত, ডাঙায় যেমন একটি প্রকাণ্ড নগর আছে, জলের মধ্যেও তেমনই এক প্রকাণ্ড নগর বসিয়াছে। সম্মুখে, বামে, ডাইনে যে দিকে দেখো, নৌকার সারি। নৌকায়ও অসংখ্য লোক, দিনরাত্রি কাজকর্ম হইতেছে। রাজাদের নৌকা দুখানি প্রায়ই মায়ার গোলার সামনে থাকিত।

একদিন সকালে মায়া দেখিল, মহারাজাধিরাজ হরিবর্মার নৌকা হইতে মহারাজা রণশূর আপন নৌকায় যাইতেছেন। দুই নৌকার মাঝখানে একটি সিঁড়ি পড়িয়াছে। মহারাজাধিরাজ কোলাকুলি করিয়া রণশূরকে তাঁহার নিজের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মাথায় কি একটা উজ্জ্বল জিনিস পরাইয়া দিলেন। রণশূর পঞ্চাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহারাজাধিরাজ তাঁহার হাত ধরিয়া কয়েকটি কথা কহিয়া আপন নৌকায় ফিরিলেন। সিঁড়ি খুলিয়া লওয়া হইল। রণশূরের নৌকা ছাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক নৌকা খুলিয়া দিল। প্রকাণ্ড জলনগরে যেন চারি ভাগের একভাগ সরিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রণশূরের বাহিনী দক্ষিণ দিকে গঙ্গার গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। আর কিছুই দেখা যায় না। মায়ার চক্ষু ফিরিল। সে শুনিল, নানারূপ বাদ্য একযোগে বাজিতেছে।

ক্রমে হরিবর্মার নৌকাগুলিও ছাড়িয়া দিল। কতক উত্তরমুখে যমুনায় প্রবেশ করিল, কতক দক্ষিণমুখে সমুদ্রে যাইতে লাগিল। হরিবর্মার নিজের নৌকা ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়ে বিহারী দত্তের নৌকা গিয়া সেখানে লাগিল। বিহারী মহারাজাধিরাজের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সেই মস্করী। দুই নৌকাই চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া বিহারী ও মস্করী আপন নৌকায় উঠিল ও দুই নৌকায় ছাড়া-ছাড়ি হইয়া গেল। বিহারী গোলার দিকে আসিতে লাগিল, আর মহারাজাধিরাজ দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

মায়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, “এই তো কিছু পূর্বে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নগর দেখিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। এখন দেখি— যে দিকেই দেখি, কেবল জল !— কেবল জল !

ওপারের গাছপালার রেখামাত্র দেখা যাইতেছে। উপরে কেবল আকাশ, নীচে কেবল জল।"

মায়া এই চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়ে পিছন দিকে শিশু-কণ্ঠে কে ডাকিল, "মা!" মায়ার ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল, সে পিছন ফিরিয়া দেখে, তাহার সেই হবু ছেলে দুহাত তুলিয়া তার কোলে উঠিবার জন্য ডাকিতেছে, "মা!" মায়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। দুই হাতে তাহাকে নাচাইতে লাগিল, আর বার বার চুমা খাইতে লাগিল। সে যত হাসে, মায়া তত চুমা খায়। তাহার হাসিরও বিরাম নাই, মায়ার চুমারও বিরাম নাই। এমন সময়ে নীচে হইতে জলদ-গম্ভীর স্বরে কে বলিয়া উঠিল, "মা কোথায় গো?" সে শব্দ কয়েক মাস ধরিয়া শুনিয়া শুনিয়া সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। মায়া ছেলেটিকে এক দাসীর কোলে দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

একটা নীচের তলায় একজনের সহিত দেখা হইল। মায়া তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিনি আমাদের মস্করী। তিনি বলিলেন, "মা, আজ বেলা বড়ো অধিক হইয়া গিয়াছে; বেশিক্ষণ থাকিতে পারিব না। তোমায় কেবল একটি কথা বলিয়া যাই। আসছে বছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় মহারাজাধিরাজ সাতগাঁয়ে বসিয়া শাস্ত্রে, কাব্যে ও শিল্পকলায় পরীক্ষা লইবেন। তোমাকে কাব্য পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি শীঘ্র সাতগাঁ ছাড়িয়া যাইব। সকল পণ্ডিত-সমাজেই আমাকে ঘুরিতে হইবে। আমি তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব।"

"সে কি বাবা! আমি কিসে পরীক্ষা দিব? আমি তো বাংলা বৈ আর-কোনো ভাষাই জানি না। শিল্পকলাতেও আমার তেমন অধিকার নাই।"

"তুই মা বাংলায় দুটা গান লিখে রাখিস। আর যা-হয় কিছু শিল্পকার্য করিয়া রাখিস। এত বড়ো মহাসভা হবে, তুই সেখানে থাকিবি না, আমার তা ভালো লাগিবে না।"

"আপনার আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইলাম। তবে কি আমার পোষ্য-পুত্র লওয়ার সময় আপনি থাকিবেন না? এই যে আমার পোষ্যপুত্র লওয়া— সে তো আপনারই প্রসাদাৎ। আপনি না থাকিলে এ-সব শিবহীন যজ্ঞের মতো হইবে।"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"আসিব রে আসিব। যেখানেই থাকি, সেদিন ঠিক হাজির হইব। তোর কোলজোড়া ছেলে হবে, আমি দেখিব না তো দেখিবে কে?"—বলিয়াই মস্করী মায়ার গোলা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিহারী বাহিরে মেয়ের গোলার কাজকর্ম দেখিতেছিলেন। মায়া আসিয়া সেখানে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন, "বেলা অনেক হইয়াছে মায়া, এখনো তোমার খাওয়াদাওয়া হয় নাই। যাও, তুমি এখন খাও গে।"

"বাবা, আজ তো বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। আপনি কেন আমার এইখানে খাওয়াদাওয়া করিয়া যান না।"

"না রে, না পাগলী, দৌহিত্রের মুখ না দেখিলে কি মেয়ের বাড়িতে খাইতে আছে? তুই যেদিন পোষ্যপুত্র নিবি, সেইদিন তোর বাড়িতে খাইয়া যাইব।"

বিহারী চলিয়া গেল। মায়াও বাড়ির ভিতর আসিলেন— আসিয়া দেখিলেন, সেই অল্পবয়সী ভিক্ষুণী তাঁহার [জন্য] অপেক্ষা করিতেছে।

## ৪

বেলা এক প্রহর হইয়াছে। গুরুপুত্র স্নানাহ্নিক সারিয়া পাঠে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতে একখানি তালপাতার পুথি, দেখিতে মাঝারি গোছের। তাহাতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে। সবগুলিই সহজধর্মের মূলগ্রন্থ। সব সংস্কৃতে লেখা, প্রায়ই অনুষ্টুপ্‌ছন্দে। গুরুপুত্র বাছিয়া বাছিয়া নিপুণ হইয়া একখানি গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন— তাহার নাম অদ্বয়সিদ্ধি। পুথিখানি এক রাজকন্যার লেখা। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি[১৫] সহজধর্মের অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে আর কাহারো লেখা পাওয়া যায় না। তিনি সর্বপ্রথম বজ্রবারাহীর পূজা প্রচার করেন। এ আমলের বৌদ্ধদের মধ্যে তাঁহার পসার-প্রতিপত্তি খুব বেশি হইয়াছিল। আমাদের গুরুপুত্র তাঁহারই কন্যার বই পড়িতেছেন— তিনি পড়িতেছেন :

"ন কষ্টকল্পনাং কুর্য্যাৎ নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্।
স্নানং শৌচং ন চৈবাত্র গ্রামধর্ম্মবিবর্জ্জনম্॥

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ন চাপি বন্দয়েদ্দেবান্ কাষ্ঠপাষাণমৃন্ময়ান্।
পূজামস্যৈব কায়স্য কুর্য্যাৎ নিত্যং সমাহিতঃ ॥"

"কিছুতেই কষ্ট করিবে না, উপবাস করিবে না, ধর্মকর্ম করিবার দরকার নাই, স্নান করিবে না, শৌচ করিবে না, 'গ্রাম্যধর্ম' ত্যাগ করিবে না, কাঠ-পাথর-মাটির দেবতাকে নমস্কার করিবে না। সর্বদা নিপুণ হইয়া দেহেরই পূজা করিবে।"

তিনি আবার পড়িতেছেন :

"সর্ব্বান্ সমরসীকৃত্য ভাবান্ নৈরাত্ম্যনিঃসৃতান্।
ভাবয়েৎ সততং মন্ত্রী দেহং প্রকৃতিনির্ম্মলম্ ॥"

"সকল ভাব পদার্থের মূলের [মূলেই] অভাব, অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ভাবপদার্থই এক। তাহাদের রস একই প্রকার। সুতরাং সাধকের উচিত, স্বভাবত নির্মল যে দেহ, তাহারই ধ্যান করা।"

গুরুপুত্র চিন্তা করিতেছেন : তাই যদি হল, দেহ যদি স্বভাবতই নির্মল, তবে আমরা যে ময়লার কথা ভাবি, পাপের কথা ভাবি, সেটা তো দেহের স্বভাবসিদ্ধ নয়। সেটা উটকা জিনিস, আসিয়া জুটে। তাকেই বলে 'বিকল্প'। সে তো আসল জিনিস নয়। আসল জিনিসে ময়লা ধরিতে পারে না। সেই যে নির্মল দেহ, তাহারই ধ্যান করো, তাহারই পূজা করো। সে পূজায় উপবাসাদি কিছুই করিবে না। যাহাতে কোনোরূপ কষ্ট হয়, এমন কোনো কার্যই করিবে না। কাঠ-মাটি-পাথর-দেবতা, এ উটকা জিনিস। আসল জিনিস দেহ। তাহারই পূজা করো। এ পূজা, এ ধ্যান কি প্রকার ? যাহাতেই কায়ের ও মনের তৃপ্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। তাহাতে বন্ধমুক্তির কথাই কি ?

"যেন যেন হি বধ্যন্তে জন্তবো রৌদ্রকর্ম্মণা।
সোপায়েন তু তেনৈব মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ ॥"

"যে সকল ভয়ংকর কার্যের দ্বারা লোকে বদ্ধ হয়, কৌশলের সহিত সেই সকল কার্য করিলে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।" সে কৌশল কি ?— গুরুর উপদেশ। গুরুর উপদেশ হইলে—

"রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ ॥"

"যে আসক্তিতে লোকে বদ্ধ হয়, সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয় —এই যে বিপরীত ভাবনা, এই যে রাগের বিপরীত শক্তি, ইহা বুদ্ধ-তীর্থিকেরাও জানিতেন না।"

শ্রীসমাজে বলেন :

"পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্ন চ পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্‌বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥"

"কামনার যে পাঁচটি বিষয় আছে, তাহার একটিকেও ছাড়িও না, তপস্যা করিয়া দেহকে পীড়ন করিবে না, সুখ ভোগ করিতে করিতেই যোগ ও তন্ত্রমতে 'বোধ' লাভ করা যায়।"

তবেই তো সুখ ছাড়া হবে না। সে সুখ আবার কোনো অনির্বচনীয় সুখ নয়। এই দেহেরই সুখ। 'পঞ্চকামোপভোগে'র সুখ। পঞ্চকামোপভোগের মধ্যে আবার স্ত্রীই সকলের প্রধান। কেননা লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :

"সৈব ভগবতী প্রজ্ঞা সম্বৃত্যা রূপমাশ্রিতা।"

"তিনিই আসল প্রজ্ঞা। অথবা আসল প্রজ্ঞাই তিনি। তাঁহারই এই যে রূপ দেখিতেছ, সেটা উটকা জিনিস— বিকল্প— মিথ্যা। ঐ রূপে ডুব দাও, আসল জিনিস দেখিতে পাইবে।" তাই আবার লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :

"সর্ব্ববর্ণসমুদ্ভূতা জুগুপ্স্যা নৈব যোষিতঃ।"

অর্থাৎ "কোনো বর্ণের নারীকেই ঘৃণা করিও না।"

ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা আরো বলিতেছেন :

"ন চাধ্যাসক্তিং কুর্বীত একস্মিন্নপি যোগবিৎ।
সমতাচিত্তযোগেন ভাবনীয়ো ভবার্ণবঃ॥"

"কিছুতেই আসক্ত থাকিও না। ভবার্ণবে যত কিছু পদার্থ আছে, সব একাকার দেখিও. সমান ভাবিও, সকল পদার্থেই এক রসের আস্বাদ পাইবে।"

ভগবতী আমাদের ধর্মটাকে কি সুখেরই করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বলিলেন, দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দই সর্বোৎকৃষ্ট। সেই আসল আনন্দ।

যোষিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই।

৫

গুরুপুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, এবং মনে মনে মায়ার রূপকল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি ভিক্ষু আসিয়া খবর দিল— মস্করী আসিতেছে। মস্করীর নাম শুনিয়াই গুরু-পুত্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন— মস্করী ?— আমার কাছে ? —কেন ? প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।" কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা বড়োই উৎকণ্ঠা হইল, বড়োই ভয় হইল।

মস্করী সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইবামাত্র, গুরুপুত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দুই জনে আসনে বসিলে মস্করী প্রথমেই আরম্ভ করিয়া দিলেন—

"আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়, আসছে বছরে ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন রাজসভা হইবে। আমার অনুরোধ, আপনাকেও তাহাতে পরীক্ষা দিতে হইবে। আপনি অল্প বয়সেই যেরূপ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছেন, আপনার গুরুর মুখে আপনার যেরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি, তাহাতে আপনি সাতগাঁতে থাকিয়াও যদি আমাদের সভাতে উপস্থিত না হন, আমাদের সভা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

"আমি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিব ?"

"কেন ? আপনি অনেক ভাষা জানেন। আপনার যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি আছে। আপনার গুরু বলেন, সহজধর্মে আপনি অতি প্রবীণ। আপনাদের নিজের ধর্মের উপরই যাহা হয় কিছু লিখিবেন। আমি সকলকেই সভায় যাইবার জন্য, পরীক্ষা দিবার জন্য, অনুরোধ করিতেছি। আপনি আমার একটু উপকার করুন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যে-সকল বড়ো বড়ো বাচক, বড়ো বড়ো পাঠক, বড়ো বড়ো পণ্ডিত আছেন, সেই সকল বিহারের ও সেই সকল পণ্ডিতের নাম দিলে, আমি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতে পারি।"

গুরুপুত্র, মস্করীর কোনো কথাতেই 'না' বলিতে পারিলেন না ; নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মস্করীর সব কথাতেই সায় দিলেন। মস্করী যাইবার

সময় বলিয়া গেলেন, "আমি যে শুধু পুরুষদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাহা নয়, অনেক স্ত্রীলোককেও নিমন্ত্রণ করিয়াছি। রাজকুমারী মায়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বাংলায় কবিতা লিখিয়া রাজসভায় উপস্থিত থাকিবেন। আচ্ছা, আপনাদের জ্ঞান-ডাকিনী নিগু এখন কোথায় ? আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চাই। আপনাদের মধ্যে আর কে কে প্রতিভাশালিনী রমণী আছেন, জানিতে পারিলে, তাঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করি।"

গুরুপুত্র বলিলেন, "আপনি যখন এ অধমের সাহায্য লইতে এত দূর আসিয়াছেন, তখন আমি আমাদের দল হইতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের লইয়া যাইব ও যাহাতে তাঁহারাও পরীক্ষা দেন, তাহা করিব।"

"আপনার জয় হউক"— বলিয়া মস্করী প্রস্থান করিলেন।

গুরুপুত্র পুঁথিখানি বাঁধিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

একদিন পিশাচখণ্ডী, জন-দুই সাতশতী ব্রাহ্মণ ও সেই বিধুভূষণ ফর্‌ফর্‌কে সঙ্গে লইয়া মায়ার গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ঠাকুরঘরে গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহারা আসিবামাত্র মায়া তাঁহাদের পদধূলি লইল ও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে সেই গালিচায় বসাইল, নিজে নীচে মেজের উপর বসিল।

মায়া বলিল, "আপনারা আসিয়াছেন; আমার দত্তক গ্রহণের একটি দিন করিয়া দিউন। বিশেষ, যখন বাবাঠাকুর আর বেশি দিন এখানে থাকিবেন না, তখন দিনটা কবে স্থির হইল, তাহা তাঁহার জানিয়া যাওয়া উচিত।"

মস্করী, ফর্‌ফর্‌ মহাশয়কে বলিল, "আপনি দিনটা স্থির করুন।"

ফর্‌ফর্‌ মহাশয় বলিলেন, "দিন আর কি স্থির করিব? সংক্রান্তিতে হতে পারে, পূর্ণিমায় হতে পারে, আর যুগাদ্যা তিথিতে হতে পারে। সংক্রান্তির মধ্যে আবার মহাবিষুবসংক্রান্তি প্রশস্ত। যুগাদ্যার মধ্যে সত্যযুগের আদি তিথি অক্ষয়-তৃতীয়াই প্রশস্ত। আর পূর্ণিমার মধ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমাই প্রশস্ত। কেমন হে ভায়া— "

বলিয়া তিনি হরেকৃষ্ণ মুল্লুককে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মুল্লুক মহাশয় দুইবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন, "কি জানেন দাদা মহাশয়, ক্রিয়াকর্মটা করিতে গেলে আষাঢ় শ্রাবণ মোটেই ভালো নয়; বসন্তকালটা বেশ। তা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বলি, মহাবিষুবসংক্রান্তিতেই দিন করুন। না-হয়, আপনি যা বললেন, অক্ষয়-তৃতীয়াতেই হউক। তা তুমি কোন্ দিনটা ভালো বল্লো ধর্‌ধর্‌ মহাশয়?"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

তখন দ্বারিক ধর্‌ধর্‌ মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমরা এই দুইটা দিনই স্থির করিয়া দিয়াই যাই। তারপর রাজা বিহারী এই দুইটা দিনের মধ্যে একটা দিন ঠিক করুন। তাঁদের উপরও তো একটা ভার থাকা উচিত। তাঁহাদেরও তো রাজকার্যের সুযোগ অসুযোগ দেখা চাই। বিশেষ, তাঁহাকেও তো দিনকতক পরে পোষ্যপুত্র লইতে হইবে।"

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে এক লম্বা খাটুলি ঠাকুরবাড়ি ঢুকিল। বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গেই চোপদার, নিশানদার প্রভৃতি অনেক লোক ঢুকিল। খাটুলি হইতে নামিয়া রাজা বিহারী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিল। মায়া দাঁড়াইয়া উঠিল, পরে পিতার চরণধূলি গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণেরা বসিয়াই আশীর্বাদ করিল।

মস্করী বলিলেন, "আমরা তো মায়ার পোষ্যপুত্র গ্রহণের দুটি দিন করিতেছি; একটি মহাবিষুবসংক্রান্তি, অপরটি অক্ষয়-তৃতীয়া। এই দুইটি দিনের মধ্যে কোন্‌টি আপনার পছন্দ বলুন— কোন্‌টিতেই বা আপনার সুবিধা বলুন। আর আপনারও তো পোষ্যপুত্র লইতেই হইবে, তা এইসঙ্গেই যদি লন তো ইহার একটি দিনে আপনি, আর-একটি দিনে মায়া পোষ্যপুত্র লউন। এবারে ঐ দুই দিনে দশ-পনেরো দিন তফাৎ বৈ নয়।"

কিছু চিন্তা করিয়া রাজা বিহারী বলিলেন, "সংকল্পিত অর্থে বিলম্ব ভালো নয়: বিশেষ, যখন শুভ সংকল্প, আর ইহারই উপর দুইটি বেনে-বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আপনারা যেমন অনুমতি করিতেছেন, আমরা ঐ দুই দিনেই দত্তক গ্রহণ করি, আমি মহাবিষুবসংক্রান্তির দিনে, আর মায়া অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে।"

ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "সাধু, সাধু।"

তখন রাজা বিহারী বলিলেন, "একটা গোলের কথা আছে। এ ক্ষেত্রে রাজার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন এরূপ কার্য হইতেই পারে না। তা তিনি তো সবে সেদিন এখান হইতে গিয়াছেন, ইহারই মধ্যে আবার তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে আমি তো পারিব না।"

মস্করী বলিলেন, "ইহার জন্য আপনাকে আর ভাবিতে হইবে না। আমি আপনার জ্ঞাতির একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা— একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে না থাকিলে, আপনাদের জাতির নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, যদি স্বয়ং না আসিতে পারেন, কোনো জ্ঞাতির ছেলেকে পাঠাইবেন ; অন্তত ভবদেব ভট্টের উপর ভার দিবেন। আপনি বেশ কথা বলিয়াছেন, আপনি এখানকার রাজা, সকলে আপনার অনুমতি লইয়া কার্য করিতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের কার্যে তো তাহা হইতে পারে না, মায়ার কার্যেও তাহা হইতে পারে না। সে যা হউক, আমি তো এখানে থাকিব না, আমাকে রাজসভার নিমন্ত্রণের জন্য যাইতে হইবে। আপনার জন্য, ভবদেব ভট্টের জন্য, আর মহারাজ হরিবর্মদেবের জন্য আমাকে ভাটের কার্য করিতে হইবে। আমি তাহাতে আমার লাঘব হয় বলিয়া মনে করি না, বরং গৌরব বলিয়াই মনে করি। আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য আমি এই তিন জন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছি। ইঁহারা পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক ও কর্মঠ। ইঁহাদের শূদ্র যজমান আছে। ইঁহাদেরই উপর আপনাদের কার্যের সমস্ত ভার দিয়া গেলাম। ইঁহারা যেমন বলেন, সেইমতো আয়োজন করুন। যদি অন্য ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় তো ইঁহারাই আনিয়া দিবেন। এই যে বিধুভূষণ ফর্‌ফর্‌ মহাশয়কে দেখিতেছেন, ইঁহার বয়স ৯০ বৎসরেরও উপর। ইঁহার যেমন ব্রহ্মবর্চস, তেমনটি প্রায় দেখা যায় না। ইনিই জীবন ধনীর প্রতিমায় জীবনদান করিয়া তাঁহাকে কথা কহাইয়া মায়ার পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়াইয়াছিলেন। নহিলে শাস্ত্রানুসারে মায়া তো পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীলোক পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না।"

এই কথা শুনিয়া রাজা বিহারী দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে লইলেন এবং ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমার জামাইয়ের বংশরক্ষা করিয়া দিলেন। আপনাকে আর কি দিব ? ফর্‌ফর্‌ গ্রামের পূর্ব দিকে হরিপুর গ্রামখানি আপনাকে দান করিলাম। মহারাজাধিরাজের স্বহস্তাঙ্কিত দানপত্র যথাসময়ে আপনাকে আনাইয়া দিব।"

"মহারাজের জয় হউক"— বলিয়া ব্রাহ্মণ দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

২

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মায়ার গোলায় প্রকাণ্ড উঠানের উপর প্রকাণ্ড পাল টাঙানো হইয়াছে। পালের নীচে সভার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সভারোহণের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে ৫৬ গ্রামী ও সাতসইকা পরগনার চব্বিশগ্রামী সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ; এতদ্ভিন্ন, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারা উঠানের উত্তর দিকে বসিয়াছেন। বেনে চার আশ্রমেরই আছেন, তাহার উপর শঙ্খবণিক্, কাংসবণিক্ প্রভৃতিও আছেন। কায়স্থকুলও আসিয়াছেন। বৌদ্ধদের মধ্যেও মাথাল মাথাল লোক সব আসিয়াছেন। গুরুপুত্রও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অনেক ভিক্ষুণীও আসিয়াছেন। সমস্ত উঠানটা যেন জম্‌জম্ গম্‌গম্ করিতেছে। সকলের মধ্যস্থলে মহারাজাধিরাজের স্বর্ণসিংহাসন, দুই পাশে দুই রৌপ্যসিংহাসন। রাজা বিহারী নিজে থাকিয়াই সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন ও মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিতেছেন। উঠানের উত্তরে চণ্ডীমণ্ডপে হোমের জায়গা হইয়াছে।

উঠানের চারি দিকে চারি দেউড়িতেই বাজনার রোল উঠিয়াছে। কোনো দেউড়িতে ঢাক, ঢোল ও কাঁসি ; কোনো দেউড়িতে দামামা, দগড়া ও বাঁশি : আর-এক দেউড়িতে দুন্দুভি, করতাল ও ঝাঁঝ ; আর-এক দেউড়িতে— মৃদঙ্গ, বীণা ও করতাল। যখন সব দেউড়িতে একত্র বাজিতেছে, তখন শব্দের রোলে আকাশ ফাটিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপে পোষ্যপুত্র গ্রহণের জায়গা হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে ঘটস্থাপন করিয়াছে। একটা কলসি, তাহাতে জল পোরা ; তাহার উপর আম্রপল্লব, তাহার উপর একটি ডাব ও কলসির সম্মুখ দিকে তিনটি সিন্দূরের রেখা। চণ্ডীমণ্ডপের ডান দিকে হোমের উদ্যোগ হইতেছে ও বাঁ দিকে আভ্যুদয়িক হইতেছে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা চণ্ডী-মণ্ডপের কর্তা। মুল্লুক মহাশয়, ধর্‌ধর্ মহাশয় ও ফর্‌ফর্ মহাশয় খুব ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ; চাকরদের খুব ধমক দিতেছেন ; মায়া সেখানে আছেন, তাঁহার উপরও খুব তম্বি হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বারেন্দ্র, মিথিলা ও উৎকল প্রভৃতি নানা দেশের কর্মকাণ্ডী পণ্ডিতেরা বসিয়া আছেন ও কি পদ্ধতিতে পোষ্যপুত্র লওয়া হয়, তাহাই দেখিতেছেন।

একজন দাক্ষিণ রাঢ়ী পাণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রী-কর্তৃক ক্রিয়ায় আভ্যুদয়িকের নিয়ম নাই ; এক্ষণে আভ্যুদয়িক কেন হইতেছে ?"

তখন উভয় পক্ষের পণ্ডিতের মধ্যে খুব বিচার বাধিয়া উঠিল। একজন বলিয়া উঠিল, "স্ত্রীর প্রেতশ্রাদ্ধেই অধিকার আছে ; আভ্যুদয়িকে তাহার আবার অধিকার কি ?"

আর-একজন বলিলেন, "যদিই করিতে হয়, প্রতিনিধির দ্বারা করিতে হইবে।"

একজন বলিলেন, "পুরোহিত প্রতিনিধি হইবেন।"

আর-একজন বলিয়া উঠিলেন, "সে কি ? বেনের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ ? একজন ধনীবংশেরই প্রতিনিধি হইবেন।"

ক্রমে বিবাদ এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, মস্করী মহাশয় সমস্ত ব্যাপারটা ভবদেব ভট্টের নিকট বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, এখনো বঙ্গভূমির ব্রাহ্মণের জন্য পদ্ধতি লেখা হয় নাই। শূদ্র-পদ্ধতির তো কথাই নাই। সে যে কবে লেখা হইবে, তাহারো ঠিক নাই। আমি যখন ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, পদ্ধতিও লিখিয়া দিব। কিন্তু রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায় পারিয়া উঠি নাই ; সুতরাং সাতশতীরা আবহমান যাহা করিতেছে, তাহাই করুক ; তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না।"

৩ আভ্যুদয়িক আরম্ভ হইয়া গেল। সাতশতীদের আভ্যুদয়িক নূতন রকমের। তাহাতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় সর্বপ্রথমে যে ভোজ্য উৎসর্গ হয়, তাহা হইল না ও তাহার দক্ষিণান্তও হইল না ; তাহার পর যে চারিটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়, গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বাস্তুপুরুষ ও ভূস্বামীর পিতৃগণের নামে, সে চারিটি ভোজ্য উৎসর্গ হইল না। মায়া দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন, আচমন করিলেন, পুরোহিত তাঁহাকে দুইটি হস্ত-কুশ দিলেন। বলিলেন, "অনামিকা অঙ্গুলিতে পরো।"

সমস্ত কর্মকাণ্ডীরা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল, "একে স্ত্রীলোক, তাহাতে শূদ্র, কুশে উহার অধিকার কি ! দূর্বা দিয়া উহার হস্ত-কুশ নির্মাণ করিতে হইবে।"

অনেক গোলমালের পর কুশই রহিয়া গেল। সংকল্পের পর সাতখানি পাত্র সাজানো হইল, যত কিছু উৎকৃষ্ট খাবার পাত্রে রাখা হইল। সাত জন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সকলেই পণ্ডিত, ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান্— সাত পাত্রে বসিয়া গেলেন। দেবপক্ষের দুই জন ব্রাহ্মণ পূর্বাস্য হইয়া বসিলেন ; পিতৃপক্ষের তিন জন উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন ; আর মাতামহপক্ষের তিন জন [ সেই ] সারেই বসিলেন। আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভিতর গোল বাধিয়া গেল। অনেকে বলিলেন, "কলিতে পঙ্‌ক্তি-ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণ মিলে না। সেজন্য দর্ভময় ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধ করা প্রথা হইয়া গিয়াছে। সারা বাংলা, মিথিলা, সরযূপার, নেপাল, উড়িষ্যা সব জায়গায়ই দর্ভময় ব্রাহ্মণ দিয়া শ্রাদ্ধের ব্যাপার চলিয়া গিয়াছে, এখানে এ আবার কি ?"

তখন বিধুভূষণ ফর্‌ফর্‌ বলিয়া উঠিলেন, "প্রতি হাতে এরূপ আপত্তি করিলে ক্রিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে যে ? আমার নব্বই বৎসর বয়স হইতে চলিল, বরাবর শূদ্রদের যেভাবে কার্য করাইয়া আসিয়াছি, এখনো সেইভাবেই করাইব। তাহাতে ত্রুটি হয়— ধরো, ঘাড় পাতিয়া লইব। অন্য দেশে কি আছে না আছে, তাহা দেখিবার দরকার নাই। আমরা সাক্ষাৎ নুগড়াচার্যের শিষ্য, তিনিই বেদের প্রথম টীকা লেখেন। তিনিই আমাদের দেশে আগাগোড়া বেদ মুখস্থ করা বন্ধ করিয়া দিয়া যান। যে জাতির যেরূপে ক্রিয়া করিতে হইবে, তিনিই আমাদের শিখাইয়া যান।" নুগড়াচার্যের নামে ও ফর্‌ফরের রাগে অন্যান্য কর্মকাণ্ডীরা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ক্রিয়া চলিতে লাগিল।

এই যে সাত জন ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন, ইঁহাদের নাম পঙ্‌ক্তি। পঙ্‌ক্তি একজনে হয়, তিন জনে হয়, পাঁচ জনে হয় ও সাত জনে হয়। সাত জনের অধিক ব্রাহ্মণ দরকার হয় না। শ্রাদ্ধেই পঙ্‌ক্তির দরকার হয় : অন্য কিছুতে দরকার হয় না ; বাছিয়া বাছিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া পঙ্‌ক্তিতে বসাইতে হয়। কানা, খোঁড়া, কুরূপ, কুৎসিত, ধবলওয়ালা, কুষ্ঠওয়ালা, কুনখী, কুদন্তী পঙ্‌ক্তিতে লইতে নাই। পঙ্‌ক্তির ব্রাহ্মণ বড়ো বাছিয়া লইতে হয় বলিয়া আর্যাবর্তে দর্ভময় ব্রাহ্মণ চলিতেছে। কিন্তু দক্ষিণে এখনো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, সেজন্য তাঁহারা পঙ্‌ক্তি হন ও ব্রাহ্মণ-পঙ্‌ক্তিতে বসেন। মায়া পুষ্প-চন্দন-বস্ত্র-অলংকার

দিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন, তাঁহাদের সৌমনস্যবিধানের জন্য প্রচুর ধূপ-ধুনা পোড়াইলেন এবং গন্ধদ্রব্য তাঁহাদের উপর বৃষ্টি করিলেন। এইরূপ পূজায় যখন তাঁহাদের মন অমল প্রফুল্ল হইল, তখন মায়া তাঁহাদের হস্তে এক-একটি ফল তুলিয়া দিলেন। তাঁহারা সেই ফল খাইলেন ও পরে পাত্র হইতে অনেক ফল-মূল ও মিষ্টান্ন লইয়া ভোজন করিলেন। ভোজনে তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা পাত্র ছাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ভোজনের স্থান পরিষ্কার করা হইল। মায়া সেখানে বসিয়া পিণ্ডদান করিলেন ও দক্ষিণান্ত করিলেন। পঙ্‌ক্তির ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লইলেন ও বলিলেন, "আমরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমাদের জাত-ভাই আমাদের সঙ্গে খাইবে না, সেজন্য আমাদের কিছু পয়সা দাও। সেজন্য তাঁহাদিগকে কিছু পয়সা দেওয়া হইল— তাঁহারাও তাহা যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

## ৪

ওদিকে যে-সকল ব্রাহ্মণেরা হোমের স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মায়ার একহাত-প্রমাণ চৌকা জমি মাপিয়া লইয়া তাহার উপর কয়েক সরা বালি ছড়াইয়া দিলেন, সেই বালির উপর এদিকে দেড় আঙুল ওদিকে দেড় আঙুল বাদ দিয়া একটি ২১ আঙুল রেখা টানা হইল। ব্রাহ্মণেরা যেদিকে বসিয়াছিলেন, সেই দিকেই রেখা টানা হইল। সেই রেখার ডাইন ধার হইতে পূর্ব মুখে একটি রেখা সাত আঙুল পর্যন্ত টানা হইল। তাহার পর মূল-রেখার সাত আঙুল বাদ দিয়া আর-একটি রেখা টানা হইল। যে অস্ত্র দ্বারা রেখা টানা হইল, তাহার নাম স্ফ্য। স্ফ্যখানি কাঠের তয়েরি— ছোরার মতো। বাঁট আছে, আগাটি সরু, সামনের দিক ধার, পিছনের দিক মোটা। আগাটি ঠিক মাঝে না হইয়া একটু পিছনের দিক আছে। পূর্বাস্য রেখাগুলি টানিতে যে বালিগুলি উঠিল, বৃদ্ধা ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা সেগুলিকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর বহ্নিস্থাপন। তিনটি রেখা টানায় দুইটি ঘর হইয়াছে ও বাম দিকের ঘরে কাঁসার পাত্রে বহ্নি আনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল।

বহ্নি কোথা হইতে আনিবে ? এক— যারা অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে ও সেই অগ্নি বরাবর রাখে, তাহাদের বাড়ি হইতে অগ্নি আনা যাইতে পারে, অথবা মন্থন করিয়া অগ্নি আনা যাইতে পারে। মায়া স্থির করিল, মন্থন করিয়া অগ্নি বাহির করিতে হইবে।

একখানি শুকনো অশ্বত্থকাঠ আনাইয়া তাহার মাঝে একটি ছেঁদা করাইল। সেই ছেঁদার মধ্য দিয়া একটি শাঁইবাবলার মোটা গোল করিয়া কোঁদা কাঠ অশ্বত্থের সেই ছেঁদায় বসাইয়া দিল। (বাংলায় শমীবৃক্ষ নাই, সেজন্য শাঁইবাবলার গাছে শমীবৃক্ষের কার্য করে)। ব্রাহ্মণেরা সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সেই শাঁইবাবলার কাঠ ঘুরাইতে লাগিলেন। অগ্নি সমিন্ধানে ব্যবহার হয় বলিয়া এই মন্ত্রগুলির নাম হইয়াছে সামিধেনী। ক্রমে যখন ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেশ একটু সহল হইয়া আসিল, তখন দুই পাশে দুই দল ব্রাহ্মণ বসিয়া দড়ি দিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে সামিধেনী মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। কাঠগুলি ক্রমে খুব গরম হইয়া উঠিল। তাহার পর ধোঁয়া বাহির হইল, তাহার পর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির একখানি আঙরা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বাকিটা কাঁসার পাত্রে করিয়া বালির উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল।' তখন পুরোহিত আগুনের কাছে বসিয়া, মহাব্যাহৃতি হোম করিলেন ; অর্থাৎ গাওয়া ঘিয়ে চামচের আকার কাঠের স্রুক্ ডুবাইয়া অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিলেন— ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা।

৫

পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ লইয়া, বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া, এইবার পোষ্যপুত্র লওয়া হইবে। হোমের স্থান ও আভ্যুদয়িকের স্থানের মাঝখানে খুব জাঁকালো বিছানা করা হইয়াছে— মখমলের বিছানা, জরির কাজ, উপরে চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার ঝালরে মুক্তা ঝুলিতেছে। মধ্যে বসিয়া আছে সাধন ধনী— যিনি পুত্র দিবেন, তাঁহার স্ত্রী ও রাজা বিহারী দত্ত। বহ্নিস্থাপন করিয়া এবার ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "এইবার পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি লও"। তখন বিহারী ও মস্করী মায়াকে সঙ্গে করিয়া প্রথমত রাজসিংহাসনের নিকটে উপস্থিত

হইলেন। মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা আসেন নাই, তাঁহার ভায়ের পৌত্র শ্যামল বর্মা আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিলে, তিনি যে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণসিংহাসনে মহারাজাধিরাজের যে তরবারি ছিল, তাহা মায়ার অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বড়ো ঠাকুরদাদার নাম উচ্চারণ করিয়া অনুমতি দিলেন। মায়া উঁহাকে কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, একটি দশমণি সিধা তাঁহার বজরায় পৌঁছে। তাহার পর ভবদেব ; তিনিও অনুমতি দিয়া কয়েকখানা স্বর্ণ-মুদ্রা পাইলেন এবং একটি বড়ো সিধা পাইলেন। তারপর প্রধান সেনাপতি— তিনিও একটি সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা পাইলেন।

শ্যামল বর্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সমারোহ-কার্যের অধ্যক্ষ কে ?"

অধ্যক্ষ তো ভবদেব শর্মা নিজে। বিহারীর বাক্যস্ফূর্তি হইবার পূর্বেই ভবদেব বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্যে ভবতারণ পিশাচখণ্ডী অধ্যক্ষ।"

তখন শ্যামল বর্মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাথায় এক শালের ফেটা বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর মস্করী ও মায়া একদিকে অনুমতি লইতে গেলেন, আর-একদিকে গেলেন রাজা বিহারী দত্ত নিজে। আর দুই দিকে অনুমতি লইতে গেলেন দত্তবাড়ির প্রাচীনেরা ও ধনীবাড়ির প্রাচীনেরা। মস্করী মায়াকে লইয়া রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল-ব্রাহ্মণদের অনুমতি লইয়া, যেখানে বৌদ্ধেরা বসিয়াছিলেন, সেইখানে গেলেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রধান পুরুষ গুরুপুত্র। মায়া তাঁহার অনুমতি লইতে আসিতেছেন, সঙ্গে মস্করী— দেখিয়াই গুরুপুত্র থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া গেল। মায়ার কিন্তু গলা একবারও কাঁপিল না।

সে বলিল, "আচার্য, মহাপণ্ডিত, মহাস্থবির, ভদন্ত, আমি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব, আপনারা প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন।"

গুরুপুত্র মনে মনে বলিলেন, "কি শিকারই পলাইল !" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমতি আছে। সাতগাঁয়ে একটি প্রধান ধনীবংশ রক্ষা হইয়া যাইবে, ইহাতে কে আপত্তি করিবে ?"

মায়া তাঁহার সম্মানের [ জন্য ] সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া গেলেন এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মঠাধিকারীদেরও সেইরূপ সম্মান করিয়া গেলেন।

যাঁহারা অনুমতি লইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া সাধন ধনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

"আপনার এই নূতন ( পঞ্চম ) ছেলেটির আজও চূড়াকরণ হয় নাই। আপনি এইটিকে আমাকে দিন। আমি ইহাকে পোষ্যপুত্র লইব ; ইহার দ্বারা আমার স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে।"

সাধন ধনী ছেলেটিকে কোলে করিয়া ছিল, সে ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিবার সময় বলিল—

"আমি এই ছেলেটিকে তোমায় দিলাম, ইহার দ্বারা তোমার স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে। তুমি ইহাকে মায়ের মতো প্রতিপালন করিবে।"

সাধন ধনী মনে করিয়াছিল, সে বীরের মতো পুত্রটিকে দান করিবে, কিন্তু তাহা পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর বদলাইয়া গেল ; সে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার মনকে স্থির করিল ও ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিল। চারি দিকে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সভাস্থ সকলে সাধু সাধু বলিতে লাগিল ; চারি দিকে চারি দেউড়িতে বাজনা বাজিয়া উঠিল ; ঘোর রোলে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গানে ও বাজনায় আনন্দের ফোয়ারা উঠিতে লাগিল। এদিকে দশ জন চাকর ছেলেটিকে সাজাইতে লাগিল— নানারূপ রেশমের কাপড়ে ও হীরা-জহরতে গরিবের ছেলে এক দণ্ডের মধ্যে বড়ো-মানুষের ছেলে হইয়া উঠিল। মায়া তাহাকে কোলে করিয়া হোমের স্থানে উপস্থিত হইলেন ; পুরোহিতেরা তাহাকে হোমের ঘি খাওয়াইয়া দিলেন। মায়াও যে গোত্রের, ছেলেটিও সেই গোত্রের ; অতএব গোত্রান্তর করিতে আর-কোনো বিশেষ ক্রিয়ার আবশ্যক হইল না।

মায়া ছেলে কোলে করিয়া বিছানায় আসিয়া বসিলে, সকলেই ছেলেকে আশীর্বাদ করিতে আসিল। প্রথমে রাজা আসিলেন, তিনি একছড়া মুক্তার মালা দিলেন। তাহার পর ভবদেব আসিলেন, তিনি একখানি কেয়ূর দিলেন। ব্রাহ্মণেরা কেহ বা শুদ্ধ ধান্য-দূর্বা দিয়া, কেহ

বা কিছু সোনা-রূপা দিয়া আশীর্বাদ করিল। ধনী বেনে ও অন্যান্য জাতিরা বিস্তর উপহার দিল। ধান্য-দূর্বাগুলিতে ছেলেটি চাপা পড়ার মতো হইলে সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু হীরা-জহরত এত জমিল যে, ছেলের চেয়ে উঁচু হইয়া উঠিল। এমন সময়ে যিনি হোম করিতেছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার হোম হইয়াছে, তোমরা ফোঁটা লও।" সকলের আগে ফোঁটা লইলেন ছেলে ; হোমের ঘিয়ে হোমের কয়লা ঘষিয়া প্রথম কপালে, পরে কণ্ঠায়, পরে দুই কাঁধে, পরে বুকে ফোঁটা লওয়া হইল। তাহার পর লইলেন মা, তারপর লইলেন বিহারী দত্ত। তাহার পর যে আসিল, পুরোহিতেরা তাহাকেই ফোঁটা দিতে লাগিল।

ইহার পর শান্তি-জলের ব্যবস্থা। কিন্তু অনেকেই বলিয়া উঠিল, "আমরা এখনো ছেলে আশীর্বাদ করিয়া উঠিতে পারি নাই।" সুতরাং শান্তি-জল স্থগিত রহিল। যে সকল লোক আশীর্বাদ করিতে আসিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধরাই বেশি— প্রত্যেক মঠধারী আপন আপন মঠের পুষ্প-চন্দন আনিয়াছিলেন ও ছেলেকে কিছু-না-কিছু মহামূল্য উপহার দিলেন। গুরুপুত্র হেরুকের প্রসাদী একছড়া মালা দিলেন আর একটি হীরার মাছ দিলেন। যে আটটি মাঙ্গল্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে মাছই সকলের আগে। গুরুপুত্রের মাছটির দুই চোখে দুইটি হীরা, নানা রকম পাথরে এমন ভাবে গড়া যে, মাছটি যেন নড়িতেছে। তিনি মাছটি, একটি সোনার হারে গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন : ছেলের গলায় পরাইতে গিয়া তাঁহার দুইটি আঙুল মায়ার গায়ে লাগিল ; সহসা যেন গুরুপুত্রের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। গুরুপুত্র যেন হঠাৎ হতচেতন হইয়া গেলেন ; কিন্তু অল্পেই আত্মসংবরণ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। বৌদ্ধস্পর্শে মায়া যদিও একটু বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার মনে হইল যে, তিনি একজন বৌদ্ধভিক্ষু, মহাবিহারের অধিকারী, লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানে, তখন তাহার আর সে বিরক্তি রহিল না। পূর্বকথা স্মরণ করিবার তাহার অবসর ছিল না— থাকিলেও সে কথাটা সে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরিত না। সকলে আশীর্বাদ করিলে শান্তি-জল। সভাসুদ্ধ লোক পা ঢাকিয়া বসিল। বিধুভূষণ ফরফর মহাশয় নারিকেলটি সরাইয়া দিয়া আম্রপল্লব

জলে ডুবাইয়া সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন ও মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার হাত এমন দুরন্ত ছিল যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভার সমস্ত লোকের গায়ে শান্তি-জল ছড়াইয়া দিলেন এবং সকলেই "শান্তি শান্তি শান্তি— হরি হরি" বলিয়া উঠিল।

৬

তাহার পর ভোজনের পালা। গোলার দোতলার বারান্দায় ব্রাহ্মণদের পাত হইয়াছে। প্রায় ৪/৫ শত ব্রাহ্মণের জায়গা হইয়াছে। সাতশতীরা ফলার করিবেন, অর্থাৎ লুচি, ছক্কা, মিষ্টান্ন খাইবেন। রাঢ়ীশ্রেণীরা কেহ কেহ খই ও দইয়ের ফলার করিবেন, কেহ বা সুদ্ধ ফল ও সন্দেশ খাইবেন। অনেকেই শূদ্রের বাড়ি জল পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন না। পাত প্রায় প্রস্তুত, এমন সময় গোল উঠিল, ধনীদের গোলা গঙ্গার তিন শত হস্তের মধ্যে— উহা গঙ্গাতীর। এখানে খাওয়াও যাইতে পারে না, দান লওয়াও যাইতে পারে না। ভাদ্রমাসের চতুর্দশীর দিন যতদূর জল উঠে, ততদূর গঙ্গার গর্ভ ; তাহার পর তিন শত হাত গঙ্গার তীর। তাহার পর গঙ্গার ক্ষেত্র। গর্ভ ও তীরে কাহারো ভোজন করিতে নাই, দানও লইতে নাই। তবে যে মায়া ব্রাহ্মণগণকে সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা দিলেন, সেটা অনুমতি দেওয়ার সম্মান। "অদৃষ্টার্থ ত্যক্ত দ্রব্য নহে," সুতরাং দান নহে। গোলায় তো কিছুতেই খাওয়া হইতে পারে না। গোল উঠিলেই রাজা বিহারী গোলা হইতে একটু পশ্চিমে পালধি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নাটচালা ছিল, সেইখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার লোকবলের অভাব ছিল না, মুহূর্ত-মধ্যে ৪/৫ শত ব্রাহ্মণের স্থান প্রস্তুত হইল, পরিবেশনও হইয়া গেল। অনেক ব্রাহ্মণ— যাঁহারা শূদ্রান্নং শূদ্রবেশ্মনি খাইতে রাজি ছিলেন না, ব্রাহ্মণের বাড়িতে উদ্যোগ হওয়ায় তাঁহারাও বসিয়া গেলেন।

গোলার বারান্দায় অন্যান্য জাতি বসিল। ইহারা, বিহারীর কাজ যে সবই ভালো হইবে, তাহা বেশ জানিত, তাই একটি কথাও কহিল না। তিনি যেমন যেমন বলিলেন, ঠিক তেমনি তেমনি করিতে লাগিল। বৌদ্ধরা একটা প্রবল সম্প্রদায়। তাহাতে অনেক জাতি,

অনেক ব্যবসায়ী, অনেক গৃহস্থ, অনেক অর্ধ-গৃহস্থ, অনেক পুরা গৃহস্থ। বৌদ্ধদের বিকাল-ভোজন নিষেধ। বিকাল শব্দের অর্থ দ্বিকাল। তাহারা দিনে দুবার খাইবে না। সকালে ১২টার মধ্যেই খাইবে। না খাইলে সমস্ত দিন কেবল ফলরস বা দুধ খাইয়া থাকিবে। কোনো কঠিন জিনিস খাইতে পাইবে না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আর বিকাল-ভোজন নিষেধ মানে না— দুই বেলা খায়— অসময়েও খায়। দু-চার জন বিকাল-ভোজন করে না। তাহাদের মধ্যে প্রায় মঠের অধ্যক্ষেরা। আমাদের গুরুপুত্র বিকাল-ভোজন করেন না। কিন্তু মায়া তাঁহারই উপর সমস্ত বৌদ্ধদের খাওয়াইবার ভার দিয়া দিলেন। গুরুপুত্রও কোমর বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। রাজার ভাণ্ডার, ফুরাইবার নহে ; সকলেই পরম তৃপ্ত হইয়া ভোজন করিয়া গেল। তখন মস্করী ও মায়া গুরুপুত্রকে ধরিয়া বসিল, আপনাকে কিছু ফলরস পান করিতে হইবে। যে কয়জন মঠাধিকারী ভোজন করেন নাই, মায়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে আনারস, তরমুজ, ফলসার সরবৎ, দুধ, ঘোল প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া দিলেন। তাঁহারাও তৃপ্ত লইয়া গেলেন।

যত লোক আসিয়াছিলেন, সকলেই বেশ তৃপ্ত হইয়া গেলেন। কেবল দুজনের মুখ ভার। একজন সাধন ধনী :— পাঁচটি ছেলে থাকিলেও একটি তো আজ থেকে তাঁহার পর হইয়া গেল। তাঁহার মনটা ঠিক প্রফুল্ল নয়। আর গুরুপূত্র আজ যাহা দেখিলেন, সবই অদ্ভুত। এমন মেয়ে তো তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একদিকে বজ্রাদপি কঠোর, আবার আর-একদিকে কত নরম— যেন মাটির মানুষ। তাঁহার মনের কথা সব জানি না ; তবে তিনি বড়োই বিচলিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

৭

সমস্ত নিমন্ত্রিত লোক বসিয়া গেলে ছেলের কথা মায়ার মনে পড়িল। সে ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গেল, দেখিল, বিছানার উপর ছেলে খেলা করিতেছে। ৪/৫ জন চাকর-চাকরানী তাহাকে খেলা দিতেছে। মায়া গিয়াই ছেলেটিকে কোলে করিল ও মুখে চুমা খাইল ; বলিল—

"আমি তোমার কে বলো দেখি ?"

সে বলিল, "নূতন মা।"

"তোমার নূতন বাবা দেখিবে ?"

ছেলে বলিল, "নূতন মা, নূতন বাবা, দেখিব বৈকি— কই ?"

মায়া বলিল, "চলো দেখাই গে।"

ছেলে কোলে করিয়া সে একলা গঙ্গার ধারেরই যে একসারি ঘর আছে, সেই দিকে গেল। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরের ভিতর দিয়া আর-এক ঘরে গেল। গঙ্গার ধারের বড়ো জানালা খুলিয়া দিল, আলো আসিলে জীবন ধনীর পিশাচখণ্ডের সেই প্রতিমাখানি দেখা গেল। সে প্রতিমা এখনো ঠিক তেমনি আছে। কেননা, পিশাচখণ্ডের একজন কুমার আসিয়া প্রতি সপ্তাহে রঙ চটিলে রঙ দিয়া যায়, মাটি চটিলে মাটি দিয়া যায়।

প্রতিমার সম্মুখে মায়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল, ছেলেকেও বলিল, "নম করো।" ছেলেও মাটিতে মাথা ছোঁয়াইয়া নমস্কার করিল। সে ঘরে ধূপ-ধুনা, ফুল-চন্দন, দূর্বা, আলো চাউল, অগুরু-গুগ্‌গুল সর্বদা তৈয়ারি থাকে। মায়া ফুল-চন্দন ধূপ-ধুনা দিয়া প্রতিমা পূজা করিল, খানিক কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিল, তারপর হাত জোড় করিয়া বলিল—

"তোমারই হুকুমে তোমারই নাম ও গোত্র রক্ষার জন্য তোমারই জ্ঞাতি সাধন ধনীর এই ছেলেকে আমি পোষ্যপুত্র লইয়াছি। এখন ইহার মঙ্গলামঙ্গল তুমি দেখিবে। ইহাকে তোমারই হাতে অর্পণ করিলাম।"

মায়া স্তম্ভিত হইয়া শুনিল, কে যেন বলিল—

"পমায়ু বায়ুক।" প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া দেখিল, প্রতিমার ঠোঁট দুটি যেন নড়িতেছে।

স্বামীর আশীর্বাদ পাইয়া মায়ার মহা-আহ্লাদ হইল। সে ছেলেকে আবার বলিল—

"নম করো।"

ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল—

"এ কে ?"

"তোমার নূতন বাবা।"

ছেলে বলিল, "পুতুল বাবা— মাটির বাবা।"

মায়া ছেলে কোলে করিয়া আর-একটি ঘর খুলিল ও গঙ্গার দিকে যে জানালা ছিল, তাহা খুলিয়া দিল। সে ঘরে জীবন ধনীর সাঁজোয়া, পাগড়ি, আঙরাখা, তীর-ধনুক, তূণ, জুতা, কাপড় সব সাজানো ছিল। মায়া প্রত্যেকটির কাছে গিয়া নমস্কার করিল ও ছেলেটিকে 'নম' করাইয়া বলিল—

"এ সব তোমার নূতন বাবার।"

ছেলে বলিল, "মাটির বাবার? পুতুল বাবার?"

ছেলে কোলে করিয়া মায়া দূরে একটি উঠানে গিয়া পড়িল; সে তো উঠান নয়, একটি কারখানা। কামার ও সেকরাদের অনেক যন্ত্রপাতি ছড়ানো রহিয়াছে, পাশে একটা বারান্দায় অষ্টধাতুর একটি প্রতিমা তৈয়ার রহিয়াছে। মায়া সে প্রতিমার সম্মুখে গড় করিল, ছেলেকেও 'নম' করিতে বলিল। ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল—

"এ কি বাবা?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "এ অষ্টধাতুর বাবা।"

ছেলে বলিয়া উঠিল, "অট্টধাতুর বাবা?" মায়ার সব সাধের সামগ্রীগুলি ছেলেকে দেখাইল, ছেলের মঙ্গলামঙ্গল স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিল। তাহার পর ছেলে কোলে করিয়া যেমন বাহিরে আসিল, ছেলে বলিয়া উঠিল—

"মা, খিদে পেয়েছে।"

মায়ার চমক ভাঙিল, বলিল—

"তাই তো, ছেলেটা দানের পর অবধি এখনো পর্যন্ত কিছু খায় নাই।"

আরো চমক ভাঙিল যে, নিজেরও আজ সমস্ত দিন এক বিন্দু জলও পেটে পড়ে নাই। সুতরাং তাহাকে খাবারের চেষ্টায় যাইতে হইল। ছেলেকে একটু দুধ ও মিষ্ট খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে শাঁখ বাজিল। সন্ধ্যা হইয়াছে, আর খাওয়া হইল না।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পিশাচখণ্ডী ভবদেব ভট্টকে বলিলেন—

"রাজা বিহারী ও তাঁহার মেয়ে দুই জনেরই তো পোষ্যপুত্র লওয়া হইয়া গেল, এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, অনেকগুলি লোক আসিয়াছেন, অনেক কলাবৎ আসিয়াছেন, অনেক শিল্পী আসিয়াছেন, ইঁহাদের সকলকেই আসছে বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাজসভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। সকলেই আসিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সকলেই আসিবেন! আপনি উঁহাদের কিছু উপদেশ দিয়া দিন। রাজসভায় কিরূপ জিনিস আনা উচিত, আর কিরূপ জিনিস আনা উচিত নয়, কিরূপ জিনিসের পারিতোষিক দেওয়া উচিত, আর কিরূপ জিনিসের ধিক্কার হওয়া উচিত, তাহা আপনি বুঝাইয়া দিন। আমি উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ়, বারেন্দ্র, কামরূপ, শ্রীহট্ট, সমতট, বঙ্গ— এমন কি, সমস্ত বাংলা দেশ নিমন্ত্রণ করিয়া অঙ্গ-রাজ্য, চম্পানগরও নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার আরো কিছু দূর উত্তরে বিক্রমশীল বিহারে যাইয়া দেখি, সেখানকার পণ্ডিতেরা কালচক্রের আলোচনা করিতেছেন। এ কালচক্র তন্ত্র নহে— জ্যোতিষ। আমি তাঁহাদের গণনায় জানিলাম, অক্ষয় তৃতীয়ার আর পাঁচ দিন আছে। সুতরাং মায়ার পোষ্যপুত্র-গ্রহণে আমাকে তো থাকিতে হইবে, আমি একখানি ছিপ ভাড়া করিলাম। আমি তিন দিনের মধ্যে সাতগাঁয়ে আসিলাম ; আসিয়া দেখিলাম, এই এক মহা-সুযোগ। আপনিও উপস্থিত আছেন। বাংলার সবগুলি লোক এখানে উপস্থিত আছেন। এখন যদি পাকা মাঝি সাজিয়া ইহাদিগকে ঠিক পথে চালাইয়া দিতে পারেন, তবে রাজসভায় আপনারই কার্যের লাঘব হইবে। অনেক সময় বাঁচিয়া যাইবে, অনেক বাজে কাজ করিতে হইবে না।"

ভবদেব ভট্ট বলিলেন—

"বেশ তো। কথাটা তুমি ভালোই বলিয়াছ, বিদায়ের দিনে সকলে তো একত্র হইবেন, সেই দিন যাহা হয় করা যাইবে।"

২

তিন চার দিন পরে বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। রাজা ও সেনাপতি [ আগেই ] চলিয়া গিয়াছিলেন, কারবারী বেনেরাও অনেকে চলিয়া গিয়াছিল ; বিষয়ী লোকও প্রায়ই চলিয়া গিয়াছিল, ছিলেন কেবল পণ্ডিত, কলাবৎ, কারিকর, শিল্পী ও অন্যান্য গুণীজন। পিশাচখণ্ডীও ইঁহাদেরই চান। বিদায়ের দিন আহারান্তে সকলে উপস্থিত হইলে ভবদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আপনারা বোধ হয়, ভবতারণ পিশাচখণ্ডী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়া থাকিবেন, পরম ভট্টারক— পরমেশ্বর— মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী ১০৮ হরিবর্মদেব আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগাঁয়ের চড়ায় রাজসভা করিয়া কাব্যশাস্ত্র, কলা, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই গুণীগণের সমাদর করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কার ও তিরস্কার করিবেন, দুস্থ গুণীগণের জীবিকা নির্দেশ করিয়া দিবেন। এজন্য মহারাজ যে সমস্ত সাতগাঁয়েরই এক বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিবেন, এমন নহে, তাঁহার বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্যের এক বৎসরের রাজস্বই এই একই কার্যে ব্যয় করিবেন ; তাহাতেও যদি সংকুলান না হয়, তবে তাঁহার বহুকাল-সঞ্চিত রত্ন-রাশিতেও হস্তক্ষেপ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। পূর্বে পূর্বে হিন্দু সম্রাটগণ পাঁচ বৎসর অন্তর এইরূপ রাজসভা করিতেন এবং গুণীজনের পুরস্কার দিতে দিতে আপন শিরস্ত্রাণ, এমন কি, অঙ্গের মহার্ঘ পরিচ্ছদ পর্যন্তও দান করিয়া এক বস্ত্রে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিতেন। তাঁহাদের অদেয় থাকিত কেবল দুইটি জিনিস— রাজচিহ্ন ও যুদ্ধের উপকরণ। মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার অনুচরবর্গ ও তাঁহার সদস্যবর্গ আমরা সকলে প্রাণপণ যত্নে, যাহাতে এই ব্যাপার মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করিব। আমাদের বিশেষ অসুবিধা এই যে, আমরা দুই-তিন পুরুষ ধরিয়া এরূপ মহাসভা কোথাও দেখি নাই। আমাদিগকে পুরাতন

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

কাগজপত্র ও পুস্তকাদি দেখিয়া কার্যপ্রণালী অবধারণ করিতে হইবে। তাহাতে যদি কোনো ত্রুটি হয়, আপনারা নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

"গুণীজনের এই পুরস্কার-ব্যাপারে আমরা সম্প্রদায় বাছিব না, বংশ দেখিব না, জাতি দেখিব না; দেখিব কেবল কে কেমন কবি, কে কেমন শিল্পী, কে কেমন শাস্ত্রজ্ঞ, কে কেমন কলাবিৎ। আমরা ভাষার বিচার করিব না: সংস্কৃত, বাংলা, মাগধী, শৌরসেনী যে-কোনো ভাষাতেই পরীক্ষা গ্রহণ করিব। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদেরও এক বিশেষ কর্তব্য আছে। আপনারা সকলেই গুণীজন— গুণহীন, অসার, অপদার্থ কিছুই আমাদের সম্মুখে আনিবেন না। যাহা কিছু আনিবেন, তাহার প্রথম পরীক্ষা আপনাদেরই কাছে। আপনারা ভালো জিনিস না হইলে, কিছুতেই আনিবেন না। কেননা, এরূপ মহাসভায় পুরস্কৃত হইলে আপনাদের যশ যেমন দিগ্‌দিগন্তে বিশ্রুত হইবে, তেমনি তিরস্কৃত হইলে আপনাদের অপযশের আর সীমা থাকিবে না। গুণীজনের পুরস্কার করিতে আমাদের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনই তিরস্কার করিতে হইলেও আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। অতএব আপনারা বিধিমতে চেষ্টা করিবেন, যেন তিরস্কারের মতো কিছু মহসভায় উপস্থিত না হয়।"

৩

"আরো কয়েকটি কথা আপনাদিগকে আমি বলিয়া দিব। এমন যে বিক্রমাদিত্য ছিলেন— তিনি কত গুণীজনকে কত লক্ষ লক্ষ দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু— তাঁহারো কলঙ্ক আছে। তিনি আপনার সমক্ষে আপনার স্তুতিবাদ না শুনিয়া দান করিতেন না। শ্রীহর্ষেরও সে কলঙ্ক আছে। আমাদের মহারাজ, সম্মুখে আত্মস্তুতি বিষবৎ পরিহার করিয়া থাকেন। আপনারা কেহ তাঁহাকে অশোক, বিক্রমাদিত্য বা শ্রীহর্ষের সহিত তুলনা করিবেন না; তাঁহাকে সরস্বতীর বা বৃহস্পতির অবতার বলিয়া সরস্বতীর ও বৃহস্পতির অবমাননা করিবেন না। আপনারা নাটক লিখিয়া তাঁহার যশোগান করিবেন না বা তাঁহার নামে কাব্যনাটকাদি চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি একজন খাঁটি মানুষ, তিনি চান খাঁটি জিনিস, ভেজাল
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

দেখিতে পারেন না। আপনারা ভেজাল জিনিস চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। গুণের আদর ভিন্ন এত ব্যয়ে এত সমারোহে তাঁহার আর কোনোই উদ্দেশ্য নাই। আপনারা মনে করিবেন না যে, তিনি তোষামোদে তুষ্ট হইয়া কাহাকেও পুরস্কার করিবেন। পরম শত্রুরও গুণ দেখিলে তিনি তাঁহাকে আদর করিবেন।

"সনাতন ধর্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস। সনাতন ধর্মের সকল অনুষ্ঠানই তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, সনাতন ধর্ম অপেক্ষাও আর-এক উচ্চতর রাজধর্ম আছে— তাহার নাম গুণের আদর। একটা নির্গুণ পুরুষকে গুণের আদর দিলে তাহার দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হয়, শত শত চোর-ডাকাতেও দেশের তত অনিষ্ট করিতে পারে না। নির্গুণকে গুণীর আদর দেওয়া তিনি পঞ্চ-মহাপাতকেরও উপর মহাপাতক বলিয়া মনে করেন। একজন নির্গুণ পুরুষকে গুণীর পদে বসাইলে, সে যতদিন বাঁচিবে, সমস্ত গুণীজনের অবমান করিবে। দেশ হইতে একটা গুণই হয়তো লোপ হইয়া যাইবে।

"সনাতন ধর্মে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেও তিনি বৌদ্ধ ও জৈন কবির যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ চিত্রকর, বৌদ্ধ সূত্রধর, বৌদ্ধ স্বর্ণকার তাঁহার বড়ো আদরের পাত্র। জ্যোতিষীরা তো শাকদ্বীপী; কিন্তু মহারাজ তাঁহাদের কতই না আদর করিয়া থাকেন। চিকিৎসাশাস্ত্র এখন তো বৌদ্ধ-মঠে ও জৈন-উপাশ্রয়েই আশ্রয় পাইয়াছে। তথাপি সেখানেও একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে, মহারাজের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না।

"সুতরাং আমি আপনাদিগকে সর্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, পবিত্র গুণরাশি লইয়া আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সভারোহণ করিবেন।"

## ৪

ভবদেবের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই 'সাধু— সাধু' বলিতে লাগিলেন। দুই-একজনে আবার ভবদেবেরই ভাষ্যভূত দুই-একটি বক্তৃতাও করিলেন। পিশাচখণ্ডী বারংবার বলিতে লাগিলেন—

"আপনারা বাল্লবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের কথাগুলি সব মনে করিয়া রাখিবেন।"

হঠাৎ গুরুপুত্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন : বলিলেন—

"মস্করী মহাশয় ভারতবর্ষের যাবতীয় বৌদ্ধ গুণীগণকে এই সভায় একত্র করিবার ভার আমার উপর দিয়াছেন ; আমিও আনন্দের সহিত সে ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং কয়েক মাস ধরিয়া এই চেষ্টাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি ; বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরাই দেশভাষার চর্চা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা দেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। একজন জৈন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, 'যে কবি ছয় ভাষায় সমান কবিতা লিখিতে না পারে, সে কবিই নহে।' মহামহোপাধ্যায় ভবদেব ভট্ট বলিয়াছেন যে, বৈদ্যশাস্ত্র বৌদ্ধমঠ ও জৈন-উপাশ্রয়কেই আশ্রয় করিয়াছে ; শুধু বৈদ্যশাস্ত্র কেন ?— সমস্ত শিল্প ও কলা আজিও বৌদ্ধগণের করায়ত্ত। কার্পাস-বস্ত্রই বলুন, ক্ষৌম-বস্ত্রই বলুন, পত্রোর্ণাই বলুন, চিত্রকার্যই বলুন, ভাস্করকার্যই বলুন, শিলালিপিই বলুন, দেবপ্রতিমাই বলুন, মনুষ্যপ্রতিমাই বলুন, গীতবাদিত্রই বলুন, সবই এখন বৌদ্ধদের হাতে। ইঁহারা আপন আপন উত্তম উত্তম শিল্পকার্য রাজসভায় উপস্থিত করিতে পারেন, আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি নিজে রাজসভায় উপস্থিত থাকিব, পরীক্ষা দিব : প্রয়োজন হইলে রাজার আদেশে পরীক্ষকের আসনও গ্রহণ করিব। শুনিয়াছি, অনেক কুলবালা পরীক্ষা দিতে আসিবেন। আমিও বহু-সংখ্যক ভিক্ষুণী আনাইবার চেষ্টা করিব। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা আপন আপন ধর্মমত ব্যাখ্যা করিয়া কবিতা লিখিবেন। মহারাজাধিরাজ যেন বিধর্মীর মত বলিয়া সেগুলি উপেক্ষা না করেন। আহা, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা এই সময়ে জীবিত থাকিলে তাঁহার আনন্দ আর ধরিত না। তিনি কলিযুগ-পাবনাবতার মহারাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি যেমন বিদুষী ও পণ্ডিতা, তেমনই কবি ও সাধিকা। তিনি অল্পদিন হইল দেহ রাখিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যার ভিতরে অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন। আমি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার গ্রহণ করিলাম। আমি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ফাল্গুনী পূর্ণিমার অপেক্ষা করিব ও সাধ্যমতো মহাসভার সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব।"

গুরুপুত্রের বক্তৃতায় সকলেই জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল।

৫

রাজা বিহারী দত্তের কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ লইয়া উপস্থিত ছিল। তাহারা ভবতারণ পিশাচখণ্ডীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে বসাইল এবং তাঁহারই হাত দিয়া গুণীজনের পাথেয় ও বিদায় দিতে লাগিল। পাথেয়ের হিসাব করিতে এই কর্মচারীরা দক্ষ— বৃহস্পতি। কারণ, তাহারা যাবজ্জীবন ধরিয়া বেনেদের ঠকাইয়া বিস্তর পাথেয় লইয়াছে, সুতরাং তাহার জন্য আর ভবদেবকে অধিক বকাবকি করিতে হইল না। কিন্তু বিদায় লইয়া অনেকে অনেক রকম গোল বাধাইল। কিন্তু পিশাচখণ্ডী হাত একটু দরাজ করিয়া দিয়া সব গোল থামাইয়া দিলেন। তাঁহার সৌজন্যে, সদালাপে ও মিষ্ট কথায় বাংলাসুদ্ধ লোক যেন বশ হইয়া গেল। বৌদ্ধেরা কেহ কোনোরূপ গোল তুলিলে গুরুপুত্র তখনই ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন, 'গোল করিও না।' বিদায় লইয়া সকলে 'জয়োঽস্তু' 'কল্যানমস্তু' বলিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সাতগাঁ আবার ৭/৮ মাসের জন্য যে ভোঁ ভোঁ— সেই ভোঁ ভোঁ হইয়া রহিল।

৬

গুরুপুত্র ইতিমধ্যে অনেক কার্য করিতে লাগিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা দেবীর দল হইতে বাছিয়া বাছিয়া জনকয়েক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি অনেক অন্বেষণের পর দক্ষিণ-রাঢ়ের এক কোণে এক নিভৃত স্থানে নাঢ় পণ্ডিতের খোঁজ পাইলেন। নাঢ়ী আবার সেখান হইতে দশ ক্রোশ তফাতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেখানে বার বার লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে সদলবলে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। [আপনার গুরুর, কিন্তু, তিনি কোথাও খোঁজ পাইলেন না।] শেষ পৌণ্ড্রবর্ধনে এক মহাবিহার হইতে খবর পাইলেন যে, তিনি বহু-সংখ্যক কীর্তনিয়া লইয়া ভোটদেশে গিয়াছেন। তিনি আরো খবর পাইলেন যে, গুরুদেব শীতের পূর্বেই নেপালে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

তথাকার রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি নেপালে ললিতপত্তনে লোক বসাইয়া রাখিলেন, গুরুদেব যেন শিবচতুর্দশীর পরই যাত্রা করিয়া সাতগাঁ চলিয়া আসেন।

ভাস্করকার্যে বৌদ্ধদিগের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। সে খ্যাতি বজায় থাকে, গুরুপুত্রের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। যেখানে যে পাথরের ভালো মূর্তিটি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তা বৌদ্ধদেরই হউক বা হিন্দুদেরই হউক, আনাইয়া রাখিলেন। সোনার গহনা বৌদ্ধবিহারে ভালো হইত। বিহারের উপর বিশ্বাস করিয়া সকলেই বিহারের সেকরার হাতে সোনা দিত। কি নকাশির কাজে, কি পালিশে, কি হীরা কাটায়, কি খোদকারিতে বিহারের সেকরারা সিদ্ধ-হস্ত ছিল। অনেক ভালো ভালো গহনা গুরুপুত্রের খাতিরে তাহারা তৈয়ারি করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহারই কাছে রাখিয়া গেল। কাঠের উপর নকশাও বৌদ্ধরা খুব করিত। ভালো ভালো নকশা-করা কাঠের জিনিস মহাবিহারে আসিতে লাগিল।

কিন্তু গুরুপুত্রের ঝোঁক— তিনি কাব্য লিখিয়া পুরস্কার পাইবেন। তিনি সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত। বহু-সংখ্যক প্রাকৃত ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন : কিন্তু সে সকলের দিকে তাঁহার ঝোঁক নাই, তাঁহার ঝোঁক বাংলার দিকে। অল্পের মধ্যে একটি বা দুইটি পদে রস ফুটানো তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। যখনই সময় পাইতেন, চক্ষু উপরে তুলিয়া কলম হাতে লইয়া কি ভাবিতেন। দুই মাস তাঁহার ভাবিতে গেল, তাহার পর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লিখেন আর ছিঁড়িয়া ফেলেন। কত তালপাতাই যে ছিঁড়িলেন, তাহার ঠিকানা নাই ; তথাপি তাঁহার মনের মতো কবিতা হইল না।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সাতগাঁয়ের কাজকর্ম শেষ করিয়া পিশাচখণ্ডী নিমন্ত্রণে বাহির হইলেন। বিক্রমশীল পর্যন্ত তিনি তো পূর্বেই গিয়াছিলেন, এবার সেখান হইতে আরো পশ্চিমে চলিলেন। বিক্রমশীল হইতে কয়েক ক্রোশ গিয়াই গঙ্গাতীরে মুদ্‌গ-গিরি (মুঙ্গের), অঙ্গ ও মগধের সীমা। গঙ্গার ধার হইতেই পাহাড় উঠিয়া অনেক দূর মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর দুর্গ— চারি দিকে মুর্চা বাঁধা। নিকটেই কষ্টহারিণীর ঘাট। সেখান হইতে কিছু দূরে সীতাকুণ্ড। মস্করী সকল জায়গায় তীর্থের কাজ করিলেন, দুর্গাধিপতির সহিত দেখা করিলেন, শিল্পীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, আবার পশ্চিম দিকে নৌকা করিয়া চলিলেন।

এখন যেখানে বক্তিয়ারপুর হইয়াছে, সেখানকার ঘাটে নৌকা লাগিল। মাঝিদিগকে পাটনায় গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া মস্করী জনকয়েক মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিলেন। এইখানটাই মগধের প্রধান জায়গা— বড়ো বড়ো মাঠ, বড়ো বড়ো গ্রাম, বড়ো বড়ো গোচর— প্রচুর ফসল হয়, প্রচুর দই-দুধ পাওয়া যায়, প্রচুর চিড়া, প্রচুর মুড়কি, প্রচুর মিষ্টান্ন, প্রচুর খোয়া-ক্ষীর, প্রচুর খাজা। মস্করী সন্ধ্যার পরই কোনো গোয়ালার গোয়ালে আশ্রয় লইয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খান। তাঁহার সঙ্গীরা বাজারের মিষ্টান্ন খাইয়া ও চিড়া-মুড়কির ফলাহার করিয়া দিন কাটান। এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই বৌদ্ধপ্লাবিত দেশে ভালো ব্রাহ্মণ একেবারেই পাওয়া যাইত না। জ্যোতিষব্যবসায়ী ঘরকতক আচার্য ব্রাহ্মণ ছিল। তাহাদের আচার-ব্যবহার বৌদ্ধদের চেয়ে কোনোমতেই ভালো নয়। ভুঁইয়ার [ভুঁইহার ?] জাতির এখনো বোলবোলা হয় নাই। কিন্তু জাতিটা গজাইতে আরম্ভ

করিয়াছে। উহারা বিহারের জমি ছাপাইয়া খাইতেছে, তাই উহাদের নাম হইয়াছে ভুঁইহার বা ভূমিহারক। উহারা এখনো বৌদ্ধই আছে, কিন্তু 'বাভন'[১৬] বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মস্করী তাহাদের বাড়িতে অতিথি হইতে রাজি নন।

মস্করীর পা খুব চলে। তিনি সকালে বারো ক্রোশ গিয়া কোথাও আড্ডা লয়েন, বৈকালেও ৫/৬ ক্রোশ হাঁটেন। দুই দিনের পর তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, একটা কি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তিনি সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিলেন—

"বলো দেখি ওটা কি ?"

কেহ বলিল স্তূপ, কেহ বলিল মন্দিরের চূড়া।

একজন বলিল—

"না ওটা গোপুর। দেখিতেছেন না, উহার মাথায় দুইটা চূড়া ? মন্দির বা স্তূপ হইলে এরূপ হইত না। বোধ হয়, ও দুটা কোটের দুয়ার।"

পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মগধের রাজধানী ওদন্তপুরী অতি নিকট। ও দুটা ওদন্তপুরী বিহারের এক দিকের দরজা। মস্করী আগেভাগেই ওদন্তপুরীর রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন।

দূত গিয়া অল্প চেষ্টাতেই রাজার দর্শন পাইল। দূত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রীতিমতো শিষ্টাচারের পর বলিল—

"বঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ হরিবর্মদেব আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাজসভা করিয়া কাব্যে, শাস্ত্রে ও শিল্পে গুণীজনের পুরস্কার করিবেন, এইজন্য তিনি রাঢ়দেশের ব্রাহ্মণ ভবতারণ পিশাচখণ্ডীকে আপনার দেশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ আপনার দেশের সমস্ত গুণীজনকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পিশাচখণ্ডীকে আপনি সাহায্য করেন, যেন একটিও বাদ না যায়— ইহাই তাঁহার একান্ত অনুরোধ।"

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিশাচখণ্ডী মহাশয় কোথায় ?"

"তিনি নিকটেই আছেন।"

রাজা তাঁহার পাত্র-মিত্রগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষকে বলিলেন—

"তুমি গিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।"

২

পিশাচখণ্ডী উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার সহিত সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পিশাচখণ্ডীও তাঁহাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করিলেন এবং রাজা তাঁহাকে যে আসন দেখাইয়া দিলেন, সেই আসনে বসিলেন। তিনি কথা কহিবার পূর্বেই রাজা বলিলেন—

"বঙ্গরাজ হরিবর্মদেব যে সংকল্প করিয়াছেন, ইহা অতি সাধু। তিনি যে দেশভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ বিচার না করিয়াই গুণীজনের পুরস্কার করিতে সংকল্প করিয়াছেন, ইহা আরো সাধু। মগধ এককালে গুণীজনের খনি ছিল বলিলেই হয়; কিন্তু এখন মগধের সে দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রী৺শ্রীনগর পাটলিপুত্র এখন প্রায় গঙ্গার গর্ভে। আমরা একরূপ মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছি বলিলেই হয়। এখানে যাহা-কিছু আছে, আপনি অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারেন। এখানে বিহারে বিহারে এখনো কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পাওয়া যায়। এখনো এখানে পাথরের কাজ খুব ভালো হয়, সোনা-রুপার কাজ খুব ভালো হয়, মিষ্টান্নও খুব ভালো হয়। যত রকম শিল্পী আপনার ইচ্ছা হয়, লইয়া যাইতে পারেন। এমন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহারা যদি পরীক্ষা দিয়া পারিতোষিক পায়, তবে তো সে আমারই গৌরব— আমার রাজ্যেরই গৌরব।" তাহার পর পাত্র-মিত্র-বর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলেই যথাসাধ্য পিশাচখণ্ডীর সাহায্য করুন।"

রাজার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পিশাচখণ্ডী অনেকক্ষণ তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং সময় সংক্ষেপ, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্যটি সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য রাজাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা, পিশাচখণ্ডী যে কয়দিন ওদন্তপুরীতে থাকিবেন, ততদিনের জন্য তাঁহার থাকার ও চাকর-বাকরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি মগধদেশের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, সেজন্য তাঁহার যান-বাহনের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কথা হইল, পিশাচখণ্ডীকে পাটনার ঘাটে উঠাইয়া দিয়া যান-বাহন ফিরিয়া আসিবে। সেইদিনই পিশাচখণ্ডী রাজার প্রধান পাত্র বুদ্ধরক্ষিতের সহিত ওদন্তপুরী দেখিতে গেলেন।

নগরের সর্বত্রই দেখিতে লাগিলেন কষ্টিপাথরের থাম; থামে কত

রকম মালা, কত রকম হার, কত রকম গহনা ঝুলিতেছে : থামের মাথায় প্রায়ই পদ্ম— কোনোটি কুঁড়ি, কোনোটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কোনো স্থানে থামটিই মানুষের মূর্তি— মাথায় বালক। নানা রকম কষ্টিপাথরের নানা মূর্তি ; বুদ্ধদেবের মূর্তি, বোধিসত্ত্বের মূর্তি, কত কত দেব-দেবীর মূর্তি। ক্রমে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে গেলেন। এই বিহারের দুয়ারই তিনি বহু-ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুয়ারটি আছে বটে, কিন্তু কখনো বন্ধ হয় না।

ভিতরে গিয়া দেখেন, দুই তলায় দুই হাজার বৌদ্ধভিক্ষুর থাকিবার স্থান ; জায়গায় জায়গায় ভাণ্ডার, বহুতর খাবার জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ রহিয়াছে ; কোনো কোনো জায়গায় বা যাত্রার সব সরঞ্জাম, কত কত আসা, কত কত সোঁটা, কত কত নিশান, কত কত খুন্তি, কত কত অর্ধচন্দ্র, রুপার সোনার রাশি রাশি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি— কাহারো হীরার চোখ, কাহারো পান্নার চোখ, কাহারো নীলার চোখ। যে সময়ের কথা হইতেছে, মহম্মদীয়া ব্যক্তিয়ার তাহার ২০০ বৎসর পরে এই বিহারই লুঠ করিয়া এত সোনা-রুপা-হীরার বৌদ্ধমূর্তি পাইয়াছিল যে, সেগুলি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য সত্তরটি অশ্বতর লাগিয়াছিল। এই বিহারের ভাণ্ডারে রাশি রাশি তালপাতার পুথি ছিল, সিন্দুক-ভরা কারচুপি-করা রেশমের কাপড় ছিল, শত শত চামর ছিল, আর ধূপদান ও দানপত্র যে কত রকমের কত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। তিনি সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন ও আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং যাহা যাহা বাংলায় পাঠাইবার, সমস্ত চিহ্ন করিয়া দিলেন ; রাজপাত্র স্বীকার করিলেন, সেগুলি যথাসময়ে সাতগাঁয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

ওদন্তপুরীর বাজারে উপস্থিত হইয়া পিশাচখণ্ডী দেখিলেন, নানারূপ মিষ্টান্নের দোকান। এখানকার লোক প্রায়ই সব বৌদ্ধ। তাহাদের বাজারের জিনিস খাইতে আপত্তি নাই। অনেকে তাই খাইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। সুতরাং বিচিত্র বিচিত্র খাবারের জিনিস তৈয়ারি হইতেছে। খাবারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট— খাজা, আর সিলাবের চিড়া— যেমন ছোটো, তেমনি মিষ্ট, আর তেমনি সুগন্ধ। দুধের জিনিস সকল রকমই পাওয়া যায়— দই, দুধ, ক্ষীর, ননি, মাখন, খোয়া— বোধ হয়, দ্বাপরের বৃন্দাবন যেন এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। ওদন্তপুরীতে

দিন-কয়েক থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও. তাঁহাকে পরদিন প্রত্যুষেই চলিয়া যাইতে হইল ; কেননা, সময় সংক্ষেপ. কাজ বেশি।

৩

তিনি নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন. সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধরক্ষিত। সে বলিল—

“বুদ্ধদেবের প্রথম প্রধান ব্রাহ্মণ-শিষ্য সারিপুত্রের জন্মস্থান— নালন্দায়। তাঁহার মা সশরী জমিদারের মেয়ে। সারিপুত্র পীড়িত হইয়া মায়ের কোলে আসিয়াই মরিলেন। মাও আপনার সমস্ত সম্পত্তি সঙ্ঘে দিয়া যান। সেই সম্পত্তি হইতেই নালন্দাবিহারের উৎপত্তি ও উন্নতি। ৫০০/৬০০ বৎসর হইতে এখানে পণ্ডিতের কিছু বেশি সমাগম হইতেছে। গুপ্তরাজেরা এখানে বড়ো বড়ো বিহার দিয়া গিয়াছেন। চলুন দেখিবেন. এখন তাহাদের আর সে শ্রী নাই। মহারাজ যে বলিয়াছেন. তিনি মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছেন, সে কথাটি ঠিক।”

এইসব কথা হইতেছে. এমন সময়ে দূরে একটি বটগাছ দেখা গেল। বুদ্ধরক্ষিত বলিলেন—

“ঐ বটগ্রাম। ওখানে সূর্যের একটি কুণ্ড আছে. সূর্যের একটি প্রতিমা আছে, তাঁহার পূজা হয়. কয়েকঘর ব্রাহ্মণও আছেন। চলুন, তাঁহাদের বাটীতে বিশ্রাম করিয়া আপনি নালন্দায় যাইবেন। নালন্দায় যদিও এখন সে গৌরব নাই. তবু আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন— কত বড়ো বড়ো বাড়ি, কত বড়ো বড়ো বিহার, কত বড়ো বড়ো স্তূপ, কত ভালো ভালো মূর্তি, কত কত পণ্ডিত. কত কত ছাত্র ; আর দেখিবেন— রাশি রাশি পুথি।”

নালন্দায় একটি বড়ো রাস্তা আছে। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। উহার একধারে বড়ো বড়ো বিহার— একটার পর একটা. তারপর একটা, দুই-তিন মাইল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, আর একধারে কেবল স্তূপ ; বড়োটা ২০০/২৫০ ফুট উঁচা ; আর মাঝারি, ছোটো যে কত আছে, তার ঠিকানা নাই। এখন বৌদ্ধধর্মের হীনাবস্থায় বাড়ি বা স্তূপ ভাঙিলে আর মেরামত হয় না। কিন্তু এখনো লোকের ধর্মের

উপর এতদূর শ্রদ্ধা যে, জায়গাটি তাহারা এতই পরিষ্কার রাখিয়াছে : সর্বদাই ঝর্-ঝর্ তর্-তর্ করে। বিহারগুলি ও স্তূপগুলির ওপাশে পড়ুয়াদিগের কুটি— একটি একটি কুটি পাঁচিশের বন্ধ ঘর, সামনে দাওয়া। ইহারই মধ্যে পড়ুয়ার খাইবার, থাকিবার, বসিবার ও পড়িবার জায়গা। সবই তাহাকে নিজ-হাতে করিতে হয়। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো আটচালা— সেইখানে বসিয়া তাহারা পরস্পর আলাপ করে, শাস্ত্রচর্চা করে, তর্ক-বিতর্ক করে, পড়া লয়, পড়া দেয়। কোনো বিদেশী পণ্ডিত আসিলে তাঁহাকে এইখানেই সংবর্ধনা করে। মাঝে মাঝে ধর্মশালা— বিদেশী লোকের থাকিবার স্থান। তাহারো উঠানে আটচালা —গল্প-গুজব-আমোদ-প্রমোদের জায়গা। নালন্দার উত্তর-পূর্ব কোণে প্রকাণ্ড এক উঠানের মাঝখানে এইরূপ এক আটচালায় বোধিচর্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে শান্তিদেব মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে শান্তিধামে চলিয়া যান।

রাস্তার ধারে যে সকল বিহার ছিল, তাহার ঠিক মাঝখানে বালাদিত্য-বিহার— চারি-তলা উঁচা। এখনকার লাট সাহেবের বাড়িতে যেমন বাহির দিয়া প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি দু-তলা পর্যন্ত উঠিয়াছে, তাহারো ঐরূপ এক সিঁড়ি একেবারে রাস্তা হইতে দু-তলা পর্যন্ত গিয়াছে। দু-তলার উপর সিঁড়ির সামনেই একটা খোলা চাতাল, তাহার বাহিরে বারান্দাটি চারি দিক ঘুরিয়া গিয়াছে। বারান্দার ওপাশে সারি সারি ঘর। বারান্দার নীচে একতলায় এক প্রকাণ্ড উঠান, তাহার এক কোণে একটি প্রকাণ্ড ও গভীর কুয়া। কিন্তু বারান্দার নীচে নিরেট পাঁচিল, একটিও দুয়ার বা জানালা নাই। উঠানে নামিবার বা কুয়া ব্যবহার করিবার একমাত্র উপায় একটি সিঁড়ি দিয়া নামা। দু-তলার বারান্দার উপর তিন-তলার বারান্দা, তাহারো চারি দিকে ঘর। এইরূপ চার-তলায়ও বারান্দা ও ঘর। সিঁড়ির সামনে দু-তলায় যেখানে খোলা চাতাল আছে, তাহার উপরে তেতলা ও চৌতলায় অধ্যক্ষের থাকিবার স্থান।

অধ্যক্ষ সর্বজ্ঞ পণ্ডিত খুব লম্বা-চওড়া, বেশ সুপুরুষ ; এখন পঁচাশি বছর বয়স হইয়াছে, তথাপি দেহের ও মনের বেশ জুত আছে। বিহারের নিয়মমতো তাঁহার বারো জন চাকর আছে। পালা করিয়া তিনজন তিনজন দিন-রাত্রি তাঁহার কাছে থাকে। প্রত্যহ সকালে তিনি

একবার নামিয়া আসেন, নালন্দার বড়ো রাস্তায় খানিক পাইচারি করেন, তাহার পর প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া নালন্দার বড়ো দিঘিতে স্নান করিয়া উপরে উঠেন, উঠিয়াই আহার করেন। আহারান্তে বসিয়া বসিয়া কিছু বিশ্রাম করেন। দিবানিদ্রা তো একেবারেই নাই, রাত্রিতেও "শয়নং যোগনিদ্রয়া।" বিশ্রামের পরই কার্য আরম্ভ। তিনি যে কেবল বালাদিত্য বিহারের কর্তা, শুধু তাই নয়, নালন্দার সমস্ত বিহারই তাঁহার কথায় চলে। বিদ্যার্থী বা পড়ুয়াদের যে সন্দেহ তাহা আর-কেহই মিটাইতে পারিত না, তাঁহার কাছে আসিলেই সে সন্দেহ মিটিয়া যাইত। তিনি পুরাদস্তুর মহাযানপন্থী ছিলেন। মহাযানের মূল-গ্রন্থগুলি টীকা-টিপ্পনীর সহিত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

একদিন বিশ্রামের পর বুদ্ধরক্ষিত পিশাচখণ্ডীকে লইয়া সর্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিশাচখণ্ডী চারি-তলা হইতে নালন্দার শোভা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সারি সারি বিহার ও সারি সারি স্তূপের পর— যেদিকে চাহেন, কেবল পড়ুয়াদের কুটি। বিহারগুলি যদিও কোথাও কোথাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে ও বে-মেরামত আছে, কিন্তু পড়ুয়াদের কুটিগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পড়ুয়ারাও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহাদের অধিকাংশই পাঠে তন্ময়। সমস্ত জায়গাটিই যেন সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র। পিশাচখণ্ডী নিজে ব্রাহ্মণ ও ঘোরতর বৌদ্ধদ্বেষী। তিনি উহাদিগকে অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, নাস্তিক, অতিপাষণ্ড বলিয়াই জানেন। কিন্তু এখানে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন তাঁহার মনের ভাব বদল হইয়া গেল! তিনি সর্বজ্ঞ পণ্ডিতকে বলিলেন—

"ভদন্ত, আমি বঙ্গাধিপতি শ্রীহরিবর্মদেবের দূত হইয়া আসিয়াছি। তিনি আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সাতগাঁয়ে রাজসভা করিবেন। সেখানে কাব্যে, শাস্ত্রে, শিল্পে ও কলায় পারদর্শী লোকগণকে পুরস্কার দিবেন। আপনি নালন্দা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজন পণ্ডিতকে সেখানে পাঠাইয়া দিবেন।"

সর্বজ্ঞ পণ্ডিত। মহারাজাধিরাজের সংকল্প অতি উত্তম। আমাদের এখানে বজ্রদত্ত[১৭] একজন মহাকবি। তিনি ছয় ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন। তাঁহার লোকেশ্বর-শতক বৌদ্ধদের বড়ো আদরের

জিনিস। তিনি তো যাইবেনই। শিল্পীও জনকতক পাঠাইব। বিশেষত কয়েকজন ভাস্কর যাইবে, কতকগুলি কষ্টিপাথরের কাজ লইয়া যাইবে। তবে শাস্ত্রে প্রধান লোক লইয়া খুবই গোল। কারণ, আমরা নালন্দায় তন্ত্রটাকে শাস্ত্র বলিতেই রাজি নই, বজ্রযান, সহজযান আমরা একটা যান বলিয়াই মনে করি না ; আমরা বড়োজোর মন্ত্রযান পর্যন্ত জানিতে পারি। তবে আমার বোধ হয়, প্রজ্ঞাকরমতি[১৮] এখন এইখানেই আছেন। তিনি যদিও নালন্দার পড়ুয়া নহেন, তিনি অনেক সময়েই নালন্দাতেই থাকেন। বিশেষ, তিনি যে বোধিচর্যা-বতারের টীকা লিখিতেছেন, তাহার জন্য যে সকল পুথি-পাঁজির দরকার, সে সকল তো এইখানেই কেবল আছে, অন্যত্র পাওয়া যায় না ; তাই তাঁহাকে এইখানেই থাকিতে হইয়াছে। মহাযান-শাস্ত্রে তিনি একজন পণ্ডিত বটেন। আমরা তাঁহাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব।

সর্বজ্ঞ পণ্ডিত এই কথা বলিতে-না-বলিতেই একজন বেঁটেখেঁটে ভিক্ষু দুই জন পড়ুয়া সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত, তিনি আসিবামাত্র সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—

"এই যে, অনেক দিন বাঁচিবে, তোমারই নাম হইতেছে।"

"আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, আচার্য ভদন্ত মহাপণ্ডিত পিণ্ডপাতিক মহোপাধ্যায় সর্বজ্ঞ পণ্ডিতের স্মৃতিপথে উদিত হইব।"

"তোমার মতো পুণ্যবান্ আর কে আছে ? যে বোধিচর্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে আচার্য শান্তিদেব, এই নালন্দা হইতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই বোধিচর্যাবতারের ব্যাখ্যা করিতেছ, টীকা লিখিতেছ। তুমি দেশসুদ্ধ লোকের স্বর্গের পথ খুলিয়া দিতেছ।"

প্রজ্ঞাকর। আমিও আজ সেই বোধিচর্যা লইয়াই আসিয়াছি।—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।<br>তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি ॥[১৯]

এ স্থলে 'নিরালম্ব' কথাটার অর্থ কি ? ভাবও নাই অভাবও নাই। তাহা হইলে তো কিছুই রহিল না। তবে 'নিরালম্ব' কে হইল ?

পণ্ডিত। ও সকল অতি গুহ্যকথা। সে গুহ্যভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া 'নিরালম্ব' বা যা হোক এমনি একটা কথা দ্বারা তাহার কতকটা আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিভৃতে আর-এক

সময় আসিও, বুঝাইয়া দিব। এখন তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে। তোমাকে একবার সাতগাঁয়ে যাইতে হইবে।

প্রজ্ঞাকর। আমার প্রতি হঠাৎ এ নির্বাসনদণ্ড কেন ?

সর্বজ্ঞ। এ যেমন-তেমন নির্বাসন নয় হে— অনেক ভাগ্যে এইরূপ নির্বাসন ঘটে। এই যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরটিকে দেখিতেছ— ইনি সুপণ্ডিত, সুবক্তা, ইনি বঙ্গাধিপের নিকট হইতে আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ কাব্যে ও শাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার করিবেন। তাই আমার ইচ্ছা, তুমিই যাও।

প্রজ্ঞাকর। আমরা তো ভিখারী। পুরস্কার লইয়া কি করিব।

সর্বজ্ঞ। ও কথা বলিও না। পুরস্কার অকিঞ্চিৎকর জানি, কিন্তু উহাতে বিদ্যার যে গৌরব, তা তো অকিঞ্চিৎকর নয়। সেইটার আদর করা উচিত। না করিলে দোষ আছে।

প্রজ্ঞাকর। প্রভু আদেশ করেন তো যাইতেই হইবে।

সর্বজ্ঞ। শুধু তুমি একেলা গেলে হইবে না। এখানে যে যে পণ্ডিত ও কবি আছেন, সকলকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।

তাহার পর সর্বজ্ঞ পণ্ডিত পিশাচখণ্ডীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

"আপনি যে কার্যের জন্য এখানে আসিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ ভার লইলাম। যথাসময়ে আমাদের লোকজন আপনাদের ওখানে পৌঁছিবে। আপনার যদি সময় থাকে, আমার অনুরোধ, একবার নালন্দাটা বিশেষ করিয়া দেখিয়া যান।"

পিশাচখণ্ডীও বুদ্ধপালিতকে [বুদ্ধরক্ষিতকে ?] বলিলেন—

"আপনি, আমাকে নালন্দায় দেখিবার যাহা-কিছু আছে, সব দেখান।"

রীতিমতো শিষ্টাচারের পর চৌতলা হইতে নামিয়া উভয়ে নালন্দা-নগরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত নালন্দা দেখিয়া পরদিন প্রত্যুষে উভয়ে সিলাও যাত্রা করিলেন এবং তথা হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন।

৪ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধরক্ষিত সরস্বতী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"এই যে চারি দিকে পাহাড়, মাঝখানে একটু সমান জমি দেখিতেছেন— এই রাজগৃহ। ইহার আর-এক নাম গিরিব্রজ। এইরূপ পর্বত-বেষ্টিত স্থান পৃথিবীতে দুর্লভ। ইহাই জরাসন্ধের রাজধানী। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, এই গিরিব্রজের তোরণদ্বার।"

"তোরণের ভিতর দিয়া নদী আসিতেছে।"

"না আসিলে এই সমতলভূমির জল কোথা দিয়া বাহির হইবে? আর-কোনো দিকেই তো পথ নাই। ঐ ক্ষুদ্র নদীটি সরস্বতী। কিন্তু উহার জলে হাত দিয়া দেখুন উহা বেশ গরম। তোরণের দুই ধারে অনেকগুলি গরম জলের ফোয়ারা আছে। সরস্বতী ঐ গরম জলের সহিত মিশিয়া ক্রমে চওড়া হইতেছে। উচ্চে তোরণের দুই ধারে ঐ দেখুন, চৌকা করিয়া পাথরে বাঁধানো দুইটি বসিবার জায়গা— উহার নাম 'জরাসন্ধকা বৈঠক'। লোকে বলে, জরাসন্ধ নাকি ঐখানে বসিয়া শত্রু-দিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। চলুন— এই রাজগৃহের এককোণে মনিয়ার নামে এক মঠ আছে। সেখানে এক আশ্চর্য কুয়া আছে, উহার গম্বুজ বাঁধানো। মঠে ভিক্ষুও অনেকগুলি আছে।"

সেখানে উপস্থিত হইয়া পিশাচখণ্ডী যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সেখানে অনেকগুলি ভিক্ষু আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এমন ধ্যানে মগ্ন যে, বাহিরের কোনো সংবাদই রাখেন না। দুই জন লোক যে সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, অনেক ডাকাডাকি করিল, তাঁহাদের উদ্বোধই হইল না।

সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রিয়ভূমি গৃধ্রকূটে গেলেন। অনেক দূর উঠিতে হইল। একে তো রাস্তা বড়োই চড়াই, তাহার উপর বে-মেরামত— অনেক জায়গাই ধসিয়া গিয়াছে। প্রাণ হাতে করিয়া সেখানে যাইতে হয়। সেখানে গিয়াও দেখিলেন, একই ভাব। অনেক-গুলি ভিক্ষু আছেন— সকলেই ধ্যানমগ্ন। ইঁহারা দিনের মধ্যে একবার উঠেন, কিন্তু কখন— কেহই জানে না।

গিরিব্রজ ছাড়িয়া তাঁহারা দুই জনে নূতন রাজগৃহে আসিলেন। বেশ ডাগর শহর, এখন কিন্তু সবই ভাঙা— শহরের প্রাচীর ভাঙা, বাড়িগুলা

ভাঙা, রাস্তায় যাতায়াত কঠিন। কেবল একটি বিহার আছে, তাহাও বৌদ্ধদের হাতে নয়। শৈব যোগীরা সেটি মেরামত করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা হঠযোগ করে, গুরু-পাদুকা পূজা করে, ভস্ম মাখে, জটা রাখে, গেরুয়া-কাপড় ও রুদ্রাক্ষ পরে, আর খুব গাঁজা খায়। তাহারা পিশাচখণ্ডীকে বলিয়া দিল, নাথযোগীদের কেহ কেহ সাতগাঁয়ের রাজ-সভায় যাইবেন।

সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে 'গিরি-এক' নামে একটি পাহাড় প্রায় হাজার ফুট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। তাহার উপরে বড়ো বড়ো ইটে তৈয়ারি একটা প্রকাণ্ড অশোকের স্তূপ, 'গিরি-একে'র প্রায় মাথা হইতে একটা পথ দিয়া আর-একটা পাহাড়ে যাওয়া যায়। সেখানেও একটা বড়ো বিহার আছে। অতি প্রাচীন স্থবিরেরা এইখানে বাস করেন। তাঁহারা সংসারের কোনো সম্পর্কই রাখেন না। 'গিরি-এক' হইতে কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে একটি বাড়ি, এখন অত্যন্ত বে-মেরামত— কিন্তু অনেক যাত্রী সেখানে যায়। এইখানে শেষ জৈন তীর্থংকর মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। ইহার নাম পাবাপুরী।

মস্করী জৈনদের নামই শুনিয়াছিলেন, জীয়ন্ত জৈন কোনোদিন দেখেন নাই। তিনি যাত্রীদের সহিত মিশিয়া গেলেন, বুদ্ধরক্ষিত তাহাতে চটিলেন ও একটু তফাতে থাকিতে লাগিলেন। মস্করী কিন্তু জৈনদের সাথে মিশিয়া— কোথায় কোন্ জৈন মঠ আছে, [ উপাশ্রয় আছে, ] কোথায় কোন্ পণ্ডিত বা কবি আছেন— ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার অনেক কাজের খবর যোগাড় করিলেন। তিনি তাঁহাদের কথায় বুঝিতে পারিলেন— মালব, গুজরাট, শাকম্ভরী, মরুদেশ, জঝৌটি, চেদি দেশ— এই সব জায়গায় জৈনদেরই প্রাদুর্ভাব বেশি, বৌদ্ধ নাই বলিলেই হয়। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, "এই সব দেশ না ঘুরিয়া দেশে ফিরিব না।"

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করিয়া তিনি বাসায় বুদ্ধরক্ষিতের সঙ্গে মিলিলেন ও সেখান হইতে গয়ায় যাত্রা করিলেন। দুই দিনে গয়ায় পৌঁছিয়া দুই জনে মহা-গোলে পড়িয়া গেলেন। বুদ্ধরক্ষিত গয়ায় যাইতে রাজি নহেন। পিশাচখণ্ডী বোধগয়ায় যাইতে রাজি নহেন। পিশাচখণ্ডী বিষ্ণুপদ দেখিতে গেলেন একা। দেখিলেন, ফল্গু নদী হইতে গয়ার পাহাড়ে উঠিতে মাঝে একটি ছোটোখাটো মন্দির ও পাহাড়ের উপর কয়েকখানি সামান্য গোছের বাড়ি। বাড়িগুলি গয়ালীদের। গয়ার মাহাত্ম্য এতদিন বেশি লোকে জানিত না। এখন ক্রমে প্রচার হইতেছে, অনেক অনেক গয়ামাহাত্ম্যের বই লেখা হইতেছে। গয়ায় অনেক যাত্রী আসিতেছে। গয়ালীদের প্রতাপ ও প্রভাব বাড়িতেছে। গয়া ছোটো হইলেও দেখিলেই বোধ হয়, উঠ্‌তি শহর। দণ্ডপাণি দত্ত উহার সামন্ত রাজা। সম্রাট মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর। এই সময়েরই কিছুদিন পরে সামন্ত বজ্রপাণি দত্ত একখানা শিলাপত্রে জাঁক করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি গয়াকে সামান্য গ্রাম দেখিয়াছিলাম, এখন আমি উহাকে অমরাবতী করিয়া দিয়া গেলাম। সকলই মহারাজাধিরাজ নয়পালের[২০] প্রতাপের ফল।" মস্করী সন্ধান করিয়া জানিলেন যে, দুই জন গয়ালী পুরাণশাস্ত্রে বড়োই প্রবীণ, বিশেষ গয়ামাহাত্ম্যে তাঁহারা দক্ষ বৃহস্পতি। একজনের নাম মুরারি সেন, আর-একজনের নাম শ্রীহর্ষ নাকফোঁফা। তাহারা বলিল, "আমরা তীর্থস্বামী। আমরা তীর্থ ছাড়িয়া কোথাও যাই না।" মস্করী গোলে পড়িলেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর। তিনি বলিলেন, "এরূপ মহাসভায় গেলে ও আদর পাইলে আপনাদের তীর্থেরই তো গৌরব হইবে। তীর্থস্বামীর কার্যক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে।"

গয়ার কাজ সারিয়া মস্করী ভাবিলেন— বোধগয়ায় না যাওয়া ভালো নয়। পৃথিবীর একটা বড়ো তীর্থস্থান। সভার উপযুক্ত অনেক জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। তাই ভাবিয়া বুদ্ধরক্ষিতকে লইয়া বোধগয়ায় গেলেন। বোধগয়ার মন্দির তখন বড়োই বে-মেরামত, যে অশ্বত্থগাছের তলায় বুদ্ধদেব বোধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ কাটা পড়ে শশাঙ্ক-নরেন্দ্র গুপ্তের সময়, সে প্রায় চারি শত বৎসর। এই চারি শত বৎসরে গাছটা প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শিকড়ে বোধগয়ার মন্দির ফাটিয়া গিয়াছে। সেই মন্দিরের পিছনে তাহারই বারান্দার মধ্যে অশ্বত্থগাছ। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধমূর্তি। যেন গাছতলায় বুদ্ধদেব ধ্যান করিতেছেন। মন্দিরটা রৌদ্রবৃষ্টি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। মন্দিরের হাতার চারি দিকে পাথরের রেলিং, তাহাতে কতই চিত্রবিচিত্র কারিগরি। কিন্তু ফল্গু নদীর বালি পড়ায় হাতটা প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে, মন্দিরের দরজায় উঠিতে এখন আর পৈঠার দরকার হয় না। চারি দিকে বিহার, সেখানে নানা দেশের ভিক্ষু বাস করে ও তীর্থ করিতে আসে। মস্করী দুই-তিন জন নেপালী, দুই-তিন জন ভুটিয়া ও দুই-তিন জন সিংহলীকে সভায় যাইবার জন্য জেদ করিয়া গেলেন; তাঁহারাও যাইবে স্বীকার করিল। সেখানে আরো অনেক দেশবিদেশের পণ্ডিত পাওয়া গেল। দুজন পারসি বৌদ্ধেরও নিমন্ত্রণ হইল। নীলা নদীর উত্তরে দুজন রোমদেশের লোকেরও নিমন্ত্রণ হইল।

২

তখন দুজনে পাটনা চলিলেন। গয়া হইতে পাটনা যাওয়ার রাস্তা ধরিলেন। রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে খোদা দেবদেবীর প্রতিমা দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। কাউআ-ডোল পাহাড়ে কাক বসিলে দুলিতে থাকে। তাহার একটু পরেই "খলতিক পর্বত" অর্থাৎ পর্বতে চড়িলেই পা হড়কাইয়া যায়। সেই পর্বতে উঠাই মুশকিল, নামা তো আরো মুশকিল। পর্বতের উপর গুহা। গুহার ভিতর এমন মাজা, এত পালিশ যে, মুখ দেখা যায়। সাদা, কালো, নীল রঙ, আর সুন্দর পালিশ। গুহায় ঢুকিলেই মানুষের ছায়া পড়ে। একটা গুহায় একজন তপস্বী আছেন, তিনি যে কত কাল চক্ষু

মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন, বলা যায় না। বীরাসনে বসিয়া আছেন, শরীর অস্থি-চর্মসার হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, রগ টিপিয়া গিয়াছে, নাকের হাড় নড়-নড় করিতেছে। মস্করী তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অতি কষ্টে খলতিক পর্বত হইতে নামিলেন।

পাটলিপুত্র এখন প্রায় জনশূন্য। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে মহা-ভূমিকম্পে সমস্ত নগর বসিয়া যায়। শোণ নদী পাটলিপুত্রের পশ্চিম-সীমা ছিল, সে সরিয়া দশ ক্রোশ তফাতে গিয়া পড়ে। এখনো দু-একখান নৌকা পুরানো পথে সময়ে সময়ে বর্ষাকালে যায়। কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতের জলরাশি শোণ দিয়াই গঙ্গা নদীতে পড়ে। বসা নগরের উপর ক্রমাগত পলিমাটি পড়িয়া নগরকে যে কত নীচে নামাইয়া দিয়াছে, কে বলিতে পারে ? তবে মাঝে মাঝে স্তূপের, জয়স্তম্ভের ও আকাশভেদী রাজবাড়ির আগা দেখা যায়। এক জায়গায় অনেকগুলি থামের মাথা জাগিয়া ছিল, ক্রমে সেগুলাও জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। পাটলিপুত্রের তিন শত্রু বলিয়া বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে, "জল, আগুন আর ঝগড়া"। কাঠের নগর কয়েকবার আগুনে পোড়াইয়া দিয়া যায়। তাহার উপর জলপ্লাবনে অঙ্গার পর্যন্ত ধুইয়া যায়, ঝগড়ায় নগরের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ হইয়া যায়। কিন্তু পাটলিপুত্র একবার আবাব উঠিত, আবার বড়ো হইত। কিন্তু বৌদ্ধেরা মনেও করিতে পারে নাই যে, উহার আর-এক প্রবল শত্রু ছিল, ভূমিকম্প। সমস্ত নগরটা ১০/১২/১৫ হাত বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। পাটলিপুত্রের নাম "নগর"। মগধসুদ্ধ লোক উহাকে নগরই বলিত। ইদানীং ভাঙা নগরের নাম শ্রীনগর হইয়াছিল।

## ৩

কাশী এ সময়ে দুটি ছোটো ছোটো নগর। একটি মৃগদাব আর-একটি অবিমুক্ত ক্ষেত্র। দু জায়গায়ই লোকজন অনেক, এক জায়গায় হিন্দু আর-এক জায়গায় বৌদ্ধ।

হিন্দু নগরটি একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের চারি ধারে। জলাশয়টি জ্ঞানবাপী। তাহার একদিকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, আর-এক দিকে অন্নপূর্ণার মন্দির। সে বিশ্বেশ্বরের মন্দির এখন আদিবিশ্বেশ্বর হইয়াছে। অন্নপূর্ণার মন্দির যেখানকার সেইখানেই আছে। মধ্যে একটা হ্রদ,

তাহারই নাম জ্ঞানবাপী। উহারই চারি দিকে সন্ন্যাসীদের বাস ও ব্রাহ্মণদের বাস। হ্রদ ক্রমে মজিয়া গিয়া তথায় নগর পত্তন হইয়াছে। জ্ঞানবাপী ক্রমে ছোটো হইতে হইতে এখন একটি বাউড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাউড়ি মানে সিঁড়িওয়ালা কুয়া। তখনকার প্রধান দেবতা অবিমুক্তেশ্বর, তিনি এখনকার জ্ঞানবাপীর উপরেই বিরাজ করিতেছেন।

মৃগদাবের এক দিকে দুইটি স্তূপ দুইটিই প্রকাণ্ড। একটির এখন চিহ্নমাত্র নাই। কেবল সে দিন খুঁড়িয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বের প্রদক্ষিণ ও তাহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারি দিকে চারিটি সিঁড়ি বাহির হইয়াছে। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইহা ১৬০ ফুট উঁচা ছিল, ব্যাস ৪০ ফুটের উপর। গায়ে উজ্জ্বল পলস্ত্রা করা। মাথায় বহু সোনার ছাতি। যেখানে ছাতি আরম্ভ, সেখানে একটি কিউবের চারি দিকে চারি জোড়া চোখ, আধ-বুজন্তভাবে ধ্যানমগ্ন, স্তূপগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছোটো প্রতিমা। সমস্ত বিশ্বই যেন ধ্যানমগ্ন, এই স্তূপের পাশে ধর্মরাজিকা, এখন ধামেক বলে। প্রকাণ্ড স্তূপ, ছাতা নাই, গা-ময় কঠিন পাথরের উপর নানা রকমের কাজ করা। এখন মাথাটা ভাঙিয়া গিয়াছে, মেরামত না করিলে শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িবে। মৃগদাবে বড়ো বড়ো বিহার। সব বে-মেরামত— সাপ, বেজি ও ব্যাঙের আড্ডা। ইন্দুর-ছুঁচাও ঢের। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনা যায়, ভিক্ষু সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। একটা পুরানো বিহারের ঢিবির উপর একটা নূতন বিহার হইল, পুরানো সব জিনিস ঢাকা পড়িল। মানুষের চক্ষেই ঢাকা পড়িল, সাপের চক্ষে তো নয়। সাপ তাহার ভিতরে বসিয়া বেশ বংশ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। নূতন বিহারের যে পাঁচিলটা পুরানো বিহারের পাঁচিলের উপর পড়িল, সেখানটা বেশ রহিল, তাহার এ-পাশ ও-পাশ গোড়া হইতেই বসিতে লাগিল, অল্পদিনেই পাঁচিল ফাটিল, ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেরামত করে কে? দেশে ক্রমেই হিন্দুর প্রাদুর্ভাব বেশি হইয়া উঠিতেছে। বৌদ্ধ-মন্দির মেরামতের সময়ে টাকা জুটে না।

এই দুই নগরেই মস্করী অনেকগুলি ভালো ভালো লোক নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে বেদান্তী চিৎসুখাচার্য[২১]। উদয়নাচার্য[২২] বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনিও যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচর্যার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী

শ্রীহীর পণ্ডিত কাশীতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও কাশীতে ছিলেন। ইঁহারা দুজনেই নিমন্ত্রণ পাইলেন।

মৃগদাব ও অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে রাজবাড়ি। রাজা স্বাধীন নন, কান্যকুব্জেশ্বরের সামন্ত। কিন্তু তিনি থাকেন স্বাধীন রাজার ন্যায়। হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রের রাজা বলিয়া তাঁহার যে একটা বিশেষ সম্মানও ছিল, তাহা আর-কাহারো ছিল না। তিনি সকল দেশের পণ্ডিতের সম্মান করিতেন এবং সকল দেশের লোককেই কাশীবাসের সুবিধা করিয়া দিতেন। মস্করী প্রথম হইতেই রাজার সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রাজার সাহায্যও সকল বিষয়েই পাইয়াছিলেন। রাজাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই মস্করীর এক মহা-বিপদ উপস্থিত হইল। পঞ্জাব হইতে একজন রাজদূত কাশীর রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মস্করীর প্রধান শত্রু হইলেন। দুজনেই আসিয়াছেন লোক নিমন্ত্রণ করিতে। একজন পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া পুবে লইয়া যাইবেন আর পুরস্কার দিবেন। আর-একজন সিপাহী লইয়া যাইবেন, আর যুদ্ধ করাইবেন। দুই জনের অনেকবার রাজসভায় বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পঞ্জাবের রাজদূত বলেন, "রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার এ সময় নয়।" তিনি বলেন, "প্রবল শত্রু হিন্দুদিগের সীমান্তে হানা দিতেছে। পূর্বেও অনেকবার এরূপ হানা দিয়াছে। কিন্তু যাহারা দিয়াছে, তাহারা ঠাকুর মানিত, দেবতা মানিত, ব্রাহ্মণ মানিত, আচার মানিত, প্রতিমাপূজা করিত, আগুনপূজা করিত, সূর্যপূজা করিত, জলপূজা করিত, মাটিপূজা করিত, অনেক বিষয়েই আমাদের মতোই ছিল। কিন্তু এ এক বিচিত্র জাতি আসিয়াছে। ইহাদের ধর্মও বিচিত্র। ইহাদের মতে দেবতা-মানা মহাপাপ। প্রতিমা ভাঙা মহাপুণ্য। জল, মাটি, সূর্য জড়পদার্থ—দেবতা নহে, মানুষ নহে, জীবও নহে। ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের জাতি নাশ করে, পইতা ছিঁড়ে দেয়। আচার মানে না, বিচার মানে না। পঞ্জাব ইহাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত। ইহারা বরাবর পঞ্জাব লুঠ করিয়াছে, কাশ্মীর লুঠ করিয়াছে, অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে উৎসন্ন দিয়াছে। অনেকে প্রাণ লইয়া বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীহীর পণ্ডিত দেশত্যাগী, তাঁহার পুত্র দেশত্যাগী, কত কত পণ্ডিত যে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়াছেন

তাহার ইয়ত্তা নাই। অমন যে আমাদের তীর্থ জ্বালামুখী, তাহা লুঠিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যে নগরকোটের ব্রাহ্মণেরা আভিজাত্যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অগ্রগণ্য, যাহাদের হাতে ভাত খাইতে কেহই আপত্তি করিতে পারেন না, সেই নগরকোট এখন শ্মশান হইয়াছে। এই কি সময় রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার ? এ সময় যদি সকলে প্রাণপণে আত্মরক্ষা না করেন, তবে ২/৫ বছরের মধ্যেই আপনারাই কোথায় থাকিবেন, তাহার ঠিকানা নাই— আবার আপনাদের গুণ ? এখন কেবল সাজসজ্জা, কেবল রণসজ্জা। আমি অনহিল গিয়াছিলাম, শাকম্ভরী গিয়াছিলাম, ধারায় গিয়াছিলাম, ত্রিপুরী গিয়াছিলাম, খাজুরাহো গিয়াছিলাম, দিল্লী গিয়াছিলাম, কনৌজ গিয়াছিলাম, মাণ্ডোর গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বড়ো একটা বকাবকি করিতে হয় নাই। পঞ্জাব হইতে, কাশ্মীর হইতে, নগরকোট হইতে, থানেশ্বর হইতে পলাতক সর্বস্বান্ত লোকজন আসিয়া আমার সব কাজ করিয়া দিয়াছে। দু-এক জায়গায় আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে হয় নাই। ইহারাই আমার কাজ সারিয়া রাখিয়াছিল। ওদিকে আপনি আর যাইবেন না, সমস্ত দেশের লোক এক-হাড় এক-প্রাণ হইয়াছে। দেখুন, রাজপুতেরা যদি রক্ষা না করিত, কাসিমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধু জয় করিয়া ঐ পথে বরাবর অনেক দূর আসিয়া পড়িত। তাহারা তিন শত বৎসর ধরিয়া এক প্রান্ত রক্ষা করিতেছে। আবার আর-এক প্রান্তে বিপদ উপস্থিত। এ সময়ে কেবল যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, বিপক্ষ-দমন ও বিপক্ষ-নাশন। এটা বারোয়ারির সময় নয়। বঙ্গাধিপ সাতগাঁ রাজ্য জয় করিয়াছেন— বেশই করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত সামর্থ্য, সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করুন। সশস্ত্রে সমস্ত প্রজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। নহিলে এ সময়ে উৎসব, আনন্দ, দান-ধ্যান আরম্ভ করিলে সব লোপ হইয়া যাইবে, আর উৎসব করিতে হইবে না, আর দান করিতে হইবে না, আর ধ্যান করিতে হইবে না। আপনি দেশে ফিরিয়া যান, বঙ্গাধিপতিকে সব কথা বুঝাইয়া বলুন। রাজসভা ছাড়িয়া দিতে বলুন। যুদ্ধের সজ্জা করিতে বলুন। আমিও সত্বর তাঁহার সভায় উপস্থিত হইব।"

৪

মস্করী শুনিলেন। রাজদূতের ভাষায় ও ভঙ্গিতে বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে যে কি, তাঁহার ধারণা হইল না, তাঁহার হৃদয়ংগম হইল না। কাশীর লোকেও যে বড়ো বুঝিল, তাহা নহে। তাহারাও বুঝিল দূরে— কত দূরে তাহার ঠিকানা নাই— একটা বিপদ উপস্থিত ; কিন্তু তাহাতে আমাদের কি ? আমরা কেন এখন তাহার জন্য মাথা ঘামাই, এই ভাবের একটা যেন আধসত্য একটা বিপদের ধারণা হইল। তাহারা মাতিল না। দু-চার জন ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিল, এই মাত্র।

মস্করী কাশীর কাজ সারিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া কনৌজ যাত্রা করিলেন। মাঝে প্রয়াগ, ত্রিবেণী-সংগমে স্নানদান করিয়া গঙ্গা বাহিয়া কনৌজ গেলেন। নৌকা লাগিল ডাঙায় নহে, প্রায় ওপারে একখানা নৌকার গায়ে। সমস্ত গঙ্গাটা নৌকায় ভরা। ওপার ভিন্ন আসা-যাওয়ার পথ নাই। মস্করী নৌকার ছইয়ের উপর দিয়া কনৌজের ঘাটে পা দিলেন। শহরটি তিন ক্রোশ দীর্ঘে, গঙ্গার ধারে, এবং প্রস্থেও প্রায় তিন ক্রোশ। ঠিক মধ্যস্থলে রাজবাড়ি। রাজপুত-প্রতিহার বংশের মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল[২৩] রাজা। তাঁহার রাজত্ব শতদ্রু নদী হইতে বিহারদেশ পর্যন্ত। কাশী, মথুরা, দিল্লী তাঁহার সামন্তরাজ্য। তাঁহাদের রাজত্ব আরো বিস্তৃত ছিল। যমুনার দক্ষিণ ধারটা এখন স্বাধীন হইয়াছে। আর প্রতিহারদের আদি ভূমি রাজপুতানা ও সেখানকার প্রতিহারেরা কনৌজের অধীন নহে, স্বাধীন হইয়াছে।

মস্করী এত বড়ো শহর কখনো দেখেন নাই। কনৌজ, একাধারে রাজধানী, বন্দর, ব্যবসায়ের স্থান, বিদ্যার স্থান ও সেনানিবাস। সুতরাং শহর যে বড়ো হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু শহরে আসিয়া মস্করী দেখিলেন, সকলের মুখেই ঐ এক কথা ; মুসলমান আসিতেছে। সকলেই সাজিতেছে, নিতান্ত শিশু ও বৃদ্ধ, নিতান্ত কানা, খোঁড়া, আতুর ও অন্ধ ছাড়া সকলেই সাজিতেছে। জাতিভেদও মানিতেছে না। ব্রাহ্মণও সাজিতেছে, ক্ষত্রিয়ও সাজিতেছে, বৈশ্যও সাজিতেছে, শূদ্রও সাজিতেছে, পাহাড়িও সাজিতেছে। শুনিলেন, পানওয়ালীরা যাহা উপায় করিয়াছিল, যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, সব দিয়া দিয়াছে। তাহাতে প্রায় এক কোটি টাকা হইয়াছে। কনৌজের পান খুব বিখ্যাত। প্রায়

এক হাজার পানওয়ালী ছিল ; তাহারা যথাসর্বস্ব দিয়াছে। রাজমহিষী বাপের দেওয়া একজোড়া হীরার বালামাত্র আইওতের চিহ্ন রাখিয়া বাকি সব গহনা দিয়া দিয়াছেন। রাজা এক বৎসরের রাজস্ব— যাহার নাম রাজার সর্বস্ব, দিয়া দিয়াছেন। ব্যাবসাদারেরা ছয় মাসের মুনাফা দিয়া দিয়াছে। শিল্পীরা এক বৎসরের আয় দিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের উদ্যোগ উপকরণ রাশি রাশি প্রস্তুত হইতেছে, সংগ্রহ হইতেছে, জমা হইতেছে ও ছালা-বন্দী হইতেছে। পঞ্জাবরাজের খবর আসিলেই রওয়ানা হইয়া যাইবে। মস্করীর রাজসভার কথা কেহই শুনিতে চাহে না। শুনিবে কি ? পঞ্জাব ধ্বংস করিতে পারিলেই কনৌজ, মাঝে আর কিছুই নাই। অনঙ্গপাল তাই কনৌজে অনেক লোক পাঠাইয়াছেন। তাহারা কনৌজের লোককে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছে যে, বিপদ আসন্ন। তাই সবাই মাতিয়াছে। আহা ! এমন সোনার কনৌজ ছারখারে যাবে গো ? এ কথা যাহারই মনে হয়, সেই সর্বস্ব পণ করে, প্রাণপণ করে। মস্করীর কথা কেহ শুনে না। শুনিবে কি ? তিনি অনেকবার ভাবেন—

"ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাজসভা করিব, না বলিলেই ভালো হইত। আমিও সাজিতে পারিতাম। আমার আর-কে আছে ? সনাতন-ধর্মের জন্য যথাসর্বস্ব তো দিতামই, প্রাণটাও দিতাম। এমন বিপদ উপস্থিত জানিলে কি এমন কার্য করি ? আমাদের দেশে এত কাণ্ডের কোনোই খবর নাই, মগধেও তো নাই। এখন করি কি ? আরো যাইব কি ? যাইয়া ফল নাই, সর্বত্রই এইরূপ দেখিব। নানা দেশ দেখিবার, নানা তীর্থ করিবার কত বাঞ্ছা ছিল ; কিন্তু যদি নিমন্ত্রণই না করিতে পারি, বৃথা অর্থব্যয়েরই বা দরকার কি ? বৃথা পরিশ্রমেরই বা কারণ কি ? তবে এখান হইতেই ফিরিব কি ? এখনো তো দিন আছে ? ফিরিব কি ?" আবার ভাবিলেন—

"দেখিলাম তো কনৌজই এখন ভারতের প্রাণ। এইখানে বসিয়াই ভারতের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর লই। তাহার পর যাহা বিবেচনা হয়, করিব।"

মস্করী মাসখানেক কনৌজে রহিলেন, অনেক দেশের অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্তাও কহিলেন ; কিন্তু সব বৃথা হইল। সকলেই বলিল, রাজসভার এ সময় নয়। পরম শত্রু দরজায় ঘা দিতেছে। ইহারা

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

আসিলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ হইয়া যাইবে। এখন একমনে একপ্রাণে যাহাতে উহাদের হটাইতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। মস্করী করেন কি? মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়া দেশে ফিরিলেন। ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে ফিরিলেন। রাজসভাটা যে বিশেষ জমিবে না, এই তাঁহার দুঃখ। কিন্তু রাজসভার পর বাংলাকেও দেশরক্ষায় মাতাইতে হইবে। হয়তো নিজেও যুদ্ধে যাইতে হইবে।*

* [ গ্রন্থভুক্তিকালে বর্জিত অংশ প্রাসঙ্গিক তথ্য/পাঠ-প্রসঙ্গ পর্যায়ে দ্র. ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ পূর্ণিমা। দুপরের পর হইতেই নৌকা আসিয়া চড়ায় লাগিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে চড়ার দক্ষিণ দিক ছাড়া তিন দিকে নৌকা লাগিল। দেখাইতে লাগিল, যেন চড়ার দাঁড়ি উঠিয়াছে। লোকে বালির চড়ায় নামিয়া বালির উপর দিয়া মাটিতে উঠিতেছে, সেখানে ঘাসের উপর দিয়া সভার কাছে পৌঁছিতেছে। সেখানে পা ধুইয়া সভায় গিয়া বসিতেছে, এখন যেমন জুতা হারানোর ভয়ে লোক অস্থির হয়, সে ভয় তখন একেবারে ছিল না। ক্রমে প্রকাণ্ড সভায় লোক থৈ থৈ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা বিহারীর এমনি বন্দোবস্ত, সবাই আপনার আপনার স্থান খুঁজিয়া পাইল এবং তাহাতে কেহই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিল না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন ভিন্ন আসন করা হইয়াছে। দুই স্থানের মাঝখান দিয়া রাস্তা, যে দিকে ইচ্ছা যাও।

বেলা একপ্রহর থাকিতে সভার দুই পার্শ্বে মেলা আরম্ভ হইল। কেনা-বেচা হাস্য-পরিহাস গান-গল্প চলিতে লাগিল। আর দোল— দুটা দাঁড়া কড়ির উপর একটা কড়িকাঠ আড় করিয়া দিয়া তাহাতে আংটা লাগাইয়া দড়ি ঝুলাইয়া তলায় একজন দুজন তিন জন চারি জনের পর্যন্ত বসিবার জন্য তক্তা লাগানো হইল। আর দোলা দুলিতে লাগিল। দুই দিকে ২৫ডিগ্রি ২৫ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিতে লাগিল। দোলায় বসিয়া লোক নানারূপ ভঙ্গি করিতে লাগিল। বাক্‌চাতুরী করিতে লাগিল। যাহারা মাটিতে ছিল, তাহাদের ঠাট্টা-বট্‌কেরা করিতে লাগিল। আর-এক দোল— নাগর-দোলা, চারি মুড়ায় চারিটা বাক্স, এক-এক বাক্সে চারি জন করিয়া লোক বসিয়া আছে, আর নাগর-

দোলা উঠিতেছে নামিতেছে— এই মাথার উপর, আবার তখনই মাটির কাছে, এই ডাইনে, এই আবার বামে। নাগর-দোলায় স্ত্রীও আছে, পুরুষও আছে। আবার জায়গায় জায়গায় এক নাগর-দোলাতেই স্ত্রী-পুরুষ দুই আছে। এদিন আর বড়ো লজ্জা শরম থাকে না। তবে এবার একটু ভয়, রাজা কাছেই আছেন। নাগর-দোলাগুলো এক-একটি ৩০/৪০ ফুট পর্যন্ত উঠিতেছে। একজন কবি বলিয়াছেন, বাংলার মেয়েরা অপ্সরাদের চেয়েও সুন্দরী, তাহারা অনেক সময় অপ্সরাদের সঙ্গে রূপের টক্কর দিবার মনস্থ করে : তাই তারা নাগর-দোলায় চড়িয়া স্বর্গ কতদূর দেখার চেষ্টা করে ; একবার নামিয়া ও একবার উঠিয়া উপরে উঠা অভ্যাস করে। কিন্তু যত বেচাল ঐ দক্ষিণ দিকে। উত্তর দিকে ব্রাহ্মণদের ও হিন্দুদের মধ্যে এ-সব বেচাল হইতে পারে না, তাহারা একটু সমীহ করিয়া চলে।

লোক সব ভালো কাপড় পরিয়া আসিয়াছে। ভালো কাপড় মানে, ঘোরালো রঙের, ঘোরালো লাল, ঘোরালো কালো, ঘোরালো নীল, ঘোরালো হলদে। সব ঘোরালো। সাদা কাপড় কেবল ব্রাহ্মণদের, বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের। তাঁহারা তো তুলার কাপড় বড়ো একটা পরেন না, পাটের কাপড় পড়েন। গরদ ক্ষীরোদ পরেন, তাহার রঙ ঘোরালো নয় বটে, কিন্তু দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

স্থির হইয়াছিল যে, মহারাজা যখন সভায় আসিবেন, তখন রণবাদ্য বাজিবে না। তাঁহার নৌকা হইতে সভা পর্যন্ত লুই-সিদ্ধার কীর্তনিয়া-দল রাস্তার দুই ধারে দাঁড়াইয়া কীর্তন করিবে। ময়ূরপঙ্খী হইতে সভা পর্যন্ত রাঙা বনাত পাতা হইল, বনাতের দুই ধারে কীর্তনিয়ারা প্রস্তুত হইয়া রহিল, ক্রমে ময়ূরপঙ্খীর সিঁড়ি পড়িল। ভাট ও চারণেরা যশোগান আরম্ভ করিল, কীর্তনিয়ারা খোলে চাঁটি দিল, তাহারা কেবল ধরিল—

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপএ দারিক দাদশ ভুঅণেং লধা॥[২৪]

২

রাজা দাঁড়াইয়া কীর্তনের গান শুনিলেন, কীর্তনিয়াদের সংগত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং ইঙ্গিত করিলেন—তাহারা পুরস্কারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কীর্তনিয়ারা রাজার মুখে প্রশংসা শুনিয়া উৎফুল্ল হইল, তাহাদের বাজনা আরো জমিতে লাগিল। রাজা ধীরে ধীরে তাহাদের বাজনা শুনিতে শুনিতে, তাহাদের যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে, সভার কাছে আসিলেন। সেখানে কয়েকটি পাকা ইটের ধাপ ছিল, সেই ধাপে উঠিয়া সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সভাস্থ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, দাঁড়াইলেন না কেবল ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা। রাজা নিকটে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। কেহ জয়োস্তু, কেহ কল্যাণমস্তু, কেহ বা দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া উঠিলেন। সভার ঠিক মাঝখান দিয়া রাজা পশ্চিম মুখে গিয়া, সভার পশ্চিম সীমায় তাঁহার জন্য যে সিংহাসন ছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—

"প্রায় একশত বৎসর হইল, কনোজে রাজসভা হইয়াছিল। তাহার পর আর কোথাও রাজসভা হওয়ার কথা শুনা যায় না। আমাদের পূজনীয় ভবতারণ পিশাচখণ্ডী মহাশয়ের কথায় আমরা গত বৎসর এই-দিনে এইখানে রাজসভা করিব স্বীকার করিয়াছিলাম এবং তিনিই সারা আর্যাবর্ত নিমন্ত্রণের ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম ভারতে মহা-অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়, তিনি কনোজের ওদিকে যাইতে পারেন নাই। তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, বরং ভালোই হইয়াছে। কারণ ইহা অপেক্ষা বড়ো সভা হইলে, আমি তো সাম-লাইতেই পারিতাম না। আর গুণীজনের উপযুক্তরূপ আদর না হইলে তাঁহাদের ক্ষোভ হইত, তাহাতে গুণের উৎকর্ষ না হইয়া অপকর্ষই ফল হইত। যাহা হউক, যাহা হয় ভালোর জন্যই হয়, মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বলিয়া, যাহা হইয়াছে, তাহাই উত্তম হইয়াছে বলিয়া মাথা পাতিয়া লইলাম। এখন আপনারা এই নিয়মে পারিতোষিক দিন। প্রথম শাস্ত্রে, তাহার পর শিল্পে ও কলায়, তাহার পর কাব্যে। বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট মহাশয় শাস্ত্রে প্রবীণ আচার্য মহাশয়দের আমার নিকটে উপস্থিত করুন।"

তখন ভবদেব উঠিয়া তাঁহার জন্য যে আসন ছিল, তাহাতে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"মহারাজাধিরাজ, শাস্ত্রে-প্রবীণ যত পণ্ডিত এক্ষণে ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে গেলেই আচার্য উদয়নের নাম করিতে হয়। তিনি নিমন্ত্রণের সময় কাশীতে ছিলেন। মস্করী তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া এখানে আনিয়াছেন। তিনি এ সভায় উপস্থিত। আচার্য উদয়নের মতো প্রবল পণ্ডিত এ সভায় যে উপস্থিত হইয়াছেন, সে মহারাজ ও মহারাজের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত পুণ্যের ফলে। যাঁহাকে দেখিলে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা উদয়নকে আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি নিজে উদয়নের নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মহারাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দণ্ডবৎ হইয়া উদয়নাচার্যকে প্রণাম করিলেন, সভাসুদ্ধ লোক তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল। মহারাজা বলিলেন—

"আচার্য, আপনি শাস্ত্র-গগনে আদিত্যস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ। আমরা খদ্যোত, আপনাকে কি আলোক দিব জানি না। আপনার পাণ্ডিত্যে সারা ভারত মুগ্ধ, আপনি সাগর সমান সমস্ত দর্শন অগস্ত্যের মতো এক চুমুকে পান করিয়াছেন, আপনি যে এ সভায় আসিয়াছেন, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ— সভা কৃতার্থ, সারা বাংলা কৃতার্থ। এ সভাই যে দণ্ডবৎ করিয়া কৃতার্থ হইল, এমন নহে, ইহাতে সারা বাংলা— এমন কি, সারা ভারতবর্ষও কৃতার্থ হইল। আমরা যখন আপনার আগমনেই কৃতার্থ, তখন আমরা আপনার কি সম্মান করিতে পারি! তথাপি আপনি আমাদের এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।"

বলিয়া রাজা তাঁহার মাথায় মহামূল্য মুকুট ও গলায় মহামূল্য হার পরাইয়া দিলেন।

উদয়নাচার্য বলিলেন—

"মহারাজাধিরাজ, আপনি অষ্ট-দিক্‌পালের অংশে নির্মিত। ধরা-ধামে আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। যে ঈশ্বর-প্রতিপাদনের জন্য বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া ঋষিগণ, মুনিগণ, আচার্যগণ চেষ্টা করিতেছেন, আপনি সেই ঈশ্বরের চলৎপ্রতিমা। আমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ছিল,

তাই আপনি আমায় এরূপ সময়ে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। আর আপনি যে আমায় এতটা আপ্যায়িত করিলেন, তাহার বিশেষ কোনো কারণ দেখি না। কারণ, এইরূপ রাজ-সভায় পরীক্ষা দিয়াই পাণিনি, ব্যাড়ি, পিঙ্গল, কাত্যায়ন, বররুচি, বর্ষ, উপবর্ষ, কালিদাস, মণ্ঠ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও কাব্যকারেরা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের তুলনায় আমি তো কোন্ ছার! আমার সম্মান করিয়া আপনি আপনারই উদার হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। আমার গুণপনা বড়োই অল্প।"

উদয়ন গিয়া বসিলেন, বাজনা বাজিয়া উঠিল। ডাক হইল রত্নাকর শান্তির[২৫]। ডাক হইবামাত্র গুরুপুত্র নিজ আসন ত্যাগ করিয়া রত্নাকর শান্তির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"মহারাজাধিরাজ, ইঁনি রত্নাকর শান্তি, বিক্রমশীল বিহারের দ্বার-রক্ষক। ইঁহার নিকট বিদ্যার পরিচয় না দিয়া কেহ সে বিহারে প্রবেশ করিতে পারে না। ইঁনি দার্শনিক, ইঁনি নৈয়ায়িক, ইঁনি সিদ্ধপুরুষ, ইঁনি বোধিসত্ত্ব। বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল জটিল অংশ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই, সেগুলি ইঁনি মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী। ইঁনি বাংলা ভাষায় একজন অতি সুকবি।"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন—

"আচার্য, ভদন্ত, পিণ্ডপাতিক, আপনার নাম আমি বহুদিন হইতে শুনিতেছি। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল, আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ হইল। আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন।" বলিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন।

তিনি বলিলেন—

"মহারাজাধিরাজ, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি গণপতি, এই সারা বাংলার গণের আপনি মুখপাত্র। আপনার মুখে আমার দেশ আমায় ভালো বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় মানুষের, বিশেষ আমার মতো ভিক্ষুর, কি হইতে পারে!" বলিয়া তিনি আপন জায়গায় গিয়া বসিলেন। আবার বাজনা বাজিল।

তাহার পর ডাক হইল শ্রীধরের, তাহার পর প্রজ্ঞাকর মতির— এই-রূপে একজন হিন্দু ও তাহার পর একজন বৌদ্ধের ডাক হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষের দশ বার করিয়া ডাক হইবার পর হরিবর্মা অবশিষ্ট পণ্ডিতগণের সেবার ভার ভবদেব ও গুরুপুত্রের হাতে দিয়া মস্করীকে সঙ্গে লইয়া সভার আর-এক অংশে যেখানে শিল্পকলার বিশেষ নিদর্শনগুলি সাজানো ছিল, সেইখানে গেলেন, এবং যাহার শিল্প পছন্দ হইল, তাহাকে পুরস্কার দিতে লাগিলেন।

৩

রাজা প্রথম দেখিলেন— একটি বিষ্ণুমূর্তি তামার তৈয়ারি, তাহার উপর সোনার পাত মোড়া। এই মূর্তি দেশের লোক সোনার মূর্তিই বলে। মূর্তি গরুড়ের উপর বসিয়া আছেন, গরুড় পাথরের। তাহার ঠোঁটটি লাল টুকটুকে পাথরের, পাখা-গুলি পাখির পাখার মতো সবুজ পাথরের, চোখ দুটি পান্নার, চোখের কালোটুকু নীলার, সাদাটুকু আগেটের, মূর্তিটির ভাবভঙ্গি চমৎকার, যেন সমস্ত জগৎকে আশীর্বাদ করিতেছেন— সকলের উপর স্নেহ ছড়াইয়া দিতেছেন। রাজা মূর্তি দেখিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। শিল্পীকে ডাকাইলেন, তাহার নাম শাক্যসিংহ সেগরা। রাজা তাহার মাথায় ফেটা বাঁধিয়া দিলেন ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন। সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া রাজার, মস্করীর ও আর-আর সকলের পায়ের ধুলা লইয়া বিদায় হইল।

তাহার পর একটি লোকেশ্বর মূর্তি, সমস্তটাই সাদা পাথরের— মার্বেলের চেয়েও সাদা, আর খুব পালিশ করা, খুব মাজা। চোখ দুটি কালো পাথরের, তাহার মধ্যে হীরা। দাঁড়ামূর্তি, গলায় পইতা, দুই হাত, দুই পা। দুদিক দিয়া দুটা পদ্ম উঠিয়া ডাইনে ও বামে কানের কাছে ফুটিয়া আছে। দুই ভুরুর মাঝখানে একটি অমিতাভের মূর্তি ; অমিতাভ লোকেশ্বরের গুরু। মূর্তিটির ঠোঁট দেখিলেই বোধ হয়, যেন হাসিতেছেন। রাজা দেখিয়া বড়ো খুশি হইলেন। ভাস্করকে ডাকাইলেন। তাহার নাম লোকনাথ চাকি, বাড়ি বরেন্দ্রভূমি। বৃদ্ধ ভাস্করের কাজ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

করিয়া পাকিয়া গিয়াছে। রাজা তাহাকে পুরস্কার দিলেন। সে পায়ের ধুলা লইয়া প্রস্থান করিল।

তাহার পর শিবের সেই জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তিটি। মস্করী এই মূর্তি মহাবিহারে দেখিয়াছিলেন। মহারাজ দেখিয়াই মূর্তিটি পাইবার জন্য বার বার জিদ করিতে লাগিলেন। শিল্পী বলিল, "সে দিতে অপারগ। কাশীর এক বেনিয়ার আদেশে সে ঐ লিঙ্গমূর্তি তৈয়ার করিয়াছে। কেবল গুরুপুত্রের জিদে সে দেখাইবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন--

"আর-একটি এইরূপ শিবলিঙ্গ তৈয়ার করিতে কতদিন লাগিবে?"

সে বলিল, "দু বৎসর।"

তিনি বলিলেন, "তবে একটি আমার জন্য করিয়া দিবে।"

এই বলিয়া শিল্পীকে পুরস্কার দিলেন এবং তাহার গুণের অনেক গরিমা করিলেন।

তাহার পর গহনা। একখানি তাড়, সোনার। তাড়ের উপর দশ অবতার— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বুদ্ধ (জগন্নাথ), বামন, রাম, রাম, রাম ও কল্কি। রাজা বিশেষ ঠাওর করিয়া দেখিলেন, বলিলেন—

"বুদ্ধের স্থান তো নবম হওয়া উচিত।" মস্করী হাসিয়া বলিলেন—

"বুদ্ধকে দশের মধ্যে লওয়াই হইয়াছে অল্পদিন। কিন্তু উঁহার স্থান এখনো ঠিক হয় নাই; যাহারা বুদ্ধকে মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহাদের কাছে উনি নবম, আর যাহারা উঁহার আকার-প্রকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া মনে করে না, তাহারা বামনের পূর্বেই উঁহার জায়গা করে, অর্থাৎ এখনো তিনি মানুষ হয়েন নাই উঁহার হাত পা এখনো ঠিক হয় নাই।"

শিল্পীকে পুরস্কার দিয়া রাজা অন্যত্র গেলেন।

দেখিলেন-- একটি হাতির দাঁতের মুখ। ঠোঁট দুটি ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে দুই পাটিতে অনেকগুলি দাঁত দেখা যাইতেছে। দাঁতগুলির উপর কালোরঙের খুব কাজ করা। প্রথম সব দাঁতেই কালো খিলান, খিলানের মধ্যে কোথাও একটা ফুল, কোথাও একটা ফল, কোথাও একটা তারা, কোথাও একটা ঘটি, কোথাও একটা বাটি। দেখিয়াই রাজা বলিলেন, "এ কি?"

মস্করী বলিলেন, "উহার নাম দন্ত-অঙ্গরাগ। সেকালে মেয়েরা

দাঁতে মিশি দিয়া এইরূপ করিয়া কারিকরি করিত। এখনো করে, তবে সকলে জানে না বলিয়া আমি ফরমাশ দিয়া হাতির দাঁতের উপর অঙ্গ-রাগ করাইয়া রাখিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "বেশ।"

রাজা শিল্পীকে পুরস্কার দিলেন।

তারপর একখানি মন্দিরের শিলাপত্র। মার্বেলের ফুল-কাটা ধারি, ফুলগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট, সবগুলি পদ্ম। ছোটোর মধ্যে কেমন পরিষ্কার করিয়া আঁকা, তাহার মধ্যে পত্র। উপরে হরিবর্মার মুদ্রা। তাহার পর রাজার নাম ও উপাধি ও বিরুদাবলি, তাহার পর দাতার নাম, তাহার পর মন্দিরের দেবতার নাম। তাহার পর মন্দিরের সম্বিদ, দুটি কি তিনটি ধারা। তাহার পর তারিখ, তাহার পর খোদকারের নাম। সমস্তটি যেন একখানি গালিচা।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিল্পী কে?"

উত্তর, "বরেন্দ্রের ভাস্কর।"

রাজা তাহাকে পুরস্কার দিলেন।

তাহার পর বিধুভূষণ ফর্‌ফরের হরিপুর গ্রামের দানপত্র। তামার পাতা, কানা উঁচা করা ও তাহার উপর সরু কাজ করা। রাজা বিহারী খুব ভালো করিয়াই খোদাই করাইয়াছেন। মাথার উপর একখানা সিংহাসনে রাজা হরিবর্মদেব নিজে। তাহার নীচে স্বহস্তোঽয়ং শ্রীশ্রীহরিবর্মদেবস্য। তারপর, পত্র। গোড়ায়ই স্বস্তি, তাহার পর যদু-বংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণের নমস্কার। তাঁহারই বংশে হরিবর্মদেবের পিতামহ, তাঁহার পিতা, হরিবর্মদেব ও তাহার বিরুদাবলি, তাহার পর "কুশলী"। তাহার পর রাজকর্মচারীদিগের নাম করিয়া ইঁহাদিগকে "মানয়তি পূজয়তি সম্মানয়তি আজ্ঞাপয়তি চ।" আমি অমুকগোত্রের সপ্তশতী-প্রদেশাবিনির্গত বিধুভূষণ ফর্‌ফর্‌কে হরিপুর গ্রাম দান করিলাম, তোমরা ইহার অধিকার মানিয়া চলিবে। তাহার পর তারিখ, তাহার পর দূতকের নাম ও তাহার পর খোদকারের নাম। রাজা একটু হাসিলেন, খোদকারকে পুরস্কার দিলেন।

এবার ছবি। ছবি আঁকা সেকালে একটা বাতিক ছিল। সবাই ছবি আঁকিত। ছোটোলোকে অন্তত ঘরের দেওয়ালে দুটা ময়ূরও আঁকিয়া

রাখিত। বেনেদের বাড়ির দুপাশে দুটা টাকার থলি আঁকা থাকিত। আর তাহার সঙ্গে একপাশে একটা শাঁখ ও আর-এক পাশে একটা পদ্ম আঁকা থাকিত। লোককে বলিয়া দিত, এ বেনের এক শঙ্খ ও এক পদ্ম টাকা আছে। যে-দুখানি ছবি রাজাকে দেখানো হইল, তাহার এক-খানিতে নারায়ণ অনন্ত শয়নে শুইয়া আছেন, আর-একখানিতে দুই শালগাছের মধ্যে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করিতেছেন। দুইটিই শোয়া-মূর্তি। দুইটিই ডানপাশে শুইয়া আছেন ; ডান হাতটি গালে। বাঁ হাতটি আজানুলম্বিত, উরথের উপর অলসভাবে পড়িয়া আছে। রাজা বিষম ফাঁপড়ে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই জন শিল্পীকেই সমান পুরস্কার দিলেন। দুই জনের ডাক হইল, একজনই দুই বার আসিল ও দুইটি পুরস্কার লইয়া গেল। রাজা আরো আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

দুখানি পুঁথি দেখানো হইল। একখানি তালপাতায় লেখা, আর-একখানি মোটা কয়গদের উপর কালো রঙ করিয়া তাহার উপর সোনার জলে লেখা। অক্ষরগুলি "সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ", সুতা চালাইবার জন্য মাঝখানে একটি ছোটো চৌকা ফাঁক। ডাইন ধারে কিনারায় অক্ষর দিয়া পত্রাঙ্ক লেখা। আর বাঁ ধারে অঙ্ক দিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া। মাঝে মাঝে ছবি দেওয়া। ছবিগুলি ছোটো, পরিষ্কার, আর তার রঙ খুব উজ্জ্বল। একখানি অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা[২৬], আর একখানি চক্রসম্বরতন্ত্র[২৭]। রাজা দেখিলেন, আর দুজনকেই পুরস্কার দিলেন।

## ৪

তারপর গান-বাজনা। রাজা পূর্বেই কীর্তনিয়াদের পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন তাহারা সকলে শিরোপা লইয়া গেল। একদল জলের উপর কাটি বাজাইয়া, তাহাতে অনেক বোল ফুটাইতে লাগিল। ইহার নাম উদকঘাত ও উদকবাদ্য। একজন বাঁশি বাজাইল। একদল তারে বাজাইল। এক-দল চামড়ায় ঘা দিয়া বাজাইল। আর-একদল ধাতুতে ঘা দিয়া বাজাইল। সবাই সিদ্ধহস্ত। রাজাও একজন প্রধান সমজদার, তিনি খুব খুশি হইলেন ও সকলকেই পারিতোষিক দিলেন।

নাচ আসিল। সেকালে সবাই নাচিতে জানিত। ছেলেও জানিত, মেয়েও জানিত। যুবাও জানিত, বুড়াও জানিত। নাচায় দোষ মনে করিত না; বরং গুণ মনে করিত। এখন অনেকে আশ্চর্য হন— পুরাতন যাত্রার দলে সবাই নাচে।— কৃষ্ণও নাচেন, রাধাও নাচেন, নন্দও নাচেন, যশোদাও নাচেন, বিদ্যাও নাচেন, সুন্দরও নাচেন, রাজাও নাচেন, রানীও নাচেন। এখনকার লোক মনে করেন, এটা অসভ্য। কিন্তু সেকালে কেহ এরূপ মনে করিত না। নাচের কায়দা— বড়ো কায়দা। মনের ভাব প্রকাশের জন্য হাত-পা নাড়া আর অঙ্গ-ভঙ্গি করার নাম অঙ্গহার। এইরূপ তিন-চারি অঙ্গহার এক করিয়া মনের গভীর ভাব প্রকাশ করার নাম করণ। করণ হইতে যে গভীর ভাব প্রকাশ হয়, তাহার নাম ভাব। যে সব লইয়া ভাব, তাহার নাম বিভাব। ভাবের কার্যকে অনুভাব বলে। এইগুলি সব ফুটিয়া উঠিলে রস হয়, রসের আস্বাদ হইলে নৃত্যে তাহা প্রকাশ হয়; সেইজন্য নৃত্যের এত আদর। ভারতে স্ত্রী-মূর্তি কোথাও অঙ্গহার ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি যেমন খাড়া-দাঁড়া— ধীর-গম্ভীর, স্ত্রী-মূর্তি সেরূপ দেখিতেই পাইবে না। তাহার সঙ্গে একটা-না-একটা অঙ্গহার আছেই আছে। রাজা দু-চারি জায়গায় নৃত্য দেখিলেন ও পুরস্কার দিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর খেলা। মেড়ার লড়াই, কুঁকড়ার লড়াই, পাখির লড়াই দেখিলেন। কুস্তি দেখিলেন, কত রকম কসলৎ দেখিলেন, লাঠি-খেলা দেখিলেন, তলোয়ার-খেলা দেখিলেন, তীর-ধনুকের টিফ দেখিলেন। কত রকম ইন্দ্রজাল দেখিলেন, আগুনের উপর চলিতে দেখিলেন। আতস-বাজি দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ণচন্দ্র লাল্‌চে-আভা ত্যাগ করিয়া একেবারে সাদা হইয়া গেলেন; আর আকাশের পূর্বপ্রান্ত ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। নদীতে যেমন হাঁস চলিয়া যায়, চলাচল কিছুই দেখা যায় না, বোধ হয় যেন ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ হাঁস মহাশয় ভিতরে ভিতরে বেশ পা নাড়িতেছেন, আর স্রোতের বিরুদ্ধেই যাইতেছেন— নদীতে হাঁস যেমন চলিয়া যায়, চাঁদ তেমনি আকাশে উঠিতেছেন। কিছু দূর উঠিলে সুধাভাণ্ড হইতে যেমন সুধা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি একটি চাঁদ হইতে শত শত ধারা বাহির হইয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পরিপূর্ণ করিয়া উঠিতেছে। চাঁদের আলো গঙ্গায়

পড়িয়া গঙ্গার সাদা জলের সঙ্গে মেশামিশি করিয়া এক অদ্ভুত সাদা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর বালিও সাদা, এ তো সমুদ্রের বালি নয় বা দামোদরের বালিও নয় যে, হলদে হবে বা রাঙা হবে। এ যে গঙ্গার বালি, তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে। সেও এক বিচিত্র বোধ হইতেছে— যেন পঙ্খের কাজ করা মেঝেতে দুধ ঢালিয়া রাখিয়াছে। চড়ায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে, ঘাসের উপর চাঁদের আলো খেলিতেছে; আর যত লোক ছিল, সকলের কাপড়ের রঙ বদলাইয়া দিতেছে। ঘোরালো লালের উপর সাদা পড়িতেছে, ঘোরালো কালোর উপর ঘন সাদা পড়িতেছে, ঘোরালো নীলের উপর ঘন সাদা পড়িতেছে, জরদার উপর ঘন সাদা পড়িতেছে। একটা বিচিত্র শোভা হইয়াছে, একটা বিচিত্র আনন্দ, একটা বিচিত্র সুখ হইয়াছে। তাহার উপর সকলেই পারিতোষিক পাইয়াছে, বাহবা পাইয়াছে, সকলেই প্রফুল্ল-উৎফুল্ল। দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। বাতাসের দাঁত নাই। বরং একটু একটু মিঠে মিঠে ঘাম হইতেছে।

রাজা বলিলেন, "এইবার কাব্যের পরীক্ষা।"

শ্রীহীর পণ্ডিত উদয়নের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুজনের বেশ রেষারেষি চলিত। উদয়নের প্রথমেই পূজা হওয়ায় এবং সমস্ত সভাসুদ্ধ লোক দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করায় ও আপনাকে পাঁচ-কি-ছয়ের পর ডাকায় হীর পণ্ডিত বড়োই মর্মাহত হইয়াছিলেন। মস্করী অত্যন্ত জিদ করায় তিনি আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কুকার্য করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। মস্করী এ কথা জানিতেন, ভবদেবও এ কথা জানিতেন। তাই কাব্যপরীক্ষার প্রথমেই শ্রীহীরপণ্ডিতের পুত্র শ্রীহর্ষের[২৮] ডাক হইল। শ্রীহর্ষ তখন যুবা পুরুষ। কিন্তু কাব্যে ও দর্শনে গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছে। কনোজের রাজা তাঁহাকে আদর করিয়া সভামধ্যে দুইটি পান ও একখানি আসন দিয়াছিলেন। তিনি চিন্তামণি-মন্ত্রে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। স্থির-গম্ভীর পদক্ষেপে তিনি আসিলেন, অথচ কোনো দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার সুন্দর গৌর বর্ণ, চক্ষু ও মুখের জ্যোতিঃ, তাঁহার নম্রভাব দেখিয়া সভাসুদ্ধ লোক মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি আসিলে রাজা তাঁহাকে নিজের একটি কবিতা পড়িতে বলিলেন। তিনি পড়িলেন—

নিলীয়তে হ্রীবিজিতঃ স জৈত্রং
শ্রুত্বা বিধুস্তস্য মুখং মুখান্নঃ।
সূরে সমুদ্রস্য কদাপি পূরে
কদাচিদভ্রভ্রমদভ্রগর্ভে।[২৯]

শুনিয়া রাজা আশ্চর্য হইয়া গেলেন। বলিলেন, "কি পাণ্ডিত্য! কি শব্দের লালিত্য! কি অনুপ্রাসের ছটা! আপনি আমার রাজত্বের একখানা কাব্য লিখিয়া দিবেন ?"

শ্রীহর্ষ বলিলেন, "আমি গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি নামে একখানি কাব্যের পত্তন করিয়াছি। ঐ কাব্যে মহারাজাই নায়ক হইবেন।"

রাজা বলিলেন, "আমি বলার আগেই পত্তন করিয়াছেন ?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।"

রাজা তাঁহার মস্তকে মুকুট ও গলায় হার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন : আর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

তারপর [ ডাক হইল ] আর্য ক্ষেমীশ্বর[৩০]। ইনি পাল-রাজাদের কবি। ইনি হিন্দু কি বৌদ্ধ, বুঝা যায় না। ইনি ভিক্ষু হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর বিবাহ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এরূপ করিতেন, তাঁহাদের লোকে আর্য বলিত। যাঁহারা বিবাহ না করিয়া ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের অনার্য বলিত। অনার্যেরা আর্যদের নমস্কার করিতেন না। ক্ষেমীশ্বরের কবিত্ব-খ্যাতি খুব ছিল। তিনি আসিলে রাজা তাঁহাকে নিজের একটি কবিতা পড়িতে বলিলেন। রাজা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন। তাহার পর আসিলেন বজ্রদত্ত। তিনি লোকেশ্বরের স্তব পাঠ করিলেন। তাঁহার উচ্চারণের অনেক দোষ ছিল। তিনি 'ড়'কে 'র' ও 'র'কে 'ড়' করিতে লাগিলেন, 'স্ত'কে 'ষ্ট' ও 'ষ্ট'কে 'স্ত' করিতে লাগিলেন। 'দৃঢ়' 'দিহ' হইয়া গেল, অচৈতীৎ 'অচৌতি' হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার গলার স্বর, পাঠের ভঙ্গি ও ভক্তিগদ্‌গদভাব সভাস্থ লোককে মুগ্ধ করিয়া দিল। রাজা তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন।

পরে আসিলেন— ধপল হুহু, তিনি একটি কবিতা পড়িলেন, তিনি কোন্ দেশের লোক, জানা যায় না ; তবে তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে কিছুই বিরক্ত হইলেন

না, বলিলেন, "আমরা বিদেশাবাসী— দেবাবাণী আমাদেরা মুখা হতে সারে না।"

তাহার পর আসিলেন জয়ভদ্র, বাড়ি সিংহলদ্বীপ, বহুকাল বাংলায় বাস করিতেছেন, দু-চারিখানা তন্ত্রের টীকাও লিখিয়াছেন, সংস্কৃত জানেন বলিয়া অভিমানও করিয়া থাকেন। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা হাসিতে লাগিলেন, বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা গদ্‌গদ হইয়া গেলেন। তিনি একটু চটিয়া বলিলেন, "ভগবান্ 'সর্ব্বারুতানুকারিণী' ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন। আমরা ব্রাহ্মণদের মতো 'সুশব্দবাদী' নই। কিন্তু আমাদের যা আছে, তোমাদের তা নাই। অস্মাকানাং সৌগতানাং অর্থাৎ তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা। আমাদের 'অর্থশরণতা' তোমাদের নাই।"

সংস্কৃত কবিতা শেষ হইয়া গেলে প্রাকৃত কবিতা আরম্ভ হইল। প্রাকৃত তো একটি ভাষা নয়। তার ভিতরে মাগধী আছে, অর্ধমাগধী আছে, শৌরসেনী আছে, মহারাষ্ট্রী আছে, পৈশাচী আছে, ঢক্কী আছে, ঢেক্করী আছে, তাহার উপর অপভ্রংশ আছে, মিশ্রভাষা আছে। একজন দুলিয়া দুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
তব রূপ সুরূপ সুশোভনকো
বশবর্ত্তি সুলক্ষণ বিচিত্রতকো॥
বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেবনরাণ বসন্তুতিকাঃ।
উঁত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্ল্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥[৩১]

সেকালে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ছয়টা ভাষায় কবিতা লিখিতে না পারিলে, সে মহাকবি হইতেই পারে না। তাই যাহারা শুধু বাংলাতেই কবিতা লিখিত, তাহাদের কবি না বলিয়া 'পদকর্তা' বলা হইত।

পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমে আসিলেন চাটিলপাদ— আসিয়া অতি মধুর স্বরে পড়িতে লাগিলেন—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মঝেঁ ণ থাহী॥

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥
*　　*　　*
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডি বোহি দূর ম জাহী ॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী ॥৩২

সভাসুদ্ধ লোক 'ধন্য ধন্য' করিয়া উঠিল। তখন বীণাপাদ আসিয়া মৃদুমধুর সুরে তালে তালে পড়িলেন—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকী কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥৩৩

তিনি বসিয়া পড়িলেন। জয় জয় শব্দে সভাস্থল ভরিয়া গেল।

তাহার পর আসিলেন সরহপাদ। অতি গম্ভীর মূর্তি, উদাস দৃষ্টি, ধীরে ধীরে অতি-গভীর-স্বরে পড়িলেন—

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥
অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥৩৪

সভা নির্বাক্-নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার কবিতা শুনিতে লাগিল।

মস্করী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, মায়া ও গুরুপুত্র সকলের শেষে আসিবেন। মায়া আসিলেন। তিনি এখন রাজকুমারী। যদিও সাদা সাটী মাত্র পরা, মাথা একরূপ মুড়ানোই; কিন্তু এখন তাঁহার মুখে স্বর্গের জ্যোতি— বিষাদের চিহ্নও নাই। বোধ হয় যেন কি এক

স্বর্গীয় বস্তু লাভ করিয়া তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সভামধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার রূপে সভা আলো হইয়া গেল। তাঁহার দৃষ্টি নিজের পায়ের উপর। তিনি একবার আকাশের দিকে চাহিয়া, দুই হাত তুলিয়া কাহাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর রমণীর কমকণ্ঠে বেশ চড়া সুরে পদ ধরিলেন—

হিণ্ডই জগমাঝ সবরী সবরা রে
সবরা পলাএল ন জার্নাম কাঁহি গই পইঠা রে।
ঢুণ্ঢিল চউদ্দ ভুবন সবরী সবরা রে
সবরা পলাএল ভইল সবরী বিআউলা রে ॥
মিলনক নহি আসা সবরী নাম লই রহিলা রে
রূপ ধিয়ানে অহর্নিশি মগণা গুঙাইলা রে।
নাম সোঙরি, নাম হিঅ ধরি, রূপ ধিয়ানি রে
সবরার নাম রূপ ধরি সবরি মাতেলা রে ॥
সুজ সসি জগ তারা নামরূপে ডুবিলা রে
বাম দাহিণ উচ নীচ সামন পিছাই রে।
সব ভরিল রূপ ধিয়ানে তাহে নাম মিলিলারে
নামরূপ ধিয়ানে সবরী ভইল ণঠারে ॥
মেরু সিহরবর এক ভই দুহু মিলিলা রে
লোণ জল জিম দুহু মিলিলা রে।
এক হোই বারমতি মাঝই দুহু মিলিলা রে ॥[৩৫]

সভা নিস্তব্ধ। মায়ার কথা সভার সকল লোকই জানিত, তিনি যে আপনার স্বামীর উদ্দেশে শবরী সাজিয়াছেন, তাহা কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি যে শবরকে খুঁজিতেছেন, তাহাও কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি যে সুমেরুশিখরে অর্থাৎ সপ্তস্বর্গের উপরে শবরের সহিত মিলিয়া অনন্তে মিশিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না। শবর কাছে নাই, তিনি তাঁহার নামরূপ ধ্যান করিতে করিতে অনন্তে নিলীন হইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্বে শবরের সহিত এক হওয়া চাই। তাঁহার দৃষ্টিতে ক্রমে সূর্য-চন্দ্র-তারা-পৃথিবী সব লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল শবরের নামরূপ আর তিনি। ক্রমে নামও রূপে ডুবিয়া গেল,

ক্রমে ক্রমে তিনিও সেই রূপে ডুবিলেন। সে রূপ ক্রমে অনন্ত হইয়া অনন্ত ভরিয়া দিল।

কিছুক্ষণ সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল, সকলেরই কানে তখনো মায়ার সুর লাগিয়া আছে। ক্রমে সুরের মোহ যেমন কাটিতে লাগিল, তেমনি তাহারা ভাবের মোহে ডুবিতে লাগিল। যখন সে মোহও কাটিয়া গেল, তখন সকলে এক স্বরে মায়ার জয়জয়কার করিয়া উঠিল। এ জয়জয়কার দুপক্ষ হইতেই উঠিল। হিন্দুরাও যেমন জয়জয়কার করিল, বৌদ্ধেরাও তেমনি জয়জয়কার করিল।

সকলের শেষে গুরুপুত্র। গুরুপুত্রের চেহারা তো রাজপুত্রেরই মতো। তাহার উপর পরিপাটি করিয়া আজ বেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধভিক্ষুরই মতো কাপড় পরিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সব রেশমের তৈয়ারি। তাহার আঁচলায় ও পাড়ে সল্‌মাচুম্‌কির কাজ করা। তিনি ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলেন এবং গুন্‌ গুন্‌ স্বরে তথাগতস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার পর একটি পদ ধরিলেন। তাঁহার সুর মেয়েমানুষের মতো চড়া ও সরু। পুরুষের গলায় এ সুর মানায় না : কিন্তু তিনি এই সুরে উপদেশ দেন, বক্তৃতা করেন, ব্যাখ্যা করেন, কীর্তনও করেন। সাত-গাঁয়ের লোকের সে সুর বেশ পরিচিত, বাহিরের লোকের তত পরিচিত নয়। তিনি ধরিলেন—

> বহই নাবী মাঝ সমুদারে, দুপ্পহর বেলা।
> দারুণ পিআসা, হিঅ মোর বাধই, কণ্ঠ শোষ গেলা ॥
> নির্ম্মাহ পাণী, পিব ন সকই, অহর্ণিসি তিষ বাধই।
> চেব ন সকই, লোণ পইসই, অহর্ণিসি তিষ বাঢ়ই ॥
> অকট জোই, নিবাণ চাহই, জোইনী বিনু নাহি পাইব।
> জোইনি সত্তি, জোইনি ভত্তি, তবহুঁ নিবান সাধব ॥
> জোইনি সাধী রহই, বিমুহি মোরে, নাহি পাতআই।
> নঅনের কোণে কভু নাহি হেরই, বিনু ফল মোর জনু জাই ॥[৩৬]

এ গানের অর্থ বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না। গুরুপুত্র সমুদ্রের মধ্যে নৌকায় বসিয়া আছেন। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু জল লোনা। জল খাইবার জো নাই। জল দেখিতেছেন— তৃষ্ণা বাড়িতেছে। শেষ প্রাণ যায় যায়। যোগী নির্বাণ চাহিতেছেন, কিন্তু

শাস্তি নাই। যাহাকে শাস্তি করিতে তিনি চান, সে সম্মুখেই আছে; কিন্তু সে ফিরিয়াও চায় না। তাঁহার জীবন বৃথায় যাইতেছে।

গান থামিল। বিহারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মায়ার মনে হইল— পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও। সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। সাত-গাঁয়ের লোক খুবই বিরক্ত হইল। এমনটা যে হবে, গুরুপুত্র বুঝেন নাই। তাঁহার পুরস্কার হইল। তিনি ফিরিলেন। সভার লোক কেহই সাধুবাদ বা জয়ধ্বনি করিল না। এতটা যে হবে, গুরুপুত্র বুঝিতে পারেন নাই। তিনি আসিয়া লুই-সিদ্ধার কাছে বসিলেন। লুই-সিদ্ধা দেখিলেন রাজা ও ভবদেব তাঁহাদের দিকে চাহিয়া কি দু-চারিটা কথা কহিলেন। ভয়ে লুই-সিদ্ধার প্রাণ উড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার চাঁদ ভাসিতে ভাসিতে সভার মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। চাঁদের সে ঘন আলোয় সভাস্থল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চারি দিকে গঙ্গার জলের উপর যেন দুধ ঢালিয়া দিল। সভা ভঙ্গ হইল। শত শত কীর্তনিয়ার দল খোলে চাঁটি দিল। রাজা উঠিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে নৌকায় উঠিলেন। যে যাহার বাড়ি যাইবার জন্য নৌকা খুঁজিতে লাগিল। লুই-সিদ্ধা গুরুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া একখানি নৌকায় উঠিলেন, সেখানিতে আর-কাহাকেও উঠিতে দিলেন না। শত শত নৌকা গঙ্গাবক্ষ আলোড়িত করিয়া সাতগাঁর দিকে ছুটিল।

নির্জন পাইয়া লুই-সিদ্ধা গুরুপুত্রকে বলিলেন—

"তোমার এখানে আর-এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। বোধ হয়, তুমি কে, হরিবর্মা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি ফিস্‌ফিস্ করিয়া ভব-দেবকে কি বলিলেন। তুমি পলাও।"

গুরুপুত্র। আমিও স্থির করিয়াছি, যুদ্ধে যাইব। কতকগুলি লোক-জনও যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি। বাগ্‌দিরা অনেকেই আমার সঙ্গে যাইতে চায়। মস্করীও যাইবে, আমিও যাইব।

লুই-সিদ্ধা। তোমার যুদ্ধে যাওয়া হইবে না। তুমি সঙ্ঘে আসিয়াছ। করুণাই তোমার মূল-মন্ত্র। যুদ্ধ বড়ো নিষ্ঠুরের কাজ। তোমার এখানে থাকা হইবে না। আমি ভাবিয়াছিলাম— তুমি সহজ-পন্থায় সিদ্ধিলাভ করিবে, কিন্তু তুমি এখনো আত্মজয়ী হইতে পার নাই।

তোমার দিনকতক অন্য পন্থা ধরিতে হইবে, মহাযান আশ্রয় করিতে হইবে। মহাযানে সিদ্ধিলাভ করিলে তখন তুমি সহজপন্থার মর্ম বুঝিতে পারিবে, আত্মজয়ী হইতে পারিবে, শূন্য ও করুণার অভেদ বুঝিবে। ভারতবর্ষে মহাযান শিক্ষার এক জায়গা আছে— নালন্দা। কিন্তু নালন্দার লোক বড়ো দাম্ভিক, সহজপন্থায় বড়োই দ্বেষ করে। তাহারা তোমাকে লইবে না। তাই আমি স্থির করিয়াছি, তোমায় সুবর্ণ-দ্বীপে যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া মহাযান শিক্ষা করো, তুমি অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষালাভ করিবে। আমি বিহারীকে বলিয়া কালই নৌকা আনাইয়া দিব।

গুরুপুত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি মহাবিহারে আসিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

### ১. সূত্র

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের পটভূমি বাংলায় মুসলমান অধিকারের আগের যুগের সামাজিক ইতিহাস। আমাদের ইতিহাসচর্চায় দীর্ঘদিন গবেষকদের মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল রাজবৃত্তের বিবরণ সংগ্রহের দিকে। শাসনকর্তৃত্বে পরিবর্তন ধারার ইতিহাসকেই দেশের ইতিহাস মনে করা হত। আমাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও সিংহাসন নিয়ে হানাহানির সেই 'রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান দৃশ্যপট' বিষয়রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এর পাশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাসবোধ, ইতিহাসের দৃষ্টি এক তাৎপর্যময় ব্যতিক্রম। দেশের মানুষের সামগ্রিক জীবনাচরণের তথ্যকেই তিনি প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান মনে করতেন। চাষ-আবাদ কারিগরি উৎপাদন ব্যাবসা-বাণিজ্য বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় এক-একটি যুগের যে-সামাজিক বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে, সামাজিক শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জনজীবনের ধারায় পর্ব থেকে পর্বান্তরে যে উদ্বর্তন ঘটে, সেই সচল সামাজিক ইতিহাসের ধারার বাস্তব পরিচয় উন্মোচন তাঁর গবেষক জীবনের ভাবনামন্ত্র ছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে গবেষণায় তিনি পথিকৃৎ, বাঙালির যথার্থ ইতিহাসের প্রাথমিক বহু উপাদান তাঁরই আবিষ্কার। সেই-সব উপাদান ব্যবহার করে 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে তিনি বাংলার প্রাচীন সমাজের সজীব প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রস্ফুট করে তুলেছেন।

উপন্যাসের শুরু ৯৯৫ খৃস্টাব্দে (পৃ. ২২৩ দ্র.)। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সুলতান মাহ্‌মুদের আক্রমণের উল্লেখ আছে— যা একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ঘটনা। থানেশ্বর আক্রান্ত হয় ১০১৪ খৃস্টাব্দে, কনৌজ ১০১৮-য়। কাহিনীটি একাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের পটে বিন্যস্ত। বেনে বিহারী দত্তর মেয়ে মায়ার শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণ, বিয়ে, বৈধব্য ও পোষ্যপুত্র নেবার গল্প বলা হয়েছে ১৮/২০ বৎসরের পরিসরে। অন্যদিকে এই কালসীমার মধ্যেই আনা হয়েছে বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাবের বিলয় এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জটিল সামাজিক ইতিহাস। বাঙালি সমাজের এ-রূপান্তর নিশ্চয়ই বিশ বছরের মধ্যে নিষ্পন্ন হয় নি। আরো দীর্ঘ সময় জুড়ে সমাজের স্তরে স্তরে বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে পরিবর্তন ঘটেছিল। সামাজিক রূপান্তরের ধারার সঙ্গে জড়িত আছে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির

উদ্যোগ ও প্রভাব বিস্তারের কাহিনী। দেশের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বৃত্তি-আশ্রিত জাতিগুলির সামাজিক মর্যাদার ওঠানামার, গোটা সমাজের বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে যাবার দীর্ঘ ইতিহাস এ-উপন্যাসে মাত্র দুটি দশকের সীমার মধ্যে বিবৃত হয়েছে। মূল গল্পের দিক থেকে আরোপিত সময়সীমা মানার বাধ্যবাধকতায় লেখক দীর্ঘতর কালে ব্যাপ্ত ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত সময়ের পটে স্থাপন করেছেন। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠেছে কালাতিক্রমণ। বাংলার ইতিহাসের এই পর্বের অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্র উপন্যাসে আনা হয়েছে। এঁরা সকলেই উপন্যাসের কালসীমার অন্তর্গত বা সমকালীন মানুষ নন। উপন্যাসটি রচনার সময় অবধি এঁদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আবিষ্কৃতও হয় নি। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসে হরিবর্মা বা ভবদেব ভট্টকে উপস্থাপন নিয়ে তাই আপত্তি ওঠে। একে ঐতিহাসিক বিচ্যুতি বলা যেতেও পারে, তবে উপন্যাসে এ-ধরনের কালাতিক্রমণ প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। এতে উপন্যাসের সাহিত্য-মূল্য কমে না। বিশেষত এ-রচনায় অত দূর কালের নানা স্তরের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক মান-মর্যাদার হেরফের, রুজি-রোজগার ধর্ম-কর্ম আচার-অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক আবহ সমেত গোটা সমাজের অখণ্ড-রূপ প্রত্যক্ষ করে তোলায় হরপ্রসাদ বিরল সৃজন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ-বাস্তবতা বিষয়ে অভ্রান্ত চেতনা না থাকলে এমন সৃষ্টি কখনো সম্ভব হয় না।

১. আদি সিদ্ধাচার্য লুই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার চর্যাগীতির প্রথম পদ 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' লুই-এর রচনা। এই সংকলনে তাঁর লেখা আর-একটি পদ, 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই' (২৯-সংখ্যক)। লুইপাদ, লূয়ীপাদ, লূয়ীচরণ— এইভাবেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত রূপ সহজযানের সাধকদের মধ্যে লুই-এর নাম অগ্রগণ্য, তিব্বতে ইনি আদি সিদ্ধাচার্য রূপে স্বীকৃত। লুই-এর জীবৎকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব কাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। তিব্বতি ভাষায় অনূদিত লুই-এর পাঁচখানি বইয়ের নাম পাওয়া যায়: ১. 'বজ্রসত্ত্বসাধন', ২. 'বুদ্ধোদয়', ৩. 'ভগবদ্‌ভিসময়', ৪. 'অভিসময়বিভঙ্গ', ৫. 'তত্ত্ব-স্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি'। 'অভিসময়বিভঙ্গ' বইটির সহ-রচয়িতা এবং তিব্বতি ভাষায় অনুবাদক রূপে দীপঙ্করশ্রী জ্ঞানের নাম থাকায় লুইকে তাঁর বর্ষীয়ান্ সমকালীন মনে করা যায়। দীপঙ্করশ্রীর জন্ম ৯৮২

খৃস্টাব্দে, ১০৪০ খৃস্টাব্দে তিনি বিক্রমশীল বিহার থেকে তিব্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই সূত্র অনুসারে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লুই বর্তমান ছিলেন ধরে নেওয়া যায়। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের ঘটনা-কালও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। হরপ্রসাদ বলেন, "আমি স্থির করিয়াছি যে তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নতুন সম্প্রদায় চালাইয়া যান। তাঁহাকে আদি সিদ্ধাচার্য্য বলে। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" (বৌ-গা-দো., পৃ. ২১)

লুই নামটির তিব্বতি ভাষায় রূপান্তর মৎস্যান্ত্রাদ। এই রূপান্তরিত নাম সম্পর্কে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন, "অর্থাৎ তিনি মাছের পোঁটা খাইতে বড়োই ভালোবাসিতেন। (কোন্ বাঙালিই বা না বাসেন!)।" (প্রাচীন বাংলার গৌরব, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩, পৃ. ৪৪)
লুই সম্পর্কে পূর্ণতর তথ্যের জন্য দ্র. *HB*-I. pp. 337-51 ; *ORC*, pp. 41-45, 444-45 ; *SM*-II, pp. xxxviii-ix ; *BE*, p. 69 ; বা-ই, পৃ. ৭২০ ; চ-গ-প, ভূমিকা।

২. চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক। নাড়, নাড়-পাদ, নাড়ো-পা, নাঢ়, নরোত্তম-পাদ, নারো প্রভৃতি নামে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। নাড় বা ণাড় শব্দের অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞাতক > জ্ঞাট > গ্নাট > ণাড়। জন্ম বরেন্দ্রভূমিতে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক জেতারির ছাত্র। নাড় পণ্ডিতকে রাজা নয়পালের (আ. ১০৩৮-৫৫ খৃ.) সমসাময়িক মনে করা হয়। মগধের পশ্চিমে ফুল্লহরিতে তিনি তন্ত্র সাধনা করেন। পরে বিক্রমশীল মহাবিহারের উত্তর-দ্বারের দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। নবাগত শিক্ষার্থীদের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করে নির্বাচনের দায়িত্ব থাকত দ্বার-পণ্ডিতদের উপরে। নাড় দীপঙ্করশ্রী জ্ঞানের অন্যতম শিক্ষাগুরু। তিব্বতের বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য মার-পা তাঁর ছাত্র। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর 'বজ্রগীতি', 'নাড়পণ্ডিত-গীতিকা', 'একবীরহেরুকসাধন', 'গুহ্যসমাজউপদেশপঞ্চকর্ম', 'বজ্রযোগিনী-গুহ্যসাধন' ইত্যাদি বইয়ের উল্লেখ আছে। ওয়াডেলের বইয়ে নাড় পণ্ডিতের ছবি আছে। "গোঁফদাড়ি কামানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখানকার বাউল সম্প্রদায়ের লোক।"

হরপ্রসাদ বলেন, যোগী হলেও নাড় পণ্ডিত গৃহাশ্রমে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নিগু, উপাধি জ্ঞানডাকিনী (শব্দটি বিদুষী অর্থে ব্যবহার হত)। এঁরা দুজনেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন।

নিগু নাড় পণ্ডিতের স্ত্রী— এই তথ্য কোথায় পেয়েছেন তা হরপ্রসাদ উল্লেখ করেন নি। তবে তেঙ্গুরের তালিকায় জ্ঞানডাকিনী নিগু বা নিগু

মা-র 'উপায়মার্গচণ্ডালিকাভাবনা', 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধি', 'প্রণিধানরাজ', 'মহামরজ্ঞান' প্রভৃতি বইয়ের উল্লেখ আছে। দ্র. *BLT*, p. 16 ; *HB*-I, pp. 419-20 ; *BE*, pp. 65-66 ; *2500 years*, pp. 200-01 ; বৌ-গা-দো, পৃ. ৩৩ ; শাস্ত্রী, 'সম্বোধন', সা-প-প, ২য় সংখ্যা, ১৩২৩।

৩. উদাস জাতি নেপালের নেওয়ার গোষ্ঠীর অন্তর্গত। গোঁড়া বৌদ্ধ নেওয়ারদের মধ্যে বন্হু। ভিন্ন 'উদাস', কাঁসার, আওয়ার প্রভৃতি সাতটি জাতি উদাস নামে পরিচিত। এঁরা মাথার চাঁদিতে চুলের গোছা গেরো দিয়ে রাখেন। হিন্দু মন্দিরে পুজো দেন না। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে 'উদাস'-রা বণিক, তিব্বত ও ভুটানে বাণিজ্য করেন। অন্য ছয়টি জাতি কারুকর্মী। ধাতু-পাথর-কাঠের কাজ করেন। দ্র. H. A. Oldfield, *Sketches from Nepal*, Delhi 1974, pp. 183-84.

৪. চর্যাগীতির ২৯-সংখ্যক পদের প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তি, লুই রচিত।

অনুবাদ : না হয় ভাব না যায় অভাব। এমন বোঝানোয় কে প্রত্যয় করে॥ লুই বলে— মূর্খ, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য। ত্রিধাতুতে বিলাস করে, কিন্তু তার সন্ধান নাই ( চতুর্থ ছত্রের সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ, তিঅ-ধাএ বিলসই উহ ন ঠাণা )॥ যার বর্ণ চিহ্ন রূপ নাই জানা, সে কিসে আগমে বেদে ব্যাখ্যাত হয়॥

৫. প্রশস্তপাদ 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' নামে কণাদের 'বৈশেষিক-সূত্র'র ভাষ্য রচনা করেন। প্রশস্তপাদের এই ভাষ্যের টীকা লেখেন শ্রীধর ভট্ট। শ্রীধরের টীকার নাম 'ন্যায়কন্দলী', রচনাকাল ৯৯১ অথবা ৯৮৮ খৃ.। তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন. পিতামহের নাম বৃহস্পতি, পিতা বলদেব, মাতা অব্বোকা ( বা অচ্ছোকা )। নিবাসের উল্লেখ করে লিখেছেন,

আসীদ্ দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥

'দক্ষিণ রাঢ়ে ভূরিকর্মা ব্রাহ্মণদের ভূরিসৃষ্টি নামে অনেক শ্রেষ্ঠীর আশ্রয় ( বাসস্থান ) একটি গ্রাম ছিল।'

ভূরিসৃষ্টি বা ভুরশুট নিবাসী শ্রীধর কায়স্থ রাজা পাণ্ডুদাসের অনুরোধে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। 'ন্যায়কন্দলী' সম্ভবত ন্যায়বৈশেষিক মতের প্রথম আস্তিক্যবাদী ব্যাখ্যা এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত গ্রন্থ। পাল রাজত্বকালে বাংলাদেশে ন্যায়বৈশেষিক-দর্শন চর্চার পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্য সম্পর্কে "Literary History of the Pāla Period" (*JBORS*, Vol. V, Part II, p. 175) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ মন্তব্য

করেছেন, "During the ascendency of the Pālas, the Brāhmaṇa settlers of Bengal had to fight hard with the Philosophy of Buddhism. That philosophy had already made marvellous progress in metaphysical spculations resulting in an absolute monism, which for want of a better word was termed Śūnyavāda. But that Śūnyavāda again developed into Advaya-vāda or Non-dual system. It was not only highly intellectual but exceedingly popular, for the Buddhists managed to give it a very attractive sensuous form. In order to demolish such a strong system, the Brāhmaṇas had recourse to realism, that is, to Nyāya and Vaiśeṣika, *viz.*, Logic and Physical Science. The earliest work [ শ্রীধর ভট্টের 'ন্যায়কন্দলী'] written by a Bengali pandit of this period on philosophy was a commentary on the Vaiśeṣika system. It was written in Śaka 913 or A.D. 991 at Bhursut in the district of Howrah, at that time a famous seat of Sanskrit learning. The works of Vācaspati Miśra and Udayana also belong to the same period. Both the authors had intimate knowledge of Buddhist Philosophy and made themselves thoroughly acquainted with the weak points of the rival system, and these they assailed with the weapons of logic and facts and with persistency and power. The consequence was that gradually the Buddhist monism went to the wall and Nyāya-Vaiśeṣika remained master of the field." দ্র. *HB*-I, pp. 312-13 ; সং-সাং-বা-দা, পৃ. ১৬৬ ; ভুরশুটের অবস্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্র. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, "কৃষ্ণমিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন ?", সা-প-প, ৮৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৮-৪১।

৬. ভুবনেশ্বরে বিন্দু-সরোবরের পুব পাড়ে অবস্থিত অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের গায়ে লাগানো প্রশস্তি-লিপিতে ভট্ট ভবদেবের বংশ পরিচয় এবং মনীষা ও পুণ্যকর্মের উচ্ছ্বসিত বিবরণ পাওয়া গেছে। তেত্রিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ

এই প্রশস্তি রচনা করেন ভট্ট ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি-কবি। ইনি 'ভামতী-টীকা', 'ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য', 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ', 'ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা' প্রভৃতি দার্শনিক রচনার লেখক বাচস্পতি মিশ্র নন। ভবদেব রাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধলগ্রামবাসী, সাবর্ণ গোত্রের ব্রাহ্মণ। পাণ্ডিত্যে ও প্রতিপত্তিতে মর্যাদা-সম্পন্ন অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। ঠাকুরদাদা আদিদেব বঙ্গভূমির কোনো রাজার সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন। বাবার নাম গোবর্ধন, মা সাঙ্গোকা কোনো বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। প্রশস্তি-লিপি ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ভবদেব বর্মণরাজ হরিবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্ভবত হরিবর্মার ছেলের রাজত্বকালে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন। তখনকার বাংলাদেশে পাণ্ডিত্যে, রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় ভবদেব ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ভবদেব ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্; মীমাংসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় 'কৃতধীর-দ্বিতীয়ঃ'। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনার উল্লেখ থাকলেও সব গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে কুমারিল ভট্টের অনুসরণে জৈমিনির পূর্বমীমাংসার ব্যাখ্যা 'তৌতাতিতমততিলক'-এর খণ্ডিত পুঁথি এবং ধর্মশাস্ত্র, 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' ও 'ছন্দোগ্যকর্মানুষ্ঠান' বা 'দশকর্মপদ্ধতি'। রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র প্রভৃতির রচনায় উদ্ধৃত হওয়ায় ভবদেবের 'ব্যবহার-তিলক' বইটির পরিচয়ও জানা যায়। বাচস্পতি-কবি ভবদেবের পুণ্য-কর্মের— মন্দির, মূর্তি, জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠারও উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎপ্রাণাশয়প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-
বক্ত্রাব্জপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ॥"

"রাঢ়দেশে জলহীন জাঙ্গলপথযুক্ত গ্রামোপকণ্ঠসীমায় শ্রমার্ত পান্থদের প্রাণ-মনের প্রীতিদায়ক জলাশয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে-সব জলাশয়ের পরিসরবক্ষে স্নানরত কুলকামিনীদের প্রতিবিম্বিত মুখপদ্ম দেখে মুগ্ধ ভ্রমরেরা পদ্মবন শূন্য করে চলে এসেছে।'

ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে ভবদেবকে 'বালবলভীভুজঙ্গ' বলা হয়েছে। মানে, তিনি বালবলভীর নাগরক। বালবলভী কোনো রাজ্যের নাম, 'রামচরিত'-এও এ-নামের উল্লেখ আছে। ভৌগোলিক পরিচয় এখনো অজ্ঞাত। হরপ্রসাদ বালবলভী ও বাগড়িকে একই জায়গা মনে করেন, কিন্তু এ-ধারণার সমর্থক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। হরিবর্মদেবের রাজত্ব ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ভবদেব ওড়িশা শাসনে নিযুক্ত

হয়েছিলেন এবং ভবদেবই ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— এই বিবরণের সত্যাসত্যও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় নি।

হরিবর্মদেবের রাজত্ব শুরু হয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ৪৬ বৎসরেরও বেশি সময় তিনি সিংহাসনে ছিলেন। সুতরাং ভবদেব একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন মনে করা হয়। তাই একাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে ভবদেব চরিত্র রাখায় কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে। তবে বাংলার সামাজিক জীবন থেকে বৌদ্ধ-প্রভাব উচ্ছেদে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রশস্তি-লিপিতেও উল্লেখ আছে, তিনি অগস্ত্যের মতো বৌদ্ধরূপ সমুদ্র গণ্ডূষে পান করেছিলেন এবং পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের অর্থাৎ বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদের যুক্তি-তর্ক খণ্ডনে দক্ষ ছিলেন। দ্র. *HB*-I, pp. 202-03, 320-03 ; Monmohan Chakravarti, "Bhatt Bhavadeva of Bengal." এবং Haraprasad Shastri, "Remarks on The Foregoing Paper", *JASB*, Sept. 1912 ; বা-ই, পৃ. ২৯১-৯২. ৭৩৮-৩৯, সং-সা-বা-দা, পৃ. ১৩৯ ; প্রা-বা-বা, পৃ. ১৫ ; দীনেশচন্দ্র সরকার, "প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী", স্মারকগ্রন্থ : নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, "ভবদেবভট্ট", পুরাতনী, কলিকাতা ১৯৬৯।

৭. বর্মণ-রাজ হরিবর্মদেব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন, তাঁর রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। হরিবর্মদেব জাতবর্মার ছেলে। তাঁর রাজত্বকাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে মনে করা হয়, একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে হরিবর্মদেব 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের কাল-সীমার অনেক পরের মানুষ। হরপ্রসাদ নেপালে হরিবর্মদেবের ১৯ রাজ্যাঙ্কে লেখা 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' এবং ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লেখা কালচক্রযানটীকা 'বিমলপ্রভা' পুঁথি আবিষ্কার করেন। প্রথম পুঁথিতে হরিবর্মদেবের 'মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক' উপাধির উল্লেখ আছে। দ্র. *HB*-I, pp. 199-204 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, "প্রাচ্যবিদ্যা-বিদ্ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী", স্মারকগ্রন্থ।

৮. আনুমানিক দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সিংহলের বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি -রচিত 'রূপাবতার ব্যাকরণ' পাণিনি-ব্যাকরণের সহজে ব্যবহার-যোগ্য সংক্ষিপ্ত রূপ। পরিচ্ছেদগুলি 'অবতার' নামে উল্লেখিত, যেমন সংজ্ঞাবতার, সংহিতাবতার, অব্যয়াবতার ইত্যাদি। হরপ্রসাদ লিখেছেন,

"Then comes Rūpāvatāra by Dharma-kirti. It was adopted in the grammatical curriculum of the educational institutions established by Rājendra-Coḍa in the beginning of the 11th century. This emperor Rājendra-Coḍa raided Bengal about 1023 A.D., ... It was he who established these educational institutions. ... So Rūpavatāra was composed some time before these institutions were established, say, in the latter half of the 10th century." দ্র. *Shastri-Cat.* VI, pp. xcv-xcvi.

৯. অনুবাদ : যৌবন, ধনসম্পত্তির অধিকার, অপ্রতিহত ক্ষমতা ও সুবিচার-হীনতা— এর এক-একটি থাকলেই তো বিপদের হয়। চারটি থাকলে আর কথা কি?

১০. অনুবাদ : জয় হোক ওই সুখরাজের যিনি স্বতঃসম্ভূত সদা সব জগতে জেগে রয়েছেন, যাঁর বন্দনাকালে সর্বজ্ঞও বাক্যহারা হয়েছিলেন।

১১. অনুবাদ : নন্দবংশেই ক্ষত্রিয়কুল শেষ হয়ে গিয়েছে।

১২. জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের রচনায় যোগ্লোক বা যোগ্লৌক নামে প্রাচীনতর একজন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবত ব্যবহারশাস্ত্র এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাল সম্পর্কে একটি 'বৃহৎ' এবং একটি 'লঘু' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। যোগ্লোকের মূল রচনা পাওয়া যায় নি, জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে তাঁর মত উদ্ধার করেছেন। জীমূতবাহন দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় বর্তমান ছিলেন মনে করা হয়। যোগ্লোকের জীবৎকাল তাই এর পূর্ববর্তী, তিনি সম্ভবত দশম শতাব্দীর মানুষ।

১৩. প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে (আ. ৯৮৮-১০৩৮ খৃ.) দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গালদেশ স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চোল-রাজ রাজেন্দ্র চোলের লিপিতে উল্লেখ আছে— তাঁর বাহিনী ১০২১-২৩ খৃস্টাব্দের আক্রমণে দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশূরকে পরাস্ত করেন।

১৪. পাল রাজবংশের নবম রাজা মহীপাল। আনুমানিক রাজত্বকাল ৯৮৮-১০৩৮ খৃ.।

১৫. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উদ্ভবস্থান 'মহাযোগ-পীঠ' উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর মেয়ে, মতান্তরে বোন লক্ষ্মীঙ্করা। ইন্দ্রভূতি লক্ষ্মীঙ্করাকে তন্ত্র সাধনায় দীক্ষা দেন। হরপ্রসাদের মতে উড্ডীয়ান ওড়িশায় অবস্থিত। ওয়াডেল বলেন, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী স্বাত-উপত্যকায় অবস্থিত। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বাংলাদেশে অবস্থিত হওয়াও সম্ভব মনে করেন। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা সম্ভবত অষ্টম ( বিনয়তোষ ) মতান্তরে নবম (M. J. Shendge) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তেঙ্গুরের তালিকায় ইন্দ্রভূতির লেখা 'সিদ্ধবজ্র-যোগিনীসাধন', 'জ্ঞানসিদ্ধিনামসাধনোপায়িকা', 'সহজসিদ্ধি' প্রভৃতি ২৩ খানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন করেন। বজ্রযান-সাধনার ধারায় অসংকোচে এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তনের দিক থেকে লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি' গুরুত্বপূর্ণ বই। উপবাস, ধর্মকর্ম, স্নান-শৌচ বর্জনীয়। কাঠ-পাথর-মাটির দেবতা বন্দনা করার প্রয়োজন নেই। নিত্য সমাহিত হয়ে দেহেরই পূজা করবে।—লক্ষ্মীঙ্করার এই মতবাদ সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, "... What Lakṣmiṁkarā advocates was quite out of the way and strange, even though since her time this new teaching has gradually won for it many adherents who are styled Sahajayānists, and who are still to be met with among the Nāḍhā Nāḍhīs of Bengal and especially among the Bāuls. (*SM*-II, p. lv)

Shendge লিখেছেন, "This short work [ অদ্বয়সিদ্ধি ] has one unique feature *i.e.*, it is written by a woman who practised and preached Tantrism. From this point of view I expected some unique doctrines but in reality all her teachings in no way differ from those preached by the male practicants of the doctrine *e.g.*, those preached by Indrabhūti or Anaṅgavajra [ 'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' রচয়িতা, ইন্দ্রভূতির গুরু ]. So naturally the question poses itself— whether there can at all be any such difference in the Sādhana prescribed for man and for woman ?" (Miss. Malati J. Shendge ed. *ADVAYASIDDHI*, Oriental Institute, Baroda, 1964, p. 11 ). দ্র. *BLṬ*, p. 197 ; *SM*-II,

pp. xxxvii-xxxix, xlii ; শাস্ত্রী, "সম্বোধন", সা-প-প, ২য় সংখ্যা, ১৩২৩।

১৬. ১৯০২ খৃস্টাব্দের ৫ মার্চ হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটিতে ভূঁইহার বাভন জাতি সম্পর্কে একটি ছোটো নিবন্ধ পড়েন। বলেন, "There are in Behar and in Benares a class of men known as Bābhans or Bhuī-hārs. Their position in Hindu society is extremely anomalous. They claim to be Brāhmaṇs but no good Brāhmaṇs such as the Kanojia and Sarayūpāriyā treat them on equal terms...

"I was struck the other day to find in the Aśoka inscriptions, the term Bābhan used several times as a corruption of the word Brāhmaṇa in the pillar inscriptions....

"Now the question is, why is the Aśoka corruption, *i.e.*, Buddhist corruption, of the word Brāhmaṇ be the proper name of a peculiar class of men who claim to be Brāhmaṇs, whose claim is not admitted by Brāhmaṇs ?

"In Hindu Sanskrit works we often hear of Brāhmaṇa Çramaṇas, *i.e.*, those who were Brāhmaṇs once but had became Çramaṇs and lost their Brāhmaṇhood, but still thev are called Brāhmaṇs.

"From these two facts I have been led to conclude that the Bābhans were Brāhmaṇ-Buddhists who lost their caste and position in Hindu Society, but on the destruction of Buddhism are again trying, though unconsciously, to regain the old position they enjoyed 2,000 years ago.

"... After the fall of Buddhism these Bābhans misappropriated the rich monastic lands and from that fact they are called Bhūmi-hārakas. The word Bhūmi-hārak is not a Sanskrit word. It is not to be found in any Sanskrit Dictionary. It is a

kritized form of the Hindi word Bhūmi-hāra, the misappropriator of land.

"The geographical distribution of the class (Bābhan) favours the theory of their Buddhistic origin. They are to be found in western Bihar and eastern Koçala countries where Buddhism originated and lingered longest." ("Bābhn", *JASB*, Vol. Lxxi, No. I, 1902, pp. 61-62.)

বাভনেরা মূলত বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধমঠের ভূ-সম্পত্তির অপহারক বলে ভূ'ইহার নামে অভিহিত— হরপ্রসাদের এই ব্যাখ্যার সমর্থন অবশ্য অন্য কারো লেখায় পাওয়া যায় না। রিস্‌লে মনে করেন, ভূ'ইহার বাভনের আদৌ ব্রাহ্মণ নন, রাজপুত জাতির প্রশাখা। ক্যাম্বেল-এর ধারণা, এ'রা নিম্নতর বর্ণের সঙ্গে মিশ্রণে উৎপন্ন। শেরিং অবশ্য এ'দের ব্রাহ্মণ সমাজেরই অন্তর্গত পতিত শ্রেণী মনে করেন। এ'রা চাষের কাজ করেন, সাধারণত ব্রাহ্মণের পদবি ব্যবহার করেন না এবং ব্রাহ্মণোচিত আচার পূর্ণত পালন করেন না বলে ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত। দ্র. H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol. I, Calcutta, 1892 pp. 29-30 ; Justice Campbell, "The Ethnology of India", *JASB*, Vol. 35, Supplimentary No., Part 2, 1866 ; Jogendra Nath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects*, Calcutta, 1968 ; Rev. M.A. Sherring, *Hindu Tribes And Castes*, Vol. I, Delhi, 1974.

১৭. বজ্রদত্ত নবম শতাব্দীর কবি, রাজা দেবপালের (আ. ৮১০-৫০ খৃ.) সমসাময়িক। সুতরাং 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের কালসীমার অনেক আগের কালের মানুষ। তাঁর 'লোকেশ্বর-শতক' কাব্য স্রগ্ধরা ছন্দে লেখা অবলোকিতেশ্বরের বন্দনা-স্তোত্র।

১৮. মহাযান-পন্থী পণ্ডিত শান্তিদেব সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর মানুষ। তাঁর তিনখানি বই : 'বোধিচর্যাবতার', 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'সূত্রসমুচ্চয়'। 'বোধি-চর্যাবতার পঞ্জিকা' নামে 'বোধিচর্যাবতার'-এর পঞ্জিকা-টীকা অর্থাৎ শব্দ ধরে ধরে ব্যাখ্যা লেখেন প্রজ্ঞাকরমতি। প্রজ্ঞাকরমতি বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। দ্র. Shastri, "Santideva", *IA*, Feb. 1913 ; শাস্ত্রী, 'সম্বোধন', সা-প-প, ২য় সংখ্যা ১৩২৩।

১৯. অনুবাদ : যখন চিত্তপটে সৎ ও অসৎ কিছুই থাকে না তখন অন্যগতি না থাকায় নিরালম্ব হয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

২০. নয়পাল পাল-রাজবংশের দশম রাজা, প্রথম মহীপালের ছেলে। রাজত্ব-কাল আ. ১০৩৮-৫৫ খৃ.।

২১. চিৎসুখাচার্য 'ভাবতত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে শংকর-ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। বেদান্তদর্শন বিষয়ে তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'তত্ত্বদীপিকা'।

২২. বৈশেষিক-দর্শনের প্রসিদ্ধ টীকাকার উদয়নাচার্য সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। কুলজি-ঐতিহ্য মতে তাঁকে উত্তরবঙ্গের ভাদুড়ী-ব্রাহ্মণ বলে দাবি করা হয়। এই দাবির অন্য কোনো সমর্থন নেই। উদয়নাচার্য 'কিরণাবলী' নামে প্রশস্তপাদের আকরগ্রন্থ 'পদার্থধর্মসংগ্রহ'-এর টীকা রচনা করেন। অন্যান্য গ্রন্থ 'লক্ষণাবলী' (রচনাকাল ৯৮৪ খৃ. ), 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি', 'আত্মতত্ত্ববিবেক' এবং 'লক্ষণমালা'।

২৩. প্রতিহার বংশের রাজা রাজ্যপাল দশম শতাব্দীর শেষ দিকে কনৌজের সিংহাসনে বসেন। ১০১৮ খৃস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কনৌজ আক্রমণ করেন। রাজ্যপাল অমর্যাদাময় সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য হন।

২৪. চর্যাগীতির ৩৪সংখ্যক গানের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। দারিকপাদ রচিত। অনুবাদ : রাজা রাজা রাজা, ওরে ( সবাই ) রাগমোহে বদ্ধ। লুই-পাদের প্রসাদে দারিক দ্বাদশ ভুবনে লব্ধ ( অর্থাৎ সিদ্ধ )।।

২৫. চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম রত্নাকর শান্তি বিক্রমশীল মহাবিহারের পূর্ব-দ্বারের দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। ইনি দীপঙ্করশ্রী জ্ঞানের অন্যতম গুরু এবং তিব্বতি সূত্র অনুসারে দীপঙ্করশ্রী যখন বিক্রমশীল থেকে তিব্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন (১040 খৃ.) তখন রত্নাকর এই মহাবিহারের ভারপ্রাপ্ত স্থবির ছিলেন। রত্নাকর সম্ভবত মগধের মানুষ এবং সাত বৎসর সিংহলে ধর্মপ্রচার করেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা 'হেবজ্রপঞ্জিকা ( মুক্তিকাবলীনাম )'. 'সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি', 'বজ্রতারাসাধন' প্রভৃতি ১৮খানি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। এ-ছাড়া তিনি 'অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন' নামে ন্যায়শাস্ত্রের বই এবং 'ছন্দোরত্নাকর' নামে ছন্দের বই লেখেন। হরপ্রসাদ অনুমান করেন চর্যাগীতির ১৫সংখ্যক ( সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে… ) ও ২৬ সংখ্যক ( তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু ) পদ দুটির কবি শান্তিপাদ এবং রত্নাকর শান্তি একই ব্যক্তি। রত্নাকর শান্তির উপাধি ছিল কলিকালসর্বজ্ঞ।

দ্র. *IPLS*, p. 63 ; *2500 years*, pp. 202-03, 207 ; *SM*-II, pp. cxi-ii ; Tāranāth, p. 295 ; বৌ-গা-দো, পৃ. ২৮ ; শাস্ত্রী, "রত্নাকর শান্তি", সা-প-প, ১ম সংখ্যা ১৩৩৮ ।

২৬. মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূল শাস্ত্রগ্রন্থ নাগার্জুন ( আ. খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক ) রচিত 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'। 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞা-পারমিতা'-র কয়েকটি চিত্রিত পুথি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো দুটি পুথি ৯৯৩ এবং ৯৯৪ খৃস্টাব্দের। দ্র. শাস্ত্রী, "সম্বোধন", সা-প-প, ২য় সংখ্যা ১৩২৩ ।

২৭. বৌদ্ধ তন্ত্র-সাধনার অন্যতম শাখা কালচক্রযান সম্পর্কে লেখা 'চক্রসম্বরতন্ত্র' বা 'চক্রশম্বরতন্ত্র'-এর অনেকগুলি বইয়ের নাম তেঙ্গুরের তালিকায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারোপার 'চক্রশম্বরসাধন', ইন্দ্রভূতির 'চক্রশম্বর-অনুবন্ধসংগ্রহ', জ্ঞানডাকিনী নিগুর 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধি' এবং চর্যাগীতির কবি ভুসুকুর 'চক্রশম্বরটীকা' ও দারিকের 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধিতত্ত্বাবতার'।

২৮. 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের কবি শ্রীহর্ষ শ্রীহীর পণ্ডিত ও মামল্লদেবীর ছেলে। 'নৈষধচরিত'-এ তাঁর আরো কয়েকটি রচনার উল্লেখ আছে : 'স্থৈর্যবিচারপ্রকরণ', 'শ্রীবিজয়প্রশস্তি', 'গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি', 'অর্ণব-বিবরণ', 'ছিন্দপ্রশস্তি'. 'শিবশক্তিসিদ্ধি' এবং 'নবসাহসাংকচরিত চম্পূ'। এসব বই পাওয়া যায় নি। শংকর-বেদান্তের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করে লেখা তাঁর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' একটি প্রসিদ্ধ রচনা। 'নৈষধচরিত' গৌড়ী-রীতিতে লেখা কাব্য। তাছাড়া এই কাব্যে বিয়েতে মাছ-ভাত খাওয়া, উলু দেওয়া , শাঁখা পরা, চালের পিটালির আলপনা দেওয়া, বরের মাথায় মুকুট হাতে দর্পণ ও স্ত্রী-আচারের উল্লেখ এবং রচনায় 'ন' 'ণ', 'জ' 'য', বর্গীয় 'ব' অন্তঃস্থ 'ব'-এর পার্থক্য না রাখায় অনেকে শ্রীহর্ষকে বাঙালি বলে দাবি করেন। তাঁর সময় নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো মতে নবম-দশম শতাব্দী, কোনো মতে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ। 'নৈষধচরিত' কাব্যে কবি গর্ব করে বলেছেন,

"তাম্বূলদ্বয়ম্ আসনঞ্চ লভতে যঃ ক্যান্যকুব্জেশ্বরাদ্
যঃ সাক্ষাৎ কুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্ম প্রমোদার্ণবম্ ॥"

'যিনি কান্যকুব্জেশ্বরের কাছে আসন ও দুটি পান পান, যিনি সমাধির সময়ে আনন্দ সাগর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পান।' এই উপন্যাসে শ্রীহর্ষের 'গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি'-কে হরিবর্মদেবের প্রশস্তি-কাব্য বলা হয়েছে, যা সম্ভবপর মনে হয় না। গৌড় হরিবর্মদেবের রাজ্যের মধ্যে ছিল না। দ্র. *HSL*, pp. 325-30; *HB*-I, pp. 306-07; স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ২৪৯।

২৯. অনুবাদ : তার বিজয়শ্রীমণ্ডিত মুখের কথা শুনে ( রাহুর ) খাদ্য চন্দ্র লজ্জায় পরাভূত হয়ে সূর্যে ( অর্থাৎ সূর্যের আড়ালে ), কখনো সমুদ্রের জলে, কখনো বা মেঘের চলমান গভীরতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

৩০. আর্য ক্ষেমীশ্বরের লেখা দুটি নাটক 'চণ্ডকৌশিক' এবং 'নৈষধানন্দ'। পঞ্চাঙ্ক নাটক 'চণ্ডকৌশিক'-এর বিষয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের হরিশ্চন্দ্র-বিশ্বামিত্র কাহিনী। হরপ্রসাদ নেপাল থেকে এই নাটকের একটি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেন। পুথিটিতে নাটকের প্রস্তাবনায় আছে,

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্য্যচাণক্যনীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্য তানেব হন্তুং
দোর্দ্দর্পাঢ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপালদেবঃ।

'গুরুগর্ভ আচার্য-চাণক্যের নীতি অবলম্বন করে চন্দ্রগুপ্ত— যিনি নন্দদের জয় করে কুসুমনগর ( অর্থাৎ পাটলিপুত্র ) অধিকার করেছিলেন, তিনিই আবার কর্ণাটরাজ ধ্রুবকে আক্রমণকারীদেরই বিনাশ করতে বাহুবলদৃপ্ত শ্রীমহীপালদেব হয়েছেন।'

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে পুথির পরিচয় দিয়ে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেন, ক্ষেমীশ্বর যে মহীপালের উল্লেখ করেছেন, তিনি পাল-বংশের রাজা প্রথম মহীপাল ( আ. ৯৮৮-১০৩৮ খৃ. )। 'ডেস্ক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ'-এ লিখেছেন, 'Caṇḍa-Kauśika was composed at the court of Mahīpāladeva by Āryya Kṣemīśvara. Mahīpāla is said to have driven away the Karṇāṭakas, that is, either the invading army of Rājendra-cola in the year 1023, or the Karṇāṭakas who came in the train of the Cedi Emperors later on."

এ বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। অনেকে মনে করেন ক্ষেমীশ্বর প্রতিহার-বংশীয় রাজা মহীপালের সভাকবি ছিলেন। 'চণ্ডকৌশিক' নাটকটিকে অনেকেই দুর্বল রচনা বলেছেন। হরপ্রসাদ অবশ্য প্রশংসাই করেন। বিহার-ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালে লেখেন, "But the Caṇḍakauśika was written undoubtedly by a Bengali poet, Ārya Kṣemīśvara, *the word Ārya there meaning a married Buddhist priest*. [ ইটালিক্ আমাদের ] The character of Viśvāmitra is drawn there with a consistency and thoroughness which would do honour to the greatest poets of the world. He is

relentless in realizing his dues from Rājā Hariś-chandra in order that the Rājā's character for unselfish devotion to duty might be shown to the best." দ্র. Shastri, "On a new find of old Nepalese Manuscripts", *JASB*, No. 3, 1893, pp. 250-52 ; *Shastri-Cat*. Vol. VII, pp. 251-52 ; Shastri, "Literary History of the Pāla Period", *JBORS*, Vol. V (1919), part. II, p. 174 ; *HB*-I, pp. 143-44, 308-09 ; *HSL*, pp. 469-70.

৩১. 'ললিতবিস্তর' থেকে উদ্ধৃত। মারধর্ষণ-পরিবর্ত নামক ২১ অধ্যায়ের ৮০ এবং ৮১ শ্লোক।

অনুবাদ : পুষ্পিতপাদপযুক্ত ঋতুশ্রেষ্ঠ সুন্দর বসন্ত এসেছে, আমরা প্রিয়ার সঙ্গে বিহার করব (শুদ্ধ পাঠ : 'রমিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে')। তোমার রূপ সুন্দর, সুশোভন, সুলক্ষণ তোমার বিচিত্র রূপেরই বশবর্তী ॥ দেবতা ও মানুষের সুখের হেতু যে স্তুতি, সেই স্তুতিকারী ( সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ : 'দেবনরাণ সুসংস্তুতিকাঃ' ) আমরা জন্মেছি ভালো জাতে এবং আমরা সুসংস্থিত। ওঠো তাড়াতাড়ি, সুন্দর যৌবনকে সম্পূর্ণ-রূপে ভোগ করো ; বোধি লাভ দুর্লভ, তার থেকে মন ফিরিয়ে নাও ॥

৩২. চর্যাগীতির ৫ সংখ্যক গান, চাটিলপাদের নামে সংকলিত। তিব্বতি-পরম্পরায় চাটিল নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পদটি আদৌ চাটিলের রচনা কিনা সন্দেহ, কারণ, অন্য কোনো চর্যায় কোনো কবি এভাবে নিজেকে অনুত্তরস্বামী গুরু, অর্থাৎ যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুরু নেই—বলেন নি। চাটিলের কোনো শিষ্যের রচনা হতে পারে। এখানে পদটি উদ্ধার করা হয়েছে মাঝের ৫ ও ৬ পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়ে।

অনুবাদ : গহনগভীর ভবনদী বেগে প্রবাহিত। দুই ধারে কাদা, মাঝে থই নেই ॥ ধর্মের জন্যে চাটিল সাঁকো গড়ে। পারগামীরা নির্ভর করে পার হয় ॥ সাঁকোয় চড়লে ডান বাঁ হোয়ো না। নিকটে বোধি, দূরে যেও না ॥ যদি হে তোমরা লোকেরা পারগামী হতে চাও তবে শ্রেষ্ঠ স্বামী ( গুরু ) চাটিলকে জিজ্ঞাসা করো ॥

৩৩. তেঙ্গুরের তালিকায় 'গুহ্যঅভিষেকপ্রক্রিয়া' নামে বীণাপাদের একখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে উদ্ধৃত অংশ চর্যাগীতির ১৭সংখ্যক গানের প্রথম ৪ এবং শেষ ২ পঙ্‌ক্তি। টীকাকার মুনিদত্ত গানটি

বীণাপাদের রচনা বলেছেন, কিন্তু তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'বীণা' শব্দ যেভাবে আছে তা কবির ভণিতা মনে হয় না। পদটিতে বীণা যন্ত্রের গড়ন ও নাচগানের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'বাকী' ভুল পাঠ, শুদ্ধ পাঠ 'চাকি' (চ-গী-প) মতান্তরে 'একি' (*C-G-K*)।

অনুবাদ : সূর্য লাউ, শশীরূপ তন্ত্রী লাগলো। অনাহত দণ্ড, চাকি করা হল অবধূতী (অথবা, অনাহত দণ্ডে তাদের অবধূতীর সঙ্গে একীকৃত করা হল)॥ বাজে ওলো সই হেরুক বীণা। শূন্যতা রূপ তন্ত্রি-ধ্বনি রণিত হচ্ছে॥ নাচ করেন বজ্রধর, গান করেন দেবী। বুদ্ধ-নাটক বিষম বা বিপরীত হয় (অথবা, এইভাবে বুদ্ধ-নাটকের বিশেষরূপ সমতা বা পরিসমাপ্তি হয়)॥

৩৪. চর্যাগীতিতে সরহপাদের লেখা ৪টি গান আছে। উদ্ধৃত অংশ ২২সংখ্যক গানের প্রথম ৬ পঙ্‌ক্তি।

অনুবাদ : আপনা থেকে সংসার-বন্ধন ও মুক্তি রচনা (কল্পনা) করে করে শুধুশুধুই লোকে নিজেকে বন্ধনে ফেলে॥ অচিন্ত্য যোগী আমরা জানি না জন্ম মরণ ও স্থিতি কেমন করে হয়॥ যেমন জন্ম মরণও তেমনি, বাঁচায় মরায় তফাত নেই॥

সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক ছিলেন। চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের তালিকায় সরহ ওরফে রাহুলভদ্রের নাম আছে। অন্যত্র তাঁর নামান্তর সরোজবজ্র, সরোরুহবজ্র, পদ্মবজ্র। হরপ্রসাদ 'বৌদ্ধগান ও দোহা'-য় সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ' প্রকাশ করেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় সরহের নামে দোহাকোষ, গীতিকা ও বজ্রযানসাধনা বিষয়ক ২১খানি বইয়ের নাম আছে। যেমন 'দোহাকোষগীতি,' 'দোহাকোষনামচর্যাগীতি', 'দোহাকোষউপদেশগীতি'.'মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি', 'শ্রীবজ্রযোগিনী-সাধন', 'শ্রীবুদ্ধকপালসাধন'— ইত্যাদি। সব বই একজনের লেখা নয়। তিব্বতি লেখক সুম্‌পা তাঁর 'পাগ-সাম্‌-জোন্‌-জাং' বইয়ে একজন সরহের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচ্য দেশের রজ্ঞী শহরে এঁর জন্ম। কোনো ব্রাহ্মণ ও ডাকিনীর সন্তান। চন্দনপাল নামে কোনো রাজার আমলের এই সরহ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ বিদ্যায় পারংগম ছিলেন। ইনি রাজা রত্নপাল ও তাঁর মন্ত্রীদের ধর্মান্তরিত করেন। নালন্দায় মহাচার্য হন। ওড়িশায় মন্ত্রযান শেখেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে এক যোগিনীর সঙ্গে সাধনা করে 'সিদ্ধ' হয়ে সরহ নামে পরিচিত হন। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ দুজন সরহকে চিহ্নিত করেন ; বয়সে যিনি বড়ো তিনি রাহুলভদ্র এবং যিনি ছোটো তিনি শাবরি নামে পরিচিত ছিলেন।

নেপালে নকল করা 'দোহাকোষ'-এর প্রাচীনতম পুঁথির তারিখের হিশাবে দোহাকার সরহ একাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। এবং এই সরহই যদি চর্যাগীতির কবি হন, তাহলে ইনি 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের কালসীমার অন্তর্বর্তী মানুষ। দ্র. *SM*-II, pp. xliv, cxvi ; *HB*-I, pp. 339-42, 348-49 ; বৌ-গা-দো, পৃ. ২৬-২৭ ; চ-গী-প, পৃ. ১৯-২০।

৩৫. চর্যাগীতির ভাষায় দুটি-একটি ব্রজবুলি ও পুরানো বাংলা শব্দ মিশিয়ে হরপ্রসাদ এই গান বা কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

অনুবাদ : জগতের মধ্যে শবরা-শবরী ঘুরে বেড়ায় ; শবর পালিয়ে গেল, জানি না কোথায় গিয়ে ঢুকল সে। শবরা-শবরী চোদ্দ ভুবন ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; শবর পালাল, শবরী হল ব্যাকুল ॥ মিলনের আশা নেই ; শবরী নাম নিয়ে রইল ; রূপ ধ্যানে মগ্ন হয়ে সে দিনরাত্রি কাটাতে লাগল। নাম স্মরণ করে, নাম হৃদয়ে ধরে, রূপ ধ্যান করে, শবরার নাম ও রূপ নিয়ে শবরী মত্ত হল ॥ সূর্য চন্দ্র তারা ( সব ) নাম-রূপে ডুবে গেল ; বাঁ ডান উঁচু নীচু সামনে পিছনে সব ভরে গেল রূপ ধ্যানে, তাতে নাম মিলিয়ে গেল ; নাম রূপ ধ্যানে শবরী হারিয়ে গেল ॥ মেরুর তুঙ্গ শিখর এক হয়ে দুটি মিলে গেল ; নুন আর জল যেন দুজনে মিলিয়ে গেল। এক হয়ে 'বারমতি' মাঝে দুজনে মিলিয়ে গেল ॥

ব্রজবুলি শব্দ : মিলনক, মগণা, ধিয়ানি, পিছাই, সামন ( নবসৃষ্ট )।

বাংলা শব্দ : ধিয়ানে, গুঁভাইলা, সোঙরি, ডুবিলা, বারমতি (?), বাকি সব শব্দ চর্যাগীতি থেকে নেওয়া।

৩৬. এ-গান বা কবিতাটি অল্পস্বল্প ব্রজবুলি-বাংলা সহযোগে চর্যাগীতির ভাষায় রচিত।

অনুবাদ : বইছে নৌকা মাঝ সমুদ্রে, দু প্রহর বেলা। দারুণ পিপাসা আমার হৃদয় পিষ্ট করছে, গলা শুকিয়ে গেছে ॥ কাছেই জল, খেতে পাই না, দিবারাত্রি তৃষ্ণায় কষ্ট পাই। জানতে পারি না, নোনা জল ঢোকে, দিবারাত্রি তৃষ্ণা বাড়ছে ॥ আকাট যোগী নির্বাণ চায়, যোগিনী বিনা পাওয়া যায় না। যোগিনী শক্তি, যোগিনী ভক্তি ; তবে নির্বাণ সাধা যায় ॥ যোগিনী সাধিকা থাকে আমাকে বিমূঢ় করে, তার খোঁজ পাই না। নয়নের কোণে কখনো দেখি না, বিফলে আমার জন্ম যায় ॥

ব্রজবুলি শব্দ : দারুণ, পিআসা, সকই, সত্তি, ভত্তি, হেরই, জনু।

বাংলা শব্দ : নঅনের কোণে।

## ২. নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশের সূচি

চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১৩২৬-এর অগ্রহায়ণ অবধি ১৪টি সংখ্যায় 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল উনিশটি। বিভিন্ন পরিচ্ছেদের উপরে কখনো অধ্যায় কখনো বা পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছিল। কোথাও কোথাও পরিচ্ছেদ এবং পরিচ্ছেদের উপবিভাগ নির্দেশক সংখ্যার অনুক্রম ঠিক নেই। এখানে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলিতে উপবিভাগ নির্দেশ করা হল।

১৩২৫ কার্তিক, পৃ. ৮৯৫-৯০৪ [ প্রথম পরিচ্ছেদ ] ( ১—৬ )
অগ্রহায়ণ, পৃ. ১-৭ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ( ১—৬ )
( দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হবে। এই ভুলের জের চলেছে ১৩২৬-এর আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত। )
পৌষ, পৃ. ৯৯-১০৯ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( ১—৭ )
মাঘ, পৃ. ১৯৯-২০৪ পঞ্চম অধ্যায় ( ১—৫ )
ষষ্ঠ অধ্যায় ( ১—৭ )
ফাল্গুন, পৃ. ২৮১-৯৪ সপ্তম অধ্যায় ( ১—৪ )
অষ্টম অধ্যায় ( ১—৪ )
( তৃতীয় উপবিভাগের উপরে ৩-এর পরিবর্তে ৪ ছাপা হয়েছিল। )
চৈত্র, পৃ. ৩৬৯-৮০ নবম অধ্যায় ( ১—৪ )
দশম অধ্যায় ( ১—৩ )
একাদশ অধ্যায় ( ১—৪ )
১৩২৬ বৈশাখ, পৃ. ৪৬২-৬৯ দ্বাদশ অধ্যায় ( ১—৫ )
জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১-১২ ত্রয়োদশ অধ্যায় ( ১—৫ )
চতুর্দশ অধ্যায় ( ১—৩ )
আষাঢ়, পৃ. ৮৭-৯৪ চতুর্দশ অধ্যায় ( ৪—৬ )
শ্রাবণ, পৃ. ১৬৯-৭৯ চতুর্দশ অধ্যায় ( ৭ )
পঞ্চদশ অধ্যায় ( ১—৪ )
ভাদ্র, পৃ. ২৫৫-৬৪ ষোড়শ অধ্যায় ( ১—৬ )
আশ্বিন, পৃ. ৩২৭-৪৯ ষোড়শ অধ্যায় ( ৭ )
সপ্তদশ অধ্যায় ( ১—৬ )
অষ্টাদশ অধ্যায় ( ১—৮ )
কার্তিক, পৃ. ৪০৭-১৭ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ( ১—৮ )
( অনুক্রমে ভুল আছে )

অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩-১৮ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ( ১—৪ )
( অনুক্রমে ভুল আছে )

## ৩. পাঠ-বিন্যাস

১৯১৯ খৃস্টাব্দে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালায় 'বেনের মেয়ে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। বইটির অন্য কোনো সংস্করণ হয় নি। আর-একবার মাত্র ছাপা হয়েছিল বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে ১৯৩২ খৃস্টাব্দে ( বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকার তারিখ ) প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ গ্রন্থা-বলী'তে। নারায়ণ পত্রিকার বিন্যাস প্রথম সংস্করণে অনেক অদল-বদল করা হয়েছিল। পরিবর্তনগুলি নিচে উল্লেখ করা হল। বর্তমান মুদ্রণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। পুরো অষ্টাদশ পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে রাখা হয়। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদটি 'পাঠ-প্রসঙ্গ' পর্যায়ে ছাপা হল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

১৩২৫-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত নবম ও দশম অধ্যায় একত্রিতভাবে প্রথম সংস্করণে অষ্টম পরিচ্ছেদে রাখা হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

১৩২৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের ১ ও ২ উপবিভাগ নিয়ে প্রথম সংস্করণের একাদশ পরিচ্ছেদ গঠিত। পত্রিকার চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩ সংখ্যক উপবিভাগটি বর্জিত। ( পাঠ-প্রসঙ্গ দ্র. )

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

১৩২৬-এর আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত চতুর্দশ অধ্যায়ের ৪-৭ উপবিভাগ নিয়ে প্রথম সংস্করণের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ গঠিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

১৩২৬-এর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত পঞ্চদশ অধ্যায় প্রথম সংস্করণে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রাখা হয়। ৪ উপবিভাগটি ভেঙে ৪ ও ৫ উপবিভাগে বিন্যস্ত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

১৩২৬-এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১-৪ উপবিভাগ পর্যন্ত প্রথম সংস্করণে ষোড়শ পরিচ্ছেদে রাখা আছে এবং এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক উপবিভাগের পঞ্চম অনুচ্ছেদ থেকে বাকি সবটা তুলে এনে ২ সংখ্যক উপবিভাগের অষ্টম অনুচ্ছেদের পরে বসানো হয়। বইয়ে ষোড়শ পরিচ্ছেদের উপবিভাগ নির্দেশ ঠিক নেই, ২ এর পরে ৪ ছাপা আছে। বইয়ের ২ উপবিভাগের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ থেকে পত্রিকায় ৩ উপবিভাগের শুরু। পত্রিকার অনুক্রম অনুসরণ করে বর্তমাণ মুদ্রণে উপবিভাগ নির্দেশের ভুল সংশোধন করা হল।

**সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥**

১৩২৬-এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫-৭ উপবিভাগ এবং ৮ উপবিভাগের প্রথম চারটি অনুচ্ছেদ নিয়ে প্রথম সংস্করণের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ গঠিত।

**অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥**

১৩২৬-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উপন্যাসটির শেষ পরিচ্ছেদ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ( অনুক্রম নির্দেশে ভুল ছিল, ঊনবিংশ হবে ) রূপে ছাপা হয়। প্রথম সংস্করণেও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদরূপে গৃহীত।

## ৪. পাঠ-প্রসঙ্গ

বর্তমান মুদ্রণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। নারায়ণ পত্রিকার ও প্রথম সংস্করণের পাঠের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি নিচে দেখানো হল। পত্রিকার ১৩২৬-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত সপ্তদশ-পরিচ্ছেদটি ( অষ্টাদশ হওয়া উচিত, অনুক্রম নির্দেশে ভুল ছিল ) বইয়ে সম্পূর্ণই বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরিচ্ছেদটি এখানে উদ্ধার করে দেওয়া হল। বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দু-একটি শব্দ যোগ করা হয়েছে। এই সব শব্দ-পত্রিকার পাঠ থেকে নেওয়া।

নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটিতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে ছত্র-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

২১৪/৪ : "খাবার জিনিস রাশি রাশি রহিয়াছে।" পত্রিকার পাঠ : "খাদ্য সামগ্রী রাশীকৃত রহিয়াছে।"

২১৪/১৪ : "তাঁহার পিছনে সাতগাঁয়ের বড়ো বড়ো রহীস..."। পত্রিকায় এর আগে ছিল : "তাহার পিছনে মন্দিরের প্রধান কারিকর ও প্রধান মিস্ত্রী। তাহার পিছনে মন্ত্রীরা ও..."

২২৭/২৭ : "...দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।" পত্রিকার পাঠ : "দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করিলেন।"

২৪৬/৮ : "...এই গায়ে পড়ে উপদেশ দেওয়া সহ্য করিল।" পত্রিকার পাঠ : "এই অ্যাডভাইস গ্রাটিস সহ্য করিল।"

২৪৭/১৩ : "দাঁড় বন্ধ করিয়া দিলেও যেমন নৌকা..."। পত্রিকার পাঠ : "কল বন্ধ করিয়া দিলেও যেমন রেলগাড়ি..."।

২৭৩/১৬ : "কৌশল চাই।" পত্রিকার পাঠ : "কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।"

২৮১/৬ : "সুতরাং বিহারী দত্ত ও তাহার জাতি-ভাই সকলেই শূদ্র।" পত্রিকায় এর আগে ছিল : "অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হইল, কলিতে ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই।"

৩০২/১৫ : "নৌকা হইতে সিঁড়ি বহিয়া তিনজন লোক নামিয়া বাঁধা ঘাটের ধাপে উঠিলেন।" পত্রিকায় এর আগে ছিল : "নৌকা হইতে সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল।"

৩০৫ পৃ. : নারায়ণ পত্রিকার ১৩২৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত চতুর্দশ অধ্যায়ের ১, ২ ও ৩ উপবিভাগের মধ্যে প্রথম দুটি উপবিভাগ একাদশ পরিচ্ছেদের ৬ ও ৭ উপবিভাগ রূপে রাখা হয়েছে, ৩ সংখ্যকটি বর্জিত। এই বর্জিত অংশটি নিচে উদ্ধৃত হল :

বিহারীর প্রতাপে জাতগাঁয়ে শান্তি হইল। বাগ্‌দিরা কেহ কেহ হরিবর্মার প্রজা হইয়া তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইল। কেহ কেহ বা বিষ্ণুপুরে চলিয়া গিয়া মেঘার সঙ্গে যোগ দিল। বিহারীর সুবিচারে প্রজারা রাজার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। বিহারী শালাকে পোষ্যপুত্র লইল। মায়া একটি ধনীর ছেলেকে পোষ্য-পুত্র লইল, এবং আপনার হৃদয়ের যত স্নেহ-মমতা ছিল, সব তাহারই উপর দিয়া তাহাকে লালনপালন করিতে লাগিল। একে স্বর্গীয় স্বামীর আজ্ঞা, তাহাতে নিজের নাম-গোত্র রক্ষা হইবে, এই আশা, এ দুয়ে মিশিয়া তাহাকে আনন্দময়ী করিয়া তুলিল। সব হইল, তাহার বিষাদটুকু কোথায় চলিয়া গেল। সে রাজ-কন্যা হইয়া প্রজাপালনে পিতার প্রধান সহায় হইল। ক্রমে তাহার স্বামীর অষ্টধাতুর মূর্তি প্রস্তুত হইল। একটি সুন্দর মন্দির করিয়া তাহাতে মায়া সে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিল।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

গুরুপুত্র গুরুদেব কবে আসিবেন, ভাবিয়াই অস্থির হইলেন। শেষে লুই-সিদ্ধা আসিলে তাঁহার হাতে মহাবিহার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং মহাযান শিক্ষার জন্য সুবর্ণদ্বীপে চলিয়া গেলেন। লুই দারিক নামে তাঁহার প্রধান ও প্রবীণ চেলার হাতে মহাবিহারের ভার দিয়া ধর্মপ্রচারে বাহির হইলেন। আপনার গ্রামগুলি বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দারিক যে জাঙাল বাঁধিয়াছিলেন, তাহা কোন্নগরের নিকট আজিও দারিকের জাঙাল বলিয়া বিখ্যাত আছে।

৩১৩/১৯ : "ততদিন সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনে, তেলি সঙ্ঘে গিয়াছে।" পত্রিকায় এর আগে ছিল : "সঙ্ঘে ইন্দ্রিয়দোষ ছিল না,"

৩৩৬/২০ : "তাহার পর মূল-রেখার সাত আঙুল বাদ দিয়া আর-একটি রেখা টানা হইল।" পত্রিকায় এর পরে একই বাক্যের মধ্যে ছিল : " , আর ৭ আঙুল বাদ দিয়া আর একটি রেখা টানা হইল।"

৩৬৪/১৯ : "রোমদেশের"। পত্রিকার পাঠ : "ব্রহ্মদেশের"।

পৃ. ৩৬৫ : ২ অনুচ্ছেদের পরে পত্রিকায় নিচের অনুচ্ছেদটি ছিল :

"মস্করী পাটলিপুত্রে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশেপাশে গ্রামগুলিতে আপনার কাজ সারিয়া বুদ্ধ-রক্ষিতকে বিদায় দিয়া তিনি নৌকায় চড়িয়া কাশীযাত্রা করিলেন।"

৩৭০/৭ : "পঞ্জাবরাজের"। পত্রিকার পাঠ : "অনঙ্গপালের"।

৩৭১ পৃ. নারায়ণ পত্রিকার ১৩২৬-এর কার্তিক সংখ্যায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদ রূপে ( অনুক্রম নির্দেশে ভুল ছিল, অষ্টাদশ হবে ) প্রকাশিত. গ্রন্থভুক্তিকালে বর্জিত অংশ নিচে সম্পূর্ণ ছাপা হল।

১.

মস্করী দেশে ফিরিলেন। তিনি গঙ্গা বাহিয়া আসিয়া অম্বুয়ার উত্তরে বল্লুকা নদীর ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে বড়োয়ানে নামিয়া হাঁটিয়া চৌথখণ্ডে গেলেন। সেখান হইতে পিশাচখণ্ড বেশি দূর নয়। নিজের বাড়ি গিয়া তিনি চারি-পাঁচ দিন বিশ্রাম করিলেন। এত দিন গৃহিণী অগ্নিরক্ষা করিতেছিলেন। সে ভার তিনি বহুদিনের পর নিজেই লইলেন। এবার কিন্তু ভবতারণ পিশাচখণ্ডীর

মনের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। পিশাচখণ্ডের উপর তাঁহার বড়ো মায়া নাই। তিনি চারি দিক হইতে হিসাবপত্র গুটাইতে লাগিলেন; সোনা, রুপা, হীরা, জহরত প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিস লইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী ইহাতে কিছু ভয় পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলে পিশাচখণ্ডী উত্তর দিতেন—

"আর কি? বিবাহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াছি, এখন ৬০/৬২ বছরের উপর বয়স হল, ৩০ বৎসরের উপর অগ্নিরক্ষা করিয়াছি। এখন অগ্নি-বিসর্জন দিয়া চলো আমরা তীর্থ-বাস করি গিয়া। ছেলেপিলে তো হইলই না। বিষয়-রক্ষা করিয়াই বা কি হইবে? সংসার ধর্ম করিয়াই বা কি হইবে?" ব্রাহ্মণীকে এইরূপে বুঝান; কিন্তু নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোক সংগ্রহ করেন। তিনি তাহাদের তীর-ধনু-ঢাল-তরবাল খেলা শিখান, ঘোড়ায় চড়া শিখান, বল্লম ধরা, কেঁচা ধরা শিখান। এইরূপে কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ তিন মাস কাটিয়া গেল। তিনিও বাহির হইয়া দেবগ্রামে ভবদেবের সঙ্গে ও ময়নামতীর পাহাড়ে হরিবর্ম-দেবের সহিত দেখা করিলেন। আসল কথা এই দুজনের কাছেই ভাঙিলেন, আর কাহারো কাছে ভাঙিলেন না। ইঁহারাও কাশ্মীর, নগরকোট, থানেশ্বর প্রভৃতি দেশের দুর্দশা শুনিয়া একটু ভয় পাইলেন এবং যথাসাধ্য মুসলমানদের বাধা দিবারও চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

২.

ইঁহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া মস্করী সাতগাঁয় আসিলেন, রাজা বিহারীর সহিত দেখা করিলেন, মায়ার সহিত দেখা করিলেন, পোষ্যপুত্র দুটিকে দেখিলেন। তাহারা সম্পর্কে 'মামা-ভাগ্নে' হইলেও মানিকজোড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মায়ার ছেলেটি দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে ইহার মধ্যে জলে ঝাঁপাই ঝোড়ে, গাছে উঠে, জন্তু-জানোয়ার তাড়ায়, ছোটো ছোটো তীর-ধনুক লইয়া খেলা করে। তাহার মামা তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ছেলে যখন তীর-ধনুক লইয়া কাক-বক-শিয়াল-কুকুর তাড়না করে, মায়ার তখন বড়ো আনন্দ হয়। তখন সে দুহাত বাড়াইয়া ছেলেটিকে কোলে লইতে যায়। ছেলে কিন্তু ঘাড় বাঁকাইয়া দূরে সরিয়া যায় এবং আর-একদিকে তীর মারে।

মস্করী মহাবিহারে গেলেন, গুরুপুত্রের সহিত দেখা করিলেন— দেখিলেন, সবার চেয়ে গুরুপুত্রেরই স্ফূর্তি বেশি। তিনি ২/৩ কুঠরি সোনার প্রতিমা দেখাইলেন, ৪/৫টি জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দেখাইলেন— একটি ছোটো পায়রার ডিমের মতো হীরার বাণলিঙ্গ, একটি পান্নার গৌরীপট্টের উপর বসানো, পাটাটি আবার একটি বৈদূর্য-শিলার উপর রাখা, বৈদূর্য-শিলার পিছন দিক হইতে একটি সোনার ডাঁটা উঠিয়া শিবের মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে; ছাতা সোনার তারে গাঁথা, চারি দিকে ঝালর দেওয়া, ঝালরে ছোটো ছোটো হীরা, ছোটো ছোটো

মুক্তা, ছোটো ছোটো পান্না, ছোটো ছোটো পলা, ছোটো ছোটো নীলা দেওয়া। মস্করী তো দেখিয়াই আশ্চর্য; বলিলেন, "কারিকর কে?" উত্তর— "সোনার গাঁয়ের সেকরারা।" মস্করী খুব নিপুণ হইয়া জিনিসগুলি দেখিলেন, শতমুখে গুরুপুত্রের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তাহার পর দুজনে নির্জনে বসিয়া বাংলায়, মগধে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধদের পাণ্ডিত্য ও শিল্পকলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মস্করী নালন্দার কথা বলিতে বলিতে ভাবে গদগদ হইয়া গেলেন। নালন্দার কথা শুনিয়া গুরুপুত্রও মনে মনে সংকল্প করিলেন— যত শীঘ্র পারেন, একবার বৌদ্ধদের এই পরমতীর্থ দেখিয়া আসিবেন। তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন, "আমার গুরুদেবও আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি এখন ললিতপত্তনেই আছেন। আমি আরো কাজ করিয়াছি; লক্ষ্মী-ভগবতীর যতগুলি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাঁচিয়া আছে, সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি। প্রকটনিতম্বা স্বয়ং আসিবেন।"

মস্করী সেখান হইতে বিহারী দত্তের বাড়ি গেলেন। বিহারী হিন্দুদের অনেক জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে— অনেক পদকর্তা ও কীর্তনওয়ালার পদ সংগ্রহ করিয়াছে, অনেক গায়ন নিমন্ত্রণ করিয়াছে। মস্করী দেখিলেন, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটা মহা-সমারোহ হইবে, মহা-আয়োজন হইবে, মহা-সাজ-সরঞ্জাম ধুমধাম হইবে, সমস্ত সাতগাঁটা যেন তার জন্য টলমল করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মস্করীর আহ্লাদ ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তিনি কিছুদিনের জন্য দেশের ও ধর্মের যে মহা-বিপদ উপস্থিত, তাহা ভুলিয়া গেলেন; কিছুদিন উহাতেই মাতিয়া রহিলেন।

৩.

ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। গোলার সম্মুখে, মহাবিহারের সম্মুখে যেখানে গঙ্গার এপার ওপার দেখা যায় না, তাহার ঠিক মাঝখানে— ঠিক বুকের উপর, এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়াছে। চড়ার চারি দিকে বালি জল হইতে একটু একটু করিয়া উঠিয়া শেষে মাটিতে দাঁড়াইয়াছে। সে [ মাটি ? ] প্রায়ই বর্ষায় ডুবে না, জল হইতে প্রায় ৩/৪ হাত জাগিয়াই থাকে। মাটির উপর ঘাস, বন-জঙ্গল খুব হইয়াছে, দুই-চারিটা গাছও হইয়াছে। জায়গাটা প্রায় এক শত বিঘা হইবে। চাঁদের আলো যখন জঙ্গলের উপর পড়ে, তার পর বালির উপর, তার পর জলের উপর পড়ে, তখন সে আলোর খেলা বড়োই বিচিত্র হয়, বড়োই মধুর হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন জঙ্গল সাফ হইয়া যাইবে, চড়াটি বেশ করিয়া সাজানো হইবে, দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতে থাকিবে, চারি দিকে ফুল ফুটিয়া উঠিবে, তখন এই চড়াতেই চাঁদের আলোর খেলা চমৎকার হইবে। এত বড়ো একটা রাজসভা হইবে, একবিন্দু তেল পুড়িবে না, একটিও আলো জ্বলিবে

না— ভগবানের আলোতেই সব আলো করিয়া রাখিবে। সাতগাঁয়ের লোকে উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে বিহারী দত্তের লোক আসিল, জঙ্গল কাটা শুরু হইল। এতটা জঙ্গল সব জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেগুলা যে কোথা ভাসিয়া গেল, ঠিক নাই। ঘাস তো এমনিই ছিল— প্রায়ই দূর্বা-ঘাস, মাঝে মাঝে মুথা, ঘাসের জন্য কোনো কষ্ট পাইতে হইল না। জমিও সমতল ছিল, কোথাও এককোদাল চাঁচিতেও হইল না। চারি দিকে পতাকা-নিশান উড়িতে লাগিল। রাজার জন্য একটা জমকালো চাঁদোয়া ছাড়া চড়ার উপরে একটা শামিয়ানাও খাটাইতে হইল না। কেবল বসিবার আসন পাতিতে লাগিল, পাতিতে পাতিতে দেখা গেল, দূরের লোক রাজসভার কিছুই দেখিতে পাইবে না— সুতরাং দূরের লোকের দেখিবার জন্য একটু উঁচা করিয়া একটু ঢালু করিয়া দেওয়ার দরকার হইল। তাহাও হইল।

ক্রমে নৌকা আসিয়া বালির চড়ায় লাগিতে লাগিল। নৌকা হইতে দেখাইবার জিনিসপত্র তুলিয়া, যেখানে রাজা বসিবেন, তাহার চারি দিকে সাজানো হইতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস সাজানো হইতে লাগিল। দুই-চারি জন প্রহরী চড়াতেই থাকিত, আর সকলে নৌকায় থাকিয়াই পাহারা দিত। চড়ায় পাঠাইবার আগে সমজদারেরা সমজিয়া লইয়া, গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া সেগুলি একখানি খাতায় টুকিয়া রাখিত। তাই দেখিয়া পরে পুরস্কারের মাত্রা ঠিক হইবে। পরীক্ষাটা কতক মহাবিহারে হইত, কতক বিহারী দত্তের বাড়িতে হইত। কিন্তু কাব্য ও শাস্ত্রের পরীক্ষা মস্করী নিজেই করিতেন, কখনো কখনো ভবদেব ঠাকুরের সহিত পরামর্শও করিতেন। পরামর্শ করার বিশেষ দরকারও ছিল। কারণ, এই দুই বিষয়ে যাঁহারা পুরস্কার লইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের মাথা। স্বয়ং উদয়ন আসিয়াছেন, শ্রীধর আসিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র আসিয়াছেন, প্রভাকর-মতি আসিয়াছেন, উদয়নের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীহীর পণ্ডিত আসিয়াছেন, তাঁহার জোয়ান ছেলে শ্রীহর্ষ আসিয়াছেন— তিনি ইহারই মধ্যে এই বয়সেই অনেক রাজ-রাজড়ার কাছে প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছেন। কনৌজের রাজাই তাঁহাকে দুইটি পান ও আসন দিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রকটনিতম্বা আসিয়াছেন— তাঁহারও খ্যাতি বড়ো কম নয়। কাব্যশাস্ত্রে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। বজ্রদত্ত আসিয়াছেন, তাঁহার লোকেশ্বর-শতক ইহারই মধ্যে সহস্রকণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। রত্নাকর শান্তি আসিয়াছেন —তিনি কাব্যেও যেমন প্রবীণ, শাস্ত্রেও তেমনি প্রবীণ। তাঁহার ভাষায় কাব্য আছে, সংস্কৃত কাব্য আছে, ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। শুভাকর গুপ্ত আসিয়াছেন। ইনিই সবপ্রথম বৌদ্ধদের জন্য একখানি স্মৃতি রচনা করিবার চেষ্টা করেন। জৈন পণ্ডিত অভয়দেব মলধারী আসিয়াছেন। নাথযোগী চামরীনাথ আসিয়াছেন। সিদ্ধ সহজিয়া দারিপা আসিয়াছেন, ভাদে আসিয়াছেন, ঢেণ্ঢন আসিয়াছেন,

ডুম্বরী আসিয়াছেন, কমলকন্দারি আসিয়াছেন, চিঁপিল আসিয়াছেন। নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথ, চামষনাথ, তণ্ডিছা, হাড়িপা— ইঁহারাও আসিয়াছেন। এই সকল লোকের কাব্য ও শাস্ত্র পরীক্ষা করা কি মস্করীর কাজ ? মস্করী যত বড়ো বিদ্বান্‌ই হউন না কেন, যাঁহাদের নাম করা গেল, তাঁহারা তাঁহাকে গুলিয়া খাইতে পারেন, তাঁহাকে বিশ বছর পড়াইতে পারেন। তবে মস্করী খুব চৌকস লোক, সব দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আছে, চোখে তাঁহার কিছুই এড়াইয়া যায় না। ভবদেব এ সকলের চেয়েই পাণ্ডিত বেশি, বুদ্ধিমান্ বেশি, কাজের লোক বেশি, চৌকসও বেশি। ভবদেব কোনো কথা বলিলে. ভারতে এমন কেহই ছিল না যে, তাঁহার কথার উপর কথা কয়। তাই মস্করী সর্বদাই ভবদেবের সহিত পরামর্শ করেন।

৪.

এইরূপ উদ্যোগপর্বে সকলেই ব্যস্ত। রাতদিন নৌকায় যাতায়াতে সাতগাঁর গঙ্গা তোলপাড়। বড়ো বড়ো লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন— আর কেবল ভেরি, শিঙা বাজিতেছে। ভাট-চারণগণ তাঁহাদের যশোগান করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় একদিন রাত্রিতে মহাবিহারের চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। ত্রিমালা মন্দির তিনটা আলোরাশির মতো বোধ হইতে লাগিল— একটাকে বেড়িয়া একটা, দুইটাকে বেড়িয়া আর-একটা ; পাঁচতলা তোরণগুলা আলোময় হইয়া উঠিল। নানারূপ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বহুকালের পর মহাবিহারের অধিকারী লুই-সিদ্ধা আবার সাতগাঁয়ে আসিয়াছেন। তাই সহজিয়ারা আজ আনন্দে মাতোয়ারা। রূপা-রাজার রাজ্যনাশ হইয়াছে শুনিয়া লুই-সিদ্ধা বড়োই দুঃখিত, বড়োই ম্রিয়মাণ, বড়োই বিমর্ষ। তিনি আসিয়া মহাবিহারের দেবদেবী-গণকে পূজা করিলেন, নমস্কার করিলেন, সব সহজিয়াগণকে মহাবিহারে ডাকিলেন। ভোটদেশ, মঙ্গলদেশ, নেপাল, সুবর্ণদ্বীপ, হংসদ্বীপ, এই সকল জায়গায় যাহা যাহা করিয়া আসিয়াছেন, চেলাদের সব তিনি শুনাইলেন। গুরুদেব এই সকল দেশে পূজা পাইয়াছেন জানিয়া তাহারাও আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার সোনার ও পাথরের প্রতিমা লইয়াছে, অনেক দেশে তাঁহার অষ্টধাতুর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অনেক দেশে তাঁহার নামে মন্দির দিয়াছে— তাঁহার নামে যাত্রা, মহোৎসবও চালাইয়াছে— ঐ সকল শুনিয়া তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মানিয়া লইল, ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া গেল।

তিনি আসা অবধি সাতগাঁয়ে আবার কীর্তনের ধূম পড়িয়া গেল। খুলিরা অনেক বৎসর ধরিয়া দেশবিদেশে খোল বাজাইয়া হাত এমনি সাফ করিয়াছে যে, খোলে চাঁটি দিবামাত্র রাগ-রাগিণী যেন মূর্তিমান্ হইয়া নাচিতে থাকে। কীর্তনিয়ারা যখন খোলের সহিত গলা তুলিয়া সহজিয়া পদ গাহিতে থাকে আর

সেইসঙ্গে খঞ্জনি-খরতাল বাজিতে থাকে, শিঙা বাজিতে থাকে, তখন সমস্ত লোক একতান-মনপ্রাণে সেই গান শুনিয়া প্রেমে, সুখে, মোহে আর মোহিনীতে মজিয়া যায়, সহজিয়ার সার কথা তাহাদের মনের মাঝে তখন ভাসিয়া উঠে। তাহারা এই ক্ষণিক সুখকে নিত্য সুখ করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হয়, তন্ময় হয়, একাগ্র হয়— মনে করে, যদি এইভাবে চিরদিন থাকিতে পারি, এইভাবে এই সুর নিরন্তর কানে বাজে, এইরূপ প্রেম যদি নিত্য হয়, এইরূপ সুখ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহিনীও যদি নিত্য হয়, সেই তো নিত্যা-নন্দ, সেই তো নির্বাণ, সেই তো শূন্যময়, বিজ্ঞানময়, মহাসুখময় নিত্যবুদ্ধভাব, সেই ভাবের জন্য তাহারা পাগল হইয়া উঠে, উন্মাদ হইয়া উঠে। লুই-সিদ্ধার কীর্তনিয়ারা কীর্তন আরম্ভ করিবামাত্রই এইরূপ সুর জমিত, এইরূপ গান জমিত, এইরূপ ভাব জমিত, এইরূপ একাগ্রতা আসিত। আর যতক্ষণ সে গানের বিরাম-সুর কানে না লয় হইয়া যাইত, ততক্ষণ এক ভাবেই থাকিত। অনেকের ভাব লাগিত, তাহারা অজ্ঞান হইয়া যাইত, অনেকরূপ সাত্ত্বিকবিকার তাহাদের দেহে প্রকাশ পাইত।

লুই-সিদ্ধা গুরুপুত্রের কাছে সাতগাঁয়ের সব ব্যাপার আগাগোড়া শুনিলেন— বুঝিলেন, দলাদলির ঝোঁকে শ্রীফলবজ্র সহজিয়াদের সর্বনাশ করিতে গিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের সর্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, "আজ যদি মহারাজা-ধিরাজ রূপনারায়ণ থাকিতেন, আমরা বাংলাও মাতাইতে পারিতাম, বাংলায়ও আমাদের জয়জয়কার হইত। যাহা হোক, যা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই। আমাদিগকেও কিছু দিন স্রোতে গা-ভাসান দিতে হইবে।"

লুই-সিদ্ধা সেবার সাতগাঁয় বাহির হইয়াছিলেন হাতির উপর হাওদায় বসিয়া, এবার বাহির হইলেন হাঁটিয়া; সেবার বাহির হইয়াছিলেন রাজসাজে, এবার বাহির হইলেন ভিক্ষুসাজে; সেবার সঙ্গে ছিল রাজার দল, এবার সঙ্গে ছিল কীর্তনিয়ার দল, সেবার সঙ্গে ছিল হাজার হাজার লোক, এবার সঙ্গে কেবল কয়েকটি কীর্তনিয়া। তিনি, যে ডাকিল, তাহারই বাড়ি গেলেন, কিন্তু সকলের আগে গেলেন রাজা বিহারী দত্তের বাড়ি। বিহারী দত্ত তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, পূজা করিল, ফুল দিল, মালা দিল, চন্দন দিল। মায়াও তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, পূজা করিল, ফুল দিল, মালা দিল, চন্দন দিল। তিনি ভবদেবের সহিত দেখা করিলেন, ভবদেবও তাঁহার কীর্তন শুনিয়া শতমুখে প্রশংসা করিলেন এবং রাজা আসিলে তাঁহারো সম্মুখে কীর্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন— বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ আমাদের বড়োই গুণগ্রাহী, তিনি কেবল গুণই দেখেন, জাতি দেখেন না, ধর্ম দেখেন না, কুল দেখেন না, সম্প্রদায় বাছেন না।" লুই-সিদ্ধা ঘাড় হেঁট করিয়া ভবদেব ঠাকুরের কথাগুলি শুনিল, আর নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

৫.

চতুর্দশীর দিন সকালে গোলীন গ্রামের সামনে গঙ্গার যে-সব প্রকাণ্ড খাড়ি আছে, তাহার উত্তর-পূর্ব কোণে যেখান হইতে যমুনা বাহির হইয়া পূর্বমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিক হইতে রণবাদ্য শুনা যাইতে লাগিল। ঢাক, ঢোল, শিঙা, ঝাঁঝের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। জলরাশির উপর দিয়া সে বাজনা সুদূর গোলীন বা সাতগাঁয়ে যখন পৌঁছিল, তখন তাহার আর রণ-রণ ভাব নাই: দূরস্থ বাজনার শব্দ যেমন মধুর হয়, তেমনি মধুর শুনা যাইতে লাগিল। প্রথমত কিসের শব্দ বলিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর কান পাতিয়া শুনিল, শব্দ ঈশান কোণ হইতে আসিতেছে আর শব্দটা যুদ্ধের বাজনার শব্দ— কুচকাওয়াজের বাজনার শব্দ। তখন তাহারা ভাবিল, রাজা আসিতেছেন। যমুনা বাহিয়া আসাই তাঁহার পক্ষে সুবিধা— তিনিই আসিতেছেন। তখন নগর-সুদ্ধ লোক গঙ্গার ধারে ভাঙিয়া পড়িল। গঙ্গার ধারে যাহাদের বাড়ি, তাহাদের বাড়িতে আর লোক ধরে না। যাহাদের দুতলা ছিল, তাহাদের ছাদে পর্যন্ত লোক উঠিল। সকলেরই মুখ একদিকে— ঐ ঈশান কোণে ঐ দিক হইতে বাজনা আসিতেছে।

ঐ দেখা যায়— ঐ দেখা যায়— ঐ যে রাজার ডিঙি— ওখানা ময়ূরপঙ্খি —দেখ্‌ছ না, ঐ ময়ূরের মুখ দেখা যায়— হাঁ হাঁ, ময়ূরপঙ্খিই বটে— দেখো না, ময়ূরের মাথার তিনটা চূড়া পর্যন্ত রহিয়াছে— হাঁ হাঁ, ময়ূরপঙ্খি নিশ্চয়ই— ঐখানাতেই রাজা আছেন— দেখ্‌ছ না নিশান— ঐখানাতেই রাজা— দেখো তো কয়খানা ডিঙা আছে— এক— দুই— তিন— চার— পাঁচ— ছয়— সাত— এক সাঙ্ঘা, আট— নয়— দশ— এগারো— বারো— তেরো— তেরোখানা— দূর চৌদ্দ-খানা— কিসে হল? আর, ময়ূরপঙ্খিখানাকে ধরলি না— তবে আবার গুনি— এক— দুই— ইত্যাদি চোদ্দখানাই বটে। দুসাঙ্ঘা ডিঙায় রাজা আসিতেছেন।

ফাল্গুন মাস— একটানা গঙ্গা— তাহাতে বাঙাল মাঝি— খুব পাকা— হালেই বলো, দাঁড়েই বলো— খুব শক্ত— তাহাতে আবার আজ একটু উত্তরে বাতাস বহিয়াছে— উত্তরে বাতাসের এই শেষ— বাতাসও মরণ-কামড় কামড়াইতেছে। সাঙ্ঘা হু হু করিয়া গোলীনের দিকে আসিতে লাগিল— ময়ূরপঙ্খির মাথাটাই দেখা যাইতেছিল— এখন সবটাই দেখা যাইতে লাগিল— উত্তরে বাতাস পাইয়া পাল তুলিয়া দিয়াছে— পাল অনেকগুলা; সেগুলা এমন চিত্র-বিচিত্র করা, যেন ময়ূরের পেখম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ময়ূরের পেখমের মতো উজ্জ্বল লাল, উজ্জ্বল নীল, উজ্জ্বল জরদায় ঠিক বোধ হইতে লাগিল, বসন্তকালেও ময়ূর পেখম ধরিয়া নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। ময়ূরের পেখম ও ঘাড় এ দুয়ের মধ্যে কামরা— কতগুলা গনা যায় না। ময়ূরের রঙে রঙ করা— মাঝখানে তিনটা দোতলা কামরা ও তাহার মাঝখানে একটা তেতলা কামরা। এগুলার রঙ

আর-একরূপ, এমন করিয়া সাজানো যে, বোধ হয়, একটা মানুষ বসিয়া আছে — তাহার গায় রাজবেশ। যেন ময়ূরে চড়িয়া কার্তিক আসিতেছেন।

সাম্পা যতই কাছে আসিতে লাগিল, লোকের কোলাহল ততই বাড়িতে লাগিল। কে আগে কি দেখিয়াছে, তাহাই লইয়া অনেকে কোলাহল বাড়াইয়া দিতে লাগিল। রাজার জয়, হরিবর্মার জয়, মহারাজাধিরাজের জয় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, প্রথম অল্প, তাহার পর একটু উচ্চ— যতই কাছে আসিতে লাগিল, তত উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। যখন গোলীনের সামনে দিয়া যাইতে লাগিল, তখন উচ্চতম হইয়া দাঁড়াইল। হাজার হাজার লোক রাজার জয়, রাজার জয় বলিতে লাগিল। শেষ সব শব্দ ডুবিয়া গিয়া এক জয় শব্দ জয়জয়কার করিতে লাগিল।

হরিবর্মার ময়ূরপঙ্খিখানি ধীরে ধীরে পাড়ের অতি কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। তেতলায় রাজা ছিলেন। তিনি বাহিরে দোতলার ছইয়ে আসিয়া কিনারায় দাঁড়াইলেন। যতবার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল— ঘাড় নোঙাইয়া হাত তুলিয়া জয়ধ্বনির উত্তর দিতে লাগিলেন, নমস্কারের প্রতিনমস্কার করিতে লাগিলেন। কতকগুলা দুষ্ট লোক বলিতে লাগিল— মহারাজকেই এ রাজসভায় প্রথম ও প্রধান পুরস্কার দেওয়া উচিত। এমন করিয়া ময়ূরপঙ্খি আর-কেহ কি সাজাইতে পারিত ?

হরিবর্মার ময়ূরপঙ্খি স্বপ্নের মতো শীঘ্র শীঘ্র সাতগাঁর লোকের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, আর চড়া ঘুরিয়া চড়ার পুব দিকে গিয়া নোঙর করিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, 'এ কি দেখিলাম— অদ্ভুত অদ্ভুত !' লোকে আর ময়ূরপঙ্খি থেকে চোখ ফিরাইতে চায় না— দেখিয়া তাহাদের যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। কিন্তু তৃপ্তি না হইলেই বা কি হইবে, ক্রমে যে চোখের বাহিব হইয়া গেল, ক্রমে যে চড়ায় আড়াল পড়িল— নিশ্বাস ফেলিয়া লোক চোখ ফিরাইল, যাহারা রাজদর্শনের পুণ্য চায়, তাহারা ছোটো ছোটো ডিঙা খুলিয়া ময়ূরপঙ্খির পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল— প্রায় হাজার ছোটো নৌকা খুলিয়া গেল। অনেক লোক তাহাতে উঠিয়া গেল। বাকি লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক এক করিয়া ফিরিয়া ঘরে গেল।

৬.

রাজাধিরাজের নৌকা নোঙর করিলেই রাজা বিহারী তাঁহাকে গিয়া নমস্কার করিলেন। রাজা বলিলেন, 'বিহারী, কাল দোল। আমরা যাদব, আমরা দোলটি আমাদেরই উৎসব বলিয়া মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরই পূর্ব-পুরুষ ছিলেন, তাঁহারই উৎসব। কাল দোলও হইবে, আবার রাজসভাও হইবে। সুতরাং আজি চারি দিকে ঘোষণা করিয়া দেও যে, কাল সকালেই যেন সকলে

দোলের উৎসব সারিয়া বৈকালে উজ্জ্বল বেশে মহাসভায় হাজির হয়। বৈকালে যেখানে যেখানে দোলের মেলা হয়, সেগুলি বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বন্ধ করিতে গেলেই একটা গোল উঠিতে পারে। বিশেষ বৌদ্ধদের দোল অন্যরূপ, তাই আমার পরামর্শ এই যে, তুমি বলিয়া দেও যে, যাহারা মেলা— বিশেষ দোলের মেলা— দেখিতে চাহিবে, তাহাদের জন্য রাজসভার দুই পাশে মেলা বসিবে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়েরই দোল খাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে ও হাট-বাজার বসিবে।'

বলিতে-না-বলিতে রাজার রণবাদ্যওয়ালারা দুজন তিন জন করিয়া বাহক হইয়া গেল ও যে যেখানে পাইল, ঢে'টরা দিয়া রাজার আজ্ঞা প্রজাদের জানাইয়া দিল। বিহারীর ঢে'টরাওয়ালারাও চারি দিকে জানাইয়া দিল। সেকালে লোককে রাজার বা বড়োলোকের আজ্ঞা জানাইয়া দিবার জন্য চৌমাথায় ও অন্যান্য খোলা জায়গায় একটা করিয়া থাম থাকিত। থামগুলা চৌকোণা, ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গা খুব মাজা পালিশ করা। রাজার লোক তাহার উপর খড়ি দিয়া বা কালি দিয়া রাজার আজ্ঞা জানাইয়া দিত। এবারে সব থামেই লিখিয়া দেওয়া হইল। বড়ো বড়ো অক্ষরে রাজার আজ্ঞা, 'তোমরা সকালে সকলে দোল সারিয়া ফাগ খেলিয়া বৈকালে উজ্জ্বল বেশে রাজসভায় যাইবে। সেখানে মেলা হইবে। নানা রূপ দোলের ব্যবস্থা আছে— হাট-বাজার আছে, রাজার আজ্ঞা, সবাই যাবে। কেহই বাড়ি বসিয়া থাকিবে না। ছেলে-মেয়ে সবাই যাবে। কার আজ্ঞা— রাজার আজ্ঞা।'

যতবারই ঢে'টরা হয়, এইরূপই হয়। থামে লিখিয়া দেওয়া হয়, আর ঢুলি দিয়া দেশের লোককে জানাইয়া দেওয়া হয়। এবার এক নূতন ব্যাপার হইয়াছে। রাজা বিহারী কোন্ দেশ থেকে "কায়গদ" নামে বড়ো বড়ো পাতলা তক্তার মতো কি আনিয়াছে। তক্তার সঙ্গে তার তফাৎ এই যে, সেগুলা গুটানো যায়, তক্তা গুটানো যায় না। তার উপর বেশ লেখা চলে ; এই কায়গদে ছোটো করিয়া লিখিয়া থামে মারিয়া দেওয়া হইল। আবার বড়ো বড়ো করিয়া লিখিয়া দেওয়ালেও মারিয়া দেওয়া হইল।

রাজা বিহারী তখনই মহাসভার দুই পার্শ্বে দোল খাবার ব্যবস্থা করিলেন ও মেলা বসাইতে বলিলেন। সাতগাঁ বেনের দেশ, বিহারীর মুখের কথা খসিবামাত্র সব ঠিক হইয়া গেল। উত্তর দিকে হিন্দুদের ও দক্ষিণ দিকে বৌদ্ধদের জন্য দোল, নাগরদোল, ঘোড়াদোল, খাটাইয়া দেওয়া হইল। মেয়েরাও দোল খাইবে, ছেলেরাও দোল খাইবে। হিন্দুর দেবতারা প্রথম দোল খান, তার পর মানুষে প্রসাদ পায় ; বৌদ্ধদের দোল থেরারা আগে খান, তার পর অন্য লোকে প্রসাদ পায়। এখনকার বৌদ্ধরা আবার শক্তি লইয়া দোল খান। প্রথম প্রথম ঘরের মধ্যেই খাইতেন, এখন প্রকাশ্যভাবে খান। এবার কিন্তু হিন্দু রাজা

পাছে চটেন, তাই সকলে প্রকাশ্যে শক্তি আনিবে না স্থির করিয়াছে। দু-এক দল কিন্তু শক্তি লইয়াই আসিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

৭.

দোলটা ঋতুর উৎসব। সুতরাং উহা যে শুধু হিন্দুরই উৎসব, অন্য কাহারো নহে, এ কথা ঠিক নহে। উহা ভারতবাসীমাত্রেরই উৎসব। এমন কি, মানব-জাতিরই উৎসব। শীত যায়, বসন্ত আসে, ঠিক সন্ধিস্থলে এই উৎসব। শীত হইল মেড়া অসুর, তাহাকে আগের দিন মারিয়া পোড়াইয়া পরের দিন উৎসব। উৎসব মানে স্ফূর্তি। আর শীতের ভয় নাই, গায়ে কাপড় দিতে হইবে না, উত্তরের বাতাসে গা যেন কাটিয়া দেয়, সে বাতাস আর বহিবে না। দক্ষিণে বহিবে, তাহাতে দেহ ও মনের আনন্দ হইবে। শীতকালের চাঁদের আলোর উপর যেন একটা খুব পাতলা হিমের আবরণ থাকে, আলো ফিকা দেখা যায়। সেটা আর থাকিবে না, চাঁদের আলো ঘন হইবে— উজ্জ্বল হইবে। শীতকালে এক কুঁদ ছাড়া ফুল হয় না। এখন সব গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, আর তাহার গা হইতে যেন ফাটিয়া ফুল বাহির হইতেছে। পলাশফুল ফুটিয়া চারি দিক লাল করিয়া দিয়াছে ; পৃথিবী যেন নূতন বৌয়ের মতো রাঙা চেলি পরিয়া আছেন। শিমুল লালফুলে লাল হইয়া বসিয়া আছে। সোঁদাল সোনার রঙ চারি দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আমের বউল ফুটিয়া গন্ধে আমোদ করিতেছে। সকলের উপর জলপদ্ম ফুটিয়া রূপে, গুণে ও গন্ধে যেন মূর্তিমান্ বসন্তলক্ষ্মী হইয়া আছে।

রাজার ঢে'টরা বন্ধ হইল, কিছুক্ষণ পরে ছেলেদের ভিতর খুব গোল উপস্থিত হইল। রাম শ্যামকে ডাকিল চ-চ-চ ; হরি কৃষ্ণকে ডাকিল— আয়, আমরা যাই। বিনোদ কানাইকে, সাধুকে ডাকিল— আয়, আমরা সরস্বতীর ওপারে যাই। সবাই সকলকে ডাকিতেছে, কেহই কাহারো জবাব অপেক্ষা করিতেছে না। সবাই সরস্বতীর পশ্চিম পারে যাইতেছে। নৌকা লাগানোই আছে, কোথাও কোথাও নৌকার সাঁকো আছে। লোকে হু হু করিয়া পার হইতেছে। ছেলেরাই পার হইতেছে— ১২ থেকে ২৪ পর্যন্ত বয়সের লোকেই পার হইতেছে, আধা-বয়সী যারা, তারা যাইতেছে না। যাহারা পার হইতেছে, তাহাদের স্ফূর্তি দেখে কে ? পার হইয়া তাহারা মাঠে পড়িল, সেখানে সারি সারি মেড়া অসুর সাজানো আছে ; বাঁশের উপর খড় জড়ানো একটা বিকট মূর্তি। সব হিন্দুর বাড়িই দোল। সব বাড়িতেই মেড়া অসুর আছে, সব মেড়াই মাঠে আসিয়াছে। সারি সারি হাজার হাজার মেড়া সাজানো। সন্ধ্যাটি হইল, আর ছেলেরা উন্মত্ত হইয়া মেড়ায় আগুন লাগাইতে লাগিল। কতকগুলা ছোটো ছোটো ঝোপড়ার মতো ঘর ছিল, তাহাতেও আগুন লাগাইয়া দিল,আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা

নাচিতে লাগিল, গাইতে লাগিল ও হাততালি দিতে লাগিল, আর কত রকম বাঁদরামি করিতে লাগিল, তাহা আর লিখিয়া কাজ নাই। চতুর্দশীর চাঁদ উঠিল, আগুন তখনো নিবে নাই। তাহারা চারি দিকে একবার চাহিল, একটা হল্লা করিয়া উঠিল, তাহার পর যে যাহার ঘরে গেল।

৮.

পর দিন সকালে দোল। দোলে সবাই মাতে, হিন্দুরা ঠাকুরকে দোল দেয়। আপনারা বড়ো একটা খায় না। বৌদ্ধেরা থেরাদের দোল দেয়, তার পর আপনারা খায়। ফাগ সবাই খেলে। শটির পালোয় গালার জল দিয়া ফাগ তৈয়ার হয়, তাহাতে বিষাক্ত কিছুই থাকে না। দেদার ছোড়ে, যার তার গায় দয়, কেউ কিছু বলিতে পারে না। এটা ফাগের দিন। বুড়ো ঠাকুরদা নাতিকে ফাগে বুড়াইয়া দিতেছেন। ছোটো ছোটো নাতিরা ঠাকুরদাদার মাথায় ফাগ মাখাইয়া দিতেছে। মেয়েরা ছেলেদের গায় ফাগ দিতেছে। আর ছেলেরাই ছাড়িবে কেন? তাহারাও মেয়েদের গায়ে ফাগ দিতেছে। রাস্তা ফাগে ফাগে ৫ ইঞ্চি পুরু হইয়া উঠিল। তাহার উপর পিচকারি। দূর-দূরান্তর হইতে রঙের জলের পিচকারি ছুটিতেছে। লোককে রাঙা জলে নাওয়াইয়া দিতেছে। সব যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। কাল শুধু ছেলেরা খেপিয়াছিল, আজ ছেলে, মেয়ে, যুবা, বুড়ো কেউ বাকি নাই। ঠাকুর-পুজো নামে মাতামাতি উৎসব। এদিনকার বাঁদরামির কথা বলিয়া কাজ নাই। সেটা ড্যাসের মধ্যে থাকিয়া যাউক।

কিন্তু রাজার হুকুম— দুপরের মধ্যেই মাতামাতি থামিয়া গেল। সকলে গা ধুইয়া ফেলিল। সব ফাগ জলে ধুইয়া গেল। গায়ে ফাগের একটা খুব পাতলা ছোপও রহিল না। কাপড়গুলাতে রাঙা রঙের গন্ধও রহিল না। এ তো ম্যাজেণ্টারের তৈয়ারি ফাগ নয় যে, সাত দিন ছোপ থাকিবে! দুপরের পূর্বেই সাতগাঁ আবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল। যে যার বাড়ি গিয়া আহারাদি করিল ও সকাল সকাল পার হইয়া চড়ায় যাইবার জন্য সাজিতে লাগিল।

৩৮৭ / ১৯ "বহই নাবী মাঝ সমুদারে দুপ্পহর বেলা" পদটির পরের অনুচ্ছেদ "এ গানের অর্থ বুঝিতে…বৃথায় যাইতেছে" পত্রিকায় ছিল না, প্রথম সংস্করণে সংযোজন।

## ৫. অনুষঙ্গ

১৩৩০-এর মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে এবং ১৩২৬-এর ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'বেনের মেয়ে' সম্পর্কে মন্তব্য আছে। পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হল।

# মোহিনী

১

মোহিনী— মোহিনী মম জীবন-তোষিণী,
কিবা মোহজালে মোরে ঘেরেছ মোহিনী !
আপনা বিস্মৃত হয়ে তব রূপ চিত্র লয়ে
ওই ধ্যান ওই জ্ঞান দিবস রজনী।

২

একাকী রয়েছি যেন মায়ার কানন,
গাঢ় ইন্দ্রজালে যেন ভুবন মগন !
জগৎ মোহিনীময় মোহিনীই সমুদয়
মোহিনী মোহিনী মোহি'— নাহি অন্যমন।

৩

আকাশে মোহিনী হেরি— হেরি নদীতটে,
সর্বত্র মোহিনী যেন আঁকা চিত্রপটে ;
যেদিকে নয়ন যায় মোহিনী দেখিতে পায়,
যা দেখি মোহিনী— হায়, মোহিনীই বটে।

৪

বিধি যেন মোর তরে কত কাল তপ করে
ভাঙিয়া জগৎ আহা, মোহিনীতে গড়েছে,
তাই তো মোহিনীময় এ জগৎ হয়েছে।

৫

কোথা যাও— কোথা যাও, শুন লো মোহিনী
চাঁদের আড়ালে কেন লুকাও সজনি ?
মোহিনী হৃদয়ে রেখে সর্বাঙ্গে মোহিনী মেখে
তাই কি চাঁদের আলো ছড়ায় মোহিনী ?

~~~~~~~~~~

৬

বিদ্যুৎবরনী বামা বিদ্যুৎ অধরে
নয়নে বিদ্যুৎ খেলে বিদ্যুৎ অম্বরে,
ছড়াইয়ে রূপরাশি দশ দিক পরকাশি
হাসি হাসি ভাসি যায় নয়ন উপরে।

৭

স্থির সৌদামিনী ধনী বরনে তাহার
গমনে— অধরে নেত্রে চঞ্চলা বাহার।
এই আসে এই যায় এই আসে পুনরায়
চঞ্চলা চপলা যেন করিছে বিহার।

৮

চপলা প্রকাশি ডুবে, আর না প্রকাশে,
করাল নীলিম মেঘ তাহারে গরাসে ;
মোর মোহি'- সৌদামিনী দ্রুত শতহ্রদা জিনি
পুনঃ আসে পুনঃ যায় হৃদয়-আকাশে।

অভাগ্য যখন ছিল কত কিই ভেবেছি
সংসারের সুখ-আশে কত বার ভেসেছি,
নিজে সুখী হব বলে মনে আছে কত স্থলে
অস্থিচর্ম ভেদি কত যাতনাই পেয়েছি।
~~~~~~~~~~

১০

মোহিনী রে, তোর তরে সকলি সে ছেড়েছি,
অপর ভাবনা যত উপাড়িয়া ফেলেছি।
বিধাতা কি শুভক্ষণে মিলাইল তোর সনে
তুমিময়— মোহিময় তদবধি হয়েছি।

১১

ছেড়েছি— ছেড়েছি যত পুরাতন ভাবনা,
তুমি বিনে বর্তমানে আর-কিছু ভাবি না,
তুমি আমি এক হয়ে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
থাকিব অনন্তকাল এই শুধু কামনা।
তুমি বিনে বর্তমানে আর-কিছু চাহি না।

১২

মোহিনী— মোহিনী মোর হৃদয়ের তোষিণী
প্রেম মোহ মায়া সুখে বিকলিছ পরানি।
শুনিছে সুখের গান প্রেমে মত্ত মন প্রাণ
"সুখময় প্রেমময় মোহময় মোহিনী!"

১৩

যেন এক সুরাধারা সুধাভাণ্ড হইতে
অজস্র মৃদুলধারে লাগিয়াছে বহিতে.
পড়িয়া হৃদয় 'পরে সর্বাঙ্গ অবশ করে
প্রতি লোমকূপ যেন ভরিতেছে অমৃতে।

১৪

বিকল নয়ন মরি কিছু নাহি দেখিছে,
অবশ শ্রবণ হায় কিছু নাহি শুনিছে,
স্পর্শন রসন নাসা ত্যজিয়াছে সব আশা,
হৃদয় শুধুই মাত্র বিকশিত হইছে।

১৫

হৃদয়কমল পূর্ণ বিকশিত হয়েছে,
লক্ষ লক্ষ দল যেন রূপ ফেটে পড়েছে।
কোমলতা চমৎকার মরি মরি কি বাহার,
সুখের সাগরে যেন ঢলি ঢলি পড়িছে।

১৬

হৃদয়ের কাজ যত হৃদয় তা ত্যেজেছে
বুদ্ধি দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ নির্বাসিত হয়েছে ; *
যতন গিয়াছে তার শুধু সুখ নির্বিকার
প্রবৃত্তি তাহার মাত্র মোহিনীতে রয়েছে।

১৭

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাখা হৃদ্‌পদ্ম ঢাকিছে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সুখে মোহিনীতে ভরিছে।
হৃদয় মোহিনীময় মোহিনীই সমুদয়
সুধাধারা মোহিনীরে বারে বারে ঢালিছে।

* ন্যায়মতে আত্মার ছয় গুণ— বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন বা প্রবৃত্তি।

১৮

প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজিয়ে
গাঢ় যোগনিদ্রামতো, স্পন্দহীন হইয়ে
থাক থাক হৃদ্ আমার— সুধাধারা শতধার
অনন্ত অমৃতহ্রদে বায়ুকরে ডুবায়ে
প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজায়ে।

'কল্পনা'
১২৮৭ ॥

# বামুনের দুর্গোৎসব

"মা, তুমি কান্‌ছ কেন ?"

একটি আট-নয় বছরের ব্রাহ্মণের ছেলে, গলায় একগোছা ধপ্‌ধপে পইতা, দিব্য মোটাসোটা নুন্‌ধুগ্‌ড়িপানা ছেলে, একটি ঘেরা বাড়ির উত্তরের পোতার বড়ো ঘরের দাওয়ার একপাশে খেলা করিতে করিতে দৌড়িয়া আর-এক পাশে মায়ের কাছে গেল ও মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দেখিল, মায়ের চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে—দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কান্‌ছ কেন ?"

অনেক দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বাড়িতে যে চাল তৈয়ারি করা ছিল, তা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আগের দিন একটু ধরণ

করায় মা কিছু ধান সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেইগুলি ঘরের বড়ো দাওয়ায় তালপাতার চেটাই বিছাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছেন। ধান তো প্রায়ই উঠানে শুকায়, কিন্তু এখন বিশ্বাস তো নাই। কখন বৃষ্টি আসিয়া ধান সব আবার ভিজাইয়া দিবে, আর ভিজাইয়া দিলেই চালে এক নাদবুড়া গন্ধ বাহির হইবে। তাই মা ধানগুলি দাওয়াতেই শুকাইতে দিতেছেন— এমন সময়ে দূরে খোলকরতালের শব্দ ও হরি-নামের রোল উঠিয়া মাকে জানাইয়া দিল যে, আজ জন্মাষ্টমী।

জন্মাষ্টমীর দিন এ বাড়ির কাঠামোপূজা[১] হইত। মা ক'নে বৌ সাজিয়া যেদিন এ বাড়িতে পা দিয়াছেন, সেই দিন হইতে এ পর্যন্ত কোনো জন্মাষ্টমীর দিনেই কাঠামোপূজা ফাঁক যায় নাই— এবার বুঝি ফাঁক যায়। কারণ, কর্তাটি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক আট বছরের ছেলে ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আর বছর ফিরিবে না। তাই মাঘ-মাসেই তিনি ছেলেটির পইতা দিয়াছিলেন, এবং তাহাকে শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গের পূজা করিতে ও ভোগ দিতে শিখাইয়াছিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দরকারি লক্ষ্মীপূজা-ষষ্ঠীপূজাটাও শিখাইয়াছিলেন। ছেলের বিদ্যা তো ঐ পর্যন্ত। কিন্তু সে বালক হইলেও অতি সাত্ত্বিক-ভাবে যে-সব নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা সে শিখিয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠান করিত ; মাকে বড়ো একটা শুধরাইয়া দিতে হইত না।

আজ মায়ের চোখে জল দেখিয়া ছেলে বড়োই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আর একশোবারই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "মা, তুমি কাদ্‌ছ কেন ?" ছেলে যতই জেদ করিতে লাগিল, মায়ের চোখের জলও ততই বাড়িতে লাগিল। মা একবার ভাবেন— 'বলিয়া ফেলি, আবার ভাবিলেন— ও যেরূপ ছেলে, বলিলে তো এখনই পূজা করিতে চাহিবে ; কিন্তু আমার তো কোনোই সম্বল নাই, কি দিয়া পূজা নির্বাহ হইবে ?' আবার ভাবিলেন— 'মা জগদম্বার তো বছরের মধ্যে একবার আসা। তারই জন্য বাড়ি, তারই জন্য ঘর, তারই জন্য বিষয়, তারই জন্য বৈভব। তাই যদি না আনিতে পারিলাম, তো গৃহস্থালিতেই কাজ কি ? গৃহস্থালি রাখিতে হইলে, বিশেষ ব্রাহ্মণের পক্ষে, জগদম্বাকে আনা চাই-ই চাই-ই।'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

মা এইসব ভাবিতেছেন, আর চুপ করিয়া কেবল চোখের জল ফেলিতেছেন, ছেলে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বলো-না মা, কান্‌ছ কেন ?"— বলিয়াই মায়ের অঞ্চল দিয়া মায়ের চোখ দুটি মুছাইয়া দিল। বলিল, "তোমাকে বলিতেই হইবে।" ছেলে আবার জেদ ধরিল।

"আজ না জন্মাষ্টমী ?"

"হাঁ মা, আজ তো জন্মাষ্টমী বটেই। ঐ যে বৈষ্ণবদের বাটীতে খোলকরতাল বাজিতেছে ; আমিও পাঁজিতে দেখিয়াছি। কিন্তু জন্মাষ্টমী হইল, তা, তুমি কাঁদিবে কেন ?"

"জন্মাষ্টমীর দিন না তোদের বাড়ি চিরদিনই কাঠামোপূজা হইয়া থাকে ?"

"হয় তো বটে। কিন্তু এবার তো কোনোই উদ্যোগ দেখিতেছি না।"

"কে করিবে বাছা ! কর্তা কি আছেন ?"

"আমিই করিব মা— কাঠামো তো রহিয়াছে।"

"দূর পাগলা ছেলে— তুই কেমন করে করবি ? দুর্গোৎসব কি কম ব্যাপার ! অনেক অর্থবল চাই— অনেক লোকবল চাই। শেষ কি একটা ঢলাঢলি করবি ?"

"না মা, ঢলাঢলি কেন হবে ? বছরের মধ্যে একবার বৈ তো নয় ? পারব না কেন ? তার পর মা জগদম্বা তো প্রতিবছরই আসিয়া থাকেন। তাঁকেই আনিতে পারিবে না বলিয়াই তো তুমি কাঁদিয়া আকুল ! তাঁরই কি আমাদের উপর কোনো মায়া নাই ? তিনি তো শুনিয়াছি, না ডাকিলেও লোকের বাড়ি যান। তুমি এত ডাকিতেছ, এত কাঁদিতেছ ; তিনি আসিবেন না ?"

বলিয়াই ছেলে ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গেল। সেখানে চণ্ডীমণ্ডপের দুই বৃহৎ শালকাঠের আড়ার উপর কাঠামোখানি বসানো ছিল. পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুঁটি বাহিয়া সে আড়ায় উঠিল, কিন্তু আড়ার উপর বসিয়া সে ভারি কাঠামো নাড়িতেও পারিল না। সে ভাবিল, 'যদি বা কোনো রকমে কাঠামো নাড়াইবার চেষ্টা করি, কাঠামো পড়িয়া যাইবে, পড়িয়া ভাঙিয়া যাইবে।' সুতরাং সে নামিয়া পড়িল— নামিয়াই সে এক ছুটে কিশোরীদাদার বাড়িতে আসিল। কিশোরীদাদা
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

জাতিতে সদগোপ, বেশ লম্বা-চওড়া দেহখানি, গায়েও যথেষ্ট বল আছে। সে ব্রাহ্মণঠাকুরকে বাবা বলিত, তাই সে এই বালকের 'কিশোরীদাদা'।

কিশোরীদাদা তখন দোব্‌জা কাঁধে করিয়া এক কলসি আখের গুড় লইয়া বেচিতে যাইতেছে। দশ-বারো দিন মেঘ হওয়ায় সে ঘরের বাহির হইতে পারে নাই। হাতে তার আজ একটি পয়সাও নাই। সে তাই গুড় বেচিয়া পয়সার সংস্থান করিবে। এখন বামুনদাদাঠাকুর আসিয়া ধরিল, "কিশোরীদাদা, চলো, আজ আমাদের বাড়ি কাঠামো-পূজা।"

কিশোরীদাদা। মা তো পূজা করিতে প্রস্তুত আছেন ?

"মা তো আছেনই, আমিও আছি। কিন্তু তুমি না গেলে হবে না— কাঠামোই নামানো হচ্ছে না। তুমি না গেলে পূজাই হবে না।"

কিশোরীদাদার আর গুড় বেচিতে যাওয়া হইল না। গুড়ের নাগরিটি ছোটো ভাইয়ের হাতে দিয়া বলিল, "ভাই, তুমিই যাও, যা হয় তুমিই করিয়া আইস। মা আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমায় যাইতেই হইবে।"

কিশোরীদাদা আসিয়া এক লাফে আড়ার উপরে উঠিলেন, কাঠামোর হাতল দুইটি আড়া হইতে উঠাইলেন, ধীরে ধীরে ধীরে কাঠামোখানি আড়ার উপর হইতে ঝুলাইয়া দিলেন ; সঙ্গে দুই গাছা কাছি আনিয়াছিলেন, একটা হাতলের দুই দিকে কাছি বাঁধিয়া কাঠামো-খানি আস্তে আস্তে নামাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর শুয়াইয়া দিলেন।

ছেলের তখন তো ভারি আমোদ। ছুটিয়া মায়ের কাছে গিয়া সংবাদ দিল—

"মা, কাঠামো নামানো হইয়াছে।"

"বলিস কি রে ? কে নামাইল ?"

"কেন, কিশোরীদাদা।"

"কিশোরীও বুঝি আসিয়াছে ? তাকে বাড়ির ভিতরে ডাক।"

কিশোরী আসিয়া মাকে গড় করিয়া বলিল, "আমিও তাই ভাবিতেছিলাম— চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক যাবে ? এত কালের পূজাটা আজ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

বন্ধ হবে! যেমন জোটে, তেমনই করিয়া মায়ের পদে জবা ও বিল্বদল দেওয়া হবে। তা আপনি ভালোই সংকল্প করিয়াছেন। বামুনের বাড়ি, বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি— চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক যাওয়া উচিত নয়।"

মা। তা বাবা, তোমরাই ভরসা। দেখো, যেন ছেলেটা মায়ের কাছে অপরাধী না হয়।

২

দুপুরবেলা ঢোল বাজিল, নৈবেদ্য আসিল, ধূপ ধুনা পুষ্পপাত্র সব আসিল, ষোড়শোপচারে চণ্ডীর পূজা হইল— কাঠামোপূজা শেষ হইয়া গেল।

বৈকালে দাদাঠাকুরের প্রকাণ্ড উঠানে একটি একটি একটি করিয়া অনেকগুলি পাড়ার মেয়ে আসিয়া জুটিল; বুড়ী আছে, আধাবয়সী আছে, যুবতী আছে, বালিকাও আছে। উঠানটি নিত্যই গোবর দেওয়া হয়, ধুলা তাতে বড়ো একটা হয় না। সকলেই উঠানে বসিল। বিশেষ সেদিন বৃষ্টি হয় নাই। বেশ রৌদ্র হইয়াছিল, খাসা হাওয়া বহিতেছিল। বাহিরে বসাই সকলে পছন্দ করিল। একজন বৌ গিন্নিকে বলিল, "তা মা, বেশ হয়েছে। আমরা পাড়ার সকলেই প্রতিমাদর্শন করিতে পাইব। পাড়ায় আরো তো অনেকে আছেন। কিন্তু তাঁরা তো ও কাজ করেন না। তোমার বাড়িতে পূজা হলে, তবু আমরা দেখতে-শুনতে, করতে-করমাতে পাব।"

একজন আধাবয়সী— গিন্নিবান্নিগোছের— তিনি বলিলেন, "তোমাদের কর্তাটির তো কাল হয়েছে চার-পাঁচ মাস। এর মধ্যে তো তোমাদের আর-কিছুই হয় নাই। সংসার চলাচলেরই কষ্ট। তুমি কি সাহসে কাঠামোপূজা করিয়া দুর্গোৎসবে ঝাঁপ দিলে?"

ইহার উত্তরে আর-একজন গিন্নিবান্নি বলিয়া উঠিলেন, "না দিয়াই বা কি করে? চিরদিনের পূজা বাদই দেয় কি করে? চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক দেখিলে প্রাণটা যেন হুহু করে উঠে, তাই গিন্নি যেমন করেই হোক, কাঠামোপূজাটা করে মায়ের আসবার পথ করে দিলেন।"

বাড়ির কর্ত্রী। আমি তো জানি, কত ধানে কত চাল। পূজা
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

করিতে কি খরচ— কত লোকজন দরকার— সবই জানি। কর্তা গিয়া অবধিই সংসারে কি অনটন হইয়াছে, তাও দেখিতেছি। কিন্তু কি করিব ? পোড়া ছেলে যে ছাড়ে না ! আমার চোখে জল দেখে— 'মা, তুই কাঁদলি কেন ?— মা, তুই কাঁদলি কেন ?— এই যে ধরিল, আমার মনের কথাটি বার করে নিলে, তবে ছাড়লে। তার পর যা-কিছু করিবার, সেই সব করেছে। কাঠামো নামাইয়াছে, পূজার আয়োজন করিয়াছে, পুষ্পপাত্র সাজাইয়াছে, নৈবেদ্য করিয়াছে, যেমন হোক ষোড়শোপচারে চণ্ডীর পূজাটা করিয়াছে, বসে বসে একরূপ চণ্ডীও পাঠ করিয়াছে। তৃতীয় প্রহরে চারিটি খেয়ে কুমোর ডাকিতে গিয়াছে।

আর-একজন। ও মা, সে কি ? সে কেমন করে পূজা করলে ? তোর যে এখনো মন্ত্র হয় নাই।

গিন্নি। সে কথা তুলেছিলাম, মা, সে কথা তুলেছিলাম। তা সে বললে, 'চণ্ডীর পূজা সকল ব্রাহ্মণেই করিতে পারে। তবে দুর্গোৎসব মন্ত্র না নিলে হয় না। তা এই পূর্ণিমার দিন ঠাকুরবাড়ি গিয়ে মন্ত্র নিব। বোধনের আগেই আমাদের মন্ত্র নেওয়া হয়ে যাবে।'

আর-একজন। সে কি ? কালাশৌচের বছর— মন্ত্র নেওয়াই হবে কেমন করে, দুর্গোৎসবই বা হবে কেমন করে ?

গিন্নি। কর্তা বোধ হয় মনে মনে জানিতেন, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'আমার তো একটি বৈ ছেলে নয়। তা সে যেন ষোলোটা মাসিক আর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পরই সারিয়া ফেলে।' তিনি সর্বদাই বলিতেন, 'বৃষোৎসর্গ না হলে প্রেতত্ব-পরিহার হয় না, আর সপিণ্ডীকরণ না হলে পিতৃলোকে যাওয়া যায় না।'

আর-একজন। তাই বুঝি, তোমাদের বাড়িতে হপ্তাখানেক ধরে শ্রাদ্ধ হয়েছিল ? আর ঐ দুধের ছেলেটি কত উপোসই করেছে, আর কত কষ্টই পেয়েছে।

আর-একজন। ছেলেটি যথার্থই ব্রাহ্মণের ছেলে, বাপ-মার উপর বড়োই ভক্তি। যে ঐ বয়সে মায়ের চোখে এক ফোঁটা জল দেখে দুর্গোৎসব করতে যায়, সে যে বাপের জন্য তিন-চার দিন ধরিয়া শ্রাদ্ধ করিবে-- আশ্চর্য কি ?

আর-একজন গিন্নি নথ নাড়িয়া বলিলেন, "বুঝি না বাপু— যার

ষোলো দানেরই অস্থিত, সে কি করে এ রকম বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেয়।"

এক যুবতী। কাজ কি আমাদের সে কথায় বাপু ? আগুন খাবে যে— সেই যে কি বলে না ?

একজন বুড়ী বলিয়া উঠিলেন, "কাজ তো খুবই ভালো বটে— ছেলেও উৎসাহ করে লেগেছে, মাও তার সঙ্গে খাটছে, তবে কি জানো দুর্গবিপত্তি না হলে হয়।"

এইসব কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। এক এক করিয়া কাপড় ঝাড়িয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন। গিন্নিরও ঘরে সন্ধ্যা দিবার সময় হইল। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে দেখাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার কানে বাজিতেছে— 'দুর্গবিপত্তি না হলেই বাঁচি।'

এমন সময়ে নাচিতে নাচিতে ছেলে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়াই বলিল, "মা, শ্যামকাকার কাছে গিয়াছিলাম। সে কাল সকালেই আসিয়া কাঠামোতে খড় জড়াইবে।"

## ৩

ছেলের তো রোখ চাপিয়াছে। তাহাকে ফিরাইবার জো নাই। গিন্নির কিন্তু ক্রমে ভাবনা আসিয়া ঢুকিল। কেমন করিয়া দায় উদ্ধার হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে তিনি একবার বার্ষিক আদায় করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু কি বার্ষিক, কত বার্ষিক, কোথায় বার্ষিক, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তাহার কোনো ফর্দও ছিল না। তিনি বাক্স, পেঁটরা খুঁজিলেন, কিছুই পাইলেন না। যে পুথি-খানি তিনি পড়িতেন, তাহার প্রতি পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন, ফর্দ তো পাওয়া গেল না। তখন তাঁহার মনে হইল, পাশের গাঁয়ে স্বরূপ দাস বলিয়া একজন সদগোপ অনেকবার বার্ষিক আদায় করিবার সময় তাঁহার তল্পিদার হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াই ছেলেকে স্বরূপ দাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিলে তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্তা কোথায় কোথায় বার্ষিক পাইতেন, জানো কি ?" সে বলিল, "কলিকাতায় গেলে আমি সেই সব বাড়ি

চিনাইয়া দিতে পারি, কিন্তু নাম তো কাহারো জানি না। বাগবাজারে দুই ঘর, শোভাবাজারে এক ঘর, হোগলকুঁড়েয় দুই ঘর, তার পর জোড়া-সাঁকোয় দুই ঘর, পাথুরেঘাটায় এক ঘর, বৌবাজারে এক ঘর ও হাট-খোলাতে এক ঘর। হাটখোলার দত্তেরা তাঁহাকে বড়ো ভক্তি করিত, তিনি সেই বাড়ি অতিথি হইতেন ; যে-কয় দিন থাকিতেন, তাঁহারা সিধা বাঁটিয়া দিতেন, সিধায় আমাদের দুজনের কোনো জিনিসেরই অকুলান হইত না। আমি সবই করিয়া দিতাম, তিনি কেবল চড়াইয়া নামাইয়া লইতেন। সর্বসুদ্ধ প্রায় ৫০টি টাকা আদায় হইত।"

৫০টি টাকা আদায় হইতে পারে শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। ছেলেরও মহা-স্ফূর্তি ! সে বলিল, "স্বরূপদাদা, তুমি যদি সঙ্গে যাও, তো আমি বার্ষিক আদায় করিয়া আনিতে পারি।"

স্বরূপদাদা। আমি বুড়া হইয়াছি, আমার যাইতে দেরি হইবে। কিন্তু আমি না গেলেও তোমায় তো কেহ বাড়ি চিনাইয়া দিতে পারিবে না। কর্তার অনেক খেয়েছি। তুমি বলিলে না গিয়াও তো থাকিতে পারি না।

গিন্নি। তুমি বুড়া হইয়াছ, আস্তে আস্তে যাইবে। আর ঐ বা কোন্ জোয়ান ! এও তো বালক। তোমরা দুই জনেই আস্তে আস্তে যাইবে, রাস্তায় তোমাদের মিল হইবে ভালো। তাহা হইলে তোমরা রতপক্ষের প্রতিপদেই যাত্রা করিবে। কেননা, পূর্ণিমার দিন ছেলেটাকে আবার মন্ত্র লইতে হইবে।

মাঝে যে কয়টা দিন ছিল, মা ও ছেলে দুই জনেই যথাসাধ্য পূজার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ; ধান ভানিয়া চাল তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন, ডাল-কড়াই ভাঙাইতে লাগিলেন, বড়ি দিতে লাগিলেন, সব গাছ ঝুড়িয়া নারিকেল পাড়াইলেন, বাল্‌দেগুলিকে কাটিয়া জ্বালানি কাঠ করিলেন, কাঠিগুলি ঝাঁটার জন্য রাখিলেন, পাতাগুলি জ্বাল দিবার জন্য আঁটি বাঁধিয়া রাখিলেন, নারিকেলের ছোবড়াগুলিও জ্বালানি হইবে—বিশেষ লোকজনের তামাক খাবার সময় বড়োই দরকারে লাগিবে ; নারিকেলগুলি কুরিয়া, তাহা হইতে দুধ বাহির করিয়া, কলসি পুরিয়া রাখিলেন— সে দুধ জ্বাল দিয়া তেল হইবে ; নারিকেলকোরাগুলি কতক গুড় দিয়া নারিকেল-লাড়ু হইল ; কতক চিনি দিয়া পাক করিয়া রসকরা হইল।

খিড়কির বাগানে যে-সব তরিতরকারির গাছ ছিল, সেগুলি বেশ করিয়া নিড়াইয়া দেওয়া হইল, ঘাস মারিয়া দেওয়া হইল. মাচাগুলি ভালো করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল ; লাউ, কুমড়া, শশা, বরবটি, বেগুন-গাছগুলির বেশ পাট করিয়া দেওয়া হইল, যেন যথাসময়ে সে সকল পূজায় লাগিতে পারে। কিন্তু গিন্নির সকলের উপর এক কাজ, মাকে ডাকা— 'মা, লজ্জা রক্ষা কোরো।'

ব্রতপক্ষের প্রতিপদের দিন ছেলে ও স্বরূপদাদা বার্ষিক আদায়ে বাহির হইল। দশ বছরের ছেলে, কখনো বাড়ির বাহির হয় নাই, তাহাকে পাঠাইয়া— কোথায় যে পাঠাইতেছেন, তাহারো ঠিক নাই— গৃহিণী অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিলেন, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন, তার পর মনে মনে মা জগদম্বার হাতে ছেলেটিকে সঁপিয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

ভোরে যাত্রা করিয়া স্বরূপদাদা ও ছেলেটি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া দুপুর-বেলায় স্বরূপদাদার এক কুটুম্ববাড়িতে উপস্থিত হইল। স্বরূপদাদা কুটুম্বের বাড়িতেই খাইলেন। ছেলেটি সদগোপদের গোয়ালে এককোণে সিদ্ধ-পক্ক রাঁধিয়া খাইল। সদগোপেরা দুধ ও গুড় দিল। বেলা দুই-তিনটার সময়ে চানকের পাকা রাস্তায় পড়িয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই তাহারা হাট-খোলার দত্তদের অতিথিশালায় উপস্থিত হইল। দশ বছরের এক ব্রাহ্মণের ছেলে বার্ষিক সাধিতে আসিয়া অতিথি হইয়াছে শুনিয়া বাড়ির বড়ো কর্তা ছেলেটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার পরিচয় লইলেন। ছেলে বলিল, তাহার নাম মাণিক্যচন্দ্র দেবশর্মা, পিতার নাম ঠাকুর নবকিশোর শিরোমণি। নিবাস নোনাচন্দনপুকুর।

কর্তা শুনিয়াই বাড়ির ভিতর খবর দিলেন, "নোনাচন্দনপুকুরের নবকিশোর শিরোমণির কাল হইয়াছে। তাঁহার দশ বছরের ছেলে বার্ষিক সাধিতে আসিয়া আমার বাড়িতে অতিথি হইয়াছে।" মেয়েরা ছেলেটিকে বাড়ির ভিতর ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং যথেষ্ট আদর করিলেন। সকলেই ছেলেটিকে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিল ; কিন্তু সে কিছুতেই খাইল না ; কেননা, তাহার তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। সে মিষ্টান্ন অতিথিশালায় পাঠাইয়া দিতে বলিল। ছেলেটি অতিথিশালায় যাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিল, ঠাকুর-

দেবতাদের নমস্কার করিল, পরে স্বপাক চড়াইয়া দিল, এবং নিজে খাইয়া স্বরূপদাদাকে প্রসাদ দিল।

৪

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই ছেলেটি স্বরূপকে ডাকিয়া তুলিল, গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিল, পরে স্বরূপদাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বার্ষিক আদায়ের জন্য প্রথম কোথায় যাওয়া যায়?" স্বরূপদাদা বলিল, "বাগবাজারে আমাদের এক স্বজাতি আছেন, তাঁহারা যাওয়ামাত্রেই বার্ষিকের টাকাটি দিয়া দেন। কর্তা বলিতেন— এইখানে বার্ষিকের বউনি করিলে সেবার একটি পয়সাও অনাদায় থাকে না।"

বালকও তাহাই করিল। প্রথমেই বাগবাজারে সেই বাড়িতে উপস্থিত হইল। দেউড়ি পার হইয়াই প্রকাণ্ড উঠান ও সামনেই প্রকাণ্ড দালান। বাড়ির ভিতর ঢুকিয়াই ছেলেটি থতমত খাইয়া গেল। এক-জন লোক আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাকে খোঁজ?" সে বলিল, "আমি বার্ষিক লইতে আসিয়াছি।" লোকটি বলিল, "ঐ সিঁড়ি, উপরে যাও।" সে উপরে দুই-তিনটি ঘর ঘুরিয়া একটি ঘরে দেখে, একটি বাবু টেবিল পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। পাশে আর-একটি লোক এক-খানি কিতাবাঁত খাতা দেখিতেছে। পইতা দেখিয়াই বাবুটি তাহাকে নমস্কার করিলেন, বলিলেন, "বার্ষিক চাই? বলুন, কাহার নাম, কোন্ গ্রাম?" বালক বলিলে, খাতাওয়ালা খাতা খুলিয়া বাবুর সামনে ধরিল। বাবু ছেলেটিকে বলিলেন, "এইখানে আপনি নাম সই করুন, আর এই সওয়া পাঁচ আনা পয়সা লউন।" বালক তাহাই করিল। পরে আর-এক ঘর হইতে আর-একখানি খাতা লইয়া আর-একটি লোক আসিল। বাবু আবার বালককে সই করাইলেন, আর স-পাঁচ আনা দিলেন। লোকটি পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু, এদের ও বাড়িতে পাঠাইব কি?" বাবু বলিলেন, "না— তাঁহারা তো দিতেই পারেন না। যাইতে ইঁহাদেরও কষ্ট, তাঁদেরও লজ্জা। তবে তেমন নাছোড়বান্দা লোক হইলে যাইতে বলিতাম। ইঁনি তো দেখিতেছি বালক।"

বালক সাড়ে দশগণ্ডা পয়সা কোঁচার মুড়ায় বাঁধিয়া কোমরে গুঁজিয়া

বাবুকে আশীর্বাদ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল, এবং স্বরূপদাদাকে বলিল, "দাদা, সাড়ে দশ আনা পয়সা পাইয়াছি, এবার বোধ হয় আমাদের বউনি ভালো।"

স্বরূপদাদা তাহাকে একটু দূরে আর-একটি বাড়িতে লইয়া গেল। বাড়িতে বড়ো বড়ো থাম, বেশ একটি বাগান আছে ও গেট আছে। থামগুলি যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার পাশেই দেওয়ানখানা। ইহারা দুজনে সেখানে ঢুকিলেই দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" ছেলে বলিল, "বাবার কিছু বার্ষিক আছে।" দেওয়ানজী নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "বার্ষিক, তা এখন কেন? পূজার তো এখনো ঢের দেরি।" বালক, "তবে কবে আসিব?" উত্তর, "পঞ্চমী ষষ্ঠী।" বালক, "সে কি মহাশয়? আমাদের নবম্যাদি কল্পারম্ভ[২] হইবে, পঞ্চমী ষষ্ঠীতে কি করিয়া আসিব?" দেওয়ানজী খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "নবম্যাদি কল্পারম্ভ!— উনি প্রায় দুর্গোৎসব করিতে যাইতেছেন, তাই নবম্যাদি কল্পারম্ভ!" তখন স্বরূপদাদা বলিল, "না মহাশয়, ওরূপ বলিবেন না। এ ছেলেটি বড়ো সাত্ত্বিক। ইঁহার বয়স এত অল্প হইলেও ইনি দুর্গাপূজার সব আয়োজন করিয়াছেন।" দেওয়ানজীর মেজাজ আরো গরম হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তুই কে রে? ব্যাটা শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, পঞ্চমী ষষ্ঠীর দিন এসো।"

দেওয়ানজীর মেজাজ একটু কড়া, বিশেষ বার্ষিক দিবার সময় মেজাজ তাঁর আরো কড়া হইয়া যায়। এ কথা বাড়ির কর্তা বেশ জানেন। তাই তিনি সর্বদা কান রাখেন— দেওয়ানজী কি করেন। উহারা দুই জন যখন গেটের বাহির হইয়া যায়, তখন কর্তা তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং উহাদের সব খবর শুনিলেন, শুনিয়া ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া নিজে দেওয়ানখানায় আসিলেন ও বলিলেন, "দেওয়ানজী, এই দুধের ছেলেকে কেন তুমি মিছামিছি কষ্ট দিতেছ? দুইটা টাকা বৈ তো নয়, কেন মিছে ফিরাইতেছ? তুমি মনে করিতেছ, ও মিছা কথা কহিতেছে। এত অল্প বয়সে মিছা কথা কয় না, ওরা এখনো পাকে নাই।"

দেওয়ানজী কি করিবেন, অগত্যা একটি টাকা বাক্স হইতে বাহির করিয়া ছেলেটির হাতে দিলেন। কর্তা তখন একটু সরিয়া গিয়াছেন।

দেওয়ানজী তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "পাকে নাই, ঝিঙ্কুর হইয়া গিয়াছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যে দুই জায়গায় বার্ষিক আদায় হওয়ায়, তাহাদের দুই জনেরই একটু সাহস হইল। তাহারা শোভাবাজারে রাজবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাড়ির অনেক শরিক। অনেকেই বৃত্তি-বার্ষিক দিতে পারেন না, অনেকে আবার দেনও না। যাঁহারা দেন, তাঁহাদের কর্তা মেজোরাজা। রাজা নবকৃষ্ণের লেনে ঢুকিয়াই মানিক দেখিল, উত্তর দিকে পাঁচিল, এক বাগান, ভিতরে একটা মস্ত বাড়ি, একটা গেট। দক্ষিণ দিকে সারি সারি দোতলা ঘর, আর মেলা গলি। তাহারই একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া একটা অন্ধকার একতলা ঘরে দপ্তরখানায় উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর দেওয়ানজী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও হে বাপু?" "আজ্ঞে, আমার বাবার কিছু বার্ষিক আছে।" "কি নাম? কোন্ গ্রাম?" দেওয়ানজী ফর্দ খুলিয়া দেখিলেন, নাম ও গ্রাম ঠিক; বলিলেন, "গতবৎসর নবকিশোর শিরোমণি মহাশয় নিজে আসিয়া বার্ষিক লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সই আছে, তুমি যে বাপু তাঁহার পুত্র, তার প্রমাণ?" "আজ্ঞা, বাবার পুরানো তল্পিদার সঙ্গে আসিয়াছে। একে আপনি আরো অনেক বার দেখিয়াছেন, এ বাবার সঙ্গে বরাবরই আসিত।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "তা হবেও। কিন্তু বাবু, মেজোরাজা না বলিলে আমি তোমাকে বার্ষিক দিতে পারিব না। তুমি পারো তো তাঁহার কাছে যাও। তিনি এই উপরঘরে আছেন।" মানিক উপরে উঠিয়াই প্রথমেই মেজোরাজার নজরে পড়িল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে আসিতে বলিলেন। কিন্তু সে পরিষ্কার ফরাসের উপর ময়লা পা কেমন করিয়া দিবে— একটু চিন্তিত হইল। রাজা বুঝিলেন ও তাহাকে আবার ডাকিলেন। তখন সে ভরসা করিয়া গিয়া রাজার কাছে বসিল।

কাছে গিয়া দেখিল, রাজার পা দুখানি সরু সরু, হাত দুখানিও সরু সরু; পেটটি খুব মোটা, আর মুখখানি খুব বড়ো। রঙটি তাঁর ফরসা বলিলেও হয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিলেও হয়। ছেলেটি কাছে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিবাস?"

সে বলিল, "নোনাচন্দনপুকুর।"

রাজা। কে? নবকিশোর শিরোমণির পুত্র? তিনি আসেন নি?

ছেলে। তাঁর স্বর্গলাভ হইয়াছে।

রাজা। এঁ্যা, তাঁর বয়স আর কত হয়েছিল, বিয়াল্লিশের বেশি হবে না।

ছেলে। আজ্ঞা হাঁ, এই বিয়াল্লিশই হয়েছিল।

রাজা। কবে মারা গেলেন?

ছেলে। মহাবিষুবসংক্রান্তির দিন।

রাজা। আ-হা-হা, তিনি বড়ো ভালোলোক ছিলেন। আমার এখানে সর্বদাই পায়ের ধুলা দিতেন। এখন—

ছেলে। এখন আর কি? জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামোপূজা হত। এবার পূজা হবার কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জন্মাষ্টমীর দিন মা কাঁদিতেছিলেন, তাই আমি কাঠামোটা বার করে ফেলেছি, এখন আপনাদের দ্বারে এসেছি।

রাজা। অমন কথা বোলো না বাবা। তোমাদেরই ঘর, তোমাদেরই দুয়ার, আসিবে বৈ কি বাবা— তা বার্ষিক পেয়েছ?

ছেলে। আজ্ঞা, দেওয়ানজী বলিলেন, আপনার হুকুম ভিন্ন তিনি আমার নাম পত্তন করিতে পারেন না।

এমন সময় একজন ভদ্রলোক রাজার ঘরে আসিলেন। তাঁহার আকার-প্রকার, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়াই মনে হইল। তিনি আসিবামাত্রই রাজা বলিলেন—

"তুমি আসিয়াছ, বেশ হইয়াছে। ঐ লও কাগজ-কলম— দেওয়ানজীকে একটু ফর্দ লিখিয়া দাও তো? লিখ— 'মানিকচন্দ্র দেবশর্মা তোমার নিকট যাইতেছেন, ইঁহার পিতা নবকিশোর শিরোমণির যে বার্ষিক ছিল, ইঁহাকে দিয়া দাও'— তুমি এইটুকু লইয়া দেওয়ানজীর কাছে যাও, তিনি তোমাকে বার্ষিক দিয়া দিবেন। তুমি যেরূপে দুর্গোৎসব করিতেছ, শুনিয়া সুখী হইলাম।"

পত্র দেখিয়াই দেওয়ানজী মাথায় ছোঁয়াইয়া ২২।৶১০ বালকটির হাতে দিয়া বলিলেন—

"একটি সই করো। আর তোমার মেজোরাজার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে না।"

উহারা ফিরিয়া হাটখোলায় আসিল। সেদিন বৈকালবেলা বৌবাজারে গিয়া দেখিল, যাহারা বার্ষিক দিত, তাহারা কেহই সেখানে নাই। বাড়িটি ফিরিঙ্গিরা কিনিয়াছে। বাড়ি বিক্রয় হওয়ার পরে তারা যে কে কোথায় গিয়াছে— কেহই জানে না। হোগলকুঁড়ে গিয়া শুনিল, বাবুদের ভালো তালুকখানি অষ্টমে নীলাম হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রীপূজার পর আসিলে কিছু-না-কিছু পাওয়া যেতে পারে। জোড়াসাঁকোতে যাহাদের বাড়ি স্বরূপদাদা লইয়া গেল, তাহাদের ঠাট সব ঠিক বজায় আছে, কিন্তু ভিতরে কিছু নাই। স্বরূপদাদা অনেক পীড়াপীড়ি করায় দেওয়ানজী বারো টাকার মধ্যে তিনটি টাকা দিয়া দিলেন, বলিলেন—

"আর-টাকার আশা নাই। তবে রাসপূর্ণিমার সময় এসো, যদি কিছু দিতে পারি।"

তাহারা হাটখোলায় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ব্যাপার কর্তাকে খুলিয়া বলিল। তিনি নবকিশোর শিরোমণির যে বার্ষিক ছিল, তাহা তো দিয়াই দিলেন, উপরন্তু গিন্নিরাও পূজার জন্য সাত জোড়া লালপাড় ধুতি দিলেন।

এত টাকা আর কাপড় লইয়া হাঁটিয়া যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় ভাবিয়া, উহারা দুই জনেই হাটখোলার ঘাটে এক গহনার নৌকায় উঠিল ও পলতার ঘাটে নামিয়া চন্নপুকুর গেল।

ছেলে যে বার্ষিক সাধিয়া আনিবে, মা তো সে ভরসা করেন নাই। সুতরাং সে যাহা আনিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার মহা-আনন্দ। সে যে এক পয়সা আনিতে পারিবে, তা তো তিনি ভাবেন নাই। সে ৩০৲/৪০৲ টাকা আনিয়াছে। তিনি মনে করিলেন— এই তো মা জগদম্বার প্রথম অনুগ্রহ।

ব্রতপক্ষের পূর্ণিমার দিন মানিক তো গুরুর বাড়ি গিয়া মন্ত্র লইয়া আসিল। গুরুদেব তাহার প্রতি সদয় হইয়া আপন এক শিষ্যকে তাহার সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন, সে মানিককে শুধু যে তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বন্দনাদির[৩] উপদেশ দিবে, তাহা নহে, দুর্গোৎসব ও তান্ত্রিক পূজাগুলি কিরূপে করিতে হয়, তাহাও শিখাইয়া দিবে। এ ছেলেটিরও বয়স বেশি নয়, ১৮/১৯ হইবে, লেখাপড়ায় বড়ো আসক্তি নাই, তবে

পূজাপাঠে খুব ভালো। দুইটি ছেলে যখন গুরুর বাড়ি হইতে বাড়ি আসিল, মা ভাবিলেন, যেন মণিকাঞ্চনযোগ হইল। দুই জনে সমস্ত দিন দুর্গাপূজার পদ্ধতি পড়ে। পূজাপদ্ধতি শিখে ও শিখায়। কখনো হরিশ পুঁথি ধরে, মানিক পূজা করে; কখনো বা মানিক পুঁথি ধরে, হরিশ পূজা করে। এইরূপে তাহারা নবম্যাদি কল্প আরম্ভ হইবার পূর্বেই পূজাপাঠ বেশ আয়ত্ত করিয়া লইল। দেশে আর লোক নাই, যাহাকে জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে, ৪/৫ ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। তথাপি একবার গিয়া গুরুদেবের কাছে তাহারা দেখাইয়া আসিল, কিরূপ শিখিয়াছে। তিনিও বলিলেন, "বেশ শিখিয়াছ।"

আজ অপর পক্ষের[৪] নবমী। আজ বেলতলায় দেবীর বোধন। দেবতারা সকলেই 'শয়নে'র সময় নিদ্রা যান। দেবীও নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বড়ো দরকার হইল তাঁহাকে জাগানো— নহিলে রাবণবধ হয় না। সেই অবধি অকালে দেবীর বোধন চলিয়া আসিতেছে। নবমী হইতে এই বোধন আরম্ভ হয়। পূজার সপ্তমীর দিন তিনি জাগিয়া উঠেন। আজ বোধন। হরিশ ও মানিক পূজা শিখিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গাপ্রতিমার মুখ লাগানো হইয়াছে। আজ খড়ি দিবার দিন।

আজ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়িতে একটু মত্ততার ভাব আসিয়া গিয়াছে। প্রথম মত্ত মা, তার পর মত্ত ছেলে, তার পর হরিশ, তার পর কিশোরীদাদা, তার পর স্বরূপদাদা, তার পর মত্ত শ্যামকাকা। বোধনের বাজনা বাজিল। বাজনাদারেরা চিরকাল চাকরান ভুঁই খায়, তাদের না বাজাইয়া রক্ষা নাই। এই একমাসের সব ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, উদ্যম-উৎসাহ— সব আজ সফল হইতে চলিল। আজ দেবীর বোধন। তাঁহাকে চিয়াইতে হইবে। জাগিয়া উঠিলে তিনি সকলের আগে এখানে আসিবেন। কেননা, এত কাতরভাবে তাঁহাকে আর-কেহ ডাকে নাই। নবমীর বোধন হইতেই রোজ একরূপ করিয়া চণ্ডীপাঠ হইত; হয় হরিশ, নয় মানিক পাঠ করিত। তাহাদের উচ্চারণ সকল সময় শুদ্ধ হইত, তা নয়; কিন্তু উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া পড়া তো ছোটো কথা। তাহারা যখন ভক্তিগদগদস্বরে পাঠ করিত, তখন লোকের মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যাইত।

ক্রমে দুর্গার গায়ে রঙ উঠিল, রঙ শুকাইল, চালচিত্রে ঘরবাড়ি,

সাজসজ্জা ক্রমে যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাদেব সত্য সত্যই ষাঁড়ের উপর বসিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছেন। ক্রমে ষষ্ঠীর দিন আসিয়া উপস্থিত। মায়ের মুখে গর্জন-তেল মাখাইয়া দেওয়া হইল, মুখেও দেওয়া হইল। সমস্ত প্রতিমা বেড়িয়া রাঙতার সাজ দেওয়া হইল, প্রত্যেক সাজের মাথায় এক-একটি পাখি বসাইয়া দেওয়া হইল। প্রতিমাকে কাপড় পরানো হইল। মায়ের মাথায়, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মাথায় মুকুট ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল : হাতে পায় নানারূপ গহনা পরানো হইল— কত অলংকার দিতে হইবে, ভক্তই জানেন। যত দাও, যা দাও, সব সাজিয়া যাইবে ; কিছু দিতে না পারো, তথাপি সাজিবে ভালো। সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বিভূতি, কি সামান্য রাঙের গহনা দিয়া তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিব ? যে পুরানো জিনিস ভালোবাসে, সে মাকে পুরানো গহনা দিয়া সাজায়, ন-নর দশ-নর হার গলায় দেয়, আর সব নরের মাঝখান দিয়া একটা ধুক্‌ধুকি ঝুলাইয়া দেয়। যে নূতন ভালোবাসে, সে ইয়ারিং দেয়, চেলী দেয়, চুড়ি দেয়। কেহ বা বাউটি-সুটে সাজায়, কেহ বা বাউড়ি-সুটে সাজায়। যে যতই সাজাক, ভক্তিই প্রধান সাজ। যেখানে ভক্তি নাই, যত সাজেই সাজাও, ফাঁকা-ফাঁকা দেখায়। বোধ হয়, সব আছে, কিন্তু কি যেন নাই। ভক্তি থাকিলে ঠিক দেখা যায়, কিছুই নাই, তবু যেন সবই আছে !

সকাল-সন্ধ্যায় স্তব্ধ হইয়া বাড়ির কয় জন লোক প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, আর তাহাদের চক্ষু দিয়া দরদর-ধারায় জল বহিতে থাকে। মায়ের এখন আর সে ভয় নাই। পাছে দুর্গবিপত্তি হয়, সে ভয় নাই : পাছে লজ্জা পাই, সে ভয় নাই ; পাছে অপরাধী হই, সে ভয় নাই। সকলেই এখন বীরের মতো আপন আপন কার্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ক্রমে পঞ্চমীর পূর্বেই গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, নবকিশোর শিরোমণির ছেলে প্রতিমা আনিয়াছে, মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে শিরোমণির বাড়ির দিকে যত লোক সব ঝুঁকিয়া পড়িল। যাহার যে ভালো জিনিসটি ছিল, তাহারা সব আনিয়া পূজার জন্য যোগাইতে লাগিল। মা আজ রান্নায় শতহস্ত হইলেন।

ছেলের শরীরে আজ দশ হস্তীর বল। হরিশের কণ্ঠে সরস্বতী স্বয়ং অধিষ্ঠান করিলেন। ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী অষ্টমী কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিতে লাগিল। কেহ অভুক্ত রহিল না, ভোজনে কাহারো অতৃপ্তি হইল না। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা যেন অমৃত পরিবেশন করিতেছেন। সকলে আজ অমৃত ভোজন করিতেছে।

অষ্টমী যায়, নবমী আসে: মহাসন্ধ্যায় মহাসন্ধিস্থল, মহাসন্ধির পূজা। আজ সবই বড়ো বড়ো। নৈবেদ্য বলো, বস্ত্র বলো, পানীয় বলো, ভোগ বলো, সব বৃহদ্ব্যাপার। আজ রাশি রাশি ধূপ-ধুনা পুড়িতেছে। আজ শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ঢোল, কাঁসি— সব উদ্দাম শব্দ তুলিয়াছে। হরিশ আজ পূজায় বসিয়াছে, মানিককে পুথি ধরিতেও বলে নাই। মানিক হরিশের পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে দুই চামর ব্যজন করিতেছে, আর ধূপ-ধুনার ধুঁয়া মায়ের মুখের দিকে সরাইয়া দিতেছে। গর্জন-তেলের উপর গরম ধুঁয়া লাগিয়া শিশিরবিন্দু জমিতেছে, বোধ হইতেছে, মা সত্য সত্যই ঘামিতেছেন। পুঞ্জীকৃত ধূমরাশির মধ্যে মায়ের প্রতিমা যেন নড়িতেছে। আরতি শেষ হইল। হরিশ ঘণ্টা ফেলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। উপস্থিত সমস্ত লোক দণ্ডবৎ ভূতলে পড়িল। মা সকলের আগে উঠিলেন, দুর্গার মুখের কাছে হাত নিয়া বলিলেন, "এমনি করে মা বছর বছর আসিস।"

'আগমনী': পূজাবার্ষিকী
১৩২৮ ॥

# প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু হয় জন্মাষ্টমীর দিন। সারা বছর যত্ন করে তুলে রাখা প্রতিমার কাঠামো এইদিন পাড়া হয়। পূজামণ্ডপে চণ্ডীর পূজার সঙ্গে কাঠামো ও একটি কাঁচা বাঁশ পূজা করা রীতি।

২. দেবীপক্ষের আগে কৃষ্ণপক্ষ। দেবীপক্ষের ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দুর্গার বোধন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু কুলাচার অনুযায়ী কেউ কেউ আগের কৃষ্ণপক্ষে নবমী তিথিতে বোধন অনুষ্ঠান করে শুক্লা দশমী পর্যন্ত দুর্গার অর্চনা করেন। বোধনের দিন থেকে কল্পারম্ভ। নবমীতে বোধন অনুষ্ঠিত হলে বলা হয় 'নবম্যাদি কল্পারম্ভ', ষষ্ঠীর দিন হলে 'ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ'।

৩. উপনীত ব্রাহ্মণের দৈনিককৃত্য দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে আচরণীয় বৈদিক-রীতির উপাসনাকে বৈদিক-সন্ধ্যা বলা হয়। গুরুর কাছে মন্ত্র গ্রহণ করলে তবেই ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক-সন্ধ্যার অধিকারী হন। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী উপনয়নের পরে মন্ত্র গ্রহণ না করলে দেহ শুদ্ধ হয় না এবং শক্তিপূজায় অধিকার জন্মে না।

৪. শারদীয়া শুক্লা ষষ্ঠী থেকে শুক্লা দশমী পর্যন্ত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। এর আগের কৃষ্ণপক্ষকে বলা হয় অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষ।

# পাঁচ ছেলের গল্প

আমি আজ একটি গল্প বলিব। সেই— সেই— পুরানো গল্প। ঠান্‌দিদিদের কাছে শোনা গল্প, তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের ঠান্‌দিদিদের কাছে। তাঁরা তাঁদের ঠান্‌দিদিদের কাছে, তাঁরা তাঁদের— এই রকম করে গল্প ঠান্‌দিদিতে ঠান্‌দিদিতে চলিয়া আসিতেছিল। এখন ইংরাজির চোটে ঠান্‌দিদিদের গল্প আর ভালো লাগে না, শোনাও যায় না। এই ঠান্‌দিদিদের গল্প যখন বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে জাতক। যখন মহাযানীরা বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে অবদান। যখন ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে সংবাদ। আবার বিষ্ণুশর্মার মুখে হইয়াছে পঞ্চতন্ত্র। এখনকার পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের কাছে

হইয়াছে ব্রতকথা। এসব গল্পে প্রেমের ছড়াছড়ি নাই, প্রেমের বীজ গজায় না ও ক্রমে ফলফুল ঝাঁকড়িয়া পড়ে না। এ লেখায় কৌশল নাই, বাঁধুনি নাই, রকমারি নাই। নিভাননী, নগেন্দ্রবালা, বিদ্যুৎবরনী, তড়িৎ-সৌদামিনী, অমিয়ানিভা, চপলাপ্রভা প্রভৃতি একেলে বাহারে নাম নাই। চন্দ্রিমার বর্ণনা নাই, বসন্তের হা-হুতাশ নাই। আছে শুদ্ধ একটি গল্প। সেকালে মিষ্ট লাগিত। লোক পড়িত, শুনিত। এ কালে যাঁদের ভালো না লাগে, পড়িবেন না, শুনিবেন না। গল্পটি এই—

এক আছেন রাজপুত্র, তাঁর আছেন চার বন্ধু— গুরুপুত্র, পাত্রের পুত্র, পুরুতপুত্র, আর কোটালের পুত্র। তাঁদের বয়স এক, বাড়ি একখানে, এক পাঠশালায় পড়া, একত্রে খেলা করা, যেন পাঁচটিতে এক। রাজা ছেলেগুলিকে ভালোবাসেন, গুরুঠাকুর তাদের ভালোবাসেন, পাত্র ভালোবাসেন, পুরুত ভালোবাসেন, কোটালও ভালোবাসেন। সকলেই পাঁচটি ছেলেকে আপনার ছেলের মতো দেখেন। চাকররা ভালোবাসে, কাছারির লোকজন ভালোবাসে, প্রজারা ভালোবাসে এবং যে দেখে, সে-ই ভালোবাসে। কিন্তু পাঁচ জনের প্রকৃতি পাঁচ রকমের। তাঁরা পাঁচ রকম জিনিস ভালো করিয়া শিখিলেন, আপনার মনোমতো জিনিস শিখিলেন। রাজপুত্র শিখিলেন পুণ্যকর্ম, দান, ধ্যান, অতিথি সৎকার, সরলতা, অমায়িকতা, সত্যকথা বলা ইত্যাদি। গুরুপুত্র শিখিলেন বিচার করা, সূক্ষ্ম হইতে আরো সূক্ষ্মে যাওয়া; শিখিলেন শাস্ত্র, শিখিলেন বুদ্ধি কেমন করিয়া মাজিয়া লইতে হয়; শিখিলেন শাস্ত্র কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। পুরুতের পুত্র শিখিলেন শিল্প, ৬৪কলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি। পাত্রের পুত্র দেখিতে সুন্দর ছিলেন। তিনি শিখিলেন চেহারাটা কেমন করিয়া খোলে তাই করিতে, রূপের কেমন করিয়া বাহার দিতে হয়। কোটালের পুত্র শিখিলেন কুস্তি, কসরৎ, লাঠিখেলা ইত্যাদি এবং শিখিলেন কেমন করিয়া দেহে জোর করিতে হয়, আর কেমন করিয়া সে জোর কাজে লাগানো যায়।

বৌদ্ধ বইয়ে বলে, ইহাদের বাড়ি কাশী। ইহাদের প্রকৃতি অনুসারে নাম হইয়াছে, পুণ্যবন্ত, প্রজ্ঞাবন্ত, রূপবন্ত, শিল্পবন্ত আর বীর্যবন্ত। রাজার প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড দেউড়ি, তারই ভিতরে অন্তঃপুর, হাতি-শালা, ঘোড়াশালা, গোশালা, কাছারি, দেওয়ানখানা ইত্যাদি রাজার

সমস্ত মহল। দেশের মধ্যে বড়ো রাস্তার উপর রাজার বাড়ি। একদিকে রাজার বাড়ি— আর-এক দিকে সব দেবমন্দির, মাঝখানে প্রকাণ্ড রাস্তা। রাস্তা প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ একেবারে দুই-তিনখানা টানা যায়। মন্দিরগুলিতে বিষ্ণু আছেন, শিব আছেন, কালী আছেন, কার্তিক আছেন, গণেশ আছেন, ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি আছেন। প্রত্যেক মন্দিরে ছোটো-বড়ো নাটমন্দির, সেইখানে দেশের লোক বসে গল্প করে। দেবতার সামনে বসিয়া মিছা কথা বলিতে পারে না। উহারই মধ্যে একটায় পাঠশালা। রাজপুত্র প্রভৃতিরা পড়েন, লেখেন, খেলা ও গল্প করেন। গল্প করিতে করিতে একদিন কথা উঠিল, পুণ্য বড়ো না প্রজ্ঞা বড়ো, না শিল্প বড়ো, না রূপ বড়ো, না বীর্য বড়ো। আপন আপন কোট কেহই ছাড়িলেন না। রাজপুত্র বলিলেন, পুণ্য বড়ো; গুরুপুত্র বলিল, প্রজ্ঞা বড়ো; পাত্রের পুত্র বলিল, রূপ বড়ো; পুরুতপুত্র বলিল, শিল্প বড়ো; কোটালের পুত্র বলিল, বীর্য বড়ো। বিচার তো হয় না, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এখানে এর বিচার হবে না, এখানে সকলে আমাদের চেনে; পক্ষপাত করিবে। চলো আর-এক ভিন্ন রাজার দেশে যাই। ঘর থেকে কেউ কিছু লইয়া যাইতে পারিবে না। যে যা উপার্জন করিবে, ভাগ করিয়া খরচ চালাইব।

যাইতে যাইতে তাঁহারা কাম্পিল্য নগরে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটি বাড়ি ভাড়া করিলেন এবং পাঁচ জনই আপনার গুণের পরিচয় দিয়া রোজগারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের মনের ইচ্ছা, তাঁহার গুণের পুরস্কার দেখিয়া অন্য বন্ধুরা তাক হইয়া যাইবেন। দুপুর-বেলা কোমরে গামছা জড়াইয়া পাঁচ জন মহাপ্রভু স্নান করিতে গেলেন; গঙ্গায় পড়িয়া স্নান করিতেছেন। সাঁতার দিতেছেন, দেখা গেল, একখানা বাহাদুরী কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে। বর্ষায় গঙ্গার বেগ খরতর, মাঝে মাঝে ঘূর্ণিও আছে, কেহই সে কাঠ ধরিতে যাইতে সাহস করিতেছে না। কোটালের পুত্র বলিল, "আমি যাইব," বলিয়া সাঁতার দিয়া কাঠের উপর উঠিল। তাহার পর যেমন দাঁড় বহে, হাতে-পায়ে সেইরূপ জল কাটাইয়া তাহাকে কৌশলে ডাঙার কাছে আনিল এবং গায়ে অসীম জোর ছিল, উহাকে পাড়ে তুলিয়া ফেলিল। পাঁচ বন্ধুতে তখন বাহাদুরী কাঠখানাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশ সুগন্ধ

বাহির হইতেছে। কিসের গন্ধ ? কিসের গন্ধ ? চন্দনের গন্ধ। তবে এটা চন্দনের কাঠ। প্রকাণ্ড চন্দনের কাঠ নদীর পাড়ে তোলা হইয়াছে শুনিয়া কাম্পিল্যের লোক ভাঙিয়া পড়িল। গন্ধবেনেরা এমন দাঁও ছাড়া যায় না বলিয়া বীর্যবন্তের কাছ থেকে অল্প দামে কাঠখানি কিনিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া, ও 'উহাকে ঠকানো সহজ নয়' বুঝিয়া এক লক্ষ 'পুরাণ' নামে টাকা দিয়া কিনিয়া লইল। সে-ও বাসায় আসিয়া আপনার বন্ধুবর্গকে ভাগ করিয়া দিল এবং একটি গাথা পড়িল—

"বীর্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
মানুষের বাহুবল সবার উপর ॥
বীর্যের প্রভাবে দেখ কোটালের সুত।
আনিল প্রচুর ধন সহস্র অযুত ॥"

সকলে বীর্যবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিল।

তাহার পর শিল্পবন্তের পালা। তিনি বীণা লইয়া বন্ধুদের কাছ হইতে সরিয়া পড়িয়া একটি মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। নগর ভাঙিয়া পড়িল। যত লোক কাম্পিল্য নগরে বীণা বাজাইতে পটু ছিল, সকলেই আসিয়া জুটিল। কত অমাত্যপুত্র আসিলেন, কত শ্রেষ্ঠীপুত্র আসিলেন। সকলেই শিল্পবন্তকে হারাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন, সকলকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। এমন সময় তাঁহার সাততারা বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। ছয় তার হইতেই সাত তারার সমস্ত আওয়াজ ও সুর বাহির হইতে লাগিল। লোক চমৎকৃত হইয়া গেল। ক্রমে আরো এক তার ছিঁড়িল, তবুও সেই সুর, যেন তার ছিঁড়েই নাই। ক্রমে সব তার ছিঁড়িয়া যখন একটিমাত্র তারে ঠেকিল, তখনো সেই সাততারার সব সুর বাহির হইতে লাগিল। সকলে আশ্চর্য হইয়া উহাকে 'পুরাণ' নামে টাকা ও বস্ত্র, অলংকার পেলা দিতে লাগিল। সে সব পেলা কুড়াইয়া বাড়ি আসিল ও পাঁচ জনে ভাগ করিয়া লইল। সকলে খুব খুশি হইল ও গাথা গাহিল—

"শিল্পের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপব।
শিল্পকলা মানুষের সবার উপর ॥

শিল্পের প্রভাবে দেখ পুরুত-নন্দন।
আনিলেন কত ধন করি উপার্জন ॥"

সকলে শিল্পবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এবার রূপবন্তের পালা। তিনিও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া, অনুপম বেশ-বিন্যাস করিয়া, চকের রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, এমন রূপ তো কখনো দেখি নাই। এ কোথা হইতে আসিল? এ কি 'অমিয় ছানিয়া বিধি রূপ নিরমিল। তাহাতে গড়িল বরবপু?' স্ত্রীলোকরা দেখিয়াই মনে মনে স্বামী-নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, আমার এইরূপ একটি স্বামী হইলে কত ভালো হইত। তা নয়, বাবা একটা পোড়া কাঠের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছে!

যাহাই হউক, চকের বাজার দিয়া যাইতে যাইতে পাত্রের পুত্র নগরের প্রধান গণিকার চোখে পড়িয়া গেলেন। সে দোতলায় জানালায় বসিয়া ছিল, উঁহাকে দেখিয়াই চাকরানীকে বলিল, "তুমি যাও, ঐ লোকটিকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া লইয়া আইস।" তিনি দাসীর সঙ্গে গণিকার সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। গণিকা অমনই স্বহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিয়া মাথার চুল দিয়া পা মুছাইয়া দিল এবং বলিল, "আর্যপুত্র. আপনি দাসীর এই খাটের উপর বসুন। আমার যা-কিছু আছে, আপনি সকলেরই মালিক। আজ হইতে আমি আপনার দাসী। আপনি আমার সহিত ক্রীড়া করুন, কৌতুক করুন, আর-যাই করুন, সব আপনার স্বেচ্ছাধীন।" স্নানের ঘরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া গণিকা তাঁহাকে স্বহস্তে গন্ধ-তৈল মাখাইয়া দিল; নানা রকম স্নান-চূর্ণ দিয়া জল সুবাসিত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইল। তাহার সুগন্ধ অনুলেপন দিয়া তাঁহার গা লেপিয়া দিল; মিহি কাপড় ও চাদর পরাইয়া তাহার মধ্যে নানারূপ ধূপের ধোঁয়া লাগাইয়া দিল। তাহার পর সে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চারি প্রকারের উৎকৃষ্ট আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "আমার ঘরে আমার চারি জন বন্ধু আছেন, তাঁহাদের এই সময়ে আনানো আবশ্যক এবং তাঁহাদের টাকা-কড়ি দেওয়া আবশ্যক।" তাহাদের ডাকা হইল। তাহারা আসিয়া সব দেখিল। তখন সে গাথা গাহিল—

"রূপের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
মানুষের রূপ হয় সবার উপর ॥
দেখ রূপবন্ত গণিকার কোলে বসি।
আহরণ করিয়াছে কত ধনরাশি ॥"

তোমরা এখন এই লক্ষ টাকা লও ও খরচ করো। তাহারা টাকা লইয়া বাসায় গেল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি রাস্তায় যাইতে যাইতে শুনিলেন, এ দেশে এক মজার মামলা উপস্থিত হইয়াছে। রাজসভায় কেহই তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিতে পারিতেছেন না। ব্যাপারটি এই— একজন শ্রেষ্ঠী নগরের প্রধানা গণিকাকে একরাত্রি তাঁহার সঙ্গে কাটাইবার জন্য আহ্বান করেন এবং তাহাকে লক্ষ টাকা দিবেন স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যেদিন তাহাকে চান, সেদিন সে আসিয়া বলিয়া যায়, সে অন্যত্র ভাড়া লইয়াছে, সেদিন আসিতে পারিবে না। তাহার পরদিন সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে আসিতে হইবে? শ্রেষ্ঠী বলে, "তোমায় আর আসিতে হইবে না, আমি কাল রাত্রে তোমায় স্বপ্নে দেখিয়াছি।" তখন সে বলিল, "আচ্ছা, যদি আমারই সঙ্গে সারারাত কাটাইয়াছ, তবে আমার ভাড়া লক্ষ টাকা দাও।" সে বলিল, "তা কেন দিব? তুমি তো অন্যত্র ছিলে, আমি তোমায় দক্ষিণা কেন দিব?" জবাব হইল, "তুমি তো আমাকেই পাইয়াছিলে, আমার প্রাপ্য আমায় দিবে না কেন?" তখন দু পক্ষই রাজার কাছে গিয়া নালিশ-বন্দী হইল। রাজা ও রাজার সভাসদগণ কেহই ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেছেন না এবং যে পারিবে, তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দুই পক্ষই রোজ দরবারে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু কিছুই হইতেছে না।

শুনিয়া প্রজ্ঞাবন্ত রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, একজন তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণকে সভায় আসিতে দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার সৎকার করিয়া বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন দিলেন। তিনি বসিয়া আলাপচারি করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা এই কঠিন মোকর্দমার কথা তাঁহাকে বলিলেন এবং তিনি যদি ইহার কিনারা করিয়া দিতে পারেন, পুরস্কার দিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "বাদী

প্রতিবাদী উপস্থিত আছে?" রাজা বলিলেন, "আছে।" তিনি তাহাদের সামনা-সামনি দাঁড় করাইয়া তাহাদের ব্যবহার শুনিলেন। উভয় পক্ষই যখন স্বীকার করিতেছে, তখন সাক্ষী-সাবুদের দরকার নাই। তিনি গম্ভীর-ভাবে অনেকক্ষণ ভাবিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "তুমি এক লক্ষ টাকা এই-খানে রাখো।" আর মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, একখানা বড়ো আরশি আনাইয়া এইখানে রাখিবার আজ্ঞা হউক।"

বলিবামাত্র দুই জিনিস আসিয়া পৌঁছিল। তিনি গণিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখো, শ্রেষ্ঠী স্বপ্নে তোমার আবছায়া উপভোগ করিয়াছেন। তুমি যে তাহার ভাড়া বা দক্ষিণাস্বরূপ সত্যকার টাকা চাহিতেছ, তাহা হইতেই পারে না। তুমি এই আরশির মধ্যে ঐ লক্ষ টাকার যে আবছায়া আছে, তাই তোমার দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ করো।" এই নিষ্পত্তিতে রাজসভায় একটা মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এমন বিচার করিতে পারিতেন না।" কেহ বলিল, "বোধ হয়, রাজার বিপদে স্বয়ং বৃহস্পতি স্বর্গ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন।" রাজা মহা-আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যে পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা তো দিলেনই, আর তাহার উপরও কিছু দিলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এত সহজে এমন মামলার বিচার হইবে। উদ্ধার পাইয়া শ্রেষ্ঠী বলিল, "আপনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন, এ লক্ষ টাকা আপনারই. আমি আর উহা বাড়ি লইয়া যাইব না।"

সমস্ত ধন-রত্ন লইয়া প্রজ্ঞাবন্ত তাঁহার বন্ধুদিগকে বাঁটিয়া দিলেন এবং গাথা গাহিলেন—

"প্রজ্ঞার প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
প্রজ্ঞা মানুষের হয় সবার উপর ॥
এই দেখ প্রজ্ঞাবন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া।
রাশীকৃত ধন-রত্ন দিলেক আনিয়া ॥"

এবার রাজপুত্রের পালা। তিনিও বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া রাজবাড়ির নিকট এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রাজার এক অমাত্যপুত্র সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্রকে দেখিয়াই অমাত্যপুত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

তাঁহাকে লইয়া আখড়ায় গেলেন, নানারূপ কুস্তি-খেলার পর তাঁহাকে লইয়া স্নানাগারে গেলেন, সেখানে স্নান করাইয়া অনুলেপন মাখাইয়া শরীর ধূপ দিয়া সুগন্ধ করাইয়া রাজপুত্রকে আহারে বসাইলেন। সে আহার তো রাজভোগ। আহারাদির পর অমাত্যপুত্র তাঁহাকে লইয়া রাজার যানশালায় একটি সুসজ্জিত গৃহে শয়ন করাইয়া দিলেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন, খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনিও একখানি যান লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজপুত্র উঠিলেই 'তাঁহার সহিত কথা কহিয়া যাইব' ভাবিয়া 'এই উঠেন, এই উঠেন' করিয়া সারারাত কাটাইয়া দিলেন। যখন তিনি যানশালা হইতে যানে চড়িয়া ঘরে যায়েন, তখন অমাত্যেরা ভাবিলেন, 'এ কি ? রাজকন্যা রাত্রিতে যানশালায় ছিলেন কেন ?' খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঘরে রাজপুত্র শুইয়া আছেন দেখা গেল। দেখিয়াই অমাত্যগণ তাঁহাকে রাজার কাছে লইয়া গেল এবং কন্যান্তঃ-পুরদূষক* বলিয়া অভিযোগ করিল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলো ?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, অমাত্যপুত্র আমায় যানশালায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি তথায় আর-কাহাকেও দেখি নাই।" রাজকন্যাও সেইরূপ সাক্ষ্য দিলেন। অমাত্যপুত্রও সব কথা খুলিয়া বলিল। রাজার বোধ হইল, আসামী নির্দোষ। তিনি উঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উঁনি বলিলেন, "আমি বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র, দেশভ্রমণে এখানে আসিয়াছি।" রাজা অপুত্রক ছিলেন, ঐ কন্যাটিই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি বলিলেন, "তোমায় দেখিয়া আমার পুত্রস্নেহ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার পুত্র হও ও আমার এই বিস্তীর্ণ রাজত্ব তোমার হউক।" পুণ্যবন্ত রাজা হইয়া আপন বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—

"পুণ্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
নরলোকে নাহি কিছু পুণ্যের উপর ॥
এই দেখো পুণ্যবলে আমি পুণ্যবন্ত।
পাইলাম রাজ্য যার নাই সীমা-অন্ত ॥"

* [ কুমারী কন্যাদের অন্তঃপুর অপবিত্রকারী। ]

এইরূপে পাঁচ বন্ধুই আপন আপন শিক্ষার পুরস্কারে অন্য অন্য বন্ধুগণকে তাক করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন, পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প ও বীর্য ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করা যায় না। সকলই মানুষের কাজে আইসে এবং সকলেরই সময়ে সময়ে প্রচুর পুরস্কার হয়।

বৌদ্ধ গল্পে বলিল, ঐ যে রাজপুত্র পুণ্যের জোরে কাম্পিল্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উনিই অনেক জন্মের পর হইয়াছিলেন ভগবান্ বুদ্ধদেব, শুদ্ধোদনের পুত্র ও কপিলবাস্তুবাসী। যিনি সে জন্মে বীর্যবন্ত ছিলেন, বুদ্ধের সময় তিনি শোণক হইয়াছিলেন; যিনি শিল্পবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন রাষ্ট্রপাল; যিনি রূপবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন সুন্দরনন্দ। আর যিনি প্রজ্ঞাবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন শারিপুত্র। যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্যে দক্ষ, তাঁহারাই এই সকল জাতকের মর্ম বুঝিতে পারিবেন, তাহার জন্য আমার আর বাক্যব্যয় করা বৃথা।

'বার্ষিক বসুমতী'
১৩৩৩ ॥

# লঘু প্রবন্ধ

সুখের বাল্যকাল কাটিয়া গেল। সরল ভাব, উদার ব্যবহার, খোলাখুলি প্রণয়, উচ্চ হাস্যের দিন শেষ হইল। ইস্কুল ঘর, টানা পাখা, পুস্তক-ভার বহন, অধ্যাপকের মিষ্ট প্রিয় উৎসাহ-বাক্যের সহিত সম্পর্ক উঠিয়া গেল। ইস্কুলের লোক আমায় ভুলিয়া গেল। আমি তাহাদিগকে, কিন্তু, ভুলিতে পারিলাম না। সেই সেই সুখ-সময়ের স্মৃতি আমায় দিবানিশি কষ্ট দিতে লাগিল। সমপাঠীগণের ভাব বিকৃত হইয়াছে। যে ভাবে তাহাদিগের সহিত বেঞ্চের উপর বসিয়া মাস্টারকে ফাঁকি দিয়া আস্তে আস্তে গল্প করিয়া এত পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তাহাদের এখন আর সে ভাব নাই। কেমন নীরস, কেমন কপট, কেমন

এক রকম কেমন-কেমন ভাব হইয়াছে, তাহাদের সহবাসে আর তৃপ্তি হয় না।

সুখের বাল্যকাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে কালে পড়িয়াছি ইহাতে তো তৃপ্তি হইতেছে না। আবার সেই কালে ফিরিয়া যাইতে চাই। কিন্তু পারি না কেন ? আবার ইচ্ছা করে সেই রকম গঙ্গার ধারে বসিয়া সুরেন অমৃত মন্মথ ললিত প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করি, আর-একবার প্রাণ ভরিয়া হাসি। তখন কত হাসিতাম, তখন তো হাসির এত দরকার ছিল না। এখন দুঃখ-দুর্ভর হৃদয়ে প্রাণ-ভরা হাসি আসিলে অনেক হৃদয়ের দুঃখ লাঘব হয় ; কিন্তু এখন হাসিতে পারি না কেন ? সে-কালের যাহারা ছিল, তাহাদের সঙ্গেতে আর হাসিবার জো নাই ; এ-কালের বালকদিগের সঙ্গে মিশি না কেন ? মিশিলাম কিন্তু শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকিলাম মাত্র, তাহারা তো আমার জন্য সেকালের সুরেন নবীন অমৃতের মতো সহানুভূতি অনুভব করে না। তাহারা তাহাদের মতো লোক চায় ; আমি চাই আমার সেকালের মতো, আমার সঙ্গে তাহাদের কেন মিল হইবে ? বিষ্ণু ঘোষাল বুড়াকালেও বলিত—"আমার ইয়ার আজিও জন্মায় নাই"— আমিও তাহাই শুনিয়া ছেলের দলে মিশিলাম। কি জানি কেন ? কি জানি কোন্ অভিমানে বা কোন্ কারণে আমি বিষ্ণু ঘোষালের মতো হইতে পারিলাম না। ছেলের দলে মিশা হইল না। তাহারা আমার ভাব বুঝিল না, তাহারা আমায় দলে লইল না।

কবিরা যৌবন সুখের কাল বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মাথা মুণ্ড বকিয়া গিয়াছেন মাত্র, কই আমার তো পূর্ণ যৌবন, আমার কিছুই ভালো লাগে না কেন ? যৌবন প্রেমের সময়, প্রণয়ের সময়, ভালোবাসার সময় ; যৌবন কার্যের সময়, সংসার প্রবেশের সময়, উন্নতির সময়, বড়ো বড়ো কাজ করিবার সময়, যশোলাভ ও বিদ্যালাভের সময়। ছাই কিছুই নহে, যৌবন অভুক্ত উৎকট লালসার সময়। এই সেই কাল, যে সময়ে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

যাই ধরি, যাই করিতে যাই, তৃপ্তি হয় না। কাজ করিয়া তৃপ্তি হয় না, ভাবিয়া তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসিয়া তৃপ্তি হয় না, যশোলাভে তৃপ্তি হয় না, বিদ্যালাভে তৃপ্তি হয় না, ধনলাভে তৃপ্তি হয় না। লালসা

ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আরো চাই, এইটুকু আরো চাই. মন কেবল এই একমাত্র জবাব দেয়। আজি একটি কার্যে সফল হইলাম ; মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, ভাবিলাম স্বর্গ হাতে। রাত্রি প্রভাত হইল, কালিকার আনন্দ স্মরণ হইল। কারণ অনুসন্ধান করিলাম— দেখিলাম এইটুকু— এইরূপ নৃত্যকর আনন্দের সঙ্গে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় না ? মনে করো তাই হইল। আনন্দ ইহা অপেক্ষা কি ঘনতর হয় না ? তাহার পর এই কথা মনে হয়, তৃপ্তি কিছুতেই হয় না। যৌবন অতৃপ্ত লালসার সময়. উহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই।

যৌবনে লোককে পাগল করিয়া তুলে। যিনি সুখী তিনি সুখের ভাবনায় পাগল, তাঁহার কিছুতেই সুখ হয় না। যিনি দুঃখী, তিনি দুঃখের ভাবনায় পাগল, যিনি প্রণয়ী তিনি প্রণয়ের জন্য পাগল, যিনি প্রণয়-শূন্য তিনিও প্রণয়ের জন্য পাগল, তোমার আছে তুমি বাড়াইবার জন্য পাগল, আমার নাই আমি পাইবার জন্য পাগল। কোম্পানি বাহাদুর পাগল শাসিত করিবার জন্য বাতুলালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দেশটা যখন পাগলময় তখন ভবানীপুরে একটি বাতুলালয় করিলে কি হইবে ? বাতুলালয়ের ডাক্তার সাহেব ! তুমি যৌবনের বুক চিরিয়া দেখো দেখি তোমার কত বাতুল রোগী দেশে আছে ? এই যে আমি নবীন পুরুষ কলম ধরিয়া যৌবনে সুখ নাই প্রতিপন্ন করিতে বসিয়াছি. যদি আমার মনের সব ভাবগুলি তুমি টের পাও, তবে কি তুমি আমায় এইখানে বসিয়া থাকিতে দাও ? কখনোই না। তবে তোমার বাতুল আরাম করার চেষ্টা সকল বিফল।

যৌবনে সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল হয়। সকল ইন্দ্রিয়ই আহার চায়। সকলেই উদ্দাম হইয়া উঠে। কেহই আহার পর্যাপ্ত হইল বলিয়া তৃপ্ত হয় না। যদি পর্যাপ্ত হয় আরো তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, যদি না হয় পর্যাপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু আসঙ্গলিপ্সা সর্বাপেক্ষা বলবতী হয়, আবার কাহারই সহবাসে তৃপ্তি হয় না। ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে। ভালো-বাসি কিন্তু সুখ হয় না। আজি একটি সুন্দর মুখ দেখিলাম, ভাবিলাম, এই মুখের কাছে থাকিলেই তৃপ্তি হইবে। তাহার কাছে গেলাম— সে হয়তো অতি পাষণ্ড, না-হয় সে আমার সঙ্গ ভালোবাসিল না ; কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। আজি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমায়

ভালোবাসিলাম। কালি তোমার দোষ দেখিয়া তোমায় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। আমার ভালোবাসা চিরস্থায়ী হইল না, আসঙ্গলিপ্সা ফলবতীও হইল না, সুখেরও হেতু হইল না।

হয়তো আর-একজন— মনের বিচিত্র গতি— আমায় ভালোবাসিল; যখন জানিলাম মন কৃতজ্ঞতা-রসে পূর্ণ হইল; কিন্তু কেমন আবার মনের গতি— তাহাকে ভালোবাসিতে পারিলাম না। সযৌবন সঙ্গীগণের সঙ্গে তৃপ্তি হইল না; নিকট গেলাম বৃদ্ধগণের, আমার সমবয়স্ক লোক ভালোবাসিতে জানে, বৃদ্ধদিগের সে প্রবৃত্তির ধার মরিয়া গিয়াছে। হয়তো একজন বৃদ্ধের নাম যশ সদ্‌গুণ শুনিয়া তাঁহার নিকট গেলাম, যাইবার সময় ভরসা করিয়া গেলাম নিশ্চয়ই সহানুভূতি পাইব। হয়তো তাহার মুখ দেখিয়াই চটিয়া উঠিলাম। না-হয় তাহার নীরস নিঃস্নেহ আমন্ত্রণে তৃপ্তি হইল না। ফিরিলাম, আসঙ্গলিপ্সা কোথাও সুখকরী হইল না। রমণী-সন্নিধান যৌবনের প্রধান সুখের কারণ; গেলাম তথায় কিন্তু সকলেই আমায় দেখিয়া ঘোমটা দিয়া পলায়ন করিল। বাল্যে কৈশোরে যে কাদম্বিনী কত হাসিত কত গল্প করিত, একটি ছেলেকে দিয়া আজ বাহিরে জলখাবার পাঠাইয়া দিল। কাদম্বিনী দিয়াছে ফেলিতে পারি না, কিন্তু তাহার স্বাদ লবণাক্ত।

পাঠক মনে করিলেন লেখক বিবাহিত নহেন, সে কথায় কাজ নাই। মনে করো শেষ কোথাও স্থান না পাইয়া গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। গৃহিণী— আমায় ছাড়া আর-কাহাকে ভালোবাসা দেখাইলে দোষ হয় এইজন্য ভালোবাসা দেখাইলেন কিন্তু আমি কি জানি না যে উভয়ে স্বাধীন না হইলে ভালোবাসা হয় না। যতদিন বিবাহ বন্ধন থাকিবে, ততদিন স্ত্রী-প্রণয় প্রণয়ই নহে, একবারের চুক্তিমতো কাজ করা মাত্র। চুক্তি যদি কাহারো কপালে ভগ্ন হয় তবে সে তো সন্ন্যাসী, আর অতৃপ্ত-আসঙ্গলিপ্স আমিও সন্ন্যাসী।

ভালোবাসিলাম সে ক্ষণিক, সঙ্গ করিলাম সে ক্ষণিক, ভক্তি করিলাম সে ক্ষণিক, স্নেহ করিলাম সেও ক্ষণিক, আশা মিটিল না, তৃপ্তি হইল না। চিরস্থায়ী কিছুই হইল না। মানুষের চঞ্চল স্বভাব, উহাদের খাম-খেয়ালি মেজাজের উপর আমার সুখের ভিত্তি নির্মাণ কখনোই উচিত নহে। অতএব যে প্রণয় লইয়া যৌবন কবি-কল্পনার পরম সুখের সময়

বলিয়া পরিগণিত, সে প্রণয় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাহারো আবার মূল্য অত্যন্ত অধিক-- স্বাধীনতা-বিনিময়-- এবং সেও অতি দুর্লভ। এই জ্ঞানটি জন্মিল, আর সন্ন্যাসীতে আমাতে প্রভেদ কি ?

মানুষ খামখেয়ালি, মানুষ চঞ্চল, মানুষ নশ্বর, মানুষের প্রণয়ের মূল্য অধিক, কিন্তু আমি ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারি না। এমন কোনো জিনিস পাইতে চাই যে কাজকর্ম করিয়া তাহাকে লইয়া সুখে সময় কাটাইতে পারি। সে জিনিসটি কি ? তবে আকাশকে ভালোবাস, আকাশ যখনই দেখ নয়ন জুড়ায়, প্রাণ প্রফুল্ল হয়। আকাশ চঞ্চল নয়, অব্যাপ্যবৃত্তি নহে-- অনন্তকালস্থায়ী চন্দ্র ভাবো, চন্দ্রকে ভালোবাস। মলয় পবন! তোমায় অনেক দিন হইল বড়োই ভালোবাসিতে লাগিয়াছি। তুমি যখনই আইস শরীর জুড়ায়, উষ্ণ মস্তক শীতল হয়, মনের অর্ধেক যন্ত্রণা দূর হয়। যখন ধীরে ধীরে ধীরে রাত্রি দশটার সময় গাঢ় চিন্তার সময় তুমি আমার বক্ষে ও মুখে লাগ তখন তোমায় ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারি নাই ; কিন্তু যখন তুমি চাঁদ আর আকাশ আমার ভালোবাসার পাত্র হইলে তখন আমার গৃহে কাজ কি ? আমি তো সন্ন্যাসী-- নবীন যৌবনে আমি সন্ন্যাসী।

যখন ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়, যখন অন্তর্জগতে সদসৎ প্রবৃত্তিতে ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, যখন নৈরাশ্য হৃদয়ের প্রতি কন্দর শূন্য করিয়া ফেলে, যখন দারুণ অভুক্ত লালসা সফল করিবার জন্য পরিশ্রম ও ভাবনায় শারীর ও মানসবৃত্তি সকল একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন এক উপায়-- এক সুখের উপায়-- স্বভাব-সৌন্দর্য পর্যালোচনা। আমাদের মনে এমনই একটি শক্তি আছে যে যাহা-কিছু বৃহৎ প্রকাণ্ড, যাহা-কিছু নূতন ও যাহা-কিছু সুন্দর, আমাদিগের সুখ সমুৎপাদন করে। কারণ উহা প্রকাণ্ড অনন্ত অনন্তকালব্যাপী ঈশ্বরের আভাস মাত্র।

তবে ভালো কথা সেই ঈশ্বরকেই ভালোবাস না কেন ? দেখো আকাশ মেঘাবৃত হয়, মলয়-মারুত ঋতুমাত্রস্থায়ী, চন্দ্রেরও পদে পদে বিপদ, অতএব এমন একজন লোক লও-না, যিনি তোমার মন হইতে অপনীত হইবার নহেন। তাঁহার চিন্তা কর না কেন ? যখন ক্লান্ত হইবে, যখন নিরাশ হইবে, তখন সেই প্রকাণ্ড অনন্ত সর্বকালব্যাপী ঈশ্বরের

চিন্তা কর না কেন? জানু পাতিয়া বা কর উত্তোলন করিয়া অথবা করজোড়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বল না কেন—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগতাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥*

যে হৃদয় এখন শূন্যময় ভাবিতেছ, যেখানে কেবল দুঃখ দুর্ভরতা মাত্র দেখা যাইতেছে, সেইখানে আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিবে। সে আনন্দ— অক্ষয়— অনন্ত— পবিত্র; যেহেতু যাঁহার সহবাসে সে আনন্দ লাভ করিতেছি, তিনি সৎ— চিৎ— আনন্দ!

'আর্যদর্শন'
জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪ ॥

* [ যাঁর রূপ অচিন্ত্য এবং অব্যক্ত, যিনি নির্গুণ অথচ গুণ-স্বরূপ, যিনি সমস্ত জগতের মূর্তিমান আধার, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। ]
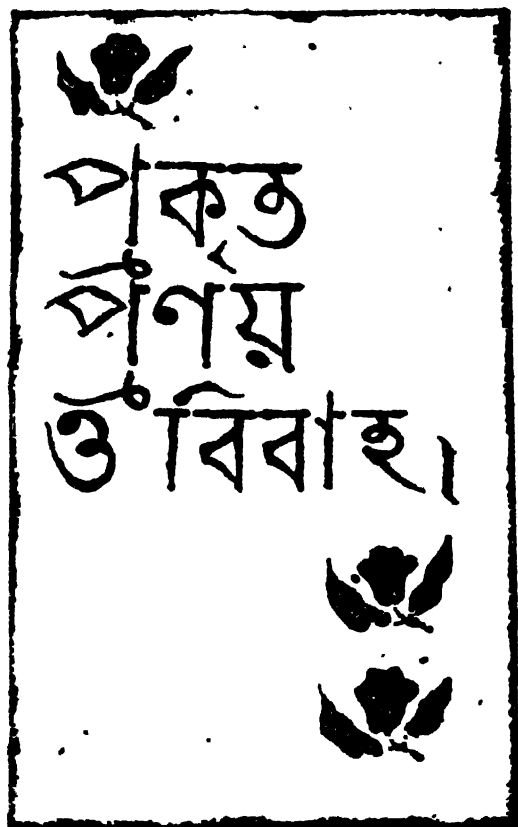
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে প্রকৃত প্রণয় মস্তকে দিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলে লোকে সহসা মনে করিতে পারে লেখক চর্বিতচর্বণ করিবেন, কতকগুলি গিলিত পদার্থের উদ্‌গার করিবেন। বাস্তবিক এরূপ আশঙ্কা অমূলক বা অসংগত নহে। ইউরোপে এ পর্যন্ত কত লোকে যে প্রণয়-শীর্ষক রচনা লিখিয়াছেন বলা যায় না। গ্রীসে বিদ্যাচর্চার প্রাতররুণোদয় আরম্ভ করিয়া গত শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় যে-কেহ লেখনী ধারণ করিয়া যশোলাভ করিতে গিয়াছেন, যে-কেহ মানব সমাজের মনোরঞ্জন করিতে গিয়াছেন, তিনিই প্রণয়ের উপর কিছু-না-কিছু লিখিয়াছেন। এবং এক্ষণে বাংলায়ও অনেকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ,আমাদের

দেশের প্রধানতম নবেল লেখক মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ অমানুষ প্রতিভাবলে মানব হৃদয়ের অভ্যন্তর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রণয়ের একটি আশ্চর্য সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আমরা লেখনী ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ-মাত্র, আমরা লিখিতে গেলে যে লোকে চর্বিতচর্বণ মনে করিবেন তাহাতে লোকের কোনো দোষই নাই। কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক. আমরা প্রস্তাবটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠ্য করিতে চেষ্টা করিব বলিয়াই এ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রকৃত প্রণয় বিষয়ে লিখিতে গেলে অনেকে আমাদের নিকট চাহিয়া বসিবেন প্রণয়ের লক্ষণ কি? আমরা বলিতেছি এরূপ লক্ষণ দিতে আমরা অসমর্থ। শুদ্ধ আমরাই অসমর্থ এরূপ বলি না, ইহার লক্ষণ হয় না। মনের প্রত্যেক বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লক্ষণ দিবার চেষ্টা বিফল। শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভট্টাচার্য মহাশয়, ইউরোপীয় ফিলজফর মহাশয় রাগ করিবেন না— আমরা বলি এরূপ সূক্ষ্ম লক্ষণের দিন গিয়াছে। প্রণয়ের লক্ষণ হয় না কিন্তু প্রণয় এমনি জিনিস যে উহার লক্ষণের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত. বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এল. ডি. হইতে সামান্য কুলি পর্যন্ত প্রণয় কি তাহাও জানে, প্রণয়ের কি বেগ তাহাও অনুভব করে। কোন্ পণ্ডিত কবে লক্ষণ দিয়া প্রণয় বুঝাইতে গিয়াছেন? আর লক্ষণ দিয়াই বা তিনি কি বুঝাইয়াছেন? আর যাহা সকলেই বুঝিতে পারে তাহারই বা লক্ষণের প্রয়োজন কি?

প্রণয়ের লক্ষণ হয় না কিন্তু উহার বিবরণ দেওয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী লোকে প্রণয় হইতে অন্য মানস প্রবৃত্তির ভেদ নির্ণয় করিতে পারেন। এই ভেদ নির্ণয় আবশ্যক এবং আমরাও এ স্থলে এই ভেদ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রণয় একটি মানসিক কোনো বিকার। একটি সুন্দর বস্তু দেখিলে আমরা যে তাহাকে ভালোবাসিতে চাই, শৈবলিনীর ন্যায় কোনো একটি সুন্দর মুখ দেখিলে মির কাসিম পর্যন্ত গলিয়া যান. তাহা প্রণয় নহে। ভবভূতি তাহার নাম তারামৈত্রক বা চক্ষুবাসা দিয়াছেন। সে তারামৈত্রক চক্ষুরাগ— প্রণয় নহে।

অনেক দিন একজনের সঙ্গে একত্র থাকিলে তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না, ছাড়িতে কষ্ট বোধ হয়, মনে মনে একটু কষ্ট হয় সে মানসিক বিকার প্রণয় নহে। অনেক স্থানে স্ত্রী ও স্বামীর মনের মিল না

থাকিলেও সাংসারিক অসুবিধার জন্য বা আবার কোথায় যাইব দূর হোক ছাই এই লইয়াই নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হইয়া থাকি এই ভাবে বাস করেন, সেটি প্রণয় নহে। অনেক অর্বাচীন লোক, আমাদের প্রাচীন কালের অনেক কবিই প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়পরতার এমনি অভেদ্য মিলন করিয়া দিয়াছেন যে উহাকে প্রণয় বলিতে আমাদের লজ্জা হয়। অনেকে রূপ-তৃষ্ণার নাম প্রণয় বলিয়াছেন তাহাও প্রণয় নহে। বঙ্কিমবাবু তাহাকে মদন-বাণ বা পঞ্চশর বলিয়াছেন, বাস্তবিকও সে মদন-বাণ বা পঞ্চশর। সে প্রণয় নহে। প্রণয় নামে যে প্রবৃত্তি আছে তাহার কার্য এই, তাহার কারণ এই— একজন লোকের সঙ্গে আর-একজন অনেক দিন থাকিলে উহার আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গি, দোষ-গুণ, শ্বেত অংশ কৃষ্ণ অংশ দেখিয়া আপনার মনের সহিত অনেক বিষয়ে তাহায় সহিত ঐক্য হয় ক্রমে তাহার সহিত একত্র বাস করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে না দেখিলে কষ্ট হয়, তাহার অদর্শনে জগৎ শূন্যময় বোধ হয়, তাহার কথা কর্কশ হইলেও প্রণয়ীকর্ণে উহা সুধাধারা বর্ষণ করে। উহার দোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় না গুণও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল সে যেমন আছে সেই ভাবে তাহার সহিত এক হইয়া— চিরকাল এক হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। স্বর্গে যদি বিচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকে তবে সে স্বর্গও অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। উহার কষ্ট হইলে আপনার দ্বিগুণ কষ্ট হয়, আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও উহার কষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হয়, শেষ উহার সামান্য সুখের জন্য আত্মবিসর্জনে ইচ্ছা হয়। এই স্থায়ী প্রবৃত্তি, এই স্থায়ী ঘনতর মনের বিকার, এই আত্মবিসর্জন— প্রণয়। তারামৈত্রক, চক্ষুরাগ, রূপতৃষ্ণা, সৌন্দর্যস্পৃহা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নানা কারণে সহবাসের ইচ্ছা হয়, সেই সহবাস শেষ প্রণয়রূপে পরিণত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। আজি কোনো কারণে সহবাস ইচ্ছা হইল কালি তাহারই বিপরীত কারণে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতএব সহবাস প্রণয়ের কারণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। এবং কোথায় কারণ হইবে কোথায় না হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। প্রণয় এইরূপ পদার্থ, কেন হয়, কেন না হয় কেহই বলিতে পারে না। হইলে তৃপ্তি হয়, মোহ হয়, আনন্দসমুদ্র সুখসন্তান বোধ হয়, আত্মজ্ঞানরহিত হয়, স্বার্থপরতা একেবারে থাকে না, পরকে আপনার

অপেক্ষা বড়ো দেখিতে হয়, প্রণয়ীর সহিত একাকার হইয়া আপনার স্বতন্ত্রতা লোপ হইয়া যায়, পরের জন্য আপনার জীবন সর্বস্ব বিসর্জন করাও অসীম সুখকর বোধ হয়।

প্রণয় প্রবৃত্তির বিবরণ দিতে গেলে আরো কত প্রবৃত্তির সহিত যে উহার ভেদ নির্ণয় করিতে হয় তাহার ঠিকানা নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, অনেক সময়ে অনেকের মনে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঙ্গে অন্য অন্য সু ও কু প্রবৃত্তি এমনি মিশ্রিত থাকে এমনি ঘনীভূত থাকে যে আপাতত উহাকে শুদ্ধ নির্লক্ষ [নির্লক্ষণ ?] প্রণয় বলিয়া বোধ হয় ; সেই স্থানে উহার অবিমিশ্রণ অতি আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি অনেক কবিরা প্রণয় ও ইন্দ্রিয়পরতা এক নিশ্বাসে বর্ণনা করিয়াছেন। যে কবিতায় মনে গভীর ভাব, অনির্বচনীয় আন্তরিক চাঞ্চল্য, তাহাতেই দুর্দাম রুধির প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাসনা অনেক স্থানে দেখা যায়। এরূপ স্থলে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি অত্যন্ত আবশ্যক। প্রণয় শুদ্ধ আন্তরিক ভাব মাত্র, বাহ্যিক তাহাতে কিছুই নাই। প্রণয় আত্মার গুণ, চিরস্থায়ী, ক্ষণিক নহে ; মনের গুণ নহে, ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে, শরীরের নহে, বাহ্য জগতের নহে, একবিধ আত্মগুণাবলীপ্রণোদিত মানসের বিকার : আন্তরিক চাঞ্চল্য উহার অনুভাব মাত্র, কার্যমাত্র, অন্য কিছুতে অন্য কোনো কার্যতেই উহার নির্ণয় হয় না, ঠিক নির্ণয় হয় না। বাহিরের যে সকল কার্য দেখিয়া আপাতত আমরা প্রণয় আছে বলিয়া মনে করি সে সকল কার্য-প্রবাহের মূল অনুসন্ধান করিলে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহা আত্মার অপর গুণাবলী হইতে নিঃসৃত, সুতরাং তাহা প্রণয়কার্য কি না নির্ণয় হওয়া দুঃসাধ্য। এইজন্য কবিরা প্রণয় বর্ণনাস্থলে সর্ব প্রথম লোকের অন্তর-মধ্যে যান, সেখানকার গোপন ভাবগুলি খুলিয়া খুলিয়া পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখান ; ক্ষুদ্র কবিরা গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লন, বড়ো কবিরা একটি অপূর্ব বিস্তৃত বীচি-বিক্ষুব্ধ মানস-সমুদ্রের চিত্র প্রদর্শন করেন। নাটকে প্রকৃত ভাব জানাইবার স্থান— স্বগতবাণী বা সখী-সংবাদ।

এই পর্যন্ত প্রণয় লইয়া গেল ; শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, মানসমাত্র-গামী প্রণয়ের স্বভাবের উপর দুই-এক কথা বলা হইল। এখন সেই প্রণয়ের স্ফূর্তি হয় কখন ? কোন্ সময়ে তাহার তেজের আধিক্য হয় ?

কোন্ সময়ে তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ থাকে ? কোন্ সময়ে তাহার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে ? কোন্ সময়ে ? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে জানা চাহি কি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যের কোন্ ব্যাঘাত হয়, কোন্ সময়ে মানসিক প্রবৃত্তি সকল বর্ষাঘ্রাত পালি শস্যের ন্যায় সবল, সতেজ ও মনোবিমোহন মাধুর্য প্রাপ্ত হয়, কোন্ সময়ে তাহাদের কোনোরূপ বৃদ্ধি ব্যাহত না থাকে, কোন্ সময়ে তাহারা স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে। বীজবপন করিয়া চাপা দিয়া রাখো, অঙ্কুর হইলেও হইতে পারে কিন্তু সে অঙ্কুর কেবল শুকাইবার জন্য। নদীর স্রোত যেদিকে যাইতেছে তাহার অন্য দিকে লইয়া গেলে তাহার গতির লাঘব হইবে মাত্র। সেই-রূপ কোনো স্ফুরণোন্মুখ মানসিক বৃত্তির মুখে যদি বাধা চাপানো যায় সে বৃত্তিটি হাপসিয়া যাইবে মাত্র। প্রণয়ের মুখে যদি অধীনতা পাথর চাপাও সে প্রণয়াঙ্কুরকে পিষিয়া ফেলিবে। বাড়িতে দিবে না, দিবে না।

প্রণয়ী যুগল যদি উভয়েই স্বাধীন হয়, কেহ কাহারো কোনো অধীনতা স্বীকার না করে, উভয়ে আপন ইচ্ছায় উভয়কে ভালোবাসে, কেবল ভালোবাসা ভিন্ন আর ভালোবাসার কোনো পার্থিব কারণ না থাকে, ক্রমে যখন সেই ভালোবাসা ঘনতর হইয়া আসে-- সেই বিশুদ্ধ প্রণয়, সেইখানেই প্রণয়ের সর্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধি। এরূপ একটি চিত্র জগতে যদি মিলে তবে জগতে আর স্বর্গে কিছুই প্রভেদ থাকে না। এইরূপ একটি চিত্র যদি কল্পনায় অঙ্কিত করা যায় তাহাতেও বিমলানন্দ। যিনি এরূপ চিত্র আঁকিয়া জগতের লোককে দেখাইতে পারিবেন তিনিই প্রকৃত কবি। কিন্তু জগতে এরূপ চিত্র নাই কেন ? জগতের লোকের অত্যাচারে, যে সমাজ বলিয়া জগতে এক বিধাতার অনির্মিত সৃষ্টি আছে, তাহার অত্যাচারে। যে সকল লোক সমাজ বলিয়া দৈত্য সৃজন করেন তাঁহারা জানিতেন উহাতে কুলোক শাসিত হইবে, কুপ্রবৃত্তির দমন হইবে, কুকার্য জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। কিন্তু সমাজ আমার পঞ্চানন্দ ঠাকুর, বড়ো ছেলেটির কিছু করিতে পারেন না, ছোটো ছেলেটির ঘাড় ভাঙেন। যাহারা কু তাহারা সমাজকে কদলী দর্শন করাইয়া কুকর্ম করে। তাহারা গোপনে করে, গোপন করে বলিয়া আরো অধিক দুষ্কর্ম করিতে পারে। সমাজ দেখিতে পান না বা দেখিতে পাইয়াও কিছু করিতে পারেন না। মাতা খান সুলোকের, সুপ্রবৃত্তিগুলিকে যুবড়া করিয়া রাখেন, তাহাদের

জন্মাইতে দেন না, জন্মাইলে বাড়িতে দেন না, বাড়িলে প্রকাশ হইতে দেন না, প্রকাশ হইলে অঙ্গহীন করিয়া দেন। এরূপ অত্যাচারে দেবদুর্লভ পবিত্র প্রণয় কোথায় মিলিবে ? গোময় রাশি মধ্যে উজ্জ্বল হীরক কখনো কি মিলিয়া থাকে ? পবিত্র বিশুদ্ধ নির্মল উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় প্রণয়ের উপর সমাজের প্রধান অত্যাচার বিবাহ প্রথা প্রচালন। ইহাতে যে একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা হয়, চারি দিক হইতে প্রণয়-স্রোত বন্ধ করা হয়, উহাকে অপরাপর প্রবৃত্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া কলুষিত করা হয়, তাহার আর কোনো সংশয়ই নাই। বিবাহে প্রণয়ের কত অনিষ্ট করা হয় একবার কল্পনা বলে দেখা যাউক। কুলোকে নানাবিধ উপায়ে সুনিয়ম কু করিয়া তুলে, ভালোতে মন্দ করে, মিষ্ট পদার্থ কটু করে, তাহাদের কথা আমাদের প্রয়োজন নাই, তাহাদের কথা আমরা কহিতে চাহি না কহিতেওছি না। আমরা মনে করিয়া লইয়াছি জগতে কুলোক নাই সবই সু, সবই ভদ্রলোক বিশুদ্ধ চরিত্র সাধু সজ্জন। বিবাহ আসিয়া বলিলেন কি ?— 'অমুক ঘোষের কন্যা তোমার গৃহিণী, তুমি তাহাকে ভালোবাসিবে, সে তোমাকে ভালোবাসিবে, অন্য লোককে তোমার ভালোবাসিতে নাই। যদি বাসো, তোমায় আমি শাস্তি দিব, হয়তো শ্রীঘরেও দিব। এই নাও ইহার হাত তুমি ধরো, তোমাদের শুভ-দৃষ্টি হউক—'। নাও কথা, তুমি আমায় ভালোবাসিতে বাধ্য করার কে ? তুমি সমাজ আছ আমি দুষ্কর্ম করিলে শাস্তি দিও, আমার অন্তর-স্রোত আমার ইচ্ছাধীন, আমি তাহাকে যেদিকে চালাইব সে সেই দিকে চলিবে। তুমি তাহার উপর কর্তৃত্ব করিবার কে ? প্রথম ঘোর অত্যাচার। আমাদের দেশের দশা ঠিক এইরূপ। সে ঘোষের মেয়ে আমার মনে ধরিল না, আমার প্রণয় বলিয়া যে প্রবৃত্তিটি ছিল তাহার বিজয়া হইল। মনে করো ধরিল, তাহাকে আমি খুব ভালোবাসিতে লাগিলাম, একদিন অতি বিশ্রব্ধ কথোপকথন সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি আমায় বড়ো ভালোবাস— না ? সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল— খুব। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইত তুমি কি করিতে ? কাহাকে ভালোবাসিতে ? যাহাকে বিবাহ করিতাম। ও হরি তবে ভালোবাসার কল আছে। যার দিকে কল নাড়িবে সেই চরি-তার্থ হইবে। আমাদের দেশের বিবাহে স্ত্রীলোকের একেবারে স্বাধীনতা

নাই। তাহারা যে ভালোবাসে তাহা একপ্রকার কল মাত্র। তাহাদের পছন্দ করিবার ক্ষমতা নাই ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। খাও দাও চিনির বলদের মতো স্বামী ও গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা করো। শেষ ঐ এক ভাবে থাকিয়া, এক রকম কি গোলমালযুক্ত একটা মানসিক ভাবের উৎপত্তি হয়। এটি প্রণয় নহে। প্রণয় একটি প্রবৃত্তি, উহার কার্য-প্রবণতা অত্যন্ত বলবতী, প্রণয় গাঢ় হইলে কার্য-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, পূর্বেই বলিয়াছি উহাতে আত্মবিসর্জন পর্যন্ত জন্মায়। পূর্বোক্ত যে ভাবটি জন্মায় সেটি নিবৃত্তি-মূলক, তাহার তলা অন্বেষণ করিয়া দেখো এই কয়টি অক্ষর পাথরে খোদা দেখিতে পাইবে। "আর তো উপায় নাই এখন এই ভাবেই মানিয়ে জুনিয়ে থাকিতে হইবে।" সেইভাবে বাস্তবিকই মানিয়ে জুনিয়ে থাকে, এইভাবে মানিয়ে জুনিয়ে অধিকাংশ বাঙালির দিন কাটে, প্রণয় মুষড়িয়া যায়, প্রণয়— মনুষ্য ও পশু প্রভেদ করিবার একমাত্র উপায়, জগদীশ্বরের প্রদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মানস প্রবৃত্তি— বৃথা হইয়া যায়। বলিয়াছি এই প্রথম জঘন্য সর্বথা পরিহারযোগ্য অত্যাচার। দ্বিতীয়— ইউরোপীয় বলিবেন, নিজে পছন্দ করিয়া বাছিয়া দুজনে মিল হইলে অন্তরে অন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত জন্মিলে বিবাহ করো। এও বরং। কিন্তু বলি ইউরোপীয় মহাশয় আমাদের যদি মনের মিল হইল, আমরা যদি উভয়ে উভয়কে বুঝিলাম, পরস্পর যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এমন-কি যদি একাত্মভাব দাঁড়াইল --বিবাহে প্রয়োজন ? চর্চে যাওয়া, দশ জনের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করা, এত হাঙ্গাম কেন ? উহাতে আমাদের কি কিছু বাড়িবে ? কিছু বেশি ঘনিষ্ঠ প্রীতি উৎপন্ন হইবে ? কখনোই না, বরং এই হইবে যে আমাদের নিজের কথার উপরে হাত দেয় কেন ? এই ভাবিয়া একটু বিরক্তি হইবে। আমরা আপন ইচ্ছায় যা করিব পরে বলিলে তা কখনোই তেমন করিয়া করিব না। ছেলেরা আপন মনে যেমন খেলা করে কি যেমন পড়ে বাপ মা কি গুরু মহাশয় যদি তাহাদিগকে হুকুম করেন সে তেমন করিয়া পড়া তো করিবেই না, অনেক জায়গায় দেখিয়াছি তেমন প্রফুল্ল মনে খেলাও করে না। হয়তো সমাজের এরূপ অনধিকার চর্চায় আমাদের প্রণয়ে বিঘ্ন হইবে মাত্র। এতদূর তো হয়তোর উপর দিয়া গেল। তাহার পর তুমি পাদরি সাহেব বলিলে আমাদের চিরদিন এই দম্পতী ভাবে থাকিতে হইবে। কেন ? চিরদিন যখন কিছুই থাকে না, সকল পদার্থেরই যখন

প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হইতেছে, তখন আমরা কেমন করিয়া বলি যে আমরণ আমরা এইভাবে থাকিব। হয়তো থাকিতাম, যদি আমাদের নিজ ইচ্ছামতো হইত আমরা ঘরে ঘরে বন্দোবস্ত করিয়া থাকিতাম। তোমার হুকুমে থাকিব কেন? এইরূপ অন্যায় হুকুম করা কি তোমার ঘোরতর অত্যাচার নহে? তাহার পর বলিবে ডাইভোর্স প্রথা আছে। তোমরা অত্যাচার করিয়া একটি বন্ধন দিলে আবার আমার সেইটি কাটাইতে হইবে। এ দোকর পরিশ্রম কেন? আর তোমাদের যেরূপ ডাইভোর্স প্রথা তাহাও তো বিশুদ্ধ প্রণয়ের পোষক নহে। পরস্পর অন্যায় ইন্দ্রিয়পরতা আদালতে প্রমাণ না করিয়া দিলে তো ডাইভোর্স হইবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও তো অনেক কারণে পরস্পর একত্র বাস কষ্টকর হইতে পারে, যখন সাত বৎসরে সমস্ত শরীরের পরিবর্তন হইয়া যায় তখন যে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হইবে না তাহার ঠিক কি? যদি এই রূপ শরীর-পরিবর্তনে মনেরও পরিবর্তন হয়? তবেই গোলমাল।

এইরূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে প্রকৃত প্রণয় স্থলে বিবাহ প্রথা— সমাজের হস্তক্ষেপ, প্রণয়ীর অত্যন্ত ক্ষতিকর, উহা যত শীঘ্র অপনীত হয় ততই জগতে মঙ্গল।

শ্রীশরৎ।

'আর্যদর্শন'
শ্রাবণ, ১২৮৪ ॥

# প্রাসঙ্গিক তথ্য।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ -সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' পত্রিকার শ্রাবণ ১২৮৪ সংখ্যায় 'প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ' প্রবন্ধ 'শ্রীশরৎ' স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে হর-প্রসাদের নামকরণ করা হয় শরৎনাথ, 'হরের প্রসাদে' কঠিন রোগ থেকে ভালো হয়ে ওঠায় পরে নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তাঁর আদি নাম ব্যবহার করেছেন।

'আর্যদর্শন'-এ প্রবন্ধের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে: "আমরা এ প্রস্তাবের শেষ সিদ্ধান্তের অনুমোদন করি না। প্রচলিত বিবাহ প্রথা অপনীত হইবার যোগ্য বলিয়া যে একেবারে বিবাহেই প্রয়োজন নাই ইহা আমরা স্বীকার করি না। আজীবন হউক বা সাময়িক হউক বিবাহ প্রথা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদের মত সকল একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাবাকারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ হরপ্রসাদের প্রথম রচনা 'ভারত-মহিলা' 'আর্যদর্শন'-এ প্রকাশ করতে রাজি হন নি। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীর ভাবে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, 'তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপানো উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে-সকল ভিউ দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।' আমি বলিলাম, 'আমার তো মহাশয় নিজের কোনো ভিউ নাই। পুরাণ পুথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।' যাহা হোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজি হইলেন না। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, আপাতত গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।"— দ্র. "বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ায়", ৭ অনুচ্ছেদ।

পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশ করেন।

এখন লোকের দেশহিতৈষিতা বড়ো প্রবল হইয়াছে। পুরানো পুথি, খোদা পাথর, তাম্রশাসন পড়িয়া আমাদের পুরানো গৌরবের কথা অনেকেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সেকালে আমাদের সোনার অট্টালিকা ছিল বলিয়া গুজব করিয়া বেড়ানো কাপুরুষের কাজ, এ কথাটি কেহ বুঝেন না। আবার অনেকে গুমর করেন যে, সেকেলে বাঙালিরা বড়ো লড়াই-মজবুত ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ লড়াই করিতে করিতে উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা প্রমাণ করাইবার জন্য দিনকত অনেক চেষ্টা হয়। কিন্তু বাঙালির লড়াইয়ে বিদ্যা কেমন ছিল, একবার দেখানো উচিত। দেখাইতে হইলে উদাহরণ চাহি, উদাহরণ রায় দুর্লভরাম।

রাজা দুর্লভরাম রাজা জানকীরামের[১] পুত্র। রাজা জানকীরাম সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান। তখন আলিবর্দি খাঁ বাংলার সুবেদার, দুর্লভরাম উড়িষ্যায় নায়েব দেওয়ান হইলেন। যে আফগান সেনাপতির হস্তে উড়িষ্যার নবাবি ছিল, সে রাজবিদ্রোহী হওয়ায়, এবং অন্য লোক উপস্থিত না থাকায় উড়িষ্যার নবাবি দুর্লভরামের হাতেই পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইলে আলিবর্দি রাজা জানকীরামের অনুরোধে তদীয় পুত্র দুর্লভরামকে উড়িষ্যার কায়েমি নবাব করিয়া দিলেন। আতাউল্লা খাঁ[২] তাহার অধীন প্রধান সেনাপতি হইলেন। এই সময় মহারাট্টাদিগের বড়োই উপদ্রব। কিন্তু উহারা বড়ো চতুর, উড়িষ্যা উহাদিগের পথ। উড়িষ্যায় কোনোরূপ গোলযোগ না ঘটিলে স্বচ্ছন্দে হুগলি চন্দননগর কাটোয়া এমন-কি মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত লুঠ করা যায়। দুর্লভরামকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য উহারা সন্ন্যাসী পাঠাইতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা বলে মহারাট্টারা আর আসিতেছে না, আমরা এই নাগপুর হইয়া আসিতেছি। আর নানা রকম পূজা অর্চা যোগ ধ্যান ইত্যাদিতে উহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখে। এদিকে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল। আতাউল্লা খাঁ নিত্য সংবাদ আনিতে লাগিল যে মহারাট্টারা সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছে। যত নিকট আসে, তিনি ততই দুর্লভরামকে উহাদিগকে তাড়াইবার উপায় করিতে বলেন। দুর্লভরাম সন্ন্যাসীদের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বলেন, যে তাহারা আজিও নাগপুর ছাড়ে নাই।

শেষ একদিন সকালে কটকের একপাশে মহা-গোলযোগ উঠিল, চারি দিকে লুঠপাট খুন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, বর্গি আসিয়া পড়িয়াছে, আতাউল্লা সংবাদ পাইয়াই শশব্যস্তে দুর্লভরামের দ্বারদেশে উপস্থিত। নবাবের হুকুম ব্যতীত সেনানী কাজ করে কেমন করিয়া? বেলা নয়টা, তখনো নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আতাউল্লা যত বেলা হইতে লাগিল ক্রমেই ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর, মহারাট্টারা যেদিকে পড়িয়াছিল, সেই দিকে ঘর সব জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। তখন প্রজাবৃন্দের দারুণ আর্তনাদে দুর্লভরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়াই শুনিলেন বর্গি কটকের উপর পড়িয়াছে। দুর্লভরামের আর কাপড় পরা নাই। সেই রাত্রিবাসের পাঁচহাতি ধুতিতে বিশাল

উদর কথঞ্চিত আবৃত করত দৌড়। একে সুখীলোক, দারুণ মোটা, তাহাতে প্রাণভয়ে দৌড়। দৌড়িয়া যাবেন কোথায় ? কটকের কেল্লায়। সেখান হইতে আধ ক্রোশ দূরে। বাড়ি হইতে গজেন্দ্র লম্বোদর দুলাইতে দুলাইতে ছুটিতেছেন ; পা উঠে উঠে উঠিতেছে না, বাহির হন এমন সময় আতাউল্লা খাঁ তাঁহাকে ধরিল। নবাব ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বুঝি বর্গিতে ধরিল। অনেকক্ষণের পর আতাউল্লার গভীর অথচ ধীর স্বরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি শুনিলেন সেনাপতি বলিতেছেন আমায় শীঘ্র হুকুমনামা দিন, আমি সসৈন্যে উহাদিগকে শহরের বাহির করিয়া দিয়া আসি। দুর্লভরাম দাঁড়াইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বলিলেন, সে সব কেল্লায় গিয়া দেওয়া যাইবে। আতাউল্লা বেশি জোর করায় নবাব ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন সেনাপতি আর চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা একটু দাঁড়ান না-হয় পালকি আনাইয়া দিই।" নবাব বলিলেন, "আর পালকিতে কাজ নাই দেরি হবে" বলিয়াই দ্রুতপদে কেল্লার দিকে ছুটিলেন। একে নবাব তাতে রাজা জানকীরামের পুত্র, আতাউল্লা শীঘ্র পালকি আনাইয়া খানিক দূর গিয়া উঁহাকে ধরিলেন ; ধরিয়া পালকিতে পুরিয়া কেল্লায় পাঠাইয়া দিলেন।

কেল্লায় গিয়াই নবাবের রোখ। যত সৈন্য ছিল শীঘ্র সজ্জিত হইতে হুকুম দেওয়া হইল। আতাউল্লাকে উপর-কটক হইতে বর্গি তাড়াইয়া দিবার হুকুম জারি করা হইল। কেল্লার কোথায় ভাঙা আছে সারাইবার একটু একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তখন কটকের অর্ধেক বর্গির দখল হইয়া গিয়াছে। আতাউল্লা খাঁ অনেক চেষ্টা করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম, যুদ্ধ, রক্তারক্তির পর সসৈন্যে পিছু হঠিয়া দুর্গের দিকে পড়িলেন। রাত্রিতে দুর্গের চারি দিকে মহারাট্টা সেনা স্থাপিত হইল, নবাবের যে সাহসটুকু হইয়াছিল রাত্রে সেটুকু তিরোহিত হইল ; ৮/১০ ক্রোশ দূরে আলিবর্দি একদল সেনা বর্গির হাঙ্গামের জন্য সর্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। আতাউল্লা বলিলেন, সেই সৈন্যদিগকে খবর দিয়া আনয়ন করা হউক ; উহারা আসিলে দুর্গ রক্ষার উপায় হইবে। নবাব বলিলেন যদি এই দণ্ডে মহারাট্টা জোর করিয়া গড় দখল করে, তখন তোমার খবর দেওয়া কোথায় থাকিবে ? আমার

হুকুম— এই দণ্ডে মহারাষ্ট্রীদিগকে কেল্লাছাড়িয়া দাও, এই মাত্র নিয়ম করো যে আমরা নিষ্কণ্টকে দেশে যাইতে পারি। ধূর্ত বর্গি সেই কথায় দুর্গ দখল পাইল. পাইয়াই সর্বপ্রথমে দুর্লভরামকে বন্দী করিল। কিন্তু বীর আতাউল্লা দুর্গের যে ভাগে ছিলেন, সেই ভাগ দুই-তিন মাস পর্যন্ত বর্গিদের সকল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। শুনিয়াছি দুর্লভরামকে উদ্ধার করিবার জন্য আলিবর্দি খাঁর তিনটি লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল।

এই এক বাঙালির বীরত্ব! বাংলায় অর্ধ স্বাধীন অবস্থায় দুই জন হিন্দু নবাব হইয়াছিল— এক রামনারায়ণ[৩] আর-এক দুর্লভরাম। তাহার মধ্যে দুর্লভরাম অপূর্ব কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেবার দুর্লভরামের অনবধানতা বশত বর্গিদিগের দূর করিতে আলিবর্দিকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। উহারা কাটোয়া পর্যন্ত লুঠ করিয়াছিল।

আমাদের কত পুরুষ যে দুর্লভরাম আছেন তাঁহার ঠিকানা নাই। আমাদের বীরত্ব পুরুষানুক্রমিক।

'বঙ্গদর্শন'
আষাঢ়, ১২৮৫ ॥

# প্রাসঙ্গিক তথ্য।

'একজন বাঙালি গবর্নরের অদ্ভুত বীরত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল আষাঢ় ১২৮৫ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ। ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ 'বাঙ্গালীর বীরত্ব' নামে একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই প্রবন্ধের সমালোচনা করে লেখক বলেন—

"আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্বের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ লেখক সয়ের মতাক্‌খরীণ হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি হাস্যরসের অনুচিত অবতারণা করিতে যাইয়া দুর্লভরামের চিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। মূল ইতিহাসের সহিত তাঁহার কোন কোন কথার ঐক্য নাই। দুর্লভরামের সেনাপতির নাম আতাউল্লা খাঁ নহে, মির আবদুল আজিজ। মারহাট্টারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, মির আবদুল আজিজ দুর্লভরামের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনার লোকদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই দুর্লভরাম দৌড় মারেন নাই। তিনি বাহিরে আসিয়া দুর্গে যাইবার জন্য পাল্কিতে আরোহণ করেন। মির আবদুল আপনার লোক লইয়া সেই পাল্কির সঙ্গে যাইতে থাকেন। কিছু দূর গেলে মারহাট্টা সৈন্য আসিয়া পড়াতে দুর্লভরাম পাল্কি ছাড়িয়া কোন ভগ্নগৃহে পলাইতেছিলেন, এমন সময় সেনাপতি আবদুল তাহাকে ধরিয়া ফেলেন, এবং অশ্বে আরোহণ করিতে কহেন। দুর্লভরাম অশ্বারোহণে আবদুল আজিজ ও তাঁহার সৈন্যদলের সহিত দুর্গে উপনীত হয়েন। তিনি দুর্গমধ্যে বন্দী হয়েন নাই। দুর্লভরাম সন্ন্যাসীদের কথায়, আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। সৈন্য-সংক্রান্ত অনেক কর্ম্মচারী দুর্লভরামের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। কিন্তু মির আবদুল ইহাতে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীদের কুপরামর্শে দুর্লভরামের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল; সুতরাং তিনি সন্ধি করিতেই উদ্যত হয়েন। কয়েকদিন কথা-বার্ত্তার পর, দুর্লভরাম গড় হইতে বাহিরে আসিয়া মারহাট্টাপতি রঘুজী ভোঁসলার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর তিনি বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে চাহেন, কিন্তু মারহাট্টাপতি তাঁহাকে প্রচণ্ড সূর্য্য তাপের সময় বাসায় যাইতে বারণ করিয়া, সেইখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন। দুর্লভরাম ও তাঁহার সম-ভিব্যাহারিগণ এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া অস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রঘুজীর শিবিরে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এই অবসরে মারহাট্টাগণ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া

ফেলে। আবদুল আজিজের ভ্রাতা, দুর্লভরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও বন্দী হয়েন। কেবল মির আবদুল আজিজ দুর্গে আসিয়া, আপনাদের স্বাধীনতা ও নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সম্মান রক্ষা করেন।

"দুর্লভরামের এই পরিচয়ে. বাঙ্গালার ইতিহাসানভিজ্ঞ পাঠক, উদ্দেশ্যে সমস্ত বাঙ্গালীর প্রতি তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতে পারেন ; সেইজন্য এই স্থলে বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বাঙ্গালার সকলেই দুর্লভরামের ন্যায় ছিলেন না। অদৃষ্টদোষে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস নাই ; বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিতেও অনেক বাঙ্গালীর প্রবৃত্তি নাই। এক দুর্লভরামের বিবরণ বঙ্গদর্শনের স্তম্ভে দেখিয়া. অনভিজ্ঞ পাঠক উচ্চ করতাল-ধ্বনির সহিত বলিয়া উঠিতে পারেন 'হো ! হো ! বাঙ্গালী কবে মানুষ ছিল ?"

এর পরে লেখক রঘুবংশ থেকে রঘুর সঙ্গে বাঙালিদের নৌযুদ্ধ : পাল ও সেন বংশের রাজাদের, বারোভুঁইয়াদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ঈশা খাঁ চাঁদরায় কেদাররায়-এর এবং রাজা সীতারাম-এর শৌর্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বাঙালির বীরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য করেছেন—

"এক্ষণে যাঁহারা আপনাদের বাসগ্রামে বানরের পাল আসিলে মহাভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সংবাদ পত্রে আর্ত্তস্বরে চীৎকার আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না। আর যাঁহারা দুর্লভরামের অদ্ভুত বীরত্বে উচ্চহাস্যের সহিত করতালি দেন. তাহাদিগকে বলি. বাঙ্গালী পূর্ব্বে সাহসশূন্য ও বীরশূন্য ছিল না, এবং বাঙ্গালা একদিনেই অধঃপাতে যায় নাই।"

পরবর্তী গবেষণায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, বারোভুঁইয়াদের নিয়ে, বিশেষত প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব নিয়ে গর্ব করার কোনো কারণ নেই। হর-প্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধের ঐতিহাসিক বিচ্যুতি সম্পর্কে এই লেখকের সমালোচনাও অনেকটাই অমূলক। হরপ্রসাদ দুর্লভরামের সেনাপতির নাম ভুল লিখেছেন, ঘটনার বিবরণেও সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কিন্তু মূলত সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ-রচিত 'সিয়র-উল-মুতাখেরিন' অনুসরণ করেই দুর্লভরামের চরিত্র এঁকেছেন। গোলাম হোসেন লিখেছেন, গবর্নর পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য দুর্লভরাম সন্ন্যাসী-ফকিরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতেন। এই সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই ছিল রঘুজি ভোঁসলের গুপ্তচর। রঘুজি এদের কাছ থেকে দুর্লভরামের অপদার্থতা ও সরকারের দুর্বলতা সম্পর্কে সংবাদ পেতেন এবং তার ভিত্তিতে নিজের পরিকল্পনা ছকতেন। রঘুজি চোদ্দ হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য নিয়ে যখন ওড়িশার সীমান্তে উপস্থিত হলেন তখনো দুর্লভ-রাম সন্ন্যাসীদের নিয়ে ব্যস্ত— আক্রমণ যে আসন্ন সে-বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণই অনবহিত। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে যোগ্য সেনাপতি মির-আবদুল-আজিজ

ঘোড়ায় চড়ে ছুটে দুর্লভরামের প্রাসাদ-দুয়ারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, দুর্লভরাম তখনো ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। দুর্লভরামকে জাগানো হলে তিনি "...came out half naked, and without a turbant, and in that condition, got into his Paleky, with intention to take shelter in the castle of Bhara-Bhaty, which was not far off." মির-আবদুল অপদার্থতার জন্যে দুর্লভরামকে ধিক্কার দিয়ে দুর্গে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। রঘুজি দুর্গ ঘেরাও করলে দুর্লভরাম সন্ন্যাসীদের পরামর্শে জীবন বাঁচাবার জন্যে মারাঠাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় রাজি হয়ে গেলেন। এভাবে আত্মসমর্পণ যে নিজেদের পক্ষে এবং আলিবর্দি খাঁর সম্মানের পক্ষে অবমাননাকর—মির-আবদুলের এই যুক্তি দুর্লভরাম গ্রাহ্য করিলেন না। দুর্গ থেকে বেরিয়ে সেনানায়ক ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়ে রঘুজির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। প্রচণ্ড গরমে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না বলে মারাঠারা তাঁদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলে সকলে হাতিয়ার খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমে থেকে উঠে দেখেন— সকলকেই বন্দী করা হয়েছে। "D8lobram remained a prisoner one full year, or over some months more; nor was he released but by the mediation of some Bankers, who paid a ransom of three lacs of rupees for him. After which he returned to M8rsh8dabad, where the Viceroy repaid the money to his father, a minister with whose faithful services he was perfectly satisfied."— Seid-Gholam-Hossein-Khan, *The SëirMutaqherin OR Review of Modern Times being an History of India*, English Edition, Vol. II, Calcutta, 1902. pp. 3, 6.

১. জানকীরাম রায় (?-১৭৫২ খৃ.) নবাব আলিবর্দি খাঁ-র একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন এবং আলিবর্দির ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমিক পদোন্নতি ঘটে। আলিবর্দি যখন পাটনার নাজিম ছিলেন তখন জানকীরাম ছিলেন তাঁর দেওয়ান-ই-তন্। ১৭৪০ খৃস্টাব্দে বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব হবার পরে আলিবর্দি প্রশাসন-কর্তৃত্বে রদ-বদল করেন, জানকীরাম বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে সিরাজদ্দৌলাকে বিহারের গবর্নর এবং জানকীরামকে সিরাজের ডেপুটি নিয়োগ করা হয়। বর্গির হাঙ্গামার সময়ে জানকীরাম নিজের

টাকায় সৈন্য সংগ্রহ করে আলিবর্দিকে সাহায্য করেন। ভাস্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করে এনে হত্যা করানোয় জানকীরাম আলিবর্দির অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন।

২. হরপ্রসাদ দুর্লভরামের সেনাপতির নাম ভুল করে আতাউল্লা খাঁ লিখেছেন, হবে মির-আবদুল-আজিজ। আতাউল্লা খাঁ ছিলেন রাজমহলের ফৌজদার এবং পরে ভাগলপুরের ফৌজদার।

৩. রামনারায়ণের বাবা রঙ্গলাল বিহার সরকারের সামান্য কর্মচারী ছিলেন। বিহারে জৈনুদ্দিনের শাসনকালে রামনারায়ণ খাসনবিশ হিশাবে চাকরি শুরু করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি দেওয়ানের পেশকারের পদ পান এবং পরে বিহারের ডেপুটি গবর্নর রাজা জানকীরামের দেওয়ান হন। ১৭৫২ খৃস্টাব্দে জানকীরামের মৃত্যু হলে তাঁকে বিহারের ডেপুটি গবর্নর নিযুক্ত করা হয়।

তৈল যে কি পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ— বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ, আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর-কিসে পারে!

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমান রূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান্, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার

অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না— উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না— বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানা রূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথ্রপি"। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়োলোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি, চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়, সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুই জনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে

গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা পুত্রে স্বামী স্ত্রীতে রাজায় প্রজায় বিবাদ বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান্ কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে সময় আছে কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়— যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল— পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু-না-কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না— একজন ইংরেজি-ওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য হয় বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান্। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরো মূল্যবান্। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া

থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার— অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোনো রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্তত উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালোই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন— কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমতো লেক্‌চার পাওয়া যায় না। যদিও কোনো রীতিমতো কালেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরির বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদাই গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালির বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালির একমাত্র ভরসা তৈল— বাংলায় যে-কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড়ো লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এ-দেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের গুরু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষ মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর-তৈলে মন ফেরে।

'বঙ্গদর্শন'
চৈত্র, ১২৮৫ ॥
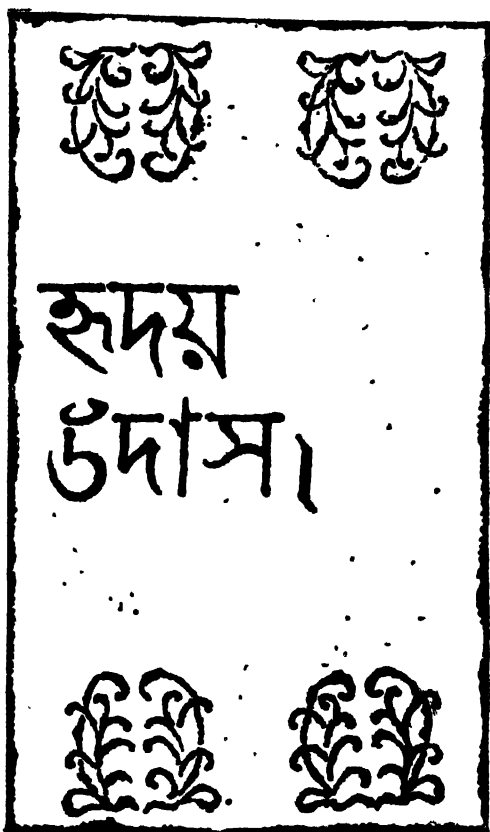
মন সদাই উদাস। অন্তরের অন্তরে সদাই প্রতিমুহূর্তে, প্রতিক্ষণে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিপলে, যেন কোনো জিনিসের জন্য মন কেমন করে। মন হুহু করে : নিজ সুখের জন্য, মন একবারও ভাবে না, ভাবিতে চায় না, ভাবিতে ভুলিতে চায়! আর-কিছুতেই সুখ নাই, কাজে কর্মে সুখ নাই, ধনে সুখ নাই, যশে সুখ নাই, যে-সকল চির-অভিলষিত যাহার জন্য এক-একবার জীবন উৎসর্গ করিতে চাহিতাম, তাহাতে আর সুখ নাই। বড়ো হইবার আশা স্বাভাবিক, তাহাতেও সুখ দেখিতে পাই না। যে-সকল গ্রন্থ পাঠে চিরকাল এত আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি তাহা আর ভালো লাগে না। যে-সকল কথায় এত আগ্রহ ছিল, তাহা

বিষবৎ বোধ হয়। যাঁহাদের সংসর্গে পূর্বে এত আমোদ হইত, তাঁহাদের সংসর্গ অরণ্যবাস হইতেও বিষম কষ্টকর বোধ হয়। যে-সকল স্বভাবসৌন্দর্য পরমরমণীয় বোধে শত-শতবার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সে-সকলের সৌন্দর্য যেন হঠাৎ কমিয়া আসিয়াছে।

সদাই বোধ হয় জগৎ অরণ্যবিশেষ, ইহার মধ্যে আমি একটি সামান্য কীট। আমার মতো শত শত কীট চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে : কিন্তু তাহাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। একা ইহা অপেক্ষা ভালো। কিন্তু সে একা কেন ? আমার মনের মতো একটি মানুষ গড়িয়া তাহাকে মর্নাসিংহাসনে বসাইয়া একা অতি গোপনে তাহার সঙ্গে মনের কথা কই। মনের কথা কি ? আমি তাহাকে ভালোবাসি সুতরাং আমি এখন বিজন-প্রিয় হইয়াছি। বিজনে আমার মনের মানুষ গড়া ভালো হয়। তাহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, অনেক কথা তাহার সঙ্গে কহিতে পারি। অনেকক্ষণ তাহার উপাসনা করিতে পারি। অনেক বার তাহার সুখ উৎপাদন ও দুঃখ বিমোচন করিতে পারি। অনেক বার অতি গোপনে বিনা শর্তে তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি : অনেক বার তাহার সেই প্রেমময় ছবি দেখিতে পাই। তাহার হাস্যবদন দেখিয়া অনেক বার সুখ পাই। আমি লোকের সংসর্গ ভালোবাসি না ; লোকে আপনার সুখে হাসে, আপনার দুঃখে কাঁদে, আপনার জন্য পরকে বিরক্ত করে, দেক্ করে, লোকে স্বার্থপর। আমার ইচ্ছা হয় অন্যের জন্য ভাবি, অন্যের জন্য কাজ করি। অন্যের যাহাতে তৃপ্তি হয় তাহাই করি। অন্যের কাজে আত্মজীবন উৎসর্গ করি। অন্যকে ভালোবাসি, আমি আমাকে ভালোবাসিয়া সুখী হইতে পারি না। আমার আর-লোক চাই। আমি ভালোবাসিতে চাই। নিজে খাইয়া, নিজে পরিয়া, আর তৃপ্তি হয় না : আর-কাহাকেও ভালো করিয়া খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা করে। চাঁদের আলো বড়ো সুখের জিনিস, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু আমার বোধ হয় আমার সে দেখিল কই। দুজনে দেখিতাম তো বেশ হইত। ফুলগুলি বেশ, বেশ জিনিস, কেমন গন্ধ ভরভর করে, কেমন কোমল, কেমন গঠন, কেমন টাট্‌কা, কেমন সুখস্পর্শ, আমার বোধ হয়, এমন ফুলগুলি তুলিয়া তাহার গলায় মালা করিয়া দিলে কতই সুন্দর হইত। যখন কোনো জিনিস দেখিয়া তৃপ্তি হয়, অমনি বোধ হয়, আমার মনের মানুষ আমার

সঙ্গে থাকিলে দুজনে উপভোগ করিতাম। যখন কোনো গ্রন্থ পাঠ করিয়া নয়নে অশ্রুজল উপস্থিত হয়, তখনি মনে হয়, আমার সঙ্গে কাঁদিবার লোক থাকিলে বড়োই আমোদ হইত। সুখে দুঃখে, আশায় হতাশায়, ভয়ের সময়, উৎসাহের দিনে, উৎসবে, ব্যসনে, ভ্রমণে আলস্যে কেবল বোধ হয়, আর-একটি লোক থাকিলে ভালো হইত। কাজেকর্মে একান্ত অন্যমনস্ক থাকিলেও যেন তাহার জন্য ঔৎসুক্যের একটি প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অথচ অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

কিন্তু সে মানুষটি কই। যাহার জন্য আমি ভাবিতে পারি, যাহাকে সিংহাসন দিয়া হৃদয়ের অধীশ্বর করিতে পারি, যাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি, যাহাকে দেখিলে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আনন্দ প্রাপ্ত হই, যাহার কথায় কর্ণরন্ধ্র ভরিয়া যায়— একবার শুনিলে যাহার প্রতিধ্বনি চিরদিনের তরে কানে লাগিয়া থাকে, কখনো অপনীত হয় না। সে মানুষ কোথায় পাই। কেহ কি বলিয়া দিতে পারো? কমলাকান্ত বলিবেন,চাঁদ ভালোবাসো, চাঁদের সঙ্গে বিবাহ করো, ফুলের বিবাহ দাও, ফুল ভালোবাসো, কিন্তু কমলাকান্ত আহাম্মক, নহিলে সে এমন কথা কেন কহিবে। আমি যে মানুষ ভালোবাসিতে চাই। স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া থাকা যায় সত্য; কিন্তু সে কয় দিন? চাঁদ ভালোবাসিয়া মন পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু সে কয় দিন। একদিন দুই দিন। কি না হয় যখন মনে বড়ো কবিত্বের ঢেউ উঠিল বলিলাম স্বভাবই সুন্দর, কিন্তু স্বভাব কি আমার দুঃখে কখনো দুঃখী হয়? একটা মনুষ্যের জীবন বড়ো লম্বা, শুধু স্বভাব ভালোবাসিয়া কাটে না, আর-কিছু চাই। মানুষ চাই, মনের মতন মানুষ চাই। আমি তাহাকে চিনি, সে আমাকে চেনে। এমন মানুষ কোথায় পাই? আমার এ বিবাহে কে ঘটকালি করিবে? আমি কুল চাহি না, কোষ্ঠী চাহি না, গোত্র চাহি না, পুরুষ চাহি না, পর্যায় চাহি না, দানসামগ্রী চাহি না। আমার এ বিবাহে দিন নাই, নক্ষত্র নাই, লগ্ন নাই, সম্বন্ধ হইলেই রাজযোটক হইবে। কাল অকাল দরকার নাই। পসন্দ হইলেই যথেষ্ট— তৎক্ষণাৎ বিবাহ। কিন্তু ঘটক মিলে না, ঘটকে আর-সব মিলাইতে পারে, কেবল মন মিলাইতে পারে না; আমার অমন ঘটকে কাজ নাই।

আরশিতে মুখ দেখিতে যাও— আরশির দোষে আপনার মুখ কখনো লম্বা দেখিবে. কখনো সরু দেখিবে, কখনো দেখিবে বাঁকা, কখনো দেখিবে গোল, কখনো দেখিবে থেবড়া, কখনো দেখিবে চেপটা। মানুষের মনও তেমনি আরশি বিশেষ। মানুষের মন যদি ভালো হয় সবই ভালো দেখায়। সবই সুন্দর দেখায়। কখনো কখনো বড়ো সুখের সময় সব সুখময় বোধ হয়. স্বর্গের সঙ্গীত দূর হইতে কান জুড়াইয়া দেয়. জন-কোলাহলপূর্ণ নির্বাতপ্রদেশও কোকিলকলরব-সংকুল নন্দনবনের ন্যায় বোধ হয়। সকল মানুষের মুখেই স্বর্গীয়সৌন্দর্য দেখায়। আবার কখনো বোধ হয় সব অন্ধকার. পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে। সমস্ত জগৎ কাঁদিতেছে— মানুষের মুখ শূকরের মতো, আমার মন এখন আপন লইয়াই ব্যস্ত, আপন মনের মানুষ গড়িতে ব্যস্ত. অপর সকল বিষয়েই নির্জীব. উৎসাহশূন্য। আমার কাছে জগতের অস্তিত্ব নাই, যদিও আছে তা নির্জীব প্রাণশূন্য। নদীর জল চলিতেছে, স্বভাবের নিয়মে ; তাহাতে চন্দ্রকলা নাচিতেছে. স্বভাবের নিয়মে ; ফুল ফুটিতেছে, স্বভাবের নিয়মে ; মানুষে গান গায়িতেছে. স্বভাবের নিয়মে : আমিও ভালোবাসার জন্য পাগল হইয়াছি স্বভাব নিয়মে ; জীবন কোথাও নাই। কিন্তু এই ভুবন নির্জীব বোধ হয় কেন ? বাস্তবিকও স্বভাব আজিও যেমন আছে কাল্লিও তেমনি থাকিবে. কালি তেমনই ছিল, ইতরবিশেষ কিছু হয় নাই হইবে না. হইবার সম্ভাবনাও নাই : তবে আজি নির্জীব বোধ হয় কেন। ফিলজফররা বলিতেন যাহা আমরা দেখিতে পাই না তাহা নাই। আরবের উপকূলভাগ নিরন্তর সুগন্ধে আমোদিত। কিন্তু তাহা ভোগ করিবার লোক নাই সুতরাং তাহা না থাকারই মধ্যে। জগতে জীবন আছে কিন্তু আমার মনে নাই। আমি যে আরশি দিয়া দেখি তাহার দোষে সবই নির্জীব বলিয়া বোধ হয়। আমার আরশির দোষ কে সারিয়া দিবে ? আমার কাষ্ঠপুত্তলীবৎ মৃন্ময় দেবপ্রতিমাবৎ অন্তঃকরণে কে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ? এ প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুরোহিত কোথায় মিলিবে ? যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে জগৎ অবশ্য হাসিবে, নদীর জলে সুখের গান শুনিতে পাইব. পক্ষী গায়িবে প্রেমভরে। ঝিল্লি ডাকিবে রাগভরে। ফুল দুলিবে আলিঙ্গনের জন্য। কোকিল কুহু কুহু করিবে বিরহে। এ প্রাণ কে প্রতিষ্ঠা করিবে ? কবে আবার এ প্রতিমা প্রাণ

পাইয়া দুলিবে আর প্রকৃতি পুরোহিতপ্রদত্ত ধূপধুনা গন্ধপুষ্প উপহার পাইয়া হাসিবে! বিসর্জনের সময় দূরে, এখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা কখন হইবে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা কি মিলিবে? মনের মানুষ প্রাণের প্রাণ কি মিলিবে?

যৌবনে-সন্ন্যাসী॥

'বঙ্গদর্শন'
শ্রাবণ, ১২৮৭॥

কয়েক মাস ধরিয়া দাম্পত্য-দণ্ড-বিধির অতি কঠিন দণ্ড ও নিয়ম-সকল আমার উপর জারি হইতেছে— জরিমানা, বেত্রাঘাত, কারাবাস, দ্বীপান্তর, নির্জন কারাবাস. সম্পত্তি-বাজেয়াপ্তকরণ. শেষ মৃত্যু পর্যন্তও বুঝি আমার অদৃষ্টে ঘটে ! আমি সত্য করিয়া বলিতোছি ( দোহাই ধর্মের যদি মিথ্যা বলি ) আমার কোনো অপরাধ নাই. আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ । আমি রোজ ঠিক আটটার সময় হাজির থাকি, কখনো উপার্জনের এক পয়সা নিজ খরচ বলিয়া লই না, জজ-বিবি রাত্রে না ঘুমাইলে ঘুমাই না, বাছিয়া বাছিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের বই হইতে সম্বোধন-পদ সংগ্রহ করি ; তবুও আমার উপর এই সকল কঠিন আজ্ঞা ! মনে

করিলাম, পূর্বজন্মে হয়তো কোনোদিন পূজার সময়ের ঢাকাই শাড়ি মনোমতো হয় নাই— অতএব প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিলাম। মিলের *Subjection of Women*[১] পড়িয়া শুনাইলাম, দাম্পত্য-অত্যাচারের Passive obedience প্রিচ করিয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিলাম। কলম পিষে খাই, সুতরাং বই পড়া বা লেখা ছাড়া অন্য প্রায়শ্চিত্ত যোগায় না। কিছুতেই পাপ গেল না। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন[২], ভরত শিরোমণি[৩], মহেশ ন্যায়রত্নের[৪] নিকট ব্যবস্থা লইয়া নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ক্রমেই কঠিন দণ্ড আজ্ঞা হইতে লাগিল। হাজার হোক পুরুষ বাচ্চা— রোক একটু আছে। দাম্পত্যবীজক সমাজের উন্মূলন করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই দিনই টাবাবেড়ে ওয়ার্লড অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করিলাম ( পাঠক হাসিবেন না, কলিকাতায় জন-আষ্টেক লোক যদি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন[৫] করিতে পারে, তবে টাবাবেড়ে আমরা ওয়ার্লড অ্যাসোসিয়েশন কেন করিতে না পারিব ? এখানেও ব্রাঞ্চ পোস্টাপিস আছে, প্রাইমেরি ইস্কুল আছে। ) প্রথম বক্তা আমি, আমার বিষয় স্ত্রীদমন— স্ত্রীর উপর পুরুষের যে সহজ স্বত্ব ও দেশীয় আইনের স্বত্ব আছে তাহার ব্যবহার করা, আর দাম্পত্য-দণ্ড-বিধি উঠাইয়া দেওয়া। আমার বক্তৃতা শেষ হইতে-না-হইতেই চারু বাবু— টাবাবেড়ের গ্লাডস্টোন[৬] —আপনার স্ত্রীর গাঢ় আলিঙ্গন লাভ পুরস্কারের লোভে স্বজাতিবিরুদ্ধ ধর্মবিরুদ্ধ নীতিবিরুদ্ধ যত বিরুদ্ধ হইতে পারে তত বিরুদ্ধ বক্তৃতা ছড়াইলেন। আমার এত বড়ো মানব-মঙ্গলকার্যে একেবারে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। হতাশ্বাস হইয়া বাড়ি গেলাম। এতকাল নিরপরাধ ছিলাম, আজ রাজবিদ্রোহ অপরাধ— ঝাঁটা লাথি প্রভৃতি পড়িতে লাগিল, বিব্রত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। নানা যন্ত্রণায় অনেক দেরিতে নিদ্রা আসিল। সেও সুষুপ্তি নয়, স্বপ্নমাত্র। যে-সকল স্বপ্ন তাহার একটি দেখিলে আমি তো আমি, আমার চৌদ্দ পুরুষের প্লীহা চমকাইয়া উঠিত। আমি তো সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি— যদি সত্যি ঘরের মাথা কাটা যায়— দাম্পত্য-দণ্ড-বিধি তবুও বরং ভালো : কিন্তু বাবা ! মেয়েমানুষকে অপমান করা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা কিছু নয় ! উহাতেই মহাপ্রলয় ঘটে। চোখের উপর দেখিলাম, ঘটিয়া গেল। কেমন করিয়া ঘটিল তাহাও দেখিলাম।

একবার নিদ্রা আসিতেছে আবার ভাঙিতেছে, এই অবস্থায় একবার যেই চক্ষু মুদিয়াছি, অমনি বোধ হইল— স্ত্রীবিপ্লব। দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাচীক্ষেত্রে একদিকে সমস্ত পুরুষ ও আর-এক দিকে সমস্ত স্ত্রীলোক। স্ত্রীশিবির সমস্ত ঠিকঠাক, ফিটফাট, রসদ প্রস্তুত— রণসজ্জা প্রস্তুত— ঢাল-তলোয়ারাদি প্রস্তুত— সব প্রস্তুত! পুরুষদিগের শিবিরে সব গোলযোগ— কেহ কাঁদিতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে। দেখিলাম, ইংরাজ বাঙালি ফরাসি জর্মান পারসি চীনে সব একত্র হয়েছে, আজ আর Black-niger নাই। যেন কোনো একটা ভীষণ বিপদ্‌পাতে জগৎসুদ্ধ ভাই ভাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্লাডস্টোন সুরেন্দ্র বাড়ুয্যেকে[৭] বলিতেছে— দাদা রক্ষা করো! কেহ বলিতেছে, "কি হবে! কি হবে!" কেহ বলিতেছে, "বাবা ওদের নাহলে চলে না, কেন চটাচ্চ!" কেহ বলিতেছে, "না-হে-না বোঝো না, একটু গরম হাওয়া চাই বৈকি?" কেহ বলিতেছে, "নাও ওরা হল আদ্যাশক্তি ওদের কাছে আবার গরম!" কেহ বলিতেছে, "মেয়েমানুষকে আমাদের উপরে হইতে দিব না, উহারা নীচেই থাকিবে।" একজন বলিতেছে যুদ্ধ তো দশ জন বলিতেছে যুদ্ধ নয়— সন্ধি। যে-কোনো শর্তে হয় এখন মিটলে বাঁচি। তখন বিসমার্ক[৮] চক্ষুর পাতা তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা— দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ— একটা সভা করো।" অমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধির ধান্যপেষণ যন্ত্রের পাশে সবে মিলিয়া দাঁড়াইল। এমনই ভিড় হইল যে, সমস্ত বেলজিয়ানেরা চাপা পড়িয়া মরিয়া গেল। তখনি, 'রক্ষা করো রক্ষা করো! বাবা, যুদ্ধ নয় সন্ধি করো, গিন্নি সব খাবার ঘরে নিয়ে গেছে, বাবা, পেটের জ্বালায় মলুম'— চারি দিক হইতে এ প্রকার ভয়ানক একটা গোল উঠিল। সে গোলে কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল। কেদারামনুষ্য (চেয়ারমেন) "নিয়ম নিয়ম" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। সভার নিয়মাবলীর চতুর্থ রুলের পঞ্চম পদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিছুই হইল না! শেষ অনেক বৃথা উদ্যমের পর বিনা তর্কে চীৎকারের চোটে স্থির হইল, সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাওয়া উচিত। স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিব, সিবিল সার্বিস, মিলিটারি সার্বিস, উকিলি, ডাক্তারি, চিহ্নিত কর্ম, অচিহ্নিত কর্ম, সব উহাদিগকে খুলিয়া দিব, নামের শেষে

আকার বা দীর্ঘ ঈকার না থাকিলে রাজা, অমাত্য, বা কাউন্সিলের মেম্বর হইতে পারিবে না। ইত্যাদি।

এই সন্ধিপত্র লইয়া যখন সানফ্রান্সিস্ শূয়ার এম ডি, মাদম লোরি বিদ্রোহিণীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। হাহাহা! এত দিন কি নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাইতে-ছিলেন? এত দিন এরূপ শর্তে রফা হইতে পারিত, এখন আর হয় না। আমরা আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না, এইবার আল্টিমেটাম পাঠাই, জবাব আসিলেই হয় সন্ধি, নয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এই আমাদের শেষ কথা। পুরুষ জাতি যদি সার্ফ হয়, আমাদিগকে লর্ড বলিয়া মানে, আমাদিগের বাধ্য হয়, আমাদিগকে কখনো দ্বিরুক্তি না করে, আর সন্তান প্রসবের সম্পূর্ণ ভার আপনারা গ্রহণ করে তবেই সন্ধি হবে।

জবাব আসিল, আমরা সব হইতে পারি। দাস হইতে পারি, সার্ফ হইতে পারি, স্লেভ্ হইতে পারি, কখনো অবাধ্য হইব না, কখনো উচ্চ কথা বলিব না, কুর্নিশ ব্যতিরেকে নিকটে পঁহুছিব না, গা টিপিয়া দিব, পায় হাত বুলাইব: কিন্তু যাহা স্বভাবের নিয়ম তাহা কি প্রকারে ব্যতিক্রম করিব? পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া দেবীদিগের দুই বৎসরে তিন বার যে অসহ্য প্রসববেদনা সহ্য করিতে হয়, আমরা আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিতাম, যদি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিত। অতএব কেবল ঐ এক শর্ত ছাড়া আর সকল বিষয়েই আমরা স্বীকার।

তখন স্ত্রীলোক মহলে যুদ্ধসভা আহ্বান করা হইল। শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বলিলেন— আইস, আমরা আমাদিগের জাতিসিদ্ধ কটাক্ষ, ইঙ্গিত, অশ্রু প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা উহাদিগকে কায়দা করি। তখন মিস্ হরিমতী বলিলেন, না-না, আর কায়দা করিয়া কাজ নাই। কাছে থাকিলেই সন্তান প্রসব করিতে হইবে— সে বড়ো যন্ত্রণা। তখন কেদারানারী যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ফ্রেন্স মাদমেরা অগ্রগামিণী পদাতিনী সাজিলেন। ইংরাজ মিসেরা অশ্বারোহিণী হইলেন। জর্মানিরা তোপখানার অধিষ্ঠাত্রী হইলেন। ইতালিয়ারা পটি ও মলম লইয়া সৈন্যগণের পশ্চাৎ চলিলেন। মুসলমানীরা তাম্বুরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। হিন্দুনীরা দলের পশ্চাদ্ভাগে রসদ যোগাইতে

লাগিলেন। চীনানীরা আফগারি মহলের কর্তৃত্বকার্যে নিযুক্ত রহিলেন। ব্রাহ্মিকারা মৃত পুরুষ, আর আমেরিকানীরা মৃতনারী সমাহিত করিবার নিমিত্ত ভার পাইতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মিকাদিগের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। কারণ, কয়েক মাস অবধি দৃষ্ট হইতেছিল উহারা অন্তরে অন্তরে শত্রুর সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছে। হুকুম হইল, উহারা হিন্দুনীদিগের সহিত সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে থাকুক। হিন্দুনীরা উহাদিগের উপর যেন নজর রাখে। ইতি উদ্যোগ-পর্ব।

তখন সমস্ত উদ্যোগ হইলে পর ফৌজ কুচ করিবার হুকুম হইল। ফরাসিনীগণ বিদ্যুদ্বেগে প্রবল বাত্যার ন্যায় পুরুষসৈন্য ভেদ করিয়া একেবারে তাহাদিগের ছাউনি দখল করিল। পুরুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। শত শত শ্মশ্রুশোভিত আস্ফালিতগুম্ফ হুংকারগর্ভ আরক্তলোচন দষ্টাধর আলোলিতকেশ অর্থাৎ টেরিশূন্য মস্তকে ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। শোণিতপ্রবাহে নদী বহিতে লাগিল। বৃটানীরা পিশাচিনীর ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই রক্তকর্দমে ঝাঁপ দিয়া প্রলয়কাণ্ড বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তখন অবশিষ্ট পুরুষেরা একত্রিত হইয়া নারীপূজা আরম্ভ করিল। স্তূপাকৃতি ধূপধুনা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। পুষ্প চন্দন গন্ধ ইকয়েটরিয়ান মারুতে প্রতাড়িত হইয়া কেন্দ্রপ্রবাহে (Polar current) আনীত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিল। নৈবেদ্যের আয়োজনের কথা অনির্বচনীয়! পাঠক মহাশয়েরা কল্পনাবলে যত দূর পারেন মনে করিয়া লউন। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তায় পেটুকচূড়ামণি, জিহ্বাগ্রে লালা সংবরণ করিয়া সে বর্ণন আমার সাধ্যাতীত! পুরুষেরা নারীদিগের স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি তো আছেই, তাহার উপর হার্মোনিয়া, পিয়ানো, এস্রাজ প্রভৃতিও বাজিতেছে। ভুলিয়াছিলাম. এই সকল পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া অরিনকো সমতলক্ষেত্রে নারীপূজা আরম্ভ করিয়াছে। নারীগণ জয়লাভ করিয়া প্রাচীক্ষেত্র ত্যাগ করত উহাদিগের অন্বেষণ করিতেছিল। শেষ যখন অরিনকোক্ষেত্রে উপস্থিত, ধূপধুনা নৈবেদ্যের আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। একজন আর-একজনকে বলিল, "এ কেমন যুদ্ধ লো!" অমনি শুনিতে পাইল, পুরুষেরা স্তব করিতেছে— তাহার ধ্বনি সমস্ত বাদ্যযন্ত্রধ্বনি অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে— তাহা ভক্তিভাবে পূর্ণ, স্নেহপ্রহ্ব ও প্রেমঘর্ঘর।

সে স্তব এই— হে তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতীশুভ্রকান্তি[৯] স্তন-ভারনমিতাঙ্গী রমণীগণ ! হে ঘনপীনপয়োধরভারনতে রমণীমণ্ডলী ! আমরা অপরাধ করিয়াছি। হে মন্মথচূতমঞ্জরিশ্রবণায়তচারুলোচনে[১০] সীমন্তিনি ! আমাদিগকে মার্জনা করো। হে বরাভয়দায়ে ! আমাদিগকে বর ও অভয় দাও। শুনিয়াছি, যত্রাকৃতি স্তত্র গুণা বসন্তি[১১] কিন্তু হে চারুভাষিণি ! মধুরভাষিণি ! সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে ! শিবে ! সর্বার্থসাধিকে ! শরণ্যে ! আমরা শরণাগত, আমাদিগের প্রতি কেন কঠিন হও ? হে গৌরবর্ণে সুরূপে সর্বালংকারভূষিতে ! আমরা ভীত হইয়াছি. আমাদিগকে অভয় দান করো।

যখন উহারা স্তবের শেষ পদ পাঠ করিতেছিল, তখন একটা বিড়ালাক্ষী, উন্নতঘোণা বিকটবদনা, রৌদ্রদগ্ধবরনা ফরাসিনী মার্সলানী উঁহাদিগের সম্মুখে। তাহার গায়ে একখানিও অলংকার নাই, পুরাতন ছিন্নবসনে যুদ্ধের রক্ত কর্দম জমাট হইয়া রহিয়াছে। সে ভাবিল বুঝি, তাহারই জন্য এই পূজার আয়োজন হইয়া রহিয়াছে। ইহারা বুঝি তাহাকেই গৌরবর্ণা সুরূপা সর্বালংকারভূষিতা বলিয়া আহ্বান করিতেছে। ভাবিয়া সে মাগী পুরুষদিগের দলে ঢুকিল, এবং জাতীয়-স্বভাবসুলভ সৌজন্যসহকারে তাহাদের সহিত ( শত্রু হইলেও ) কথা কহিতে লাগিল। বলিল, "শুদ্ধ আমায় পূজা করিলে কি হইবে ? তোমরা প্রসবের ভার গ্রহণ করো, আমরা সন্ধি করি।"

দূর হইতে মিস্ হরিমতী দেখিল, একটা মার্সলানী পুরুষের দলে ঢুকিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সদলবলে আসিয়া অগ্রেই বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া সে হতভাগিনীর শিরশ্ছেদ করিল। তখন পুরুষগণ 'রক্ষা করো রক্ষা করো' বলিয়া হরিমতীর পায়ে জড়াইয়া পড়িল। হরিমতী বলিল, "পাপিষ্ঠ-গণ, এখনো আমাদের সাম্য দিতে রাজি নহিস্, এখনো প্রসবের কষ্ট আমাদের দিতে চাস্. আবার পায়ে পড়িলে দয়া করিব ?"— যেমন এই কথা বলা, তেমনি অসি-আস্ফালন। শত শত পুরুষ সে অসির প্রচণ্ড আঘাতে শমনসদনে প্রেরিত হইল। অবশিষ্টগণ প্রাণ লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া পানামা যোজক পার হইয়া পড়িল। হরিমতীও ছাড়িবার পাত্র নহেন, সমস্ত দল সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ ধাবমানা। স্ত্রীসৈন্য পানামা পঁহুছিয়া দেখিল, খোজারা পথ আটকাইয়াছে। তাহারা কনস্টান্টি-

নোপলে বসিয়া দেখিল, সব স্ত্রী-পুরুষ লড়াই করিতে চলিয়া গেল. তাহারা নিরাশ্রয় ভাবিয়া নৌকা ও জাহাজ চড়িয়া পৃথিবীময় খুঁজিয়া বেড়াইল। শেষ পানামা যোজকে আজ বিজয়িনী হরিমতীর সাক্ষাৎ পাইল। উহারা সমস্ত অবগত হইয়া হরিমতীকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিল। সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া হরিমতী একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। খোজারা সুলতানের বালাখানার তৈয়ারি বিন্দু বিন্দু তৈল দিয়া হরিমতীর লাঙ্গুলে স্থূলত্ব সম্পাদন করিয়া দিল। তখন হরিমতী বলিল. "আচ্ছা, তোমাদের অনুরোধে ৫০বৎসরের জন্য Truce করিব। বিষুবরেখার উত্তরে পুরুষ আর দক্ষিণে মেয়েমানুষ থাকিবে। মধ্যে বিষুবরেখায় খোজারা গার্ড থাকিবে। কোনো পুরুষ কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে আসিলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।"

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কি সর্বনাশ !! ৫০বৎসর স্ত্রী পুরুষে মুখ দেখাদেখি থাকিবে না !— আমার বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল। স্বপ্ন না সত্য ? বিবেচনা করিয়া দেখিলাম স্বপ্ন। সত্য নয় স্বপ্ন বটে। প্রাণ একটু স্থির হইল। কতক্ষণ পরে আবার ঘুম আসিল। আবার স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, ৫০বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, খোজারা সব মরিয়া গিয়াছে, কেবল জন-আষ্টেক স্ত্রীলোক আর জন-সাতেক পুরুষ আছে— পৃথিবী বনে পূর্ণ হইয়াছে, একমাত্র হরিমতী অশ্বারোহণে বিষুবরেখায় ঘুরিয়া গার্ড দিতেছে। ঘুম ভাঙিল। প্রলয় আর কাহাকে বলে ? রমণীকুল কোমলা অবলা সরলা কুলবালা বটে, কিন্তু বিশ্বাস নাই— একটু এদিক ওদিক হইলেই প্রলয় সেই মুহূর্তে। কেমন করিয়া সে প্রলয় সংঘটিত করিয়া থাকেন তাহাও সেদিন স্বপ্নাবস্থায় দেখিলাম। তার পর জাগ্রতাবস্থায়ও অনেক দিন অনেক গৃহে সে প্রলয়ংকরী রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়াছি। দেখিয়া জ্ঞান হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণ গেলেও আর-কখনো খোঁপাধারিণীর অবাধ্য হইব না। পাঠকবর্গও সাবধান !

'কল্পনা'
প্রথম বর্ষ, ১২৮৭-৮৮ ॥

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. ইংরেজ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ্ John Stuart Mill (১৮০৬-৭৩ খৃ.) বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি নারীর ভোটাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত Womens' Suffrage Society-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই এ-বিষয়ে পার্লামেন্টে প্রথম আবেদন পেশ করেন। তাঁর *Subjection of Women* গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে।

২. নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (?-১২৯২ বঙ্গাব্দ) স্মৃতিশাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। রচিত বই : 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়'। দ্র. ব-সং-অ-জী. পৃ ২৭৯।

৩. স্মার্ত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি (?-১৮৭৮ খৃ.) সংস্কৃত কলেজে ১৮৪০-৭২ খৃ. পর্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। সম্পাদিত বই : 'দায়ভাগ', 'দত্তকমীমাংসা', 'দত্তকচন্দ্রিকা', 'মনুসংহিতা', 'দত্তক শিরোমণি', 'স্মৃতিচন্দ্রিকা', 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি' প্রভৃতি। রচিত বই : 'বিষ্ণ্বাদিশতক'।

৪. মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১২৪২-১৩১২ বঙ্গাব্দ) ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক রূপে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন এবং ১৮৭৬-৯৫ খৃ. পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত বই : 'কাব্যপ্রকাশ'-এর টীকা, 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলির তাৎপর্য-বিবরণ' টিপ্পনী, সায়নভাষ্যসহ 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড এবং শবরভাষ্য সহ 'মীমাংসাদর্শন'— ইত্যাদি।

৫. কলকাতায় ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভা সর্বভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির উদ্যোগে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে ভারতসভা রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

বিশেষভাবে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে ভারতসভা প্রধান উদ্যোগী ছিল।

৬. William Ewart Gladstone (১৮০৯-৯৮ খৃ.)। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ্, উদারনৈতিক দলের নেতা। ১৮৬৮-৭৪, ১৮৮০-৮৫, ১৮৮৬ এবং ১৮৯২-৯৪—চার বার প্রধানমন্ত্রী হন। এখানে হরপ্রসাদ গ্লাডস্টোনের বাগ্মিতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৭. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ খৃ.) ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে ১৮৭১ খৃস্টাব্দে সিলেটের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। সরকারী চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর অধ্যাপনা শুরু করেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন।

৮. Otto von Bismarck (১৮১৫-৯৮ খৃ.) জর্মন রাষ্ট্রনায়ক, জর্মন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

৯. অনুবাদ : তরুণ চন্দ্রের খণ্ড ধারণকারিণী শুভ্রকান্তি।

১০. অনুবাদ : হে কামদেবের আম্রমুকুল-শর-স্বরূপিনি কর্ণ পর্যন্ত আয়ত দীর্ঘলোচনে!

১১. অনুবাদ : যেখানে রূপ সেখানে গুণ বাস করে।

দুর্গাপূজা বাঙালির মহা-মহোৎসব। এখনো খাঁটি হিন্দুর ঘরে পূজা দেখিলে মনে ভক্তির উদয় হয়। আরতির সময় পুরোহিত ঠাকুর প্রথমে পঞ্চ-প্রদীপ লইয়া পরে পাণিশঙ্খ লইয়া, তার পর কাপড় লইয়া, নির্মাল্য লইয়া, তার পর কর্পূরের আলো, ধুনুচি লইয়া দেবীর আরতি করিতেছেন, তাঁহার চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে। ধূপ ও ধুনার ধোঁয়ায় প্রকাণ্ড দালান অন্ধকার। কর্তা চামর ঢুলাইতেছেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দাস-দাসী, প্রতিবেশীতে দরদালান ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে উঠানে লোকে লোকারণ্য; তাহার মাঝে ঢুলিরা মাথা চালিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইতেছে; সকলের উপর চড়িয়া সানাই বাজিতেছে।

শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা তো আছেই। কর্তা এক-একবার উচ্চৈঃস্বরে মা— মা —বলিয়া ডাকিতেছেন ; সে স্বর তাঁহার নাভি-কমণ্ডলু হইতে হৃদয়ের মর্মস্থল স্পর্শ করিয়া উঠিতেছে। সে স্বরে সকলেরই মন ভক্তিতে গলিয়া যাইতেছে। গৃহিণী ও তাঁহার কন্যারা, পাড়ার আর-আর স্ত্রীলোকদের লইয়া, একপাশে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। ক্রমে গৃহিণী পুরোহিতের নিকটে আসিলেন ও আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন। পুরোহিত তাঁহার মাথার উপরে আগুনের সরা বসাইয়া দিলেন ও ক্রমাগত ধুনা দিতে লাগিলেন। আবার ধুনার ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল। কন্যা বা পুত্রবধূ আসিলেন। তিনি কর্পূরের সরা মাথায় তুলিয়া লইলেন, পুরোহিত ঠাকুর সেটি জ্বালাইয়া দিলেন। যতক্ষণ সে কর্পূর না নিভিল, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। আরতি শেষ হইল : ঢাক-ঢোলের বাদ্য থামিল : সকলেই মাটিতে লুটাইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন এবং দেবীর প্রণামের মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এক এক করিয়া সকলেই উঠিল, কর্তার মন্ত্রও শেষ হয় না, প্রণামও শেষ হয় না, তিনি উঠেনও না। তাঁহার যেন ভাব লাগিয়াছে। অনেক পরে তিনি উঠিলেন। আরতির পর্ব শেষ হইল। এখন দেবীর বৈকালির আয়োজন।

এই যে আরতির মুহূর্ত, যে-মুহূর্তে যত লোক উপস্থিত, সকলেরই মনে অন্য কোনো চিন্তা নাই, কেবল মহামায়ার চিন্তা, আত্মহারা হইয়া —আত্ম-পর-জ্ঞান-শূন্য হইয়া— কল্পনার অতীত মহামায়াকে আত্ম-সমর্পণের মহামুহূর্ত— এ বড়ো গম্ভীর মুহূর্ত। এ-মুহূর্তে শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ঈর্ষা-দ্বেষ, অন্তত একদণ্ডের জন্যও, অন্তর্হিত হয়— এজন্য এ বড়ো মধুর মুহূর্ত। বৎসরে একদিনের জন্যও যদি এ-মুহূর্ত ফিরিয়া আসে, লোকে এক মুহূর্তের জন্যও, পৃথিবীতে স্বর্গসুখ অনুভব করে।

এক বছর, অষ্টমী পূজার রাত্রি, পর দিন সাতটার পূর্বেই সন্ধিপূজা করিতে হইবে। বাড়ির কর্তা সমস্ত দিন নিমন্ত্রিত ইতর ভদ্র সকলেরই আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানো-দাওয়ানো ইত্যাদিতে ক্লান্ত হইয়া, রাত্রি ১টার পর নিস্তব্ধ হইলে, সদর দরজাটি বন্ধ করিয়া সিঁড়ি দিয়া শুইবার ঘরে যাইতেছেন ; শুনিলেন দুই জনে কথাবার্তা করিতেছে, দুটিই স্ত্রীলোক। এত রাত্রিতে এ বাড়িতে কে কথাবার্তা কয়— জানিবার জন্য কর্তা নামিয়া আসিলেন : দেখিলেন দালানের এককোণে বসিয়া গৃহিণী স্বহস্তে কোষা-

কুষি, পুষ্পপাত্র, তাম্রকুণ্ড মাজিতেছেন। এ কাজটি আর-কাহারো মনে পড়ে নাই। কিছু পরেই সান্ধপূজার জন্য এ-সব চাই : তাই গৃহিণী নিজেই মাজাঘষা আরম্ভ করিয়াছেন, আর প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। কর্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও গিন্নি, কার সঙ্গে কথা কহিতেছ ?"

গিন্নি। কেন, জান না ? যাঁকে তুমি এত এরেবরে বাড়িতে আনিয়াছ ?

কর্তা। তিনি কে ?

গিন্নি। জান না ? ঐ দেখো ! দালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তুমি তো একবার দালানে উঠিলেও না। তাই আমি মাকে বলিতেছি যে তাঁর কাছে তো আমাদের সবই অপরাধ। তিনি যেন আমাদের সে সব অপরাধ না লয়েন। আর ক্ষমা ঘৃণা করিয়া তিনি যেন বছর বছর এমনই করিয়া আসেন।

কর্তা। ( একটু লজ্জিত হইয়া ) কি করি গিন্নি ? অনেকগুলি ভদ্রলোক পায়ের ধুলা দিয়াছিলেন। তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করাও তো আমার কাজ। তাতেই বড়ো ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে একবারও আসিতে পারি নাই।

গিন্নি। তুমি তো বাবু-ভাইদের লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু তুমি কি জান না কাঁকে তুমি বাড়িতে লইয়া আসিয়াছ ? তাঁর চেয়ে বড়ো কে আছে ? তুমি তাঁর দিকে একবার চাইলে না। বাবুদের লইয়াই মাতিয়া রাহলে ! উনি কি আর তোমার বাড়ি এমন করিয়া আসিবেন মনে করিয়াছ ?

কর্তা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী কিন্তু সারারাতটি কেবল মহামায়ার কাছেই এই কথাই বলিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের অপরাধ লইও না। আবার যেন এসো।"

আজ বিজয়া। প্রতিমা দালান হইতে উঠানে নামিয়াছেন। আজ আর পুরোহিত নাই ; বাজে লোক নাই ; শুদ্ধ বাড়ির মেয়েছেলে, ও নিতান্ত আত্মীয়স্বজনের মেয়েছেলে। পুরুষেরা উঠান ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গিন্নি নূতন কাপড় পরিয়া, বরণডালা মাথায়, উপস্থিত

হইলেন ; সঙ্গে মেয়ে, বৌ, বাড়ির আর-আর মেয়েছেলে। সকলে আসিয়া মাকে নমস্কার করিলেন। অধিবাসের যত জিনিস ছিল, গিন্নি সকলগুলিই এক এক করিয়া মায়ের মাথায় ছোঁয়াইয়া বরণডালায় রাখিতেছেন : এক-একবার ছোঁয়াইতেছেন আর তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতেছে। ক্রমে সব মেয়েদেরই চোখে জল আসিল। পুরুষেরাও আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্য সময় এ দুর্বলতা-টুকু যাঁহারা দেখাইতে চান না, এখন তাঁহাদের সে ভাব রহিল না। কারণ, এ শোকে লজ্জা নাই। বরণ আরম্ভ হইল। বিশ-ত্রিশ জন স্ত্রীলোক মহামায়াকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, একবার, দুই বার, তিন বার, ক্রমে সাত বার প্রদক্ষিণ হইল। তাহার পর সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন। পরে কর্তা এক পূর্ণপাত্র আনিয়া প্রতিমার সম্মুখ হইতে— গৃহিণী প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন— তাঁহার অঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন। গৃহিণী এই 'কনকাঞ্জলি' লইয়া সংবৎসর মায়ের শোক নিবারণ করিবেন।

এ সব তো হইয়া গেল। তাহার পর কিছু মিষ্টান্ন আসিল। গৃহিণী একটি মিষ্টান্ন লইয়া মায়ের মুখে দিলেন, আর-একটি মায়ের হাতে দিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়ানো হইল, ও পথের সম্বল স্বরূপ কিছু হাতেও দেওয়া হইল। ইহার পর বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল !!!

এই দুর্গোৎসবের ব্যাপারটা কি ? হৈমবতী বিবাহের পর মহাদেবের সঙ্গে কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। মেনকা ক্রমাগত গিরিরাজকে মেয়ে আনিবার জন্য জিদ করিতেছেন। শেষে, গিরিরাজ কৈলাসে লোক পাঠাইলেন, অনেক কষ্টে মহাদেব, পার্বতীকে তিন দিনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন, স্বীকার করিলেন। যে তিন দিন হৈমবতী গিরিরাজের বাড়িতে ছিলেন, সেই তিন দিন গিরিরাজপুরে মহা-মহোৎসব হইল। তাহার পর দশমীর দিন হৈমবতী পুনরায় কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। এখন বুঝিলেন, দুর্গোৎসবের ব্যাপারটি মেয়ে আনা ও মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার। কর্তা স্বয়ং গিরিরাজ, গৃহিণী স্বয়ং মেনকা, আর মহামায়া তাঁহাদের কন্যা। মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার যে দেখিয়াছে, যে ভুগিয়াছে, সেই 'বিজয়া'র অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। ভক্তরা বলেন, বিজয়ার সময় মহামায়ারও চোখের

কোণে জল দেখা যায়। ভালোবাসা তো শুধু বাপ-মায়ের নয়, মেয়েরও তো ভালোবাসা আছে। যখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই কাঁদিয়া আকুল, মহামায়া কি তা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়।

নদীতে হউক, পুষ্করিণীতে হউক, হ্রদে হউক, বিলে হউক, মায়ের বিসর্জন হইয়া গেল। জগৎকারণ যে মাটি, সেই মাটি হইতেই মহামায়ার মূর্তি গড়া হইয়াছিল, মাটিরই সাজসজ্জায় তাঁহাকে সাজানো হইয়াছিল। যিনিই মাটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই মাটির মূর্তিতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে সজীব করিয়াছিলেন, তাহাকে 'পরা শক্তি' করিয়াছিলেন, তাহাকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়াছিলেন— এখন তিনি আর নাই— যে মাটি সে আবার মাটিই হইয়া গেল, জলে মিশিয়া গেল। যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল, এ ব্যাপার সকলেই স্বচক্ষে দেখিল। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, আপন আপন ঘরে ফিরিল। যাহার দালানে দুর্গা আসিয়াছিলেন, তাহার কথা তো দূরে যাউক, দেশসুদ্ধ লোক দেখিতে লাগিল— সব শূন্য !! সবাই শূন্য মনে বাড়ি ফিরিল !!! তাহারা এতক্ষণ যে এক অমানুষ শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল, সে শক্তির আজ অন্তর্ধান হইয়াছে: তাই তাহাদের আবার আত্মীয়স্বজন মনে পড়িয়াছে— মনে পড়িয়াছে এ শক্তি ক্ষণকাল আমাদের নিকটে আসিলেও আমরা এ শক্তি হইতে ভিন্ন, এ শক্তির অনেক নীচে, এখন আমাদের যাহা আছে, যাহা লইয়া আমাদের ঘর করিতে হইবে, যাহা লইয়া আমাদের চিরদিন থাকিতে হইবে, তাহাদের সম্মান, সম্ভাষণ, পূজা করাই আমাদের আবশ্যক। তাই ছেলে আসিয়া বাপের পায়ে গড়াইয়া পড়িল, বাপ তাকে কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহার মস্তকের ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বড়ো ভাই তাহাকে কোল দিলেন। যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, সকলেই পরস্পর সম্মান ও সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। যিনি সকল সম্পর্কের অতীত, তিনি যতদিন উপস্থিত ছিলেন, ততদিন এ সকল পার্থিব সম্পর্ক তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আবার সে সম্পর্ক জাগিয়া নূতন হইয়া উঠিল। গৃহিণী শূন্য

দালানে আসিয়া সব শূন্যময় দেখিলেন, তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া তো আকুল। কর্তারও অবস্থা তাই। তবে তিনি পুরুষ। তিনি গৃহিণীকে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন, "ভয় কি ? মা আবার এক বৎসর পরে আসিবেন।" সেই আশায় বুক বাঁধিয়া, সকলে আবার সংসারধর্মে মন দিল।

'নারায়ণ'
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ ॥

১৮৭৯ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে মুসুরী গিয়া বাজারের পুবগায় একটি ছোটো দোতলা বাড়িতে আশ্রয় পাই। বাড়ির মালিক আমার আত্মীয় : সুতরাং সেখানে থাকার কোনো কষ্ট ছিল না। তাঁহাদের বাড়িতে দেখিলাম, সব পরিষ্কার ঝকৃঝকে তকৃতকে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা এত পরিষ্কার থাকো কেমন করিয়া ? তাঁহারা বলিলেন, না থাকিয়া করি কি ? ময়লা হইলেই পিসু হয়। ছারপোকার চেয়ে পিসু অনেক বেশি কষ্টকর। ছারপোকা মারিলে মরে, পিসুর গায়ে খোলা আছে, টিপিলে মরে না, আর তার কামড়ও খুব কঠিন। যে ঘরটিতে আমি থাকিতাম, তাহার পুব দিকে জানালা ছিল, খুলিলেই একটি খড়্,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

কত গভীর, বলা যায় না। তাহারো ওপারে ছোটো ছোটো পাহাড়ের সারি— এক সারি দু সারি। তারপর, তারপর, না কি, দূরে— অনেক দূরে, বরফের পাহাড় দেখা যায়। কিন্তু আকাশ হয় ধূম, নয় ধুলায় আচ্ছন্ন থাকায় দেখা যায় না। এখন আমার নিতান্ত ইচ্ছা— বরফের পাহাড় দেখি। বাড়ি বসিয়া দেখিতে পাইব বলিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা তো হইল না। আমি বড়োই দুঃখিত হইলাম এবং সকলকে আমার দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম। তাঁহারা বলিলেন, আচ্ছা, যদি সত্যই বরফের পাহাড় দেখিতে চাও, তবে চলো, একদিন ব্যনোগী টিব্বায় যাই। সেটা ১১ হাজার ফুট উঁচু। সেখানে এত ধূমও নাই, এত ধুলাও নাই। আর সেখানে বাঙালিদের একটা মস্ত কীর্তিও আছে।

শুনিয়া অবধি ব্যনোগী টিব্বায় যাইবার জন্য বড়োই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। একদিন রাত্রি ৪টার সময় উঠিয়া আমরা চারি-পাঁচ জন, কেহ ডাণ্ডিতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া যাত্রা করিলাম। সেই সকালে এক পেট যা হয় তাই খাইয়া লইলাম। আর যত খাইলাম, তাহার দ্বিগুণ খাবার সঙ্গে লইলাম। কারণ, পাহাড়ে হাঁটিলে ক্ষুধা খুব বেশি হয়। রাস্তায় কিছু পাওয়া যায় না। বাজারের উত্তম মুড়ার ঠিক পিছনে পুবের দিকে আমাদের বাড়ি, বাড়ি হইতে বাহির হইয়া একটি সাঁকো, সাঁকোর ঠিক সম্মুখেই মুসুরীর লাইব্রেরি। লাইব্রেরির পুব ধার দিয়া একটু গিয়াই আমাদিগকে একটা চড়াই উঠিতে হইল। চড়াইটা শতখানেক ফুট হইবে। তাহার পর একটা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া রাস্তা, রাস্তাটা বেশ চাটাল— বরাবর সমান। প্রায় ৭ মাইল চলিয়া গিয়াছে সোজা পশ্চিমমুখ। আমার মনটা খুব খুশি হইল— একেবারে পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া যাইতেছি। মুসুরীর সীমানা পার হইয়া আর বাড়ি-ঘর কিছুই নাই। পুবের দিকে খড্ আর পশ্চিমের দিকে একটা বেড়া। বেড়া গোলাপ গাছের। হলদে হলদে গোলাপ ফুল রাশি রাশি ফুটিয়া আছে, বেড়া কত মাইল, মনে নাই— তবে ২/৩ মাইল হইবে। বেড়ার ওধারে বাগান, তাহার অপর সীমা অনেক দূরে— অনেক নীচে। এই বেড়ায় ঘেরা বাগানটি শুনিলাম দেরাদুনের উইলিয়ম 'সাহেবের'। তাঁহার পূর্বপুরুষরা দিল্লীর শেষ বাদশা শাহ্ আলমের সময়

দিল্লী ও আগ্রা সুবার অনেক অংশ দখল করিয়া স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। এখন অনেকগুলি 'সাহেবই' ঐ দুই সুবায় ২/১০ লাখ টাকার জমি দখল করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে টমাস 'সাহেব' একজন, জর্জ 'সাহেব' একজন, হার্সে 'সাহেব' একজন, সমরু 'সাহেব' একজন। সমরুর স্ত্রী বেগম সমরু রীতিমতো রেজিমেণ্ট রাখিয়া নিজেই রাজত্ব করিতেন। আপনার সৈন্যসামন্ত সুদ্ধ সমস্ত রাজ্য বাড়ি-ঘর সমস্ত ইংরাজদের দিয়া গিয়াছেন। উইলিয়াম 'সাহেবের' পূর্বপুরুষও এইরূপ হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিতেন। ইংরাজরা দেরাদুন দখল করিলে সেখানেও তাঁহার পূর্বপুরুষরা বাড়ি-ঘর-দুয়ার বাগান সব করিয়াছিলেন। পাহাড়ের গায়ে যে প্রকাণ্ড বাগান, সেটি তাঁহার। আমাদের দেশের বাগান যেমন সমতল জমির উপর চারি দিকে ঘেরা, এ সেরূপ নহে। জমি বিষম ঢালু, বাগানটি যেন কাত হইয়া রহিয়াছে। বাগানের ভিতর শীতের দেশের সব রকম গাছ আছে। আখরোট, নাশপাতি, আলু-বোখারা, আঞ্জির, তিম্‌লা প্রভৃতি ফলের গাছ, বাঁচ্, বোঁরাশ, সর্‌লা, দেওদার ইত্যাদি বাহাদুরী কাঠের গাছ, নানা রকম লতা— কেহ বা গাছে জড়াইয়া আছে, কেহ বা জমিতে খেলিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ভূর্জপত্রের গাছ— পাখিতে ঠোকরাইয়া উপরকার ছালে গর্ত করিয়াছে, ভিতরকার ছাল টানিয়া বাহির করিয়াছে। এই ভিতরকার ছালের নামই ভূর্জপত্র। কতকটা বা গাছে লাগিয়া আছে, কতকটা বা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। আমরা বেড়ার বাহির হইতে বাগানের শোভা দেখিতেছি। আমরা বেড়ার বাহিরে রাস্তায়ই আছি। আমাদের দক্ষিণে কোনোরূপ বেড়া নাই, কিন্তু বিশেষ অসাবধান হইলে গড়াইয়া একেবারে ৩/৪ হাজার ফুট নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ততটা অসাবধান কিন্তু আমরা হই নাই। আমাদের রাস্তাটি— বাঁকা নয়, পায়ে চলা রাস্তা, মাঝে মাঝে উঁচু আছে। উঁচুর উপর ঘাসও জন্মিয়াছে। বাংলার মাঠে পায়ে চলা রাস্তা যেমন, ইহাও ঠিক তাই। কিন্তু রাস্তায় অনেক দেওদারের গাছ। দেওদারের গাছ— সর্‌লা গাছেরই মতো। দেওদারের গাছ আমি পূর্বে দেখি নাই— এই প্রথম। দুই-ই ঝাউজাতীয় গাছ— ইংরাজিতে ফার বলে। পাতা এক-একটি সরল রেখা। দুইয়ের পাতাই থোকা থোকা হয়। সর্‌লার রঙ সোনার মতো। দেওদারের রঙ কালো,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

কিন্তু কেলোর মতো গাঢ় নয়। কেলো এই জাতীয় গাছ। মুসুরীতে তখন দেখি নাই, সিমলায় অনেক আছে। সর্‌লা ৩০/৪০ ফুট না উঠিলে তাহার ডাল বাহির হয় না ; কিন্তু দেওদার দু-মানুষ-ভোর হইবার আগেই ডালে ভরিয়া যায়। সর্‌লার ডাল ফাঁক ফাঁক, কিন্তু দেওদারের ডাল ঘন ; সেইজন্য দেওদারের গাছের মাথায় ঝোপ ঝোপ বলিয়া বোধ হয়। সর্‌লার ঝোপ তো থাকেই না, বেশ তফাত তফাত— দেখিতে ঠিক ঝাড়ের মতো। বিজলি বাতির কল্যাণে আমাদের দেশের লোক সে কালের বেলোয়ারের ঝাড় ভুলিয়া গিয়াছে। বেলোয়ারের ঝাড়ের যেমন নীচে বড়ো বড়ো ডাল ও প্রত্যেক ডালের মাথায় ২/৩টি করিয়া বাতি। যত উপরে উঠিতে থাকিবে, ডালগুলি তত ছোটো হইয়া আসিবে ; কিন্তু বাতি নীচেও যে ক'টা, উপরেও সে ক'টা থাকিবে। আর সকলের উপর ডাল নাই। একটিমাত্র ফানুস, তাতে একটি বাতি। সমস্তটা দেখিতে ঠিক মোচার আগার মতো। সর্‌লা গাছও ঠিক তাই। ৩০/৪০ ফুটের উপর এক জায়গা হইতে বড়ো বড়ো ডাল বাহির হইল —প্রত্যেক ডাল হইতে কতকগুলি ফেঁক্‌ড়ি বাহির হইল, প্রত্যেক ফেঁক্‌ড়ির মাথায় এক গোছা করিয়া পাতা। পাতাগুলি লম্বা, সরু এবং রেখার আকার। সর্‌লার গাছকে অনেক জায়গায় ঝাড়ের গাছ বলে।

বেলা হইতে লাগিল— রৌদ্র উঠিল। আমরা দেবদারুর তলায় মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া রৌদ্রের হাত এড়াইতে লাগিলাম ও হাঁপ ছাড়িতে লাগিলাম। সমতল দেশে বাস, যেদিকে চাই, সমতল দেখিতে পাই, আমাদের পক্ষে সাড়ে ছ হাজার ফুট একটি পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া চলিয়া বেড়ানোই একটি আশ্চর্য জিনিস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা সমতল দেশের লোক, আমাদের চারিটা বৈ দিক নাই— উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। কিন্তু পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম, আর-দুইটা দিক বাহির হইল। উপর আর নীচে। আমরা এত উপরে উঠিয়াছি যে, আমাদের আর উপরে দিক নাই, কেবল নীচে দিক ; ডাইনেও নীচে, বাঁয়েও নীচে। উইলিয়াম 'সাহেবের' বাগান অনেক দূর ছাড়িয়া আসিয়াছি।

ক্রমে ক্রমে আমরা মুসুরীর পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া যে সাত মাইল পথ আসিবার কথা, তাহার শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

আমাদের নামিতে হইবে। নামিবার জন্য 'সাহেবরা' যে রাস্তা করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনেক জায়গায় ভাঙিয়া গিয়াছে; সুতরাং নামা বেশ কষ্ট ও বিপদের কথা হইয়াছে। পাহাড়ে নামার পথকে পাকডাণ্ডি বলে এবং এক ঢালুও নয়, এক গোড়েনও নয়। একবার খানিক গোড়েন ধরিয়া নামিয়া আসিলাম। এক জায়গায় দাঁড়াইলাম, আবার উল্টা দিকে গোড়েন ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। এইরূপ হয়তো ২শত ফুট চলিয়া মাত্র ২০ফুট নামিলাম। এখন মনে করুন, ৩ হাজার ফুট নামিতে হইলে কিরূপ পাক খাইতে হইবে। ইহার মধ্যে আবার যদি কোথাও পাথর বা পাথরের ঢিপি থাকে, কষ্ট আরো বাড়িয়া যাইবে। যতক্ষণ উপরে ছিলাম, ঢালুর অবস্থা এমনই ছিল যে, পা বেশ চলিতে পারে। যতই নীচে নামিতে লাগিলাম, ততই ঢালুর খাড়াই বাড়িতে লাগিল; নামা কষ্টকর হইতে লাগিল। যাহা হউক, সাড়ে আটটা নটার সময় আমরা যতদূর নামিবার নামিয়া আসিয়াছি, আর নামিতে হইবে না, সামনেই এক নদী। নদীতে এক বিন্দু জল নাই, কিন্তু তাহার খাতে কোনো গাছপালা, এমন কি, ঘাসও নাই। নদীর খোলা কত চটালো, কত গহেরা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

খাত পার হইয়াই আমাদিগকে উঠিতে হইল। ব্যনোগী টিব্বাটি শুনিয়াছি সমুদ্রের জল হইতে ১১ হাজার ফুট উঁচু। আমরা মুসুরীতে যেখানে ছিলাম, সেটা সাড়ে ছ হাজার, নামিয়াছি তিন হাজার; সুতরাং আমাদের এখনো আট হাজার ফুট উঠিতে হইবে। পাহাড়ে উঠায় তত ভয় নাই, একটু পরিশ্রম হয়, একটু শ্বাস লইতে হয়, একটু হাঁপ ছাড়িতে হয়; কিন্তু পড়িয়া মরিবার ভয় হয় না। নামিবার সময় মহা-মুশকিল; পরিশ্রম অত হয় না, হাঁপ ছাড়িতে হয় না, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এইবার পড়িয়া যাইব। হয় সামনে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইব, না-হয় পাশে একেবারে খডের ভিতর পড়িয়া যাইব।

ব্যনোগী টিব্বার গা দিয়া উপরে উঠিবার যে রাস্তাটি ছিল, সেটি বেশ ঢালু। আমরা স্বচ্ছন্দে উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে মেলা পাক খাইতে হয় না, কিন্তু তিন ভাগের দুই ভাগ উঠিয়া বড়োই বিপদে পড়িলাম। পাহাড়ের খানিক ধস ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রায় ২শত ফুট রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সেটুকু পার হওয়া যায় কি করিয়া?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

২শত ফুট বৈ তো নয়, সোজাসুজি চলিয়াই যাই। কিন্তু একটি পা দিয়াই দেখি, কেবল বজরী অর্থাৎ কুচো কুচো পাথর। পা দিলেই পা হড়কাইয়া যায়। একবার হড়কাইলে কোথায় যাইব, ঠিক নাই; কিন্তু ইহজগতে যে থাকিব না, সেটা ঠিক। সুতরাং পা-টি তুলিয়াই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। শেষ স্থির হইল, পাহাড়ের গায়ে যে ঘাস থাকে, সেগুলি খুব শক্ত, কিছুতেই ছিঁড়ে না, হাত দিয়া সেই ঘাসের মুটা ধরিয়া হয় হামাগুড়ি দিয়া, না-হয়, পায়ে চলিয়া, যেখানে ধস ভাঙিয়াছে, তাহার ৫০ ফুট উপর দিয়া এই দুই শত ফুট পার হইতে হইবে। সেই ভাবেই আমরা পার হইলাম। খুব উপরে গিয়া আর-এক বিপদ। সেখানে কেবল পাথর, তাহা কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারি হয় নাই। সেই পাথরের উপর দিয়া গিয়া আমরা কষ্টেসৃষ্টে ব্যানোগী টিব্বার মাথায় চড়িলাম। মাথাটি বিঘা-দুই জমি হইবে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, মাঝখানটা একটু নীচু, পুবে একটু বেশি উঁচু, পশ্চিমে একটু কম নীচু। পুবের উঁচু জায়গায় পূর্বে কয়েকখানি ঘর ছিল। ঘরগুলির দেয়াল পাথরের— বালি ধরানো— চুনকাম করা। ছাদ ছিল টিনের— উড়িয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর যে যখন আসিয়াছে, কয়লা দিয়া নাম লিখিয়া গিয়াছে। অনেক নাম লেখা আছে। আমরাও আমাদের নাম কয়লা দিয়া লিখিয়া রাখিলাম।

শুনিলাম, এই ঘরগুলি রাধানাথ শিকদার[১] মহাশয়ের তারা-ঘর (Observatory) ছিল। তিনি এইখানে অনেক দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রথম আমলের হিন্দু কলেজে যে সকল ছাত্র অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার সকলের চেয়ে বড়ো। তিনি প্রথম হইতেই সার্ভেয়ার জেনারেল আফিসে ঢুকিয়াছিলেন এবং খুব উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার বেতন ৮ শত টাকা হইয়াছিল। তখনকার কালে ৮ শত টাকা বেতন— বিশেষ বাঙালির পক্ষে খুব বড়ো মাহিনা। রাধানাথ শিকদার জরিপের এক নূতন রীতি বাহির করিয়াছিলেন। তাহা অনেক দিন তাঁহার নামে চলিয়াছিল, এখন অনেক হাত বদল হইয়া তাহা রেট্রেসেস্ মেথড হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একটু সুস্থ হইয়া, একটু জল মুখে দিয়া, ছায়ায় বসিয়া চারি দিকে

যাহা দেখিলাম— তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা বোধ হয় মানুষের নাই। বেলা তখন ১২টা। উত্তর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, বরফের পাহাড় দূরে, কিন্তু বোধ হইতে লাগিল নিকটে। উত্তর-পশ্চিম কোণে কুলুর পাহাড় —সব বরফ; কিন্তু শীতকাল হইলে যেমন রাশীকৃত বরফ হয়, একেবারে ফাঁক থাকে না, এ সে রকম নহে। অনেক জায়গাই ফাঁক হইয়া গিয়াছে— বরফ গলিয়া গিয়াছে— অথবা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে বরফ আছে, সেখানে সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে; আর যেখানে নাই, সেখানে একবারে অন্ধকার। হয়তো আবার একটু পাশেই সামান্য বরফের উপর একটু সূর্যকিরণ পড়িয়াছে মাত্র, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। উত্তর-পূর্বে ধবলাগিরি। তত গ্রীষ্মকালেও বরফের রাশি ত্রিভুজাকারে আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। কিন্তু অনেক দূর একটু ম্লান বোধ হইতেছে। সংস্কৃত কবিরা যে বলেন, রাজাদের বাড়িগুলা মেঘ ভেদ করিয়া উঠে, মেঘ চাটে— ধবলাগিরি দেখিলে একটু একটু তাহার মর্ম বুঝা যায়। ধবলাগিরির শিখর মেঘরাজ্যেরও উপরে— তিনি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছেন। কুলুর পাহাড় হইতে ধবলাগিরি পর্যন্ত যে সকল ছোটো ছোটো পাহাড় আছে, তাহাতে কত বিচিত্র বিচিত্র রঙই যে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহারা ধবলাগিরি বা কুলুর পাহাড়ের মতো উচ্চও নহে, প্রকাণ্ডও নহে এবং মাথা ঘুরাইয়া দিবার মতো নহে। একটি জিনিস কিন্তু সর্বত্রই আছে। শোভাটা সব জায়গাই আছে, আর সে শোভা অত্যন্ত মনোলোভা। আর-একটি জিনিস রঙের বাহার। কোথাও সাদার উপর লালের আভা, কোথাও লালের উপর সাদার আভা। কোথাও আভাটা ঘন, কোথাও ফিকে, কোথাও চক্‌চকে, আবার কোথাও ম্যাড়্‌মেড়ে। আমার কাছে অতি চমৎকারই বোধ হইল। কারণ, আমি ঐ দেখিতেই গিয়াছিলাম এবং এতদিন দেখিতে পাই নাই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও— আর সময় নাই, অল্পসময়ের মধ্যে চারি দিক দেখিয়া লইতে হইবে, তাই উত্তর দিক হইতে চক্ষু ফিরাইলাম। পূর্ব দিকে চাহিয়া দেখি, মুসুরী, ল্যাণ্ডর প্রভৃতি পাহাড় হইতে আমরা অনেক উঁচুতে। মুসুরীর সকলের উঁচু যে শিখর— নাম লালটিব্বা, সেটিও

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

একটি ছোটো ঢিপি বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পূর্ব দিকে চক্ষু ফিরাইবার পূর্বে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি ও বরফের মধ্যে পাহাড় যেখানে আছে, ইহার মধ্যে অগণ্য ছোটো ছোটো পাহাড়ের সারি— অনেক নীচে বোধ হইতে লাগিল, যেন লাঙলের ফাল দিয়া জমিটা চষিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়গুলা উঁচু মাটি আর নদীগুলা লাঙলের ফালের দাগ। অথবা যেন সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা লম্বালম্বি দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ফাটিতেছে না, ফেনা হইতেছে না। এই যে ঢেউ-খেলানো জমি, ইহার নাম গাড়ওয়াল। এখানে গ্রাম আছে, নগর আছে, বাজার আছে, হাট আছে, মাঠ আছে, বাট আছে, এখানেও খাজনা আদায় হয়, গোমস্তারা খাজনা আদায় করে। খেরে টাকা আদায় না করিতে পারিলে তারা হাজতে যায়।

পুবের দিকে পাহাড়গুলো উঁচু উঁচু— ঠিক যেন নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। কেবল চূড়ার উপর চূড়া। এখানেও গ্রাম নগর সবই আছে। যেখানে সরলা ও দেবদারুর বন আছে, সেগুলি দেখিতে বড়োই সুন্দর। একটা একটা গাছই দেখিতে কত সুন্দর! যেখানে ঝাঁক বাঁধিয়া ঐ সব গাছ হইয়াছে, সেখানে আরো সুন্দর। আবার যেখানে পর্বতের গায়ে হইয়াছে, ক্রমে উপর হইতে নীচে নামিতেছে, সেখানে তো একেবারে চমৎকার! আমায় এইরূপ একটি সরলার বনে দিনকতক বাস করিতে হইয়াছিল। একটা ছুরি বা পেরেক দিয়া সরলার গাছে একটি লম্বালম্বি দাগ দিলেই উহা হইতে এক রকম রস বাহির হইত এবং তাহার গন্ধে বাড়িটা তর্ হইয়া উঠিত। ঐ পাতলা রসই ঘন হইয়া গন্ধবিরজা হয় এবং বাজারে বিক্রয় হয়।

পুব দিকেও যেমন দেখিলাম, পশ্চিমেও তেমনই পর্বতের পর পর্বত বরাবর পঞ্জাব পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ দিক অতি সুন্দর। নিকটেই মুসুরীর সারি সারি পাহাড়— সাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচু। এই সব পাহাড়ের আড়াল হওয়ায় দেরাদুনটা আমরা দেখিতে পাইলাম না, শিবালিক পর্বতও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু শিবালিকের দক্ষিণ দিকে বরাবর ধূ ধূ করিতেছে। দেরাদুন হইতে ৫৩ মাইল সাহারানপুর। সাহারানপুর বেশ দেখা যাইতে লাগিল। রেলগাড়িগুলি পিঁপড়ের সারির মতো পুব দিক হইতে আসিয়া উইয়ের ঢিপির মতো একটি স্টেশনে

থামিল— খানিক থামিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। চোখ টানিয়া টানিয়া আরো দূরে— আরো দূরে দেখিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ একটা আলো চোখে লাগিল। তত দূর হইতে কিসের আলো আসে, আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। একজন জরিপ মহালের লোক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিলেন, দিল্লীর জুম্মা মসজেদের সার্সির উপর সূর্যের আলো পড়িয়াছে, তাই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বিশ্বাস হইল না, কিন্তু মনে করিলাম, হবেও বা।

আমরা এইরূপে পর্বতের শোভা দেখিতে নিমগ্ন আছি' এমন সময় আমাদের এক ঘোর শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চিম দিক হইতে হাওয়া উঠিল। অত উপরে হাওয়া, বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসিল— ধূম ও ধুলা। পাহাড়ে ধুন্ধুলা বলে। পূর্বেই বলিয়াছি, পাহাড়ে ছটা দিক আছে— সব দিকই ধুন্ধুলায় ভরিয়া গেল। এতক্ষণ একতানমনপ্রাণে যাহা দেখিতেছিলাম, তাহার আর-কিছুই দেখা গেল না। আমরা বিষাদে মগ্ন হইয়া গেলাম। ধুন্ধুলা শীঘ্র ছাড়িবে না বুঝিয়া নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নামিবার সময় অত হাঁপও লাগে না, পরিশ্রমও হয় না, আর ঘামও বাহির হয় না। যেখানে কোনো বিপদ নাই, সেই রকম জায়গায় গা ছাড়িয়া দিলেই হয়, আপনিই নামিয়া আসে। যেখানে বিপদ আছে, সেখানে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতে হয়। কারণ, গড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশি। যখনকার কথা বলিতেছি, সে সময়ে একরকম লাঠি পাওয়া যাইত, তাহার সবটাই খুব শক্ত একরকম বাঁশের আর নীচে একরকম ছুঁচালো লোহা খুব শক্ত করিয়া আঁটা। সে লাঠি হাতে থাকিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম হইত ; কিন্তু এখন সে লাঠি আর পাওয়া যায় না ; তিনি আর্‌ম্‌স্ অ্যাক্‌টে পড়িয়া চম্পট দিয়াছেন।

আমরা নামিতে লাগিলাম। যেখানে ধস ভাঙিয়াছিল, উঠিবার সময় যেখানে খুব কষ্ট পাইয়াছিলাম, সেইখানে প্রাণ হাতে করিয়া নামিলাম। ক্রমে ক্রমে আসিয়া নীচের নদীতে উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় বলিতে ভুলিয়াছিলাম, নদীর ঠিক মাঝখানে একটি মোচার আকার পাহাড় আছে, তাহা ৩০/৪০ ফুট উঁচু হইবে। তাহার মাথায় একটি আখরোট গাছ। আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দুই হাজার ফুটের

উপরে উঠিয়া মুসুরীর রাস্তা পাইলাম আর বাড়ির দিকে যাইতে লাগিলাম। সেই সরলার গাছ, সেই দেওদারের গাছ, সেই উইলিয়াম 'সাহেবের' বাগানের বেড়া, সেই মুসুরীর লাইব্রেরি, সেই লাইব্রেরির সামনে সাঁকো। তারপর মুসুরীর বাজার, বাজারের পিছনে আমাদের বাটী। রাত্রি ৯টা হইয়াছিল, কিন্তু বেশ চাঁদিনীর আলো ছিল। রাস্তায়ও অন্ধকার হয় নাই, বাটীতেও অন্ধকার হয় নাই, কিন্তু রাত চারিটা হইতে যুঝিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

'বার্ষিক বসুমতী'
১৩৩৪ ॥

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রাধানাথ শিকদার ( ১৮১৩-৭০ খৃ. ) হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১ খৃঃ) তত্ত্বাবধানে সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গ্রীক ও লাতিন ভাষা ভালো জানতেন। অন্যদিকে গণিত ও বিজ্ঞানে তিনি শিক্ষা পান ডি. রস ও ডক্টর টাইট্‌লার-এর কাছে। 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' বা ভারতীয় জরিপ বিভাগে কর্নেল জর্জ এভারেস্ট-এর অধীনে সার্ভেয়ার হিশাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। এই বিভাগে চীফ-কম্পিউটর পদে কাজ করার সময়ে ১৮৫২ খৃস্টাব্দে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়-চূড়া এভারেস্ট চিহ্নিত করা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। ১৮৫২-র শেষ দিকে তিনি জরিপ বিভাগের পদের সঙ্গে আলিপুর অবজারভেটরির সুপারিন্‌-টেন্‌ডেন্‌ট পদে নিযুক্ত হন। তাঁর লেখা *Auxiliary Tables* ( ১৮৫১ খৃ. ) এবং *The Manual of Surveying* ( ১৮৫১ খৃ. ) বইয়ের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত অংশটিতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক রূপে তিনি চলিতভাষায় "সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পড়ার উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' ( ১৮৫৪ খৃ. ) নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটির সহকারী সভাপতি এবং শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আমি মুসুরীতে যাই। তাহার পূর্বে কখনো ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে যাই নাই। ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে মানুষ কি রকম করিয়া থাকে, তাহা জানিতাম না। মুসুরী ঠিক ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে নয়। সেখানে আইন-কানুন ইংরাজেরই চলে। আদালত কাছারিও ইংরাজের। কেবল ইংরাজ মুসুরী ও ল্যাণ্ডরে যত একর জমি দখল করেন, তাহার প্রত্যেক একরে গাঢ়ওয়ালের রাজাকে এক আনা করিয়া খাজনা দেন। জমি দখল করিবার সময় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন কি না, জানি না; তবে কয়েক বৎসর অন্তর এক-একবার উভয় পক্ষ থাকিয়া, ইংরাজ কত জমি দখল করিয়াছেন, তাহা জরিপ করা হয়

এবং সেই জরিপের উপর জমাবন্দি হয়। রাজা মুসুরীতে কোনো বাড়ি, ঘরদুয়ার নূতন করিয়া কিনিতে পারেন না। তাঁহার যে পুরানো বাড়িঘর আছে, তাহার হাতায় গাছপালাও কাটিতে পারেন না। সুতরাং মুসুরী ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে নহে।

আমি যখন বাজারের কোলে পরিষ্কার কামরাটিতে বসিয়া জানালা খুলিয়া পুবের দিকে দেখিতাম, আমার ইচ্ছা হইত, একবার নিকটবর্তী কোনো গ্রামে যাই। শুনিলাম, অতি নিকটেই ঝিন্সী বলিয়া একটি গ্রাম আছে। বাঙালি বাবুদের দুধ সেই গ্রাম হইতে আইসে ; তরিতরকারিও অনেক আইসে ; চাকরবাকরও আইসে। আমার বন্ধুবান্ধবরা ঝিন্সীর অনেককেই চিনেন ; কিন্তু কখনো ঝিন্সী যান নাই। তাঁহারা অনেকেই আমার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন। দুপুরের পর সব এক-একগাছি লোহার ছুঁচওয়ালা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। বাজারের উত্তর অংশে আমরা থাকি, উহার দক্ষিণ অংশে নামিবার পথ। পথে খাড়াই বড়ো বেশি। পাশ দিয়া নালা চলিয়া গিয়াছে। সেই নালাই অনেক নীচে গিয়া নদী হইয়া গিয়াছে। একে তো খাড়াই রাস্তা, পাশেই নালা, তাহার পর আমরা নামিতেছি, প্রতি মুহূর্তেই পড়িয়া যাইবার ভয়। লাঠিতে কিন্তু আমাদের খুব সাহায্য করিতেছে। ছোটো নালাটি যে কত বার পার হইতে হইল, বলিতে পারি না। কিন্তু নালার মাঝখানে লাঠির মুখটি পুঁতিয়া দিয়া তাহার উপর ভর দিয়া আমরা লাফাইয়া নালা পার হইতেছি। যেখানে বড়ো গোড়েন— পা পিছলাইয়া যায়, সেখানেও লাঠি আমাদের সহায়। অনেক জায়গায় পাকডাণ্ডিতে নামিতে হইতেছে। ৪০ফুট নামিতে চার-পাঁচ বার পাক খাইয়া প্রায় আড়াই শত তিন শত ফুট হাঁটিতে হইতেছে। পাঁচ-সাতশো ফুট নামিয়া আমরা একটু গোলপানা সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঠিক সমতল নয়, খুব খাড়াইও নয়, সহজে গোড়েন জায়গা। এই জায়গাকেই সংস্কৃতে সানু অথবা নিতম্ব বলে। সেখানে দেখি, একরকম ছোটো ছোটো গাছ, তাহাতে বিস্তর ছোটো ছোটো ফল ধরিয়াছে। ফলগুলি খুদে লঙ্কার মতো। সকলে বলিল, ব্ল্যাকবেরি এবং সকলেই ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। ফল অম্লমধুর। সকলেই ২/৪ মুঠা খাইল। তাহার পর আবার নামিতে লাগিলাম। এবার

গোড়েন তত বেশি নয়. আর পড়িয়া যাইবার ভয় নাই ; লাঠি ব্যবহারও তত হইল না। অনেক নীচে এবং দূরে একটা ঘর দেখা গেল। পাথরের গাঁথনি, শ্লেট পাথরের ছাওয়া। চার-চালা ঘর। আর নামিয়া আসিয়া দেখা গেল, একটি স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। রঙ খুব ফরসা, তাহার উপর সূর্যের কিরণ মুখে পড়িয়াছে, ঠিক যেন একখানি জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা বলিয়া মনে হইল। আরো খানিক নামিয়া দেখি, আমাদের পথ সেই ঘরের পাশ দিয়া। ঘরে কতকগুলি গোরু আছে। মেয়েটি সেই গোরুগুলি চরাইতেছে। বুঝিলাম, এইসব গোয়াল হইতেই আমাদের দুধ যায়। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এখান হইতে ঝিন্সী কত দূর ? সে বলিল, চলো, আমিও ঝিন্সী যাইতেছি। সে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। দেখিলাম, তাহার রঙ ফরসা হইলেও তাহার নাকটি খাঁদা। গায়ে ইংরাজের ছাড়া মখমলের জামা, অত্যন্ত ময়লা। পরা একটি ঘাগ্‌রা, সে-ও বড়ো ময়লা। মাথায় একটি খোঁপা আছে। খোঁপা যে শৌখিন করিয়া বাঁধা, তাহা নহে, কিন্তু সে খোঁপাতেও ২/৪টি করিয়া ফুল গোঁজা আছে।

আমরা যে রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম, তাহা পায়ে চলা রাস্তা। খানিকটা নামিতেছি— আবার খানিকটা সমতলের উপর দিয়া যাইতেছি। আবার নামিতেছি, আবার খানিক সমতলের উপর দিয়া যাইতেছি। এইরূপ ভাবে অনেক নামিয়া, অনেক ঘুরিয়া ঝিন্সীর কাছে আসিলাম। উপর হইতে দেখিতে পাইলাম, নীচে ঐ ঝিন্সী। আরো নামিলাম, আরো উঠিলাম, কিন্তু সে পথ অত্যন্ত ময়লা। মাঝে চাষবাসও আছে। ঐ যে ঢালু জমি, উহার মাঝে মাঝে খুঁড়িয়া পাথর বাহির করিয়া এক হাত দেড় হাত উঁচু প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। সে প্রাচীরের ভিতর দিকের জমি বিশ-পঁচিশ হাত চাটাল আয়নার মতো করিয়া সমান করা হইয়াছে ও তাহাতে নানা রকম ফসল হইয়াছে। প্রাচীরের বাহিরের জমিও আবার ঐরূপ সমান করিয়াছে ও তাহার সামনে প্রাচীর দিয়াছে। এইরূপ প্রাচীর দেওয়া ও সমতল করা ২০/২৫টা খেত নামিয়া আমরা ঝিন্সীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মেয়েটি অগ্রদূতী হইয়া গাঁয়ে খবর দিতে গেল যে, বাবুরা আসিতেছে।

গাঁয়ের চারি পাশে দেখিলাম— ময়লাই বেশি। ২/৫টা গাছপালাও

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

আছে, জায়গায় জায়গায় একটু বাগান করার চেষ্টাও হইয়াছে। গাছের মধ্যে আখরোট, আলুবোখারা, নাশপাতি এবং আর-আর শীতের দেশের ফলের গাছ।

মুসুরী থেকে বাবুরা এসেছে শুনে গাঁয়ের লোক সব এসে জমা হল। ছেলে, মেয়ে, বুড়া, যুবা, বুড়ী, আধাবয়সী সব এল। কারো কোনোরূপ সংকোচ নাই। বুঝিলাম, ইহারা জানানার ধার ধারে না।

গ্রামে দেখিলাম, দুইখানি ঘর, মাঝখানে একটি উঠান। ঘর বলিলাম, তাহাতে বোধ হয় গ্রামের অবস্থা বুঝিতে পারা গেল না। ঘর দুইটি খুব লম্বা ২/৩ শত ফুট হইবে; চাটাল প্রায় ৩০ ফুট। লম্বায় তিনটি প্রাচীর আছে; পাশের দুটি প্রায় ২০ ফুট উচ্চ হইবে; মাঝেরটি আরো ৫/৭ ফুট বেশি। বাতি শালের রোয়া, তাহার উপর শ্লেট-পাথরের ছাউনি। আড়ে দুই ধারের দুইটি প্রাচীর বাহির হইতে দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে অনেক প্রাচীর আছে। এক-একটা ঘরে ২০/৩০টা করিয়া কামরা এবং সকল ঘরই দোতলা। ঘরগুলি খুব অন্ধকার। বাহির দিকে একটি করিয়া দুয়ার, জানালা নাই। উপরের ঘরে কিন্তু জানালা আছে। নীচে যেখানে দরজা, উপরে সেখানে জানালা; কিন্তু জানালা বড়ো ছোটো। বুঝিলাম, ইহারা ঘরে বড়ো একটা থাকে না। শীতের রাত্রিতে ঘরে শোয় আর-সব সময় বাহিরে থাকে। ঘরে আপনাদের জিনিসপত্তর রাখে।

উপরে বলিয়াছি যে, গ্রামে দুইটি বৈ ঘর নাই; কিন্তু এই দুইটি ঘরে অন্তত একশতটি পরিবার বাস করে। দূরে দেখিলাম, একটি ঘরট্ট রহিয়াছে। ঝরনার জলের তোড়ে জাঁতা ঘুরিতেছে। যাহার যখন ইচ্ছা গম পিষিয়া লয়। শুনিলাম, আরো নীচে ও দূরে একটি দেবীর মন্দির আছে। দুইটি ঘরের মাঝে যে উঠানটি আছে, সেটি গ্রামের শ্রী। উঠানটি পাথরের; উহার দুইটি ধাপ; দুইটিই যত্ন করিয়া পাথর কাটিয়া সমতল করা হইয়াছে। এইখানেই তাহারা ফসল আনিয়া ঝাড়ে, বাছে, আর এইখানেই তাহারা সমস্ত দিন থাকে।

গাঁয়ের লোক উপরের উঠানে একখানি পুরাতন গুনচট আনিয়া বিছাইয়া দিল এবং আদর করিয়া আমাদিগকে তাহার উপর বসিতে বলিল। বাবুরা ২/১ জন নাক সিঁটকাইলেন। কারণ, একে গুনচট,

তার উপর ময়লা ; কিন্তু সকলেই বসিলেন। কেননা, সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুক্ষণ শিষ্টাচারের পর ছেলেরা নাচিতে আরম্ভ করিল। সাহেবদের ও বাবুদের ছেলেদের ছেঁড়া প্যান্টুলন, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া টুপি— এই সকল পরিয়া ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যখন দলে দলে আসিল, আমরা আশ্চর্য হইয়া গেলাম। ছেলেগুলির রঙ খুব ফরসা, কালো খুব কমই আছে। এমন-কি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও কম। সকলেই যেন ফুট্ গৌরবর্ণ। তাহার পর জামা যাহা গায়ে দিয়া আসিয়াছে, ছেঁড়া হউক, কিন্তু তাহার একটা রঙ আছে। সে রঙে উহাদের গায়ের রঙ আরো বেশি খোলতাই হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। ছেলেদের মধ্যে একটিও রোগা বা শুষ্ক নাই ; উহাদের স্বাস্থ্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। এক বুড়া ঢোলক বাজাইতে লাগিল ও ছেলেরা নাচিতে লাগিল। তাহারা বেশ স্ফূর্তি করিয়া নাচিতে লাগিল ; বাজনার সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে কেহ বিরক্ত হইল না। আমরা মাঝে মাঝে হাততালি দিতে লাগিলাম ; তাহাতে তাহাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে তাহারা কখনো আগু বাড়াইয়া আসিতেছে, কখনো পিছু হটিতেছে, কখনো ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, কখনো কখনো জোড়-পায়ে নাচিতেছে। কিন্তু সকলেই একভাবে নাচিতেছে, কোনো জায়গায় কাহারো তাল কাটিতেছে না। আমরা অবাক হইয়া দেখিতেছি। আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের পর দেখিলাম, সেই শীতের দেশেও ছেলেদের কপাল দিয়া দর-দর করিয়া ঘাম পড়িতেছে। তখন আমি তাহাদিগকে থামিতে বলিলাম। আমার এক বন্ধু বলিলেন, "তোমরা কিছু খাও।" এই বলিয়া আমাদের যে খাবার ভাণ্ডার ছিল, তাই তিনি খুলিয়া বসিলেন। ছেলেরা অনেকে নাচ ছাড়িয়া খাইবার জন্য ব্যস্ত। এই সময় ছেলেদের মা-রা আসিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইল। তাহারাও নাচিতে লাগিল। পুরুষরাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। উঠানময় নাচ আরম্ভ হইয়া গেল। ছেলেরাও কিছু জল খাইয়া আবার নাচিতে লাগিল। নাচের সঙ্গে ক্রমে পাহাড়িয়া রাগে ২/১টা গানও বাহির হইল। আমরা গানের কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু পাহাড়ে আসিয়া অবধি ঐ একই রাগ শুনিতেছি ; তাহাতে বুঝিলাম যে, পাহাড়িয়ারা এই রাগ ছাড়া অন্য রাগ জানে না।

যাহা হউক, ২/৪টি গানের পর নাচ থামিয়া গেল। কারণ, আমাদিগকে সন্ধ্যার আগে মুসুরী ফিরিতে হইবে ; নহিলে রাস্তায় অন্ধকার হইয়া যাইবে। হয়তো এক-আধ পসলা বৃষ্টিও হইতে পারে। তাহা হইলে আরো মুশকিল। তাই আমাদের খাবার ভাণ্ডার খালি করিয়া পকেট হইতে কিছু পয়সাকড়ি দিয়া নাচগান থামাইয়া দিলাম ও ঝিল্লী হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিলাম। উঠানটি আমাদের বেশ পছন্দ হইয়াছিল। সেই উঠানে দাঁড়াইয়া কোন্ পথে যাইব, সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম। বাবুরা বলিলেন, 'যে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই যাইব।' আমি বলিলাম, 'সে হতেই পারে না। কারণ, পথ বড়ো সরু, বড়ো খাড়াই, বড়ো পাথর, তার উপর আবার পাশে একটি নালা আছে। যদি বৃষ্টি হয়, একেবারেই সর্বনাশ। পারতপক্ষে ও পথে যাওয়া হবে না।' আমি শুনিয়াছিলাম যে, আমরা যে লেভেলে আছি, সেই লেভেলে মাইলখানেক তফাতে কোম্পানির বাগান আছে, তাহার নাম হুরুরি। আমরা যদি সেখানে সন্ধ্যার আগে পৌঁছিতে পারি, তা হইলে নিশ্চয়ই ভালো রাস্তা পাইব ; কারণ, কোম্পানির বাগান হইতে মুসুরী যাইবার নিশ্চয়ই একটি ভালো রাস্তা আছে। গ্রামের লোকও সেই কথা বলিল। সকলেরই হুরুরি যাওয়ার মত হইল। আমরা পায়ে চলা পথে চলিতে লাগিলাম ; চড়াই উতরাইয়ের কোনো কথাই রহিল না। চারটি মেয়ে আমাদের সঙ্গ নিল। অল্প দূরে আমাদের পিছনে পিছনে তাহারা আসিতে লাগিল। পুরুষরা সব ফিরিয়া গেল। জমিটি ধনুকের আকার। যেমন একটা ধনুক শেষ হইল অমনই একটি ঝরনা। যেমন ঝরনাটা পার হইলাম, আবার একটি ধনুক। মাঝে মাঝে এক-একটা পাথরের ঘর— শ্লেট-পাথরে ছাওয়া। গোরুবাছুর অনেক সময় সেখানে আশ্রয় লয়। কিন্তু মানুষও অনেক সময় সেখানে আশ্রয় লইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এইগুলিই মেঘদূতের শিলাবেশ্ম[১]। পাঁচ-সাতটা ধনুক পার হইয়া একটি বড়ো ঝরনার কাছে আসিয়া পড়িলাম। ইঞ্চিখানেক পুরু জল ২৫/২০ ফুট চাটাল হইয়া ক্রমাগত পড়িতেছে। নীচে শেওলা হইয়াছে, অত্যন্ত পিছল হইয়াছে। পার হওয়া যায় কেমন করিয়া? একজন চাকর পার হইয়া গেল। তাহার পাহাড়ি পা, পায়ের জোর আছে, পার হইয়া

গেল। আমরা পার হই কি করিয়া ? একজন বলিলেন, হামাগুড়ি দেও। জলের উপর হামাগুড়ি-- সে আবার কেমন ! কাহারো পছন্দ হইল না।

জল পাইলেই গাছপালা হয়। এ ঝরনার ধারেও গাছপালা হইয়াছিল যথেষ্ট। মাঝখানে তো গাছপালা নাই। আছে কেবল পুদিনার গাছ, এক মানুষ দু মানুষ উঁচু। কিন্তু তাহা ধরিয়া তো ঝরনা পার হওয়া যায় না— যদি উপড়াইয়া যায় ? শেষে ঝরনার পাশের গাছ ধরিয়া ধরিয়া খানিক উপরে উঠিলাম। যেখানে ঝরনা সরু হইয়া গিয়াছে, তাহার এ পাশের গাছের ডাল ধরিয়া খানিক আগাইয়া গেলাম এবং ওপারের গাছের ডাল ধরিয়া পার হইয়া পড়িলাম। বিপদ যদিও পদে পদে ছিল, ভাগ্যে ভাগ্যে কোনো রকমে উদ্ধার হইলাম।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঝরনা পার হইয়া দেখি, ধনুকের উপর দিয়া পুল বাঁধিয়া দিয়াছে এবং সেই পুল দিয়া জল হুরুরি বাগানে যাইতেছে। আমরা হুরুরির বাগানে আসিয়া দেখিলাম, অনেক আলু-বোখারার গাছ, অনেক নাশপাতির গাছ, অনেক বিলাতী শাকসবজির গাছ। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, সকলেই ২/১টি ভালো আলুবোখারা ছিঁড়িয়া খাইলাম। সে অম্লমধুর স্বাদে ক্লান্তি ও তৃষ্ণা একেবারে দূর হইল। পাকা আলুবোখারার চেয়ে ডাঁশা আলুবোখারার স্বাদ অনেক ভালো। খানিকক্ষণ একখানা পাথরে চাপিয়া বসিয়া হাঁপ ছাড়িলাম। পরে বাগান হইতে যে রাস্তা মুসুরী গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিলাম। রাস্তা বেশি খাড়াই নহে, বেশ আস্তে আস্তে উঁচু হইতেছে, যাইতে বেশি কষ্ট হইতেছে না। খানিক উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এ অঞ্চলে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, বরফের পাহাড় দেখা যাইতেছে ; কিন্তু সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে, বরফের পাহাড়ের সে জলুস আর নাই। প্রতি মুহূর্তেই বেশি করিয়া ম্লান হইয়া যাইতেছে। বরফের পাহাড়ের দিকে চক্ষু রাখিয়া মুসুরীর রাস্তা বহিয়া ক্রমে বাসায় আসিয়াও জানালা খুলিয়া বরফের পাহাড় দেখিতে দেখিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয়, ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুর আসিয়া খাইতে ডাকিল।

'মাসিক বসুমতী'
কার্তিক, ১৩৩৪ ॥

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. মেঘদূত কাব্যে পূর্বমেঘ-এর ২৬ সংখ্যক শ্লোকে 'শিলাবেশ্ম' শব্দটি আছে,

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্‌গারিভির্নাগরণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥

'মেঘদূত ব্যাখ্যা' বইয়ে (পূর্বমেঘ, ৩০ অনুচ্ছেদ) হরপ্রসাদ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

"সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে শহরতলির পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে তাহার পুলক কদম্বফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্মপৃষ্ঠ ৩০০/৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহা বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক-একটা খালি ঘর নির্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্বত্র দেখিতে পাইবে।"

ওহে মনের মানুষ, ওহে প্রাণের বঁধুয়া, এসো এসো, শুধু একবার 'এসো' নয়— বার বার বলিতেছি, এসো এসো। আমার বড়ো আগ্রহ, বড়ো উদ্বেগ, বড়ো কাতরতা, বড়ো চাঞ্চল্য— তুমি এসো এসো। একবার এসো বলিলে বোধ হয়, যাওয়া আসা আছে, জানাশুনা আছে, বসা দাঁড়ানো একত্রে হয়— আসিতে দেখিয়া বলিলাম, এসো, আদর করিয়া বলিলাম এসো— ইয়ার ইয়ারকে বলে, 'এসো' ; প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে বলে, 'এসো' ; সম্বন্ধী সম্বন্ধীকে বলে, 'এসো' ; মিতা মিতাকে বলে, 'এসো'। আমার সে 'এসো' নয়— আমার ব্যাকুল ডাক 'এসো এসো' ! আমি অধীর, তাই দেখিয়াই ডাকিতেছি 'এসো এসো'। আমার প্রাণ

বাহির হইয়া যাইতেছে, তাই অধীর হইয়া ডাকিতেছি 'এসো এসো'। আমার অধীরতার পার নাই, আমার ব্যাকুলতার ইয়ত্তা নাই, তাই আমার 'এসো এসো' ডাকে কুলাইতেছে না ; আমি আরো ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছি, 'এসো এসো বঁধু এসো'। তিন সত্য দিতেছি 'এসো'। তোমার জন্য হৃদয় ভরা— তোমার চেহারা হৃদয়ে চিরাঙ্কিত, তোমার ভাবনায় সদা অস্থির, ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে, সকালে, সন্ধ্যায়, দিনে, রাত্রে, পথে, ঘাটে, বাটে, মাঠে, গৃহে, বনে, শ্মশানে, মশানে, বাজারে, হাটে— তোমারই চিন্তা করিতেছি, তোমারই কথা তোলাপাড়া করিতেছি। এমন ক্ষণ নাই— তোমার কথা মনে নাই ; এমন ক্ষণ নাই— তোমার স্বর কানে লাগিয়া নাই ; এমন ক্ষণ নাই— তোমার ছবি চক্ষুর উপর খেলিতেছে না। যখন বড়ো ব্যস্ত, যখন রোগে, শোকে, পরিশ্রমে, পিপাসায়, গোলেমালে, কাজে, কর্মে ব্যাকুল— বড়োই কাতর, তখনো দেখি, ঝড় থামিলে পর্বতের তলদেশ দিয়া ছোটো নদীটির মতো তোমার চিন্তা ধীরে ধীরে চলিয়াছে, গম্যস্থান কোথায় জানা যায় না ; কিন্তু তাহার গতিরও বিরাম নাই। ঝড় থামিলে, বৃষ্টি থামিলে, কুহেরা গলিয়া গেলে, সূর্যের উদয়ে দেখিবে— ঝরনা সেই ভাবেই ঝরিতেছে। ঝম্ ঝম্ করে দূর হইতে হৃদয় মন প্রাণ ভরিয়া দিতেছে আর তাহার শীতল বায়ুতে দেহ মন জুড়াইয়া দিতেছে।

কিন্তু হে মনের মানুষ, তোমায় তো দেখি না। তোমার চিন্তা দেখি, তোমার আবছায়া দেখি, নয়নের ক্যামেরায় তোমার ফোটো লাগানো আছে— সদাই দেখি, কিন্তু তোমায় তো দেখিতে পাই না, তাই আজ তোমায় দেখিয়াই এত আগ্রহ হইয়াছে— এত ব্যাকুলতা হইয়াছে— প্রাণ এত উদ্বেল হইয়াছে : তাই প্রাণ ভরিয়া— মন ভরিয়া— গলা তুলিয়া তোমায় ডাকিতেছি, এসো এসো ! আর-কিছু চাহি না, শুধু চাই এসো —আমি তোমারে চাই ! তোমার কিছু চাই না, তোমার প্রেম চাহি না— প্রতিদান চাহি না ! আমি জানি, প্রতিদান চাহিলে প্রীতিদান দানই হয় না ! 'এক ঢোক্ লেগা, দো ঢোক্ দেগা' গোছের একটা ব্যাবসা মাত্র। আমি দিয়াই খুশি। তাই বলি, এসো, তাই বলি দেখি, তোমায় দেখি, তোমার কোনো জিনিসে আমার আগ্রহ নাই, শুদ্ধ তোমার প্রতি আমার আগ্রহ !

যদি আসিলে, যদি দয়া করিলে, যদি মনে করিলে, যদি চোখের কোলে স্থান দিলে, যদি মুখ তুলিয়া চাহিলে, তবে ব'স আমার কাছে ব'স, আমি আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছি, তাহারই একপাশে খানিকটা লইয়া— অর্ধেকটা লইয়া ব'স। দূরে বসিও না, দু হাত তফাতেও বসিও না, একহাত অন্তরেও বসিও না— এসো আমরা এঁকাসনে বসি। এসো আড়াই হাত কাপড়ে দুজনে বসি, যত কাছে সয়— বসি, দেখো, যেন তোমার আমার মাঝখানে বৃথা ফাঁক থাকে না। ভৌতিক দেহে কিছু ফাঁক থাকিবেই— থাকাই উচিত— কিন্তু সেখানে যেন ফাঁক না থাকে। সেখানে— কোন্‌খানে ? হৃদয়ে। সে তো আমার হাত, সেখানে আমি তোমায় ছাইয়া রাখিব, যেমন পর্বতবাসে কুহেরা হয়, উপর নীচে, আশে-পাশে, উপরে আকাশ পর্যন্ত, নীচে গভীর খডের মধ্যে ও আশে-পাশে, সর্বত্র কুহেরায় আচ্ছন্ন থাকে, আমারও তেমনি হৃদয় গিয়া তোমার চারি দিক আচ্ছন্ন করিবে। সে হৃদয়ের স্নেহে, প্রেমে, আদরে, অপেক্ষায় তোমায় ডুবাইয়া রাখিব। কিন্তু সে কথা এখন নয় —এখানেও নয়। এখন তুমি ব'স, বিশ্রাম করো, কত দূর হইতে আসিয়াছ— বিশ্রাম করো, শরীরের ক্লান্তি দূর করো। আমি বেশি দূর হইতে আসি নাই, সে কথাটা কি সত্য ? আমার চোখের আড়াল হইলেই আমার পক্ষে দূর। আমার চোখের আড়াল হইতেই তুমি আসিলে, অতএব তুমি অনেক দূর হইতে আসিলে ! তা তুমি দু বাড়ি তফাত হইতেই এসো আর দু জেলা তফাত হইতেই এসো— আমার পক্ষে তুমি সমান দূর হইতেই আসিলে। আমার চোখের উপর থাকিলেই নিকট, আর আড়াল হইলে দূর। আমার চোখে আর-কালও নাই— আর-দিকও নাই— আর-দেশও নাই। কাল-দিক-দেশকে অনন্ত বলে ; মিছা কথা, আমি তো উহাদের অন্ত বেশ দেখিতে পাইতেছি। তুমি চোখের উপর থাকিলেই আলো, নহিলে সব অন্ধকার। তুমি যতক্ষণ কাছে থাক, ততক্ষণ কাল, নহিলে সব অকাল। তোমায় যে দিকে দেখি, সে-ই দিক, অন্য সব অদিক। তুমি যতক্ষণ কাছে থাক, ততক্ষণ সেইটুকু দেশ, বাকি অদেশ। সুতরাং অনন্ত কিরূপে হইল ? হাঁ হাঁ, হয় বটে বটে ! তুমি কাছে না থাকিলে সে অন্ধকারের অন্ত নাই, সে অকালের অন্ত নাই, সে অদিকের অন্ত নাই, সে অদেশেরও অন্ত নাই !

যাক, আবার কি বলিতেছিলাম, তুমি এসো— আধ আঁচরে ব'স। কেন ?—

'নয়ন ভরিয়া তোমায় হেরি।'

তোমায় দেখিব বলিয়া, হেরিব বলিয়া, অমন চকিতের মতো— তড়িতের মতো-- ক্ষণকালের মতো দেখিলে আমার তৃপ্তি হয় না ! তোমায় কাছে বসাইয়া, তোমার প্রতিমা— তোমার ছবি দেখিব, আবছায়া দেখিয়া, ধ্যান করিয়া আর তৃপ্তি হইতেছে না। যেমন দেখিয়া আসিতেছি, তেমন করিয়া দেখিলে তৃপ্তি হইবে না। দেখিব— একমনে দেখিব, এক-প্রাণে দেখিব, নয়ন ভরিয়া দেখিব, হৃদয় ভরিয়া সে সুখ পূরিয়া রাখিব। আড় চাহনিতে দেখিলে— চোখের কোণে দেখিলে— চোখের কোলে দেখিলে— শুধু চোখে চোখে দেখিলে চলিবে না। একেবারে দুটি চক্ষু বিস্তার করিয়া দু চক্ষুতে চারি চক্ষু হইয়া, সহস্র চক্ষু হইয়া তোমায় দেখিব, তথাপি 'নয়ন না তিরপিত ভেল!' যদি হয়, তবে চক্ষুর রেটিনায় যে ফোটো উঠে, প্রতি চাহনিতেই উঠে, সেই ফোটোগুলি এত তুলিব— এত জলদ, এত পরিষ্কার, এত ক্ষিপ্র হস্তে তুলিব যে, সেগুলিতে নয়ন ভরিয়া থাকিবে— 'না তিরপিত ভেল' হইবে না।

আমি আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছি, তুমি আমার মুখের দিকে মুখ করিয়া ব'স। যত কাছে হইলে দেখা ভালো যায় না, তত কাছে হইবে না, অথচ দূরও হইবে না। আমি নীচে হইতে তোমার মুখের দিকে চাইয়া থাকিব। চাঁদ হতে যেমন পৃথিবী দেখায়, তেমনই তোমার মুখ আমার দৃষ্টির মণ্ডল ভরিয়া থাকিবে। সে উজ্জ্বল মুখ— সে প্রিয় মুখ, সে প্রেমময় মুখ আমি দেখিব। দেখিব, আবার দেখিব, আবার দেখিব, আবার দেখিব। চক্ষু ক্লান্ত হইবে না— হৃদয় শ্রান্ত হইবে না, কেবল দেখিব !

আমার এত ব্যাকুলতার কারণ কি জান, তোমায় এত কাতর আহ্বান, এত কাতর সম্ভাষণ কেন জান ? তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখিবার এত ইচ্ছা কেন জান— তোমায় হৃদয়ে পুষিয়া রাখিবার এই বাঞ্ছা কেন জান ?

'অনেক দিবসে মনের মানসে তোমা-ধনে মিলাইল বিধি !'

অনেক দিবসে— সে যে কত দিবস, মনে হয় না। যখন উদাস

হৃদয়ে 'মনের মানুষ' 'প্রাণের প্রাণ' খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম, সে কথা মনে হয় না ; মনের আবেগে কত দেশে ঘুরিলাম, কত নদ, নদী, পর্বত, কন্দর পার হইলাম। বড়ো বড়ো পাহাড় ডিঙাইলাম, বড়ো বড়ো সমুদ্র পার হইলাম, কত জাতির সহিত মিশিলাম, রুশ, জর্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, পোর্তুগীজ, ইংরেজ, স্কচ্, আইরিশ, আরবি, পারসি, কাবুলি, চীনে, জাপানি, বর্মা, মগ, সিংহলি, বাঙালি, হিন্দুস্থানি, উড়ে, তৈলঙ্গি, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্রি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বেনে, হাড়ি, মুচি, ডোম, চণ্ডাল— সবারই সঙ্গে মিশিলাম, কেবল মরীচিকা— কেবল মরীচিকা ! কত জায়গায় 'জল পাইব' বলিয়া ছুটিয়া গেলাম, শেষ তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিল। সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে জীবন যায় নাই, তাই প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আসিলাম, বড়ো আশায় বড়ো ছাই পড়িল— মনের মানুষ মিলিল না ! অনেক জ্ঞান পাইলাম, অনেকে চৈতন্য করিয়া দিল। হতাশের শেষ তৃপ্তিজ্ঞান কিছু-না-কিছু সকল কাজেই পাওয়া যায়। তাই খাইয়া তাহারা মানসী কদলী ভক্ষণ করিয়া থাকে ; কিন্তু আমি জ্ঞানের ভিখারী নই, চৈতন্যেরও ভিখারী নই, আমি যাহার ভিখারী— তাহা যখন মিলিল না, তখন থোড়া জ্ঞানে আমার কি হইবে ! অনেক নরচরিত্র বুঝিলাম, কেহ আমার প্রাণ লইয়া খেলা করিল, কেহ বেচিয়া অর্থ উপার্জন করিল। সে সব দুঃখের কথা কহিয়া কাজ নাই। সে যে এক গঙ্গা। গ্রেল অন্বেষণ করিতে গিয়া কিং আরথার ও তাঁহার গোল টেবিলের নাইটরা যত দুর্ভোগ ভুগিয়াছিলেন, আমি আমার মনের মানুষ খুঁজিতে গিয়া তাহা অপেক্ষাও অনেক দুর্ভোগ ভুগিলাম। অথচ মনের মানস পূর্ণ হইল না। মনের মানুষ পাইলাম না। কিন্তু আশা ছাড়িলাম না, শ্রমেরও ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু দেহ মন প্রাণ সে অন্বেষণে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নরচরিত্রে অবিশ্বাস জন্মিল, মিসান্থ্রোপ [Misanthrope] হইলাম। কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম, অন্বেষণ শিথিল হইয়া আসিল, একটা গভীর দুঃখ মনে রহিয়া গেল। হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়ে চাপিয়া মুখে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলাম। জীবন ভার বোধ হইতে লাগিল। কান্না চির-সহচর হইল। উৎসাহ স্ফূর্তি কোথায় চলিয়া গেল। মনের ভিতর মনে কিন্তু আশা গেল না। হতাশের শেষ আশা ভগবান্।

তাঁহার উপর নির্ভর করিলাম। তাঁহার নিকট মনের বেদনা জানাইলাম। তাঁহাকে ডাকিতে শিখি নাই। তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিখি নাই। পারিব কেন ? যন্ত্রণার একশেষ হইল। কেবল মনে হয়, আমি একা, এ অনন্ত সংসারে আমার আর-কেহ নাই। আমার ব্যথায় ব্যথী হয়, এমন একজনও মিলিল না। আমি একা-- বড়োই একা, সংসার-অরণ্য —আমি একা। মনের দুঃখে আকাশ-পাতাল পূরিয়া যাইত, আমি একা। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের শেষ শাস্তি 'একা', একঘরে 'একা'; হিন্দু আইনের শেষ শাস্তি— নির্বাসন, সেও বিশাল পৃথিবীতে একা। আমি নির্বাসিত, চিরক্লিষ্ট, একা অসহায় ; মুখের দিকে তাকায়, এমন একটা লোক নাই। যন্ত্রণায় ছটফট করিলে 'আহা' বলে, এমন একটা লোক নাই। এমন অবস্থায় নিরাশায় মনস্তাপে মানুষ কি বাঁচে গা ?

হঠাৎ বিধি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তোমা-ধনে মিলাইয়া দিলেন। পঁচিশ হাজার মাইল পৃথিবীর পরিধি। এ পঁচিশ হাজার মাইল ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িব- যাহা পাই নাই, হঠাৎ বাড়ির পাশে পাইয়া গেলাম— তোমায় পাইলাম। এই যে তুমি আমার সামনে, আমার আঁচলে, আমার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছ। তোমায় বিধাতা মিলাইয়া দিলেন। আমার কৃতিত্ব ইহাতে নাই। এটি বিধাতার অনুগ্রহ —বর। মানুষের চেষ্টায় কিছুই হয় না। মানুষ পুরুষকারের অহংকারে দাপাইয়া বেড়ায়, কিন্তু পুরুষকারে কিছুই হয় না। পুরুষকার যখন মানুষকে হতাশায় আনিয়া ফেলে, যখন মানুষ আপনার শক্তি কত অল্প, তাই দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানের নাম করে, তখন সে নিশ্বাস ভগবানের কাছে পৌঁছায়, তখন হইতে সিদ্ধির সূত্রপাত হয়। পুরুষকার নহিলে ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায় না। তাঁহার কাছে না পৌঁছিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই পণ্ডিতেরা বলেন —'দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে'*। ভগবানের লীলা শম্বুক বুঝিয়াছিল, তাই সে বলিয়াছিল— 'মহদুপকৃতং তপসা' তপস্যায় রামচন্দ্রকে আমার কাছে পৌঁছিয়া দিয়াছে, বাকি সব তিনিই করিবেন।

বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, আমার দুঃখে কাতর হইয়া তোমায় মিলাইয়া দিলেন। হঠাৎ বহু দিনের সঞ্চিত দুঃখ গলিতে লাগিল।

* [ বিদ্বান ব্যক্তির প্রয়োজন দুটি বস্তুর। ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

আবার যেন আলো পাইলাম, আবার চাঁদ হাসিল, আবার নক্ষত্র ফুটিল, আবার মানুষের উপর বিশ্বাস হইল। আবার স্নেহসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। যেন হৃদয়ের ফোয়ারা কে খুলিয়া দিল। যাহাকে দেখিতে পারিতাম না, তাহাকে ভালোবাসিতে লাগিলাম। যাহাকে ভালোবাসিতাম, তাহাকে স্নেহসাগরে ভাসাইতে লাগিলাম। যাহার উপর রাগ ছিল, তাহার উপর দয়া উপজিয়া আসিল। যে আমার অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, তাহাকে ক্ষমা করিলাম। যে আমায় উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার উপর রাগ কোথায় চলিয়া গেল। 'আমি' ভাবটা আর বড়ো রহিল না। অথবা আমিত্বের প্রসার হইয়া সর্বভূতে ছড়াইয়া পড়িল। আমি সব লিখিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যেমন ঘোর অন্ধকার রাত্রির পর প্রভাত হইলে জগৎ প্রফুল্ল হয়, যেমন তুমুল ঝড়-বৃষ্টির পর আকাশ ফরসা হইলে আবার পৃথিবী হাসিতে থাকে, যেমন ঘোরতর যুদ্ধের পর শান্তি আসিয়া পক্ষদ্বয়কে নিরস্ত করিয়া দিলে আবার দেশে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জন্মায়, বহু কালের পর মনের মানুষ পাইয়া আমার সেই অবস্থা হইয়াছে। এখন সকলই মিষ্ট লাগে, সকলেরই মধ্যে যেন একটি প্রাণ আছে, আর তেমন নির্জীব বলিয়া বোধ হয় না। এখন নদীর জল চলিতেছে— স্বভাবের নিয়মে সত্য, কিন্তু তাহাতে একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যের মধ্যে আমিও একজন। সে জলে চন্দ্রকলা নাচিতেছে— স্বভাবের নিয়মে সত্য, কিন্তু তাহাতেও একটি উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যের মধ্যে আমিও একজন। আমিও সে মঙ্গল উদ্দেশ্যের ফলভাগী। ফুল ফুটিতেছে— স্বভাবের নিয়মে সত্য, আমি উহাকে ফুটাইতে পারি না, তবে আমার এমন প্রাণ আছে, আমি উহাতেও প্রাণ দেখিতে পাইতেছি। প্রাণ অর্থাৎ উদ্দেশ্য, সে যে আমায়, তোমায়— আমাদের দুজনকে গন্ধ শুঁকাইবার জন্য জন্মিয়াছে। আমরা তাহার গন্ধ শুঁকিলাম, সে মরিয়া গেল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। মানুষেরা গান গাহিতেছে— স্বভাবের নিয়ম। উদ্দেশ্য কি নাই? প্রাণ কি নাই? আছে বৈ কি? সে গানে যে গায়কের অথবা মহাজনের প্রাণ মাখা। আছে বৈ কি? এখন যে সে গান তোমার কর্ণকুহর হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার কানে লাগিতেছে, তাই তাহাকে এত মিষ্ট লাগিতেছে, তাই তাহার প্রাণ আছে— উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

পারিতেছি। 'আমি ভালোবাসায় জন্ম-পাগল হইয়াছি'— স্বভাবের নিয়মে সত্য। কিন্তু আমার প্রাণ না থাকিলে কি আমি পাগল হইতাম? ছিল, তাই পাগল হইয়াছিলাম। স্বভাবের নিয়মে পাগল হইয়াছিলাম বলিয়া নির্জীব ছিলাম না। জীবনে তৃপ্ত হই নাই। জীবনের জীবন খুঁজিতেছিলাম, পাই নাই। শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে কখনো ম্রিয়মাণ হইতেছিলাম, কখনো রোদন করিতেছিলাম, কখনো হা-হুতাশ করিতেছিলাম। জীবন ছিল বলিয়াই করিতে পারিয়াছিলাম, নহিলে পারিতাম কি? ছিল না কি? সঙ্গী ছিল না, সাথী খুঁজিতেছিলাম; ব্যথার ব্যথী খুঁজিতেছিলাম, শিক্ষার দোষ খুঁজিতেছিলাম, দেশ-বিদেশে— তাহা কি মিলে? তোমার ব্যথা পরে কি জানিবে? তোমার আপনার লোকই জানিবে। আমি আপনার লোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, বেশ ফল পাইয়াছি— 'স্বপক্ষস্য ক্ষয়ে জাতে কো নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি'* এ মহাবাক্য মনে ছিল না।

বিধাতা কি মিলাইলেন? তোমা-ধনে মিলাইলেন। তুমিই আমার ধন, আমার অমূল্য নিধি, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত, মধ্য, পরার্ধ— ইহারই মধ্যে এক নিধি। অথবা ভৌতিক পদার্থের সহিত তোমার তুলনাই হয় না। ভৌতিক ধনের সঙ্গে তোমার তুলনা করিলে তোমায় আটক করা হয়। আমি সে ধনের সঙ্গে তোমার তুলনা করিব না। তুমি আমার অমূল্য ধন। তুমি আমার অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, সত্য, দয়া, দান, ধর্ম— তুমি আমার সব। তুমি আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন— তুমি আমার সব। তোমায় পাইয়া আমি সব পাইয়াছি। এখন পিতার প্রতি ভক্তি করিতে, মাতাকে দেবতাস্বরূপ দেখিতে শিখিয়াছি। ভাই-ভগিনীকে আদর করিতে শিখিয়াছি, স্বামী এখন আমার দেবতা হইয়াছেন। পুত্র-কন্যাকে কখনো প্রাণ পূরিয়া আদর করিতে পারি নাই, এখন পারিতেছি, সে কেবল তোমার কল্যাণে। তোমায় পাইয়া প্রাণ পাইয়াছি, জীবিত হইয়াছি, সব পাইয়াছি। নিজে যে নির্জীব প্রাণশূন্য, তাহার আবার পুত্র-কন্যা ভাই-ভগিনী কোথায় থাকিবে? আমার সে নির্জীব ভাব নাই, তাই

* [ নিজের পক্ষ ( দল ) নস্ট হয়ে গেলে কে আমাদের ত্রাণকর্তা হবে। ]

আমি সব পাইয়াছি। তোমায় পাইয়া আমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছে। যেন আবার বাল্যকালে উপনীত হইয়াছি, সব বস্তুই যেন নূতন আলোকে আলোকিত, নূতন জীবন পাইয়া চৈতন্যময়। মেঘ-দূতের মেঘ বিরহে সব চৈতন্যময় দেখিয়াছিল। আমি মিলনে সব চৈতন্যময় দেখিতেছি। তাই আমি আপনাকে মহা-ভাগ্যবান্, মহা-ধনী দেখিতেছি। আমার এত ধন কোথা হইতে আসিল, তোমা-ধনে পাইয়া তো।

বিধাতা যে তোমা-ধনে মিলাইয়া দিলেন, ইহার কারণ তো 'মনের মানসে'। আমি মনে মনে কত সাধনা করিতাম, আমার মনের মানুষ এমনি এমনি হইবে, তাহার এত বয়স হইবে, তাহার জোড়া ভ্রূ হইবে, কপালটি ছোটো হইবে, সে কপালের দুই পাশে চুলগুলি বাঁকিয়া ধনুর মতো হইবে। কপালখানি দেখিতে ঠিক শুক্লা সপ্তমীর চাঁদের মতো হইবে। কপালের নীচে দুটি চোখ বড়ো বড়ো ঢলঢলে ; চোখের উপর-পাতাটি একটু বেশি বেশি চওড়া। নাকটি ভুরুর মাঝখানে হইবে— 'খাঁজ না কাটিয়া' বরাবর সমান নামিয়া আসিয়াছে। তাহার নীচে গোঁফ জোড়াটি ডাহিনে বামে হেলিয়া দুই ডগায় বাঁকিয়া উপর দিকে উঠিয়াছে। মুখটি এইখান হইতে একটু বাঁকা হইয়াছে, দাড়িটি সরু হইয়া গিয়াছে, একটু ডাহিনে হেলা মুখখানিতে সে সরু দাড়ি পুরা আরিয়ান কট্। হাত দুটি আজানুলম্বিত, সুন্দর সুঠাম বেশ, গোল-গাল নিটোল। দেহখানি লাঠিগাছটির মতো ভুঁড়িশূন্য, তিনি না হাসিয়া কথা কন না। চলিতে গেলে ঠমকে ঠমকে চলেন আর দৃষ্টি ধীর চঞ্চল, অথচ স্থিরও নয়, কেবল নয়নে কোণের দিকে ধাবিত। স্বরটি সরু এবং চেরা। আমি গম্ভীর মোটা স্বভাব ভালোবাসি না। এই চেহারা ক্রমে ধ্যান করিতে করিতে আমার মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল, তাই তোমায় প্রথম দেখিবামাত্র তোমায় চিনিয়াছিলাম। একেবারেই মনের মানুষ বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিতাম, আমার মনের মানুষ সদ্বংশজাত হইবে, ধার্মিক হইবে, হিন্দুধর্মে আস্থাবান্ হইবে। পরের দুঃখে তাহার হৃদয় গলিবে, আপনার ক্ষতি করিয়া সে পরের উপকার করিবে। স্ত্রী-পুত্রে তাহার পুরা প্রেম থাকিবে অথচ আমার জন্যে তাহার রতিপ্রীতির অভাব হইবে না। তাহার বুদ্ধি মার্জিত হইবে, স্বভাবটি কোমল হইবে,

শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি হইবে। ঈশ্বরে অচলা ভক্তি থাকিবে। পরহিংসা, পরনিন্দা, পরদ্রোহ একবারেই থাকিবে না। এই আমার ধ্যানে গড়া মনের মানুষ। অহে আধ আঁচরে বসা মানুষটি, তুমি আমার ধ্যানে গড়া মনের মানুষের চেয়ে অনেক অধিক গুণবান্। আমরা অবলা নারী জাতি বৈ তো নই! আমরা কতই বা মনে মনে গড়িব? তবুও আমি যাহা যাহা চাহিতাম, ধ্যান করিতাম, সকলই তোমার আছে। উপরন্তু অনেক সদ্‌গুণ আছে— যাহা অনেকেরই নাই। আমার তখনকার ধ্যানের পার ছিল না, মূর্তি যখন ইচ্ছামাত্র সামনে দাঁড়াইত, তখন কতরূপে তাহার পূজা করিয়াছি। কখনো করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছি। 'কখন কবে আসিবে' বলিয়া হাত জোড় করিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ক্ষীরের বাটিটি মুখে তুলিবার সময় কতবার সে মুখ মনে পড়িয়াছে। ভালো খাবার পাইলে, ভালো শয্যা ভালো কাপড় পাইলে কেবলই সেই ছবি মনে জাগিয়াছে। ভাবিতাম, সে কাছে থাকিলে কত ভালো হইত। এখন অনেক মনের মানসে তোমায় পাইয়াছি। এসে আমার সব প্রকার সেবা গ্রহণ করো, তোমারই সেবা আমার ব্রত, তোমারই সেবা আমার ধর্ম, তোমার সেবাই আমার হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন। কিসে তুমি ভালো থাক, কিসে তুমি খুশি থাক, তাই আমার ধ্যান, তাই আমার জ্ঞান, তাই আমার জপ, তাই আমার তপ। আমার অন্য ধর্ম নাই, অন্য ধ্যান নাই, অন্য জ্ঞান নাই, অন্য ধ্যানে আমার প্রয়োজন নাই, অন্য জ্ঞানে আমার প্রয়োজন নাই, অন্য যোগে আমার প্রয়োজন নাই, অন্য তপে আমার প্রয়োজন নাই!

কবিরা বিরহ আর পূর্বরাগের কথাই বলিয়াছেন। বিরহ মিলনের পর হয়, বড়ো যন্ত্রণা বাড়া ভাতে মই [ছাই?]— আর পূর্বরাগ প্রথম দেখিয়াই অনুরাগ, তাহার কোনো ফল নাই, সেও বড়ো যন্ত্রণা; সম্মুখে শীতস্বচ্ছ বারি অথচ খাবার জো নাই। আমার এ ভাব দুয়েরই বাহিরে। আমি ক্রমাগত মনের মানুষ গড়িয়া গড়িয়া একটা নিজের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি। তাহাতেই যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সামনে বসাইয়াছি। বিধাতা যেন যতদিন আমার বিরহ হইয়াছে, ততদিন হইতে আমার মন হইতে উপাদান লইয়া বিরলে বসিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহভরে আমার মনের মানুষ গড়িতেছিলেন, গড়া শেষ হইলে উঁহাকে আমার

সম্মুখে আনিয়া দিলেন। আমি দেখিয়াই অবাক. উদ্দেশ্যে বিধাতাকে নমস্কার করিলাম, আপনার জীবন ধন্য করিয়া মানিলাম।

তোমার সেবায় আমার একটু স্বার্থ আছে। আছে বৈ কি? নিঃস্বার্থ সেবা হয় কই? আমার স্বার্থ যেন তোমায় আমায় আর ছাড়াছাড়ি না হয়। কি করিলে হয় না? এসো, তোমায় হার করিয়া গলায় পরি। হার দিন-রাত গলায় থাকিবে. গলা হইতে নামিবে না। নিদ্রার সময় খুলিয়া রাখিতে হইবে না, আহারাদির সময় খুলিয়া রাখিতে হইবে না। আর হারের মণি আর মাণিক্যগুলি খুব পালিশ করা আর ঠাণ্ডা. তাই গলায় করিয়া রাখিলে গলাটা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। আরো কথা, হারটা বুকের উপর থাকিবে, যেখানে তোমায় রাখিলে তৃপ্ত হবে, ঠিক সেইখানেই থাকে। দিন-রাত তুমি-হার বুকের উপর পড়িয়া থাকিবে, স্পর্শে স্পর্শে দেহ, মন, প্রাণ পবিত্র হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাও হইবার নয়, আমার বুক-জোড়া ধন হার তো হইবার নহে। যেহেতু, তিনি মণিও নহেন, মানিকও নহেন, তিনি যে মানুষ। তাঁহাকে হার করিব কিরূপে? তাই কবি বলিলেন, "মণি নও, মানিক নও যে হার করে গলায় পরি।" নহিলে আমার কি ইচ্ছা, তোমায় বুকের উপর হইতে নামাই। যাহাকে বজ্রলেপ দিয়া বুকে জড়াইয়া রাখিলেও তৃপ্ত হয় না, যাহাকে বুকে রাখিয়া যাহার গরমে নিজের ঠাণ্ডা হৃদয়কে গরম করিয়া তুলিব, যাহাতে আমার ফুসফুসক্রিয়া পরিষ্কার হইবে. হার-স্পর্শে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিবে, শরীর অবশ হইবে, তাহাকে হার করিয়া গলায় করিয়া পরিতে পারিব না। স্বভাবের নিয়ম কি কঠোর! আমার অদৃষ্ট কি মন্দ!

যদি বুকেই না রাখিতে পারিলাম, না-হয় মাথায় রাখি। মাথা সকলের উপর: ভালোবাসার জিনিস মাথায় রাখাই ঠিক! বুকের উপর —হাড়ের উপর প্রাণেশ্বর ব্যথা পাইবেন। আমার মাথায় এক মাথা চুল। চুলের গদি ফুলের গদি অপেক্ষাও কোমল, মোলায়েম আর তেলা; কোনো কষ্ট নাই। তাঁহারো আরাম হয়, আমারো খুব আদর করা হয়। আদরের শেষ ইহজগতে মাথায় করিয়া রাখার চেয়ে আর আদর কি হইতে পারে? কিন্তু তাহাও হইবার জো নাই। কারণ, তুমি যে মানুষ। তুমি তো ফুল নও যে, খোঁপা করার সময় মাঝে মাঝে লাগাইয়া দিব আর যতক্ষণ ফুলের পরমায়ু থাকিবে, তোমায় মাথায় করিয়া রাখিব।

তুমি যদি ফুল হইতে, যদি আমার নিবিড় কৃষ্ণ চিকুরাবলীর মধ্যে, বনের মধ্যে নবমল্লিকা যেমন বনজ্যোৎস্না, যদি আমার কেশরাশির মধ্যে কেশ-জ্যোৎস্না হইয়া থাকিতে ? না, তোমায় হারও করিতে পারিলাম না, তোমায় ফুল করিয়া মাথায়ও রাখিতে পারিলাম না। জড় শরীরে জড় শরীরে চিরস্থায়ী মিল হইল না, হইবে না, হইবার নহে। তোমায় আমায় চিরকালের জন্য একত্র থাকা অসম্ভব। তবে এখন উপায় ? এসো, সমাজ, সামাজিক, কুল, মান, দেশ, ভূমি, বাড়ি, ঘর, সব বিসর্জন দিয়া তোমায় আমায় দেশে দেশে— দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই। একদিন মনের মানুষ খুঁজিতে গিয়া যে গিরিগুহায় শয়ন করিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সারারাত বসিয়া কাটাইয়া আসিয়াছি ; তুমি চলো, তোমার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সেই গিরিগুহায় সারারাত সুখে বঞিয়া আসি। মনের মানুষ খুঁজিতে গিয়া যে ঝরনার ধারে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাসে শীতল বায়ু গরম করিয়া আসিয়াছি, চলো, সেই ঝরনার ধারে তোমায় আমায় বসিয়া বসিয়া ঝরনার গান, পাখির গান, ঘাসের মকমল, পুদিনার বন দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে ভোর হইয়া উঠি। যে পর্বত-চূড়ায় দাঁড়াইয়া দূর দূরবর্তী দেশে, নগরে মনের মানুষ খুঁজিয়াছিলাম, আর-কোথাও না পাইয়া হতাশ হইয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছিলাম, সেই পর্বত-চূড়ায় সেই মনের মানুষের সাথে দাঁড়াইয়া দূর দূরবর্তী দেশে ও নগরে মানুষ মনের মানুষ লইয়া কেমন ভোর হইয়া আছে, দেখিয়া আমরাও ভোর হইয়া উঠি। যে সমুদ্রের ধারে বসিয়া সমুদ্রের কল্লোল শুনিতে শুনিতে মনের মানুষের অভাবে আপনার হৃদয়-সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে বিচলিত, বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম, সেইখানে তোমার সঙ্গে সেই ঢেউ দেখিয়া, সেই মন্ত্রধ্বনি শুনিয়া হৃদয়-সমুদ্রের জোয়ার আসুক, দেখি আর মানুষকে দেখাই— হৃদয়ে হৃদয় মিশিলে সে প্রশান্ত অগাধ সমুদ্র হইয়া উঠে। চলো, আমরা পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তু সকল দেখিয়া আসি। যেখানে অগ্ন্যুৎপাত হইবে, যেখানে সূর্যের সর্বগ্রাস হইবে, যেখানে চন্দ্রের কেতুগ্রাস হইবে, যেখানে ধূমকেতু উদয় হইবে, যেখানে বরফ ভাঙিয়া দেশ আচ্ছন্ন করিয়া যাইবে, যেখানে জলস্তম্ভ হইয়া উপরের জল নীচে ও নীচের জল উপরে লইয়া যাইবে, চলো, আমরা সেইখানে যাই। যেখানে সমারোহ, যেখানে কাচের বাড়ি,

যেখানে করোনেশনের ধুম, যেখানে একজিবিশনের আড়ম্বর, যেখানে বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার, যেখানে পুরাতত্ত্বের গূঢ়তত্ত্বের উদ্ধার, চলো আমরা সেইখানে যাই। তুমি কাছে থাকিলে আমার উৎসাহ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ হয়, আমার দশ হস্তীর বল হয়, আমি সত্য সত্যই মাতিয়া উঠি।

কিন্তু হায়, আমার তো তাহা হইবার জো নাই। আমি যে নারী—পর-হস্তগতা পরাধীনা। আমি তো ইচ্ছামতো মাতিয়া বেড়াইতে পারি না, সে ক্ষমতা যে আমার নাই। তাই তো তোমার মতো গুণনিধিকে লইয়া দেশে দেশে বেড়াইতে পারিলাম না। আমি নারী, আমার স্বামী আছে। তিনি আমায় যাইতে দিবেন কেন? আমার জীবনের উদ্দেশ্য অন্য। আমার জীবনের ফল অন্য, আমার জীবন অন্যের জন্য, স্বামীর জন্য সমর্পণ করা হইয়াছে। তবু যে তোমায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, সে তাহাদের দয়ায়। তাহাদের আমার প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়া, আমি সতী বলিয়া, আমার দ্বিচারিণী হইবার ভয় নাই বলিয়া। তোমার সঙ্গে আমার ভাবে, ভালোবাসায়, ইন্দ্রিয়ের উৎপাত নাই বলিয়া তাই তোমায় মনের মানুষ করিয়া মনের মধ্যে স্থান দিতে পারিয়াছি। নহিলে পারিতাম না, পারিলে কলঙ্ক-স্পর্শ হইত। আমি তোমায় পতির মতো দেখি না, উপপতির মতো দেখি না। গুরুর মতো দেখি, দেবতার মতো দেখি, তোমায় দোষ-স্পর্শ হইতে পারে, এমন আমার বিশ্বাস নাই। তুমি পবিত্র, তুমি নির্মল, তুমি নিষ্কলঙ্ক। যে তোমার সংস্পর্শে আসে, সেও নির্মল, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়। তাই আমি তোমায় মনের মধ্যে স্থান দিয়া— তোমায় মনের মানুষ করিয়া আপনার মনকে পবিত্র, নির্মল করিয়াছি। তুমি আমার গুণনিধি; শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, খর্ব, নিখর্ব গুণ তোমার আছে। আমি চমৎকৃত হই, আমি বিস্মিত হই। তোমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত দয়া, এত করুণা, এত অনুকম্পা, এত স্নেহ, এত মমতা, এত ভক্তি, এত প্রীতি, এত প্রেম, এত অনুরাগ থাকে কিরূপে? দেখিতে তো ঐ রত্তি এই ক্ষীণ দেহযষ্টির এতটুকু অংশ হৃদয়, ইহাতে এত কিরূপে থাকে? অনন্ত জীবের জন্য যত কোমল ভাব ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ে পুষিয়া রাখিয়াছ, কাহাকেও তো ভুলো নাই, ক্ষুদ্র কীট হইতে মহা মহা জীব—

সকলেই তোমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। মশাটির জন্য মাছিটির জন্যও তোমার মুখে 'আহা' শুনিতে পাই। মানুষের দুঃখে তোমার চোখে জল পড়ে, রোগীর কাতরতায় তুমি কাতর হও, যথাসময়ে সকলের ব্যথায় তোমায় ব্যথী দেখিতে পাই, এত গুণের নিধি তুমি কেমন করিয়া হইলে ? তোমার শতাংশের একাংশ পাইয়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শিবি, যুধিষ্ঠির চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আর তোমার গুণের পার নাই। তোমায় লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিতে পারিলাম না।

'নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।'

আমার দুর্ভাগ্য, তোমায় গলার হার করিতে পারিলাম না, মাথার ফুল করিতে পারিলাম না, তোমার সঙ্গে গলায় গলায় হইয়া দেশে দেশে ফিরিতে পারিলাম না। এখন উপায় ? তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ তো হবেই। তাহা বন্ধ করার তো উপায় নাই। বিচ্ছেদ তো হইয়াছিল। তখন যা করিয়াছিলাম, এখনো তাহাই করিব। আহা, সে দুঃখের কথা কহিও— বলিও না, মনে করিতেও কষ্ট হয়। অনেক খুঁজিয়া তো তোমায় পাইলাম, মনের মানুষ পাইলাম। তাহার পরই তুমি চলিয়া গেলে। সে কষ্ট লিখিয়া উঠা যায় না। সেই সময়ে এক-একবার তোমার কথা মনে হয়। যাহা সর্বদা হৃদয়ে লাগিয়া আছে, তাহাকে আবার—

'যখন তোমায় পড়ে মনে
আমি চাহি বৃন্দাবন পানে।
আলুয়িত কেশ নাহি বাঁধি।'

যখন মনে পড়ে বলা কেন ? ওর মানে মনে পড়া নয়, স্মরণে উদয় হওয়া নয় : উহার অর্থ এই যে, যখন তোমার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয়, না দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, দেখিবার জন্য ছটফট করিতে থাকে, সেই সময়, সেই ঘোর ব্যাকুলতার সময় আমি কেবল বৃন্দাবনের দিকে চাই। এ বৃন্দাবন কোথায়—যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যেখানে কোনো দিন কোনো সময় তোমার সহিত মিলন হইয়াছিল, সেই স্থান— সেই সব স্থানই আমার বৃন্দাবন। সেই দিকে চাই, সেই বৃন্দাবনে যাই, সব আবার বর্তমান বোধ হয়, প্রত্যক্ষ

বোধ হয়, আবার তোমায় দেখিতে পাই। যদি বলো, সে ভ্রম, সে ভ্রম যদি না ঘুচে, তবে সেই তো প্রমাজ্ঞান. সেই তো প্রত্যক্ষ। আমি সেই প্রমাজ্ঞানে ভোর হইয়া, যেখানে যেখানে তুমি ছিলে, সেই সব স্থানে যাই। সেই আমার বৃন্দাবন। বৈষ্ণবের বৃন্দাবন পরম স্বর্গ; সপ্ত স্বর্গেরও উপরে। সেখানে শাল. তাল, তমাল, পিয়াশাল, হিন্তাল. বক, বকুল, বান. বঁরাস, তিমলা, চিলধেল, দেবদারু, সরল প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের বন। কুমুদ, কহ্লার. কুবলয় প্রভৃতি পুষ্প, হংসকারণ্ডবাদি নানা জলচর বৃন্দাবনের চারি দিকে। সেখানে যমুনার জল কুল-কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহার জলে কচ্ছপ কাছিম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তীরে কদম গাছে ফুল ফুটিয়া দিক আলো করিয়া আছে আর তাহার উপর ময়ূর-ময়ূরী পেখম ধরিয়া নাচিতেছে। সবুজের ভিতর হলিদা, হলিদার ভিতর সাদা, তাহার উপর চুনোট করা মণি-মুক্তার কাজ, কত মণির কত রকম রঙ মিলিয়া মিশিয়া ঝক্‌মক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সেই বৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশরি বাজে. সে বৃন্দাবনে গোপিনীরা রাসলীলায় নাচে। মাঝে নবঘনশ্যাম, চারি দিকে বিদ্যুদ্‌বরণী গোপীগণ যেন মেঘ বেড়িয়া বিদ্যুন্মালা হইয়া বেড়িয়া নাচিতেছে। এই সুখের বৃন্দাবন বৈষ্ণবের শেষ গম্যস্থান। সুখাবতী মহাযানওয়ালাদের শেষ স্থান। সেও বড়ো পবিত্র, বড়ো পূত, বড়ো মনোহর। ক্রিশ্চানের পারাডাইস, মুসলমানের বেহেস্ত, হিন্দুর নন্দনবন— সবই পবিত্র. সবই মনোহর, সবই সুখে ভরা। সবই পুণ্যবলে পাওয়া যায়। আমি অনেক সাধনায়, অনেক তপস্যায় আমার শেষ গম্যস্থান বৃন্দাবন পাইয়াছি। এ বৃন্দাবন তোমার স্মৃতিতে ভরা। তোমার স্মৃতি, একটু ভ্রম হইল, একটু মনের বেগ হইল —তুমিই, তুমিই বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাই তোমার জন্য ব্যাকুল হইলে সেই বৃন্দাবনের দিকে, যেখানে যেখানে তোমার সঙ্গে মিলন হইয়াছিল. তাহার দিকে চাহি, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি। তৃষ্ণাদীর্ঘ চক্ষু সেই দিকে লাগাইয়া রাখি। আবার তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হইলে তাহাই করিব। সেই দিকেই চাহিয়া থাকিব। নিজের দিকে দৃষ্টিপাতই করিব না। নিজের যে চুল খুলিয়া গিয়াছে, তাহার খবরই নাই, নিজের অভাবের উদ্বোধনই নাই। নিজে না খাই, না পরি, তাহার প্রতি লক্ষ্যই নাই। নিজের বসন, নিজের ভূষণ— ইহার চেষ্টাই নাই। চুল খুলিয়া

গিয়াছে, বসনগ্রন্থি শিথিল হইয়াছে, অলংকারগুলা ছিঁড়িয়া যাইতেছে; জ্ঞান নাই। আত্মহারা হইয়া আমার প্রথম মিলনের জায়গায় চোখ দিয়া বসিয়া আছি, চোখ সরাইতে পারিতেছি না। দৃষ্টি সেখানে গাঁথিয়া গিয়াছে, দৃষ্টির উপর চক্ষু আবদ্ধ, চক্ষুর খাতিরে মস্তক আবদ্ধ, মস্তকের খাতিরে সমস্ত শরীর আবদ্ধ। আমি নিস্পন্দ, নির্বাক, নির্নিমেষ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আত্মহারা।

রন্ধন আমার নিত্য কর্ম। আমার স্বামী আছে, পুত্র আছে, কন্যা আছে, শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন, আরো কত গুরুজন আছেন, তাঁদের সেবাও আমার পরম ধর্ম। আমি যদি তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা না করি, তুমি কি আমায় অনুগ্রহ করিবে ? তোমার প্রীতি কি আমি পাইব ? তোমার দর্শন কি আমি পাইব ? তুমি যে আমার সর্বস্ব, তুমি যদি একবার মুখ বাঁকাও, আমার যে অনন্ত নরকেও গতি নাই। তাই তোমার প্রীতির জন্য আমি কায়মনোবাক্যে গুরুজনের সেবা করি, যাহা যাহা আমার ধর্ম বলে, সব প্রতিপালন করি। সেই রন্ধনের জন্য রান্নাঘরে গিয়াও তোমায় ভুলিতে পারি না, কেবল গুন্-গুন্ করিয়া তোমার গুণ-গান করি। 'প্রাণের বঁধু এসো হে এসো হে' বলিয়া তোমায় ডাকি। বঁধু হে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, অপরাধ করেছি, ক্ষমা করো বলিয়া তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি ভালো সুক্ত রাঁধিয়াছি, বঁধু হে, চেখে দেখো। তেল-পিটিলির বড়া তুমি বড়ো ভালোবাসো, বেগুনের তেল-পিটিলি করিয়াছি। ইহাতে হিং আছে, তিল আছে, মৌরি আছে, একবার চেখে দেখো। আমার রন্ধন সব চেখে দেখো। পায়স রেঁধেছি, একবার চেখে দেখো। কত পিটা-মাটা রেঁধেছি, একবার চেখে দেখো। খেয়ে কাজ নাই, তোমায় খাওয়াব আমার কি ভাগ্য, একবার চেখে দেখো, চেখে দেখো বলিয়া তোমায় ডাকি। তোমার কত গুণ, তাই গাইয়া বেড়াই। সে গুণের ইয়ত্তা নাই। সব গুণ অপেক্ষা আমার কাছে তোমার অসীম ক্ষমাগুণের আদর বেশি, কারণ, আমি অবলা, কুলবালা। আমার বুদ্ধি নাই, শুদ্ধি নাই, কাণ্ডজ্ঞান নাই, ভালো-মন্দ-জ্ঞান নাই। তোমায় ভালোবাসিয়া আমি আরো আত্মহারা হইয়াছি। আমার অপরাধের সীমা নাই। কত অপরাধ যে মুহূর্তে মুহূর্তে করিয়া ফেলি, তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে আমি দেখি, তিলে তিলে তাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু তিল কি তাল, তোমার অসীম ক্ষমার কাছে সবই সমান ; তুমি সবই ক্ষমা করো। তোমার ক্ষমা না থাকিলে কি আমার মতো ক্ষুদ্র প্রাণী তোমার প্রীতি লাভ করিতে পারে ? তাই আমি সদাই রান্নাঘরে বসিয়া তোমার ক্ষমাগুণের প্রশংসা করি, গান গাইয়া থাকি।

'যখন রন্ধনশালাতে যাই তুঁয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।'

তোমার অত গুণ, কত গাহিব ? তাই আমি যে গুণের জন্য ঘুরি, কেবল সেই গুণই গাই। আমার প্রতি যেন এই অনুগ্রহ চিরদিন বজায় থাকে। রান্নাঘরে আমার আর-এক কাজ আছে— কান্না, দুঃখিনীর চির-সহচর। আমি কাঁদি, প্রাণ ভরিয়া উঠিলে খানিক বাহির করিয়া দিই। কান্না দুঃখময় হৃদয়ের সেফ্‌টি ভাল্‌ব। তোমার বিরহে আমার হৃদয় দুঃখের সমুদ্র হয়, তাই নদী-নালা কাটিয়া কিছু জল সে ভরা সমুদ্র হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার দরকার হয় ; তাই কাঁদি। কিন্তু বিজনেই কাঁদি। রান্নাঘরের উনুন বড়ো বিজন ; আমার কান্নার বড়ো সুবিধা, কেহ দেখিতে পায় না। যদি ননদ বা ভাজ দেখিতে পায়, আমি বলি, চোখে ধুঁয়া লাগিয়াছে, কাঁচা কাঠের ধুঁয়া, বড়ো চোখ করকর করে, তাই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। তোমার বিরহ-দুঃখটি তাহাদের কাছে গোপন করি। ও প্রীতির কথা কি অরসিককে বলিতে আছে ? ডবগা ছুঁড়িরা ও কথা লইয়া রসরঙ্গ করিবে ; কুৎসিত কথা কহিবে ; কত কল্পনা-জল্পনা করিবে, সেটা আমার অসহ্য হইবে। তাই ধুঁয়ার ছলনা করিয়া থাকি এবং সেই ছলনা করিয়া কাঁদিয়া থাকি। নহিলে আমি কি ইচ্ছা করিয়া একটা মিছা কথা কহিব ? কহিলে তুমি তো প্রায় অন্তর্যামী, জানিতে পারিলে আমার প্রতি বিরূপ হইবে, আর আমার জন্ম-কর্ম সব বৃথায় হইবে, যে জীবনটুকু পাইয়াছি, আবার হারাইব, আবার নির্জীব জড়পদার্থবৎ হইয়া পড়িব। মনের মানুষ হারাইব। এ যে সুখ—মিলনেও সুখ, বিরহেও সুখ। কারণ, মিলনেই বলো, আর বিরহেই বলো, মনের মানুষ যে পাইয়াছি, সে যে আমার আছে, তাহাকে যে চেষ্টা করিলেই কাছে পাইব, সেটাতে তো সন্দেহ নাই। আছে—বিশ্বাসটাই মহাসুখ। সে সুখে বাঁচিয়া আছি, সেই সুখে নাড়িয়া চাড়িয়া বেড়াইতেছি। সেই সুখে কাজকর্মে উৎসাহ জন্মিয়াছে, স্ফূর্তি জন্মিয়াছে,

দশ হস্তীর বল জন্মিয়াছে। এখন হে মনের মানুষ, হে প্রাণকান্ত, তোমার কাছে এক প্রার্থনা—শেষ প্রার্থনা—স্বল্প প্রার্থনা—যেন আমার "আছে," এ বিশ্বাসটা যায় না। তুমি আমার আছ. এটা যেন সদাই মনে করিতে পারি। সেই বিশ্বাসই সুখ, সেই মনে করাই আনন্দ। হে অনেক যত্নের নিধি, হে চিরবাঞ্ছিত! যেন এ আনন্দে বঞ্চিত না হই।

'মাসিক বসুমতী'
পৌষ, ১৩৩৮ ॥

# পরিশিষ্ট

# বাল্মীকির জয়

১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪ খৃ.) লেখা সমালোচনা। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রথম প্রকাশিত এবং 'বাল্মীকির জয়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৬ খৃ.) সূচনায় সংশোধিত ভাবে পুনর্মুদ্রিত। এখানে 'বাল্মীকির জয়'-এ মুদ্রিত পাঠ অনুসরণ করা হল।

বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। "বাল্মীকির জয়" কিয়দংশে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেননা ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না, কেননা ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা আছে কিন্তু পুরাণ নহে; দিগ্বিজয়ের কথা আছে কিন্তু ইতিহাস নহে; একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ "Origin of species" নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাল, গ্রন্থের জাতিনির্ব্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা

করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "The Three Forces— Physical, Intellectual, and Moral." ইংরেজি ভাষার শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force ত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাটমূর্তি— বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি ! যদি বল এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিব। তোমাব মানবদেবী অপেক্ষা আমার দুর্গাঠাকুরাণী অনেক ভাল। দুর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানবদেবী কোথায় ?

কথা অনেকদিন হইতে দেশে আছে— কোন্ কথা নাই ? তিনটি force— physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অথবা তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না— ইঁহারা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কলা মহার্ঘ করেন, আর একজন কেবল দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং— আমরা অন্য ত্রিমূর্ত্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগরপারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্ত্তি Physical, Intellectual, Moral ! দেখ Physical— আমাদের এই বাহ্য সম্পদ ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য ! এই অসংখ্য অজেয় সেনা ! Intellectual— সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্র !! আর Moral ? বুঝি শুধু খ্রীষ্টধর্ম্ম। এ ত্রিমূর্ত্তিতেও অমাদের মন উঠিল না— আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্ত্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং ! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি ? তুমি বলিবে— আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয় ? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও— সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ। সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে সমস্ত মনুষ্য-বংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি ? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র "Fraternity !" ভ্রাতৃভাব। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ

কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে, তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে ; যখন মনুষ্যে মনুষ্যে "ভাই ভাই" সম্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্যসমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই "ভাই ভাই" সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এ দেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে— তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলা মোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চাণক্য ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলেন ; ভ্রাতৃভাবে হইবে না— আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর— সর্ব্বভূতেষু !

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই যে, এই গ্রন্থে যেখান "ভাই ভাই" পড়িব সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল, পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কিসে হইবে ? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, একচ্ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবারি একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের একচ্ছত্রাধীন সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তর-ভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল। আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও ! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে— সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাদ্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর একদল বলেন, "আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই— আছে কেবল বাক্যবল ; আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।" যীশু ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্ম্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর সুকবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি— এই তাঁহার বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে "Physical, Intellectual, এবং Moral" নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে— এমত আমাদের বোধ হয় না !

যাহাই হউক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে পুণ্যবান্ মনুষ্য মরিয়া স্বর্গে যায়, কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যায় না। তাহারা ঋভু হয়। ঋভুগণ কোন দিব্য লোকে বাস করেন। গ্রন্থের প্রথম দৃশ্য, ঋভুগণ এক রাত্রে সংমিলিত হইয়া পৃথিবীদর্শনে আসিতেছেন। কাব্যাংশে বাঙ্গলা ভাষায় এ.

দৃশ্যের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে "সহসা ছায়া পথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইল— তাহার মধ্য হইতে অগণিত সংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া— আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে।"

ঋভুগণ হিমালয়ে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না— উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয়-বর্ণনা আজিও সাহিত্যসাগরে অতুল— তাহা স্মরণ কর। দেখিবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ! কুমারসম্ভবের কবি,— জগতের কবিকুলের আদর্শ— অতিপ্রকৃত সৌন্দর্য্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু আধুনিক কবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চিরমার্জ্জিত পবিত্র অতিপ্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া, পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব?

ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গান করিলেন। সে গানে বিশ্ব বিমোহিত হইল। গানের ধূয়া "ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!" গান করিয়া ঋভুগণ আকাশপথে চলিয়া গেলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেত-মেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

গান শুনিয়া পৃথিবীস্থ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিন জনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। একজন বাহুবলে বলী দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্যাবলে বলবান্ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। তৃতীয় নরহত্যাকারী দস্যু বাল্মীকি।

বিশ্বামিত্র সেই "ভাই ভাই" মোহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাই ভাই সম্বন্ধে মিলাইতে পারিবেন : "অহং বিশ্বামিত্র। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কানে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন যদি পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র— কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?"

বশিষ্ঠ ভাবিতেছেন :— "বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এখন কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না?** সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি? তেজ কি: শাস্ত্রে ত বলে 'স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ' তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব ; পারিব না কি? তেজঃ, সত্য। ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন?"

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, "কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম ; তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল ; আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায় কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম! কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল!"

গোড়াতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উভয়ে প্রভাতে হিমালয় অবতরণ করিতেছিলেন— সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরিচিত হইলেন— এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন,— আপনার অতুল ঐশ্বর্য দেখাইলেন, বশিষ্ঠের বড় সমারোহে আতিথ্যসৎকার করিলেন, এবং রত্নরাশি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন। গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন— তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য গুরুতর। দেখিয়া "বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য কোথা হইতে আসিল?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"বশিষ্ঠ বলিলেন, 'মহারাজ আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।'

"বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।'

"বশিষ্ঠ বলিলেন, 'আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না।"

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না— বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন, যে গোরু কাড়িয়া লইয়া চল। তখন বশিষ্ঠ কি করেন— ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা। কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়া যায়, কার সাধ্য— নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে অগণিতসংখ্যক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইলেন।

বাহুবল বিদ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তারপর এখন বিদ্যাবল ধর্ম্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়— বাল্মীকির জয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু নবীন গ্রন্থকার— অব্যয়িত প্রতিভার বলে মহাবলবান্— এ সোজা পথে যাইতে ঘৃণা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে লেখকের গতিকে দৃপ্ত সিংহের গতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং— ব্রহ্মতেজোবলং বলং"— তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেলেন— তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান "ব্রাহ্মণত্ব"। কিন্তু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্মা কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন না। বিশ্বামিত্র কিছুতেই অন্য বর লইলেন না— ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মর্ষিগণকে হাঁকাইয়া দিলেন। বলিলেন :—

"তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।"

তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দুঃখ রহিল না— ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাহার নিয়ন্তা। পাঠক দেখিবেন যে, গ্রন্থাকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন— এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন তিনি বাহুবল নহেন— এখন তিনি বিশ্বামিত্র তপোবল, বিদ্যাবল। নন্দিনীর হুঙ্কারে সাগরবৎ সেনা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল— বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নূতন সৌর জগৎ সৃষ্ট হইল। বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাঁহাকে বাল্মীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা— কিন্তু মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল একদিন কাঁদিয়াছিলেন, "সব হইল— কিন্তু সুখ

কই ?” বিশ্বামিত্রও এখন কাঁদিলেন, “সব হইল, কিন্তু সুখ কই ?” সুখের জন্য পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয় স্বজন সহিত কান্যকুব্জনগর উঠাইয়া লইয়া আপনার সৃষ্টিতে চলিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিছু দূর গিয়া পুরী আর যায় না— পড়িয়া যায়— ব্রহ্মা ধরিয়া নামাইয়া লইলেন। তার পর, বিশ্বামিত্র নিজে স্বীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শূন্য হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে বাল্মীকি ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি,— তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন— ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বাল্মীকি-প্রতিভা”— পড়িয়াছেন. বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্ম-বৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক— প্রথম কবি। তিনি পৃথিবীময় গান করিয়া বিচরণ করেন— সমবেদনা শিখান— তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রকৃত সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন— সেইখানে সমস্ত পৃথিবী আহূত ও সমবেত। একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে— এক দল যজ্ঞ করিতে দিবে আর এক দল দিবে না। দুই দলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নিবারক একা বাল্মীকি। বাল্মীকির অস্ত্র— অশ্রুজল, বাণীদত্ত বীণা। এই সময় অনন্ত শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া লোকে ভীত ও বিস্মিত হইল— বাল্মীকির বাক্যবল বাড়িয়া গেল— তাঁহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ হইল— লোকের মন ফিরিল— বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গেল— **বাল্মীকির জয় হইল।**

ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি ও আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে “সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্যস্থাপনমানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।” বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন তিন জন ঋষি রামায়ণের “Plot” নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, “রামকে ধার্ম্মিক কর।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ কর।” বাল্মীকি বলিলেন, “আমি রামকে আদর্শ মনুষ্য করিব।”

রামায়ণ প্রণীত হইল। তার পর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল— নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শেষ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন— বিশ্বামিত্র ঋভুদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকেও স্বর্গ-যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্মীকি তখন গেলেন না— তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রহ্মার আদেশে তিনি নভোমণ্ডলে বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বাল্মীকি সেই বিরাটমূর্ত্তির স্তুতিবাদ করিলেন।

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

"তখন ব্রহ্মা বলিলেন, 'বাল্মীকে! তুমি দেখ সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।'

"বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল 'জয়!"

পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা— আমাদের জানা আছে। যাঁহারা আরও বাহাদুর তাঁহারা বলিবেন, যে এ কেবল গাঁজা। ছায়াপথ ফাটিয়া দ্বিধা হইল, নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সহস্র সহস্র সেনা সৃষ্ট হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এ সকল গাঁজা নয় ত কি? যাঁহারা আর একটু সুশিক্ষিত তাঁহারা বলিবেন এ রূপক। নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সৈন্যের সৃষ্টি, ইহার অর্থ সরস্বতীর অনুকম্পায় জড়বলের উপর মনুষ্যের আধিপত্যস্থাপন। নন্দিনীর এক হুঙ্কারে বারুদের সৃষ্টি, আর এক হুঙ্কারে ধূমযন্ত্র ষ্টীমের কল, বাষ্পীয় পোত, রথ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি কেহ রূপক বলিতে চান, আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আমরা বলিব, ইহা যদি রূপক হয়, তবে স্পেন্সরের রূপকের মত, রূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীতগুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণ সকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ— কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋভুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাটদর্শন,— যাহা দেখ সকলই

মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্ব্বাপেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মূর্ত্তি। রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁচে ঢালা, এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ— হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাপা জোকা বেড়া গোড়া। রাবণ ও বৃত্র প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইলেও মাপা জোকা বেড়া গোড়া। কেবল সেই প্রাচীন পুরাণ প্রণেতারা অপরিমেয়, অনন্ত বিরাটমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে জানিতেন : পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মানসিক শক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য্য উভয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে ; এবং এই বিশ্বামিত্র প্রণয়নকালে তিনি প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রুচি পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহাদের কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে না।

যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেক বার এ পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

২

যোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পত্রিকায় (২৩ পৌষ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত সমালোচনা, 'বাল্মীকির জয়'-এর তৃতীয় সংস্করণে সংকলন করা হয়। ১৩৩১-এর বৈশাখ সংখ্যা সুবর্ণবণিক সমাচার পত্রিকায় 'সাহিত্য-সংবাদ'-এ উদ্ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য থেকে জানা যায়, এ সমালোচনা লেখেন দেবেন্দ্রবিজয় বসু। বঙ্গবাসী পত্রিকা এখন দুষ্প্রাপ্য, এখানে 'বাল্মীকির জয়' তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রিত পাঠ নেওয়া হল।

বাল্মীকির জয়। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম. এ. প্রণীত। সাহিত্যসংসারে বাল্মীকির জয় একটী নূতন জিনিষ। মনুষ্যের মনের কি অসীম ক্ষমতা, মানুষ ইচ্ছা করিলে, প্রতিভাবলে, সমস্ত বাহ্যজগৎ কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, হরপ্রসাদ বাবু একথাগুলি বাল্মীকির জয়ে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ কল্পনা সম্ভব নহে। জর্ম্মান কবি গেটে ফাউষ্ট গ্রন্থে মনুষ্যের অসীম শক্তি কতকটা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইউরোপ মধ্যে তাই আজ গেটের নাম এত বিখ্যাত। বাল্মীকির জয়ে বিশ্বামিত্র বাল্মীকি প্রভৃতির আশ্চর্য্য চরিত্র কল্পনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। হরপ্রসাদ বাবুর বর্ণনা অতি মনোহর। তাঁহার উজ্জ্বল-ভাবময়ী কল্পনা বর্ষাকালের নদীর মত ; পূর্ণ, উচ্ছ্বসিত, বলিষ্ঠ, শোভাময় অথচ অবিরতগতিতে স্বীয় উদ্দেশ্যপথে প্রধাবিত হইতেছে।

পুস্তকখানির উদ্দেশ্যও অতি মহৎ। যে কথা শাক্যসিংহ হইতে রুশো পর্য্যন্ত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন— হরপ্রসাদ বাবু অতি সুন্দররূপে তাহা বুঝাইয়াছেন। বুদ্ধিই বল, আর বীর্য্যই বল, এ সংসারে সাম্য ও একতা সংস্থাপনে অক্ষম। নেপোলিয়ানের ন্যায় বীরত্ব, অথবা কম্‌টী কি রোবস্‌পিয়রের মত প্রতিভা থাকিলেও কেবল বুদ্ধিবলে সাম্যসংস্থাপন সম্ভব নহে। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম বলই প্রধান বল। বুদ্ধদেবই বল, চৈতন্যই বল, খ্রীষ্টই বল আর রুশোই বল, একমাত্র ধর্ম্মবলে, একমাত্র হৃদয়ের বলে, তাঁহারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি প্রতিভায় নূতন উপায়ে এ কথাটী সুন্দররূপে বুঝান হইয়াছে। এই পুস্তকের কাব্যাংশও মন্দ নহে। ঋভুদিগের গান শুনিয়া ক্ষত্রিয়ের, বিশেষতঃ বাল্মীকির মন পরিবর্ত্তন, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কামধেনুর জন্য বিবাদ, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি— এগুলিতে চমৎকার লিপিকৌশল আছে। বিশ্বামিত্র যখন নিজ বাহুবল ও সৈন্যবল অভীষ্টসাধনে অসমর্থ দেখিলেন— বুদ্ধিবলের উৎকর্ষ বুঝিলেন— তখন তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যা কি ? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রস্ফুটন ও পরিবর্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। শেষে মানসিক শক্তিও বাল্মীকির ধর্ম্মবলের কাছে পরাস্ত হইল। হরপ্রসসাদ বাবুর দার্শনিক মত সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় এই যে, সমাজের প্রথম অবস্থায় এবং সভ্যতার প্রারম্ভে বাহুবলই শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহার পর বুদ্ধিবলের সময়— এ সময়কে পৌরোহিত্যাধিকার বলিলেও অসঙ্গত
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

হয় না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য, ইউরোপে ডার্ক এজে খৃষ্টীয় পাদরিদের প্রাদুর্ভাব এই সময়ের পরিচয়। তাহার পর উচ্চতর নীতির সময়। এ সময়কে সাধারণমতের সময় বলা যায়।

ইউরোপে এক্ষণে অনেকটা এই সময় আসিয়াছে। সেখানে রাজ্যসাধারণ সম্পর্কীয় আইন বলবতী হইয়াছে। এখন যদি ইংলণ্ড ইজিপ্ত অধিকার করিতে চান, রুসিয়া কি জর্ম্মানির ভয়ে তাহা পারিবেন না। ইহাই আমরা নৈতিক বল মনে করি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল এবং আর একটু সহজ হইলে ভাল হইত।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

৩

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে *The Calcutta Review* (Vol. LXXIV, No. CXLVIII) পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা। 'বাল্মীকির জয়'— তৃতীয় সংস্করণে সংকলন করা হয়। এখানে পত্রিকার পাঠ অনুসরণ করা হল।

In a recent number of this Review we had the pleasure to introduce Mr. Sāstri to our readers as the author of an exceedingly useful and interesting work entitled *Bhārat Mahilā.* Mr. Sāstri's new work *Vālmikir Jaya,* is one of an entirely different description. *Bhārat Mahilā* is of the nature of a digest, or compilation, prepared with considerable erudition and critical acumen. *Vālmikir Jaya* is of the nature of a poem, and, as such, it furnishes a clearer and more conclusive test of the author's mental powers than *Bhārat Mahilā.* One autumn evening, just at the point of time when the *Satya Yuga* was passing away and the *Treta Yuga* was coming in, the skies presented a wonderful spectacle. Breaking through the vast milky expanse over head and illumining by their heavenly brightness the infinite space around, there descended on the high summits of the Himalayas a countless host of *Ribhus*, or spirits of departed ancestors, who sang a song of universal brotherhood, which entranced the Universe, but which only three men understood. These three were Basistha, Biswamitra and Valmiki, who felt profoundly stirred by the spirit of the song, and resolved to establish Universal brotherhood among men. Basistha proposed to do this by his intellectual power over the different castes into which Hindu society was divided; Biswamitra by establishing a military sovereignty over the whole race of man. In a conflict which soon broke out between these two men, Biswamitra's military power gave [a]way before Basistha's spiritual or intellectual power; whereupon Biswamitra resolved to usurp the superior spiritual power of Brahmin. With this object in view,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

he entered upon a course of spiritual meditation, combined with physical austerities, which enabled him in the end to defy even Brahmā, and to create by spiritual force an entirely new world, with a new solar system, in which order and harmony reigned supreme. But Biswamitra himself felt solitary and miserable in his newly created world ; and so he resolved to take up and place there in the great city of Kanouj, the capital of his terrestrial empire, wherein lived all his friends and relatives. But the attempt proved unsuccessful, because the spiritual power acquired by him had been fully spent in the creation of the new world. His new world was therefore resolved back into its original nebulæ, and he himself, deprived of his spiritual power and half stupified with grief, fell whirling down upon a grand ceremonial altar, where Basistha was about to perform a great sacrifice, and around which were ranged to hostile parties, representing respectively the sacerdotal and warrior classes, armed to the teeth, and ready to close in deadly conflict, but exhorted all the while by the humane Valmiki and his humanised fraternity to forget all class-interests, and love each other as brothers. The song prevailed ; all hearts were melted ; Basistha and Biswamitra embraced each other and Valmiki ; a strong wave of brotherly feeling swayed the vast multitude ; the gods, who had assembled there, blessed every body, and went back to their abodes well pleased at the fraternal union, effected by Valmiki's song of universal brother-hood.

Such is, in a few words, the plot of this poem. It is written in prose, but it is not on that account the less a poem. Its object, as may be seen from the brief summary given above, is to prove that social order can not be created and maintained by mere physical force, nor even by intellectual force, and that moral force is alone competent to do this. We are not quite sure whether this is a

complete solution of the question of social organization ; but this we can say, that Mr. Sāstri's method of solution, so far as it goes, is not correct. If his Biswamitra and Basistha are respectively intended to represent physical force and intellectual force, they are both failures. Biswamitra creates his typical world, not by means of physical power, but by spiritual power, and thus we find no experiment of harmonious social organization effected by the exercise of mere physical power. If Biswamitra had established a vast military empire, like that of the Romans in the ancient world, or like that of Napoleon Bonaparte in the modern, and if that empire had been found crumbling to pieces through the action of the dissolving forces which are inherent in purely military organizations, we should have had in him a true representative of the idea which he is intended to personify. But he does not do that, and the experiment of a harmonious social organization effected by physical power remains, therefore, unperformed. Basistha, again does not represent intellectual power, but priestcraft or sacerdotal cunning ; and, as regards social organization, we do not even find him making an attempt in that direction. We do know of any instances in history of attempts made by individuals or communities to construct society upon a purely intellectual basis. But a man of strong imaginative power, like Mr. Sāstri could have easily gathered materials for an intellectual experiment from such facts as the Puritanic regime in England (which laid an interdict upon the fine arts and the sports and amusements of the people), the scholasticism of the Middle Ages, and the merciless intellectualism of the Convention. But though defective and even incorrect in procedure, Mr. Sāstri is really grand in his execution. His sentiments are pure and elevated, his scenes are full of the greatest loftiness of the earth and the skies, his style is cast in the high heroic mould, his imagi-

nation soars above the greatest heights of the earth and the heavens. His Biswamitra, apparently his most favourite creation, is a grand colossal figure, a wonderful monument of imaginative powers in modern Bengali literature. Mr. Sāstri is really a poet, and an ornament to his country's literature.

Continuing the thread of his narrative, Mr. Sāstri gives in his concluding chapter a brief view of the moral plan of Valmiki's *Ramayan.* The poet is represented as giving the following account of what he intends doing in his great epic.

"আমি রামকে ধার্ম্মিকও করিব না ; বীরও করিব না ; রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন ; তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্র বর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা ও আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটী মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।"

The reader will find in this a happy coincidence with the view which we have ourselves taken of the *Ramayan* in our notice of Babu Rajkrishna Raya's Bengali metrical version of that poem in the last number of this *Review.*

## ৪

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের এই আলোচনা "The Neo-Romantic Movement in Literature" প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে *The Calcutta Review* (Vol. XCII, No. CLXXXIII) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। পরে তাঁর *New Essays in Criticism* (Calcutta, 1903) বইয়ে সংকলিত। এখানে বইয়ের পাঠ নেওয়া হল।

We have, in the endeavour to give a connected account of the neo-Hindu movement, passed over two remarkable works, one of them of monumental grandeur, in the neo-romantic literature of Bengal. The Valmikir Jaya, or the three forces physical, intellectual and moral, of Pandit Haraprasada Sastri, and the Sarada-Mangala of Babu Beharilala Chakravarti, represent a real advance in method and design upon the transfiguration of subjective egoism with which Babu Rabindranatha Tagore's lyrics are replete. What predominates in these two works, the one a prose rhapsody, the other a phantasmagory in verse, is the mythopœia, both the transfiguration and criticism being subordinated to the central myth. Generically speaking, we may call this the mythopœic method of poetic interpretation, of which the fundamental design is a phantom-like succession of majestic shapes and images, stalking figures, allegories, and symbols, rolling on in one vast, surging, dream-like movement "*tumultuosissimament'e*". Goethe's phantasmagory of Helena, De Quincey's Dream-fugue, many of Richter's rhapsodies in his Fruit, Flower and Thorn pieces, as also in his Recreations under the Cranium of a Giantess, Shelley's Witch of Atlas, Sensitive Plant and to a great extent, his Alastor and Epipsychidion, and Byron's Dream, are glorious examples of this mythopœic method of poetic interpretation. There are endless varieties of this method, according as the two constituent elements, the phantasm and the movement, vary in character, and according as there is

more or less of transfiguration and criticism. For example, the Valmikir Jaya is instinct with the profoundest criticism of life and society, and of schemes of regeneration of humanity, the myth being grouped round a central idea, or regulative conception. On the other hand, the Sarada-Mangala, which may be described as a Bengali version of a phantasmagory that should combine the two visions Alastor and Epipsychidion in one, revels in an intoxication of emotional transfiguration. With regard to the movement, the Valmikir Jaya is more processional, the Sarada-Mangala more billowy. Similarly, the phantasms, visions, or images have a definite sculptural, cast in the one, and an indefinite, musical billowiness in the other. We have said that the mythopœic method is an advance upon a method of mere transfiguration, such as natural magic or the transfiguration of subjective egoism. This is because creative or constructive imagination is more elaborative, and has greater complexity of organisation, than mere emotional exaltation, however intense. As a result, a deeper criticism of life, a higher regulative conception, is usually present in the former than in the latter. Indeed the central idea of Valmikir Jaya, which is very inadequately expressed by describing it as the eternal triumph of moral over intellectual and physical force, has alike moral profundity and universal applicability. It is not, however, the criticism of life and society, but the mythopœia, the phantasmal succession, that constitutes the essence of this sublime rhapsody. For we must say at once that it is the most glorious phantasmagory in literature known to us. Goethe's Helena with its weird uncertain movement, mingling the antique with the mediæval, the classical with the romantic, displays a fine critical insight; but it pales before the Valmikir Jaya, not only in moral profundity, but also in grandeur of design, a sense of primitive ele-

mental freedom, and an intoxication of the creative imagination. De Quincey's Dream-fugue, strangely mingling the sepulchral passion of deliverance from sudden death with the jubilant salvation of Christendom from that apocalyptic dragon, the first Napoleon, and symbolically with the Resurrection of Christ, strains after a profound spiritual significance ; but it pales before the Valmikir Jaya, in internal and organic connectedness, if not in the weird sublimity of the phantom-like procession. Richter's Dream of the dead Christ is morally profound, and grotesquely imaginative ; but it pales before the Valmikir Jaya in magnitude and breadth of canvas and dramatic intensity of life and passion. The Bengali phantasmagory is sublime not with the sublimity of Ossa and Olympus, but with that of the Himalayan range. Visvamitra, with his creation of a Universe and his fall, forms the Everest,—the descent of the celestial Ribhus from beyond the Milky Way upon the mountain summits the Kinchinjanga, and the vision of the Virata Murti, or the Universe-body of Vishnu, the Dhawlalgiri, of the majestic range. The transfiguration here of the India of the Ramayana period (though not in the neo-Hindu interest) would compare favourably with that of the India of the Mahabharata epoch in the Raivataka fragment, both bearing marks of the illumination in the motto of fraternity of universal brotherhood, and it may be safely said that Visvamitra and Krishna, whih the two visions of the Virata Murti, are the sublimest conceptions to which the neo-romantic movement in Bengal has given birth. And this leads us to remark that the neo-oriental material of the Puranas lends itself with peculiar ease to neo-romantic treatment. In the classical epos of Michael Madhusudana Dutt and Hemchandra Banerji, we observe no special advantage that the poets derive from the nature of the neo-oriental traditions they work up ; but this is at once perceived when

neo-romantic treatment is applied to the neo-oriental material. This is easily intelligible *a priori*, when we consider the element that is common to the three transitional stages, the neo-oriental, the neo-classical and the neo-romantic.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

৫

'বাল্মীকির জয়'-এর ইংরেজি অনুবাদ *The Triumph of Valmiki* সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের *The Calcutta Review* (Vol. CXXIX, No. CCLVIII) পত্রিকায়।

**To translatc from one language to another and to do so without the sense or beauty of the original being lost is admittedly extremely difficult of accomplishment. That Mr. Sen who is Law Lecturer in the Chittagong College has attained such marked success in his English version of H. P. Shastri's Bengali *Valmiki[r] Jaya* places him in the forefront of translators and shows that he is possessed of marked linguistic abilities. The purity with which the theme of the work is maintained is not its least pleasing characteristic and the way in which he has preserved the spirit of the original constitutes a triumph.**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## ৬

সিলভাঁ লেভি Sylvain Lévi ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা *Journal Asiatique* পত্রিকায় *The Triumph of Valmiki*-র সমালোচনা করেন। এখানে ফরাসি ভাষায় লেখা মূল রচনা এবং পরে তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হল।

Le pandit Haraprasad Shastri est un des grands noms de la science indienne. Formé à l'école de Rajendralal Mitra, il a su égaler l'érudition solide et brillante du maître ; il a édité une masse de textes dans la Bibliotheca Indica ; il a publié des mémoires importants dans le *Journal de la Société asiatique du Bengale* ; il a continué, après Raj. Mitra, la série des Notices qui restent encore le modèle des catalogues indigènes de manuscrits ; il a été chargé de plusieurs missions au Népal et il en a rapporté de nombreux documents ; il a enseigné au Presidency College de Calcutta ; il a dirigé le collège sanscrit du Gouvernement ; enfin il a été promu, par brevet impérial, au titre d'archi-grand-maître (mahâmâhopâdhyâya). Mais Haraprasad Shastri ne s'est pas contenté d'être un érudit : il s'est essayé dans la littérature vernaculaire. Vers le début de sa carriére, il y a trente ans environ, il a publié une sorte d'épopée en prose bengalie qui est restée inconnue en dehors du Bengale : *Le Triomphe de Vâlmîki* (Vâlmîkir Jaya). M. R. R. Sen, avocat à Chittagong, vient d'en donner une traduction anglaise qui rend désormais l'œuvre accessible aux lecteurs européens. Il convient de lui en savoir gré, car, en dehors des mérites du style que la critique indigène avait vivement appréciés dans l'original, le *Triomphe de Vâlmîki* se recommande à l'attention par sa conception, son inspiration, les sentiments qui l'animent et la pensée qui s'y exprime.

Aux temps lointains du passé, entre le crépuscule de l'âge d'or (satya-yuga) et l'aurore de l'âge d'argent (tretâ-yuga), des saints mystérieux, les Ṛbhus, apparaissent soudain

au-dessus de l'Himâlaya et chantent une mélodie magique qui plonge les créatures dans une extase béate. Mais, entre tous les êtres, trois hommes seulement ont compris les paroles de ce chant : Vasiṣṭha en qui s'incarne l'orgueil de la science brahmanique ; Viçvâmitra, le champion de la noblesse militaire ; enfin Vâlmîki, destiné à s'immortaliser par le Râmâyaṇa, mais qui n'est encore qu'un chef de brigands. Les voix ont chanté : "Frère ! ô mon frère ! nous sommes tous frères !" Et le brahmane rêve d'une fraternité humaine imposée et maintenue par l'intelligence des brahmanes ; le guerrier, d'une fraternité humaine imposée par la victoire, maintenue par le chef : Vâlmîki ne pense qu'à la honte de sa conduite, et il se met à pleurer. Redescendu de la montagne, Viçvâmitra rend visite à Vasiṣṭha dans son ermitage ; il y voit la vache d'abondance, Nandinî, qui réalise tous les souhaits des brahmanes ; il veut l'avoir, de gré ou de force ; mais des flancs de la vache sort une armée invincible qui inflige à Viçvâmitra sa première défaite. Humilié, il disparaît, renonce au monde, se livre aux plus formidables austérités en vue d'obtenir le rang brahmanique ; mais la prière sacro-sainte, la Gâyatrî, a beau se révéler devant lui ; Brahma el ses ṛṣis, défenseurs obstinés du privilège de la naissance, refusent de lui concéder le titre envié. Furieux, Viçvâmitra se décide á créer par la puissance de ses mortifications un univers nouveau dont il sera le Brahma. Il s'élève par delà les espaces, et des atomes épars tire un monde entire qu'il organise à son gré. Cependant, ici-bas, l'anarchie qu'il avait su dompter étend ses ravages ; la terre n'offre plus que guerres, dissensions, pillages. Le génie de Vâlmîki sauve l'univers d'une ruine, définitive ; retiré dans les bois pour y pleurer ses fautes, il voit un chasseur qui frappe à mort un oiseau amoureux, prononce la célèbre imprecation rythmée qui fut le premier vers, et désormais initié à la poésie, il va de citéen cité

chantant la concorde, la charité, l'amour d'autrui, et toutes les mauvaises passions s'évanouissent à ses accents. Viçvâmitra exilé dans sa création, y sent douloureusement l'absence d'une sympathie humaine, d'êtres faits à son image et non pas à son goût. Il veut y transporter sa capitale et ses sujets terrestres ; mais ses mérites sont épuisés, sa force de miracle anéantie. Dans sa colère, il insulte Brahma et soudain l'univers qu'il avait créé s'anéantit. Viçvâmitra retombe sur la terre, à Kauçâmbî, en présence de Vasiṣṭha et de Vâlmîki, au moment même où Vâlmîki essaie de détourner un combat imminent. Brahma paraît en personne, reconnaît à Viçvâmitra la dignité brahmanique ; tous les partis se réconcilient et la foule crie : Vive Vâlmîki ! Pour fixer et pour perpétuer l'idéal humain tel qu'ils l'ont unanimement conçu, Vasiṣṭha, Viçvâmitra et Vâlmîki élaborent ensemble le Râmâyaṇa ; Vasiṣṭha y dépose les leçons de sa sagesse, Viçvâmitra celles de son expérience ; Vâlmîki y met son âme même. Plus tard, après des milliers et des myriades d'années. Viṣṇu incarné vient sous les traits de Râma réaliser cet idéal ; sa tâche accomplie, il remonte au ciel. Vasiṣṭha l'y suit et prend place parmi les étoiles de la Grande Ourse "les sept Ṛṣis". Viçvâmitra passe parmi les archanges. Et le dieu des dieux, Nârâyaṇa, manifeste sa forme suprême devant Vâlmîki et proclame à l'univers le triomphe du poète.

Réduit à une sèche analyse, le *Triomphe de Vâlmîki* ne semble être qu'une mise en œuvre banale du vieux matériel épique ; l'auteur n'a pas craint de puiser directement au Râmâyaṇa plusieurs épisodes : la lutte de Vasiṣṭha et de Viçvâmitra, la naissance du çloka. En fait, ce placage de noms consacrés et d'incidents fameux ne sert qu'à donner le change : il dissimule aux esprits superficiels l'originalité et la hardiesse de Haraprasad Shastri. Sous l'appareil de l'épopée antique, c'est l'Inde moderne qui est

en jeu. Vasiṣṭha, Viçvâmitra, Vâlmîki, ne sont ici que des symboles. L'Inde doit-elle rester fidèle à Vasiṣṭha, à la tradition séculaire, au régime des castes, à la hiérarchie des naissances avec les brahmanes au faîte ? Ira-t-elle à Viçvâmitra, le héros de la raison servie par la force ? Ou bien doit-elle préférer Vâlmîki, la douceur, la bonté, le sacrifice ? La réponse semble nette ; le titre même annonce la victoire de Vâlmîki. Et il convient de féliciter Haraprasad Shastri pour avoir si magnifiquement rendu justice au poète du Râmâyaṇa. Vâlmîki mérite une place au premier rang des gloires de l'Inde, à côté du Bouddha, car il a su exprimer sous une forme vraiment humaine les sentiments les plus nobles, les plus élevés, les plus touchants de l'humanité ; on ne l'approche pas sans y gagner en vertu. Tandis que le Mahâ-Bhârata est avant tout le code moral et social de l'Inde brahmanique, le Râmâyaṇa s'inspire de l'idéal universel. Mais, si Vâlmîki triomphe, Haraprasad Shastri ne lui sacrifie qu'à regret Viçvâmitra ; c'est Viçvâmitra qui occupe le premier plan, comme le Satan du Paradis perdu ; c'est lui qui s'impose à l'attention, à la sympathie, au souvenir. Si sa création échoue, ce n'est pas par impuissance, mais par excès d'audace ; il a logé son idéal trop haut pour le rendre viable. Il n'y a pas aménagé seulement le confort plantureux de toutes les utopies, les moissons spontanées, les retraites ombreuses, les lits de gazon parfumé ; "en amant passionné de la nature, il avait disposé des chemins faciles pour monter au sommet des hauteurs. Il avait aussi mis à la disposition de l'homme des moyens d'investigation pour observer les abîmes des cieux comme les abîmes de la mer. Il n'avait jamais cru à la supériorité naturelle des brahmanes ; il pensait qu'ils devaient leur suprématie à la culture des plus hautes facultés de l'esprit. Aussi, dans son désir d'assurer à tous les hommes d'égales facilités pour développer leur intelligence, il établit partout des écoles et des

institutions scientifiques. Pas de classe qui fût exclusivement qualifiée à enseigner la morale ; chacun pouvait participer à la tâche. La raison était la seule divinité adorable. Tous s'aimaient ; tous étaient égaux ; le progrès de chacun servait au progrès de tous...Le nœud du mariage n'existait pas dans le monde de Viçvâmitra ; mais la force de l'amour y était si puissante que les cœurs une fois unis ne se séparaient plus. En vînt-on même à se séparer, on attendait au moins trois ans avant de contracter une nouvelle union...Le nombre des naissances était limité." Par une ironie singulièrement expressive, dans cette œuvre d'un pandit, c'est le brahmane qui fait piètre figure ; Vasiṣṭha malgré son nom, est plus loin du ṛṣi védique que du Basile de Beaumarchais. Son entretien avec Viçvâmitra, au retour de l'Himâlaya, aurait mis en joie Voltaire et les encyclopédistes. Tandis que Viçvâmitra revendique avec une réelle grandeur les droits de la force pour établir l'ordre, Vasiṣṭha lui répond : "Non ! l'emploi de la force n'amène pas l'union. Tant que chaque homme pense par lui-même, impossible d'unir même deux créatures. La première et l'essentielle nécessité, c'est d'arrêter la liberté de la pensée. Il ne faut absolument pas que les basses classes aient la liberté de pensée."—Viçvâmitra : "Veux-tu dire qu'une demi-douzaine de brahmanes peut arretêr le cours de la pensée indépendante sur toute la terre ?"—Vasiṣṭha : "Quelle est la tâche trop difficile à accomplir pour l'intelligence ? Je changerai la teneur de leur esprit dès l'enfance. Je ferai qu'ils se livrent aux plaisirs et aux jouissances ; je ne les laisserai pas penser à autre chose . Je les priverai de l'étude des livres. Si une génération ne suffit pas, eh bien ! en dix générations l'homme ne sera pas seulement le frère de l'homme, il sera aussi le frère de la bête ! ... Je remplirai de formes effroyables le vide immense de là-haut. Les voyages en mer engendrent la liberté ; nous les interdirons.

Nous ferons la vie journalière si chargée d'observances que personne ne pourra bouger sans les brahmanes."— qu'on ne s'étonne pas ensuite si la vache mythique, Nandinî, qui nourrit à planté les brahmanes, n'est plus que le symbole du génie des brahmanes qui vit avec eux et qui les fait vivre.

Étudié au point de vue de la critique littéraire, le *Triomphe de Vâlmîki* provoquerait à coup sûr d'intéressantes observations ; ce serait l'occasion de montrer à quel point les modèles anglais ont agi sur l'imagination de l'Inde contemporaine. J'ai déjà, à propos de Viçvâmitra, évoqué le Satan de Milton ; Vâlmîki, chef de brigands et sauveur de l'humanité, semble sortir en droite ligne de Byron et de Walter Scotte. Le récit de la création porte l'empreinte éclatante de la Bible. "Viçvâmitra regarda, et il vit que la lumière était bonne. Il dit : Que Bûdha (la planète Mercure) soit ! et un fragment de la masse incandescente en révolution se détacha, s'envola dans l'espace, et se mit à décrire son orbite alentour..." Mais c'est là une étude où je ne veux point m'engager ici. Je ne me suis proposé que de montrer par un example frappant les préoccupations en cours dans l'Inde contemporaine. Haraprasad Shastri est loin d'être un politicien, un brouillon ou un révolutionnaire ; son œuvre n'est poin t un pamphlet d'actualité ; elle remonte à trente ans. L'Europe, en ce temps-là, croyait au conservatisme incorrigible et rassurant de l'Orient. Elle n'avait déjà, et depuis longtemps, qu'à lire et à se renseigner pour se convaincre du contraire.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'লেভির প্রবন্ধের অনুবাদ ॥

ভারতীয় জ্ঞানচর্চার জগতে বরণীয় যাঁরা তাঁদের অন্যতম পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুযোগ্য শিষ্য; বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল মনীষায় আচার্যের সমকক্ষ। "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা"র প্রচুর গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন তিনি: "এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল"-এর জার্নালে প্রকাশ করেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এ দেশে পাণ্ডুলিপি সমূহের সম্পাদনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আরব্ধ কাজ তিনি যেভাবে সম্পন্ন করেন তা স্মরণযোগ্য। নেপালে গবেষণার কাজে তাঁকে অনেকবার যেতে হয়, যার ফলে আমরা পেয়েছি অনেক মূল্যবান পুঁথি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শুধু পণ্ডিতই নন, বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যও তিনি রচনা করেছেন। প্রায় ত্রিশ বছর আগে, তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরুতে তিনি একটি গদ্য-আখ্যান প্রকাশ করেন, যেটি বঙ্গদেশের বাইরে প্রায় অজ্ঞাত: "বাল্মীকির জয়"। শ্রী আর. আর. সেন— চট্টগ্রামের অ্যাডভোকেট— সম্প্রতি গ্রন্থটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ফলে গ্রন্থটি য়োরোপীয় পাঠকদের আয়ত্তে এসেছে। রচনারীতির উৎকর্ষ— যা তাঁর স্বদেশীয় পাঠকরা ভালো বুঝবেন— ছাড়াও, "বাল্মীকির জয়", বিষয় ও ভাব-গৌরবে সমৃদ্ধ।

সুদূর অতীতে, সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিক্ষণে, "ঋভু" নামক পুণ্যাত্মাগণ হঠাৎ হিমালয়ের ঊর্ধ্বদেশে আবির্ভূত হয়ে গান গাইতে লাগলেন: মায়াময় সংগীতের সম্মোহনে সমস্ত প্রাণীবর্গ মুগ্ধ। গানের ভাষা কিন্তু বুঝলেন মাত্র তিনজন: বশিষ্ঠ— মূর্ত ব্রহ্মতেজ; বিশ্বামিত্র: ক্ষাত্র বীর্যের প্রতিভূ; এবং বাল্মীকি: রামায়ণ রচনা করে তখনো অমরত্ব লাভ করেননি, শুধুই একজন দস্যু দলপতি। গানের কথাগুলি এই রকম: "ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলেই পরস্পরের ভাই!" ব্রাহ্মণ (বশিষ্ঠ) দেখছেন, মানববৃন্দের সৌভ্রাত্র ব্রাহ্মণের বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; ক্ষত্রিয়ের (বিশ্বামিত্রের) চোখে এই সর্বজনীন সৌভ্রাত্র ক্ষাত্র বীর্যের দ্বারা সম্পন্ন; বাল্মীকি কেবল ভাবছেন তাঁর লজ্জাজনক আচরণের কথা; তিনি কাঁদতে লাগলেন। পর্বত থেকে অবরোহণ করে বিশ্বামিত্র গেলেন বশিষ্ঠের আশ্রমে, সেখানে দেখলেন কামধেনু নন্দিনীকে। মনে মনে বললেন, একে চাই, যে করেই হোক। তখন নন্দিনীর পার্শ্বদেশ থেকে নির্গত হল অজেয় সেনা, বিশ্বামিত্রের এই হল প্রথম পরাভব। এই দারুণ লাঞ্ছনার পর বিশ্বামিত্র সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করবার জন্য কঠোর তপশ্চর্যায় রত হলেন। এমন সময় তাঁর কাছে আবির্ভূত হল— গায়ত্রী মন্ত্র। তথাপি ব্রহ্মা এবং ঋষিগণ— যাঁরা ছিলেন
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

বর্ণাশ্রমধর্মের সংরক্ষক— তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করতে অস্বীকৃত হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর তপোবল প্রয়োগ করে সৃষ্টি করলেন এক নতুন জগৎ, যার ব্রহ্মা হলেন তিনি স্বয়ং। সৃষ্টি হল অভিনব অন্তরীক্ষ লোক, নক্ষত্রজগৎ। কিন্তু তাঁর পরিত্যক্ত মর্তলোকে শুরু হয়ে গেল ধ্বংসলীলা; চতুর্দিকে প্রাদুর্ভূত হল যুদ্ধ, সংঘর্ষ, বেপরোয়া লুণ্ঠন। এই সর্বগ্রাসী ধ্বংস হতে পৃথিবীকে ত্রাণ করলেন বাল্মীক। দস্যুজীবনের প্রতি প্রবল ধিক্কার এল তাঁর। কামমোহিত একটি ক্রৌঞ্চের হন্তা জনৈক ব্যাধকে দেখে তিনি দিলেন অভিসম্পাত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে; কাব্যের জন্ম হল। গ্রাম থেকে গ্রাম, নগর থেকে নগরে তিনি পর্যটন করে চললেন গান গেয়ে— যে গানের বাণী হল : মৈত্রী, করুণা, প্রেম; তিরোহিত হল সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি।

ওদিকে তাঁর নবনির্মিত বিশ্বে নির্বাসিত বিশ্বামিত্র বেদনার সঙ্গে অনুভব করতে লাগলেন— মানবসুলভ সমবেদনার অসদ্‌ভাব; কোথাও চোখে পড়ছে না মনের মতো মানুষ। তাঁর ইচ্ছা হল— নতুন বিশ্বে পুরাতন পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে আসবেন। কিন্তু তখন তাঁর তপোবল, অলৌকিক যোগৈশ্বর্য নিঃশেষিত। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ব্রহ্মাকে অপমান করলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল তাঁর সদ্যোনির্মিত নতুন জগৎ। ক্ষীণপ্রভ বিশ্বামিত্র পুনরায় পতিত হলেন মর্তলোকে, কৌশাম্বী নগরে, বশিষ্ঠ আর বাল্মীকির সমক্ষে। তখন ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য-মর্যাদা স্বীকার করলেন। সেই মহামিলনের শুভমুহূর্তে সমবেত ধ্বনি উত্থিত হল : "বাল্মীকির জয়।" মানবজীবনের আদর্শ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি— তিন জনের দৃষ্টিতে এক; সেই আদর্শরই যৌথ বিবৃতি : রামায়ণ। এর মধ্যে আছে— বশিষ্ঠের প্রজ্ঞা, বিশ্বামিত্রের ভূয়োদর্শিতা, আর বাল্মীকিব আত্মা। এর বহু সহস্র বর্ষ পরে বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন; মনুষ্যত্বের এই পরিপূর্ণ আদর্শ মূর্ত হল রাম-এর চরিত্রে। আরব্ধ কাজ সম্পন্ন হলে বিষ্ণু আবার ফিরে গেলেন স্বলোকে; তাঁর অনুসরণ করলেন বশিষ্ঠ— সপ্তর্ষির একজন। রাজর্ষিবৃন্দের মধ্যে স্থান পেলেন বিশ্বামিত্র; আর দেবদেব নারায়ণ তাঁর পূর্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হলেন বাল্মীকির সামনে, ঘোষণা করলেন— কবির জয়।

রসকষ বাদ দিয়ে এইভাবে বিবৃত হলে "বাল্মীকির জয়" পুরাতন বিষয়বস্তুর এক মামুলি রূপায়ণ মাত্র। লেখক "রামায়ণ" থেকে সরাসরি কয়েকটি আখ্যান নিয়েছেন; যেমন : বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহ, "শ্লোক"-এর জন্ম, ইত্যাদি। পুরাণ-বিশ্রুত এই সব চরিত্র এবং ঘটনার ব্যবহার কাহিনীকে অভনবত্ব দান করেছে; স্থূলদৃষ্টি পাঠকের চোখে তাই হয়তো ধরা পড়বে না হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহস এবং স্বকীয়তা। দৃশ্যত পৌরাণিক আখ্যায়িকা হলেও বস্তুত এতে বিবৃত হয়েছে আধুনিক ভারত। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীক— এ'রা এখানে প্রতীক

ছাড়া কিছু নন। ভারত, আধুনিক ভারতের আদর্শ কে? বশিষ্ঠ, যিনি সেই বর্ণাশ্রম-ধর্মের—যার শীর্ষে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ— প্রতীক? না বিশ্বামিত্র, যিনি ন্যায়নিষ্ঠ ক্ষাত্রবীর্যের প্রতিমূর্তি? না কি, বাল্মীকি, যিনি মাধুর্য, ঔদার্য ও সদাচারের প্রতিরূপ? উত্তর গ্রন্থের নামকরণেই প্রকটিত: "বাল্মীকির জয়।" রামায়ণের রচয়িতার মহিমা যেভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা প্রশংসার যোগ্য। গৌতম বুদ্ধের পরেই ভারতের গৌরব যাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি বাল্মীকি, কারণ তাঁর মহাকাব্যে যথার্থ মানবিক রূপাবয়বে প্রকাশিত হয়েছে সর্বমানবের সব চেয়ে উদার, উন্নত এবং স্নিগ্ধ-মধুর অনুভূতিগুলি। মহাভারত যেমন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার নৈতিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র, তেমনি রামায়ণ হল মানবজাতির সার্বভৌম আদর্শের প্রকাশ। কিন্তু— বাল্মীকির জয় হলেও লেখক বিশ্বামিত্রকে ভুলতে পারেন নি। বাইবেল-এর স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত শয়তানের মতো তিনিও এই আখ্যায়িকার শীর্ষে বিরাজমান, বার বার তিনি আকর্ষণ করেন আমাদের অভিনিবেশ, সমবেদনা, স্মৃতি; তাঁর সৃষ্ট জগৎ যে ব্যর্থ হল, তার কারণ তাঁর অক্ষমতা নয়, দুঃসাহস; তাঁর আদর্শ অত্যুচ্চ বলেই স্থায়ী হতে পারল না। এই নবসৃষ্ট জগৎ শুধু কল্পিত স্বর্ণযুগের স্বপ্নবিলাস নয়; স্বতোৎপন্ন শস্যে, ছায়াবৃত আবাসে, সুগন্ধি তৃণশয্যায় বিন্যস্তই নয়, স্বভাবসৌন্দর্যের জন্য পাগল বিশ্বামিত্র পাহাড়ে উঠবারও উপায় করে দিয়েছেন; তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে তিনি দেখতে চেয়েছেন ভূর্লোক জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা। ব্রাহ্মণজাতির সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব তিনি কখনো মেনে নেন নি; তাঁর চোখে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব জন্মে নয়, মনীষার চরমোৎকর্ষে। তাছাড়া তিনি চেয়েছিলেন সর্বমানবের চিৎপ্রকর্ষের বিকাশ অবধারিত করতে, সমান সুযোগ দিয়ে: কেবল ধর্ম ও নীতিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানই তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও চাই, যুক্তিই ছিল তার একমাত্র আরাধ্য দেবতা, আর সেই সঙ্গে— প্রেম ও সাম্য। বিবাহ-বন্ধনকে তিনি জোর করে অচ্ছেদ্য করতে চান নি, চেয়েছেন প্রেমের মধ্যে তার সহজ দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। বিচ্ছেদ অনিবার্য হলে তাকে রোধ করা উচিত নয়, কিন্তু অন্যের সহবাসের পূর্বে অন্তত তিন বৎসর অপেক্ষা করা উচিত। জন্ম সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত ছিল।

এখানে একটা জিনিস যেমন কৌতুকাবহ তেমনি অর্থপূর্ণ: ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই রচনায় ব্রাহ্মণের চিত্রটি মোটেই উজ্জ্বল নয়; এমন-কি বশিষ্ঠকে দেখেও মোটেই মনে হয় না একজন বৈদিক ঋষি। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে খুব খুশি হতেন একজন ভলতেয়ার এবং এনসাইক্লোপিডিস্টরা। বিশ্বামিত্র যখন তাঁকে বললেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হলে ক্ষাত্র বীর্য চাই, তখন বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, "না, শক্তি প্রয়োগ করে ঐক্য স্থাপন করা যায় না। প্রত্যেকে যদি স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে, তা হলে দুজন মানুষের মধ্যেও ঐক্য হতে পারে না;

অতএব ঐক্যের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন— চিন্তার স্বাধীনতা রুদ্ধ করা, বিশেষ নিম্ন বর্ণের নরনারীর।"

উত্তরে বিশ্বামিত্র বললেন, "আপনি কি বলতে চান মুষ্টিমেয় ক'জন ব্রাহ্মণ মানুষের স্বাধীন চিন্তার স্রোত রুদ্ধ করে রাখবে?" বশিষ্ঠ— "বুদ্ধির অসাধ্য কিছু নেই। শৈশব থেকেই তাদের চিন্তাধারা ঘুরিয়ে দিতে হবে আমোদপ্রমোদ ও ভোগের দিকে ; মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মাতে দেব না ; 'তাদের বই পড়তে দেওয়া হবে না। ওভাবে চললে একপুরুষে না হোক দশপুরুষেও মানুষ শুধু মানুষেরই নয়, জীবজন্তুদেরও সঙ্গে সৌভ্রাত্র স্থাপনে সফল হবে।...অন্তরীক্ষ বিভীষিকায় ভরে দেওয়া হবে। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করা হবে। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করা হবে, যাতে ব্রাহ্মণ না হলে এক পাও না চলা যায়!" এ থেকে বোঝা যাবে, কামধেনু নন্দিনী হল ব্রাহ্মণ্য চেতনার এবং চিন্তার প্রতীক।

সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টিতে "বাল্মীকির জয়" নানা দিক থেকে রোচক। সমকালীন ভারতীয় কল্পনায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব কতটা প্রবল, তাও স্পষ্ট অনুভূয়মান। আগেই দেখেছি— বিশ্বামিত্রের চরিত্র-চিত্রণে মিলটনের শয়তানের প্রভাব ; এবং দস্যুনেতা এবং মানব-ত্রাতা বাল্মীকির ওপর বায়রন এবং স্কটের ছাপও দুর্লক্ষ্য নয়। সৃষ্টির বর্ণনায় বাইবেল-এর প্রভাব খুব স্পষ্ট। যেমন বিশ্বামিত্র তাকালেন আলোর দিকে, বলে উঠলেন : বাঃ, সুন্দর! তিনি বললেন, বুধ গ্রহ হোক। অমনি জ্যোতির্ময় মণ্ডল থেকে একটি খণ্ড বেরিয়ে এল। ছুটে গেল অন্তরীক্ষে, আর কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে লাগল।

বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ আমার অভিপ্রায় নয়। আমি শুধু দেখাতে চাইছি বর্তমান ভারতীয় চেতনার একটি চরিত্রব্যঞ্জক উদাহরণ, সমকালীন সাহিত্যে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজনীতিক নন, বিপ্লবীও নন ; তাঁর এই গ্রন্থটি প্রচার-পত্র নয়। বইটি লেখা হয়েছিল ত্রিশ বছর আগে, যখন য়োরোপ নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করত প্রাচীর দুর্মর এবং আশ্বাসজনক সনাতন পরায়ণতায়। "বাল্মীকির জয়"-এর মতো একটি রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে প্রতীচীর মানুষ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে— প্রাচী সম্পর্কে তার এই ধারণা এখন আর সত্য নয়, এমন-কি ভ্রান্ত।

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥

# কাঞ্চনমালা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' দ্বিতীয় সম্ভারের জন্য বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এই দীর্ঘ 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়েছিলেন। 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'তে সম্পাদক মন্তব্য করেন, "শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদের বিশেষ অনুরোধে, 'কাঞ্চনমালা'র একটী 'মুখবন্ধ' লিখিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'কাঞ্চনমালা' রচনাটীর সার্থকতা বিচার করিতে হইলে, তাহার ঐতিহাসিক পটভূমি জানা প্রয়োজন। ডক্টর ভট্টাচার্য্য লিখিত 'মুখবন্ধে' সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।"

পরমপূজ্য ৺পিতৃদেব অপরিণত বয়সেই 'কাঞ্চনমালা' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই উপান্যাসখানিতে তাহার বয়ঃসুলভ উৎসাহের কিছু কিছু নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে লক্ষ্য করিবেন, স্থানে স্থানে 'কাঞ্চনমালা'র ভাষা এত সংস্কৃতবহুল এবং সংস্কৃত অলঙ্কারে পরিপূর্ণ যে মনে হয় ইহা অপর কাহারও লেখা। এইরূপ সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী ভাষার একটু নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

"যেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদসন্ধ্যামোদিনী, ঝিল্লীরবরূতমারুত-সংসেবিনী, বিহগকুলকলরবাবিধ্বংসিনী, পুঞ্জপুঞ্জমঞ্জুতারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয়কচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌতাবিধৌতসুরভিচর্চিচতবদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন করে আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ়প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃ-সংযোগবৎ পুরীতকীমনঃ-সংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ১ম অনুচ্ছেদ)

এই একটি অংশ পড়িলেই বাণভট্টের কাদম্বরীর কথা স্মরণ হয়। এইরূপ সাংঘাতিক সংস্কৃতভূয়িষ্ঠ লেখা ৺পিতৃদেবকে আমার জীবদ্দশায় কখনও লিখিতে দেখি নাই। আমি বহুকাল তাঁহার শ্রুতিধারক হইয়া তাঁহার প্রবন্ধাবলী লিখিয়া যাইতাম এবং তিনি বলিয়া যাইতেন, এইরূপে বহু প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। তাঁহার শেষজীবন তিনি সংস্কৃত বিভক্তি-প্রত্যয় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহারের

পক্ষপাতী একেবারে ছিলেন না। প্রত্যেক প্রবন্ধ শুদ্ধ করিবার সময় এই জিনিসটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, সময়ে সময়ে সাধারণ সংস্কৃত শব্দগুলিও বদলাইয়া দিতেন। তিনি 'সহস্রের' পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বলিতেন ও লিখিতেন 'হাজার'। 'প্রাচীন' বা 'পুরাতনে'র বদলে লিখিতেন 'পুরাণ'। 'কথিত' শব্দের স্থানে বলিতেন 'বলা'। এইরূপে তিনি শেষজীবনে সংস্কৃতকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন।

৺পিতৃদেবের এই আদর্শটি আমরা দেখিয়াছি। আমাদের জন্মের পূর্ব্বে কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ ছিল। কখনও কখনও তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলে বলিতেন, "ও সব ছেলেবেলার লেখা, তাই অত পাণ্ডিতীতে ভর্ত্তি।" সেই কথাই সত্য, কারণ যে স্থানটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা আজ আবার পড়িয়া কল্পনাও করিতে পারি না কি করিয়া এইরূপ জটিল কাদম্বরীর শৈলীতে তিনি রাত্রির বর্ণনা করিয়াছিলেন। যখন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স আট আনা গ্রন্থমালায় 'কাঞ্চনমালা'র পুনর্মুদ্রণ করেন, তখনও প্রুফ তাঁহার হাতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করেন নাই। কেবল একটি ছোট ভূমিকা দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২৬০ সালে ৺পিতৃদেবের জন্ম হয়। 'ভারতমহিলা' ১২৮৭ সালে অর্থাৎ তাঁহার ২৭ বৎসর বয়সে 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রথম ছাপা হয়। বাঙ্গালা ১২৮৯ সালে 'কাঞ্চনমালা' যখন প্রথম 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হয়, তখন তাঁহার বয়স ২৯। তিনি এম.এ. পাস করেন ইংরেজী ১৮৭৭ সালে (বাঙ্গালা ১২৮৪)। তখন তাঁহার বয়স ২৪। পড়িতে পড়িতে তিনি 'ভারতমহিলা' লিখিয়াছিলেন, এবং এম.এ. হইবার তিন বৎসরের পর হইতেই তাঁহার লেখা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। অতএব 'কাঞ্চনমালা' তাঁহার আদি লেখাগুলির অন্যতম। 'কাঞ্চনমালা'তে সেইজন্য যে ভাষা তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে তাহা অব্যবহার্য্য মনে করিতেন। কিন্তু কাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি একই পুস্তকে স্থানে স্থানে সংস্কৃতবহুল, গুরুগম্ভীর, আবার স্থানে স্থানে সহজবোধ্য চলতি ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা এখন বুঝা কঠিন।

আমাকে একবার তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় "সরু মোটা খেলে।" অর্থাৎ কখনও তিনি গুরুগম্ভীর সমাস-বহুল সংস্কৃত শব্দাবলীর প্রয়োগ করেন, আবার কখনও কখনও চলতি সহজ, এমন কি, গ্রাম্য ভাষা একই পুস্তকে ব্যবহার করেন। ৺পিতৃদেবের মতে ইহাই ছিল 'সরু মোটা' লেখার লক্ষণ। 'কাঞ্চনমালা' পড়িলে মনে হয়, গ্রন্থকার ইহাতে বঙ্কিমবাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ 'সরু মোটা' ভাষায় লেখা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাই স্থানে স্থানে কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য, সমাসবহুল ভাষা, আবার স্থানে স্থানে সহজ, ঘরোয়া এবং অতি-পরিচিত ভাষা তাঁহার একই 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার জীবনে স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। পরে তাঁহার ভাষা সহজ খাঁটি

বাঙ্গালাতে পরিণত হইয়াছিল। 'বেনের মেয়ে'র সহিত 'কাঞ্চনমালা' মিলাইয়া দেখিলে ইহা প্রতিভাত হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'কাঞ্চনমালা' একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, অর্থাৎ ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তুকে কাঠামো করিয়া কল্পনাবলে তাহাকে রক্ত, মাংস, বেশভূষা ও অলঙ্কারে সুশোভিত করা, যাহাতে বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী হয়। ইতিহাস বলিতে সংস্কৃতে 'ইতি-হ-আস' এই তিনটি শব্দের সমষ্টি বুঝায়। এই শব্দ সমষ্টির অর্থ : 'পূর্বকালে এই রকম ছিল বা হইয়াছিল।' এই লক্ষণ অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনাকেই ইতিহাস বলা যায়। সেই হিসাবে কাঞ্চনমালা ও কুণালের সুখদুঃখের কথাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যায়।

কাঞ্চনমালা ও কুণালের ইতিহাস পাওয়া যায় বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থে। 'দিব্যাবদান' গ্রন্থখানি ছাপা হইয়াছে, এবং ইহাতে কুণালের গল্প 'কুণাল-অবদান' নামক একটি অবদানে প্রকাশিত হইয়াছে। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নামক একখানি অবদান-গ্রন্থ কাশ্মীরী মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছিলেন। এই সংস্কৃত পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ বহুকাল পূর্বে রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদটি কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই অনুবাদের ৩য় খণ্ড বাঙ্গালা ১৩২১ সালে বাহির হইয়াছিল, এবং এই খণ্ডে কুণালের অবদান পাওয়া যায় (পত্র ৫১৭ হইতে ৫৩৯)। কুণাল-অবদানের শেষভাগ হইতে খানিকটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ('বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা', ৩য় খণ্ড, পত্র ৫৩৮-৩৯)।

"ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সঙ্ঘস্থবির বলিলেন, এই রাজপুত্র (কুণাল) পূর্বজন্মে কাশীপুরে এক লুব্ধক ছিলেন।

"সেই লুব্ধক হিমালয়ের তটপ্রান্তে গুহায় প্রবিষ্ট পঞ্চ শত মৃগকে চক্ষু উৎপাটন দ্বারা অন্ধ করিয়া আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে বধ করিয়াছিল।

"অন্য জন্মেও ইনি মুগ্ধ নামে একটি শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিলেন। সেই বালক শ্রেষ্ঠিতনয় মোহবশতঃ চৈত্যস্থ জিনপ্রতিমার মুখ-পদ্মটি শস্ত্রদ্বারা লোচনহীন করিয়াছিল।

"বালক পরে জ্ঞানোদয় হইলে ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা সেই প্রতিমার নয়নদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তৎপরে অন্যজন্মেও সে একটি জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার ও পূজা করিয়াছিল।

"বনে মৃগগণের নেত্র উৎপাটন করার জন্য এবং বাল্যকালে চৈত্য প্রতিমার চক্ষু নাশ করার জন্য রাজপুত্র এই জন্মে নিজ চক্ষুর্দ্বয়ের বিনাশদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"প্রতিমার বিনষ্ট নেত্র পুনরায় রত্নদ্বারা নির্ম্মাণ করার জন্য ইনি বিনষ্ট দৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার করার জন্য প্রসাদগুণযুক্ত ও কান্তিমান্ হইয়াছেন।

"...স্থবিরের এই এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন।"

'অবদানকল্পলতা' বা 'দিব্যাবদানে'র প্রায় সমস্ত অবদানেরই একটা উদ্দেশ্য

আছে। সেই উদ্দেশ্য ইহজন্মে পূর্বজন্মার্জিত পাপের পরিণাম এবং পূর্বজন্মকৃত পুণ্যের ইহজন্মে কি ফল হইয়া থাকে তাহাই স্পষ্টভাবে সমাজের সম্মুখে ধরা। সমাজ এই সকল অদ্ভুত জীবন-চরিত দ্বারা শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি করিতে পারে, এবং আপন আপন কর্ম্ম সংযত করিয়া কায়-বাক্-চিত্তের উন্নতি বিধান করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'কাঞ্চনমালা' ঐতিহাসিক উপন্যাস। কাঞ্চনমালার স্বামী কুণাল খোদ অশোক রাজার পুত্র এবং সর্বগুণসম্পন্ন। তিষ্যরক্ষিতা বা তিষ্যরক্ষা অশোকরাজার পট্টমহিষী হইয়াছিলেন পট্টরাজ্ঞী অসন্ধিমিত্রার তিরো-ধানের পর। এই রাণী অসন্ধিমিত্রার গর্ভে কুণালের জন্ম হয়। 'দিব্যাবদান' ও 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'য় কুণালের মাতার নাম দেওয়া হইয়াছে দেবী পদ্মাবতী। খুব সম্ভব অসন্ধিমিত্রা ও পদ্মাবতী অভিন্ন। তিষ্যরক্ষা (বা তিষ্য-রক্ষিতা) যখন পাটরাণী হন, তখন অশোক রাজার বয়স হইয়াছে। পাপিষ্ঠা তিষ্যরক্ষা কুণালের প্রতি পাপদৃষ্টি দিয়াছিল, এবং তাহার কাছে পাপ প্রস্তাব করিয়াছিল। কুণাল বিমাতার জঘন্য প্রস্তাবে ভীত হইয়া তিষ্যরক্ষার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে কতরূপ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, পাপের গুপ্তলীলা অনুষ্ঠিত হয়, 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস হইতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। অন্তঃপুরের একজন মাত্র দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক কিরূপে রাজা, রাজকুমার, রাজ্য ও রাজ্যের ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করিতে পারে, 'কাঞ্চনমালা'য় তাহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। প্রত্যাখ্যাতা তিষ্যরক্ষিতার কোপে পড়িয়া কিভাবে কুণালের দুইটি চক্ষু উৎপাটন করা হইয়াছিল, সে বর্ণনা অতিশয় হৃদয়বিদারক। তাহা অপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ সেই বিবরণ যাহাতে কাঞ্চনমালা রাজার পুত্রবধূ হইয়াও অন্ধ পতির হাত ধরিয়া সামান্যা ভিখারিণীর ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষার্জ্জিত অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলেন এবং সেইভাবে সুদূর তক্ষশিলা নগরী হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। কুণাল যখন জন্মগ্রহণ করেন, অশোক রাজা তাঁহার অপরূপ চোখের শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হন, এবং মন্ত্রীদিগকে সেইরূপ চক্ষু অপর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রিগণ অনেক খোঁজখবর লইয়া রাজাকে বলেন যে, এইরূপ চক্ষু কুণাল নামক হংসবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। অশোক তখন নবজাত শিশুর 'কুণাল' নাম রাখেন।

কুণাল বড় হইয়া সচ্চরিত্র, ধীমান্, দিব্যকান্তি, নয়ন মনোহর, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধবিদ্যাকুশলী ও রাজকার্য্যে দক্ষ হন এবং অশোকের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। তিনি পুণ্যাত্মা ও মহাধার্ম্মিক ছিলেন এবং সদ্ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন, প্রত্যহ চৈত্যদর্শন করিতেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু আচার্য্যদের সহিত সর্ব্বদা মেলামেশা করিয়া সদ্ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা, সদ্ধর্ম্মের প্রচার করা এবং সদ্ধর্ম্মের

দিকে সকলকেই সমানভাবে আকৃষ্ট করা। এইরূপ অকলঙ্কচরিত্র, সকল গুণের আধার কুমারের বিনা কারণে চক্ষুনাশ পাঠকদের মনে গভীর আঘাত দিয়া থাকে। কাঞ্চনমালার মত নিষ্পাপ কুসুমকোমল কুণালপত্নীর করুণ কাহিনী সেই আঘাতের উপর আরও নিদারুণ আঘাত হানিয়া দেয়। বড়ই আনন্দের কথা যে, শেষে কুণাল নিজপুণ্যবলে তাঁহার বিনষ্ট চক্ষু ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এবং কাঞ্চনমালাও সুখী হইয়াছিলেন। অশোক রাজা কুণালকে যুবরাজ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কুণাল তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সদ্ধর্মের প্রচারে মন দিয়াছিলেন। অশোক রাজা নিরুপায় হইয়া "তত্তুল্য গুণবান্ তদীয় পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।" অতঃপর রাজা অশোক পত্নী তিষ্যরক্ষার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া কুণালের দুর্দ্দশা উপেক্ষা করার জন্য তক্ষশিলাধিপতির প্রতি দুঃসহ ক্রোধানল প্রকাশ করিলেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭২ সালে সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ২৩২ সালে। প্রবীণ ঐতিহাসিকরা হয়ত তাঁহার সহিত একমত না হইয়া দু-চার বছর আগুপিছু করিবেন, কিন্তু তাহাতে এস্থলে কিছু ক্ষতি হইবে না। অশোক রাজার তিরো-ধানের পরে দশরথ রাজা হন, এবং তাঁহার শিলালেখও পাওয়া গিয়াছে। শেষ মৌর্য্যরাজার সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আসীন হন। পুরাণে পুষ্যমিত্রের বংশধরদিগকে শুঙ্গ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রবল শুঙ্গদিগের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুন্নতি হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আচার ব্যবহারের পুনঃপ্রবর্ত্তন হয় এবং বৌদ্ধদিগের প্রভাব খর্ব্ব হয়। ৺পিতৃদেব একস্থানে বলিয়াছেন, শুঙ্গ রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং শুঙ্গদের রাজত্বকালে ধর্ম্মশাস্ত্র ণাদিপুরা শাস্ত্রের সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল।

অত বড় অশোক রাজা আর তাঁহার হাতে-গড়া অত বড় মৌর্য্য সাম্রাজ্য কিরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইল, ইহা লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানারূপ জল্পনা কল্পনা লইয়া থাকে। ৺পিতৃদেব মৌর্য্যরাজত্বের ধ্বংসের কারণগুলি বেশ ভাল করিয়া একটি ইংরেজী প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, May 1910, pp. 259-262 : "Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire")। যাঁহাদের এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁহারা প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন। এখানে সংক্ষেপে দুই একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া সারিব।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, অশোকের জাতিটি কি ছিল, তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের ভিতর ছিলেন কি বাহিরে ছিলেন। সকলেই জানেন, অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক ধর্ম্মযাজক দেশবিদেশে পাঠাইয়া জগৎবাসীর সম্মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বের অবস্থা কি ছিল, তিনি আদিতে কি ছিলেন? স্মিথ সাহেব

বলিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নানা প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে একত্র করিয়া তাহাদের সাহায্যে গ্রীক রাজপ্রতিনিধিদের ধ্বংস সাধন করিয়া দেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, চন্দ্রগুপ্ত ক্ষুদ্রক মল্লাদি হিমালয় ও হিমালয়-পারের আয়ুধ-জীবী জাতিদের কোন একটির সর্দার বা নেতা ছিলেন; এবং সে কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত আদিকালে চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন না, কিন্তু কৌটিল্যের প্রভাববশতঃ পাটলিপুত্র জয় করার পর বর্ণাশ্রমধর্ম্মী বলিয়াই চলিতেন। শেষে চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র বা বৃষল বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার, তাই তিনিও শূদ্র। তাঁহার পুত্র অশোক, কাজেই তিনিও শূদ্র।

তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমভুক্ত লোকদের জন্য কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ সুখ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের সুখ সুবিধা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অশোক রাজা আদেশ দিয়া এই বিশেষ বিশেষ সুবিধাগুলি বন্ধ করিয়া দেন, এবং ব্রাহ্মণ, শূদ্র, অন্ত্যজের ভিতর কোন্ ভেদই রাখেন নাই। ইহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মহামাত্র নিযুক্ত হইল, এবং তাহারা শীঘ্রই ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের স্থান গ্রহণ করিল। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রতিশোধের আশায় বসিয়া রহিল। অশোক রাজা ছিলেন অতি পরাক্রমী এবং দুর্দ্ধর্ষ; কাজেই, তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন প্রতিবাদীরা কার্য্যে বড় কিছু করিতে পারিতেন না। তদানীন্তন দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবটিকে গ্রন্থকার বার বার সুস্পষ্টরূপে 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

তখনকার দিনে শস্ত্রচিকিৎসা ও শরীর-বিজ্ঞানের বিদ্যা কতদূর উন্নত ছিল তাহার পরিচয় 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে এবং 'কুণাল-অবদানে' পাওয়া যায়। আমরা ছোট বয়সে দেখিয়াছি, সাধারণ ছোটখাট অস্ত্রোপচারের কাজ নাপিতেরাই করিত। তিষ্যরক্ষা মূলতঃ নাপিতের কন্যা বলিয়াই হয়ত তাঁহার ভিতর অস্ত্রোপচারের কুশলতা ছিল। কি করিয়া যে তিনি অশোক রাজাকে কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্বল্পকালের জন্য রাজসিংহাসনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাহার একটি বিস্ময়কর কাহিনী 'কাঞ্চনমালা'য় দেওয়া আছে। অত্যন্ত চিন্তাবশতঃ কোন অজ্ঞাত কারণে রাজা অশোকের উদরমধ্যে মূত্র বন্ধ হইয়া কঠিন ব্যথা হইল. তাঁহার নিদ্রা বন্ধ হইল। বৈদ্যগণ রোগ অসাধ্য বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। রাজাও মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া রাজপুত্রকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। এমত অবস্থায় পাটরাণী কি করিলেন, তাহাই মূল অবদানের একাংশে পাওয়া যায়। সেই অংশ নিম্নে দেওয়া হইল:

"তিষ্যরক্ষা এইরূপে রাজার ধৈর্য্য বিধান করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং অন্বেষণ করাইয়া তুল্যরোগাক্রান্ত একটি আভীরকে একান্তে আনয়ন করাইল।

"ক্রূরাশয়া তিষ্যরক্ষা ক্রূরবুদ্ধি একটি দাসীদ্বারা আভীরকে হত্যা করিয়া তাহার নাভিকোষটি উৎপাটন করিল। তৎপরে তাহার অন্ত্রে সংলগ্ন ও কঠিনভাবে দংশনকারী একটি বিকৃত কৃমি দেখিতে পাইল।

"তিষ্যরক্ষা দেখিল যে, কৃমিটা বেগে ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে চলাচল করিতেছে এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে। তৎপরে পিপ্পলী, হিঙ্গু ও বিড়ঙ্গযুক্ত ঔষধ কৃমির উপর নিক্ষেপ করিল।

"সেই সেই ক্ষারদ্রব্য দিয়াও কৃমিটি মরিল না। পরে পলাণ্ডুরস স্পর্শ-মাত্রেই কৃমি মরিয়া গেল।

"তিষ্যরক্ষা এই উপায়টি জানিতে পাইয়া অত্যন্ত হর্ষসহকারে রাজার নিকট গেল এবং প্রচ্ছন্নভাবে পলাণ্ডুরস সেবন দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যেই রাজাকে সুস্থ করিল।...

"তৎপরে কৃতজ্ঞ রাজা জীবনলাভহর্ষে এবং তিষ্যরক্ষিতার প্রতি প্রেমবশতঃ তাহার প্রার্থনাবশতঃ সাতদিনের জন্য রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভাররূপ বর তিষ্যরক্ষাকে প্রদান করিলেন।" ('বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৭-২৮)

এই সাতদিনের ভিতর তিষ্যরক্ষা রাজমুদ্রাঙ্কিত একটি পত্র তক্ষশিলাধিপতি কুঞ্জরকর্ণের নিকট পাঠাইয়া কুণালের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিবার আদেশ দিলেন। একটি ক্রূরস্বভাব লুব্ধ ব্যক্তি এই কার্য্য সম্পন্ন করিল। কাঞ্চনমালা সেইখানে আসিয়া কুণালের দশা দেখিয়া মূর্ছিতা হইলেন।

'দিব্যাবদান' ও 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'য় কাঞ্চনমালা ও কুণালের যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা যুগোপযোগী করিবার জন্য উপন্যাসের প্রয়োজন অনুসারে গ্রন্থকার অনেক নূতন কথা ও দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। সমস্ত কথা এখানে বলিলে মুখবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। তাই সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

কুণাল ও কাঞ্চনমালার পুষ্পাভরণ তৈয়ারীর কথা গ্রন্থকারের সৃষ্টি। 'ললিত-বিস্তর'-এর অভিনয়ও তাঁহার নূতন সৃষ্টি। উপগুপ্ত কর্ত্তৃক অশোকের, তিষ্যরক্ষার, কুণালের ও কাঞ্চনমালার দীক্ষার কাহিনী ও মহার্হৎ-স্পর্শে বিরাট ও বিচিত্র মানসিক বিপর্য্যয়ের বিবরণ সম্পূর্ণ নূতন ও অভূতপূর্ব্ব কল্পনা।

ভগবান উপগুপ্তের হস্ত মস্তকে পড়িবার পর রাজা অশোক দেখিলেন, অনন্ত বোধিদ্রুমে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং প্রতি বোধিদ্রুমতলে এক একজন বোধিসত্ত্ব ধ্যানমগ্ন। পাটরাণী তিষ্যরক্ষা দেখিলেন, ভয়ঙ্কর অন্ধকার মধ্যে চৌরাশী নরককুণ্ড। কুণাল দেখিলেন, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব জেতবনে সদ্ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন; আর কাঞ্চনমালা দেখিলেন, তাহার নির্ব্বাণ-সময় উপস্থিত এবং তাঁহার চারিদিকে দেব দানব সিদ্ধ চারণগণ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কাঁদিতেছে

আর বলিতেছে, "মাত! আমাদের কি উপায় করিয়া গেলে ?" তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "আমিও অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ব্রহ্মাণ্ডে একটিও প্রাণী নির্ব্বাণশূন্য যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণপ্রয়াসী নহি।" অমনি সর্বত্র জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলেন ভগবান অবলোকিতেশ্বর তাঁহার দেহে মিশাইয়া গেলেন। কাঞ্চনমালার এই প্রতিজ্ঞা পরবর্ত্তী বৌদ্ধ মহাযানসূত্র কারণ্ডব্যূহে বিবৃত অবলোকিতেশ্বরের প্রতিজ্ঞার ছায়া অবলম্বন করিয়া লিখিত বলিয়া মনে হয়। গুরুর মত গুরু হইলে, গুরু নিজে সিদ্ধ হইলে তিনি যদি তাঁহার হস্তদ্বারা শিষ্যের মস্তক স্পর্শ করেন তাহা হইলে হস্ত হইতে তীব্র শক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে এবং সেই শক্তি শিষ্যের মনে প্রাণে চিন্তায় ও কল্পনায় বিচিত্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। এইরূপ আলোড়নের চিত্র, এইরূপ মানসিক পরিবর্ত্তনের চিত্র গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন 'কাঞ্চনমালা'র তৃতীয় পরিচ্ছেদে।

পরিশেষে অশোকের পাটরাণীর অদ্ভুত নাম তিষ্যরক্ষিতা কেন হইল, তাহার কথা এখানে একটু বিবেচনা করিব। নক্ষত্রমণ্ডলের তারা পুষ্যাকে সেকালে তিষ্যা বা তিষ্য বলিত। কর্ক্কটরাশিস্থিত পুষ্যনক্ষত্রাশ্রিত চন্দ্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়াই খুব সম্ভব তাঁহার নাম তিষ্যরক্ষিতা রাখা হয়।* ইহার অর্থ হইল, যিনি তিষ্য অথবা পুষ্য নক্ষত্র দ্বারা রক্ষিত বা পালিত। এই পুষ্য বা তিষ্য নক্ষত্রের প্রভাব অশোক রাজার উপরও পড়িয়াছিল। শিলালেখে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিঙ্গ-লেখে এবং ধৌলির শিলালেখে তিষ্য নক্ষত্রের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক রাজা ইহাতে হুকুম দিয়াছিলেন যে, শিলালেখে লিখিত আদেশ প্রতি চারি মাসে একবার তিষ্য-উৎসবে যেন সভায় পাঠ করা হয়। তিষ্যনক্ষত্রাশ্রিত চন্দ্রে অশোক রাজার রাজ্যে উৎসব হইত, এবং সে সময় লোকজন একত্র জমায়েত হইত এবং আনন্দ করিত। এই নক্ষত্রে তিষ্যরক্ষিতার জন্ম হইয়াছিল বলিয়াই কি তিষ্য-উৎসব অশোক রাজার রাজ্যে পালিত হইত, না, অন্য কোন কারণে, তাহা এখন ঠিক বলা শক্ত। কিন্তু তিষ্যরক্ষিতা ও তিষ্য-উৎসব, দুই শব্দেই তিষ্যের স্থিতি সত্যই লক্ষ্যের বস্তু।

স্বর্গত পিতৃদেব ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৫ বৎসরের উপর দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি এখন স্তুতি ও নিন্দার বাহিরে। আমার দৃঢ় ধারণা, এমত অবস্থায় তাঁহার পুত্র হইয়া তাঁহার স্তুতি করা পাপ এবং নিন্দা করা মহাপাপ। কিন্তু ৺পিতৃদেবের লেখাগুলির ভিতর কোথাও কোথাও তিনি স্বপিতা ৺রামকমল ন্যায়রত্ন সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর দিয়াছেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা

* কেরল দেশে— ভূতপূর্ব্ব ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে— রাজাদের নামের আদিতে সব সময় জন্মনক্ষত্রের নাম সংযুক্ত থাকিত। ('হরপ্রসাদ রচনাবলী'র সম্পাদকীয় মন্তব্য)।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া 'কাঞ্চনমালা'র মত মনোরম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণের মুখবন্ধ লিখিতে সাহসী হইয়াছি। শাস্ত্রে বলে—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
এষ এব সতাং মার্গস্তেন গচ্ছন্ন দুষ্যতি॥

'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস সম্বন্ধে এখনও নানা কথা বলা যায়, কিন্তু গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে এইখানেই ক্ষান্ত হইতে হইল। এই মুখবন্ধে 'কাঞ্চনমালা'র প্রণয়নে, কল্পনায়, বিষয়বস্তুতে ও রসসৃষ্টিতে গ্রন্থকার কিরূপ অদ্ভুত কুশলতা এবং গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহারই একটু মাত্র দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

শাস্ত্রী ভিলা
নৈহাটি
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৩
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## ৮

শরচ্চন্দ্র দাস অনূদিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' তৃতীয় খণ্ডের (১৩২১ বঙ্গাব্দ) অন্তর্গত 'কুণালাবদান'। ঊনষষ্টিতম পল্লব।

একঃ স এব সুকৃতোচিতচক্রবর্ত্তী
সুব্যক্তকীর্ত্তিতিলকা গুণরত্নভূষা।
অম্লানদানকুসুমা কৃতসত্যচর্চ্চা
যস্যাবভাতি শুচিশীলদুকূলিনী শ্রীঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার রাজলক্ষ্মী তদীয় সুপ্রকাশ কীর্ত্তিরূপ তিলক ধারণ করিয়া এবং তদীয় গুণরত্নে ভূষিত হইয়া ও তদীয় বিশুদ্ধস্বভাবরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভিত হন এবং যাঁহার দানরূপ কুসুম কখনও ম্লান হয় না অথচ যিনি সত্যের আদর করেন, একমাত্র তিনিই পুণ্যবান্ রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখের যোগ্য। ১।

পৃথিবীর তিলকস্বরূপ পাটলিপুত্র নামক শ্রেষ্ঠ নগরে সূর্য্যবংশাবতংস যশস্বী মহারাজ অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। ২।

অশোক প্রথমে অত্যন্ত কামাসক্ত ছিলেন, তৎপরে অত্যন্ত প্রচণ্ডস্বভাব হইয়াছিলেন এবং অবশেষে বয়ঃ-পরিণামে ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৩।

পবিত্র উপবনে প্রস্ফুটিত কুসুমদ্বারা যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ মহারাজ অশোকদ্বারা পৃথিবীর শোভা হইয়াছিল। অশোকই পৃথিবীর আভরণস্বরূপ ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালে নানাবিধ পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদিত হওয়ায় প্রজাগণও অশোকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪।

কালে অন্তঃপুর-সুন্দরীগণের অগ্রগণ্যা দেবী পদ্মাবতী, দানানুগতা সম্পত্তি যেরূপ প্রশংসাবাদ উৎপাদন করে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণপূর্ণ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। রাজার বহু পুণ্যফলে এরূপ পুত্র লাভ হইয়াছিল। ৫।

লক্ষ্মীর হস্তস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দরনয়ন ও সুবর্ণকান্তি রাজকুমারের হিমাদ্রিপর্ব্বতস্থিত কুণালনামক হংসের তুল্য নয়ন হওয়ায় তাঁহার নাম কুণাল রাখা হইল। ৬।

কুণাল, বিদ্যারূপ বধূগণের বিমল দর্পণস্বরূপ ছিলেন, সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যারূপ লতার চৈত্রোৎসবস্বরূপ ছিলেন এবং কীর্ত্তিরূপ কুমুদিনীর চন্দ্রোদয়স্বরূপ ছিলেন। তিনি সকলেরই প্রীতিপাত্র ছিলেন। ৭।

চন্দ্রের ক্রোড়স্থিত মৃগের ন্যায় সুন্দর, ভ্রূদ্বয়রূপ ভ্রমর-মণ্ডিত ও বিলাসযুক্ত রাজকুমারের নয়ন-পদ্মদ্বয় বিলোকন করিয়া রাজা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ৮।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

সকল দিকের ও সকল দ্বীপের রাজগণ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া কন্দর্পের গলদেশস্থ মুক্তালতাসদৃশ নিজ নিজ কন্যাকে নানাগুণালঙ্কৃত কুণালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৯।

আয়তনয়না, চন্দ্রমুখী কাঞ্চনমালিকানাম্নী কন্যাটিই জনপ্রিয় সুন্দরাকৃতি কুমারের অধিক প্রীতিপাত্র হইয়াছিল। বোধ হয়, স্বয়ং কন্দর্প কুণালরূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রতি কাঞ্চনমালিকারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। ১০।

অনন্তর একদিন একটি স্থবির ভিক্ষু পিতৃনিকটস্থ রাজকুমারকে দর্শন করিলেন এবং রাজার অনুমতি লইয়া কুমারকে সঙ্গে করিয়া সুযশ নামক বিহারে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। ১১।

ভবিষ্যদ্দর্শী মনীষী সেই বৃদ্ধ যোগী কালক্রমে কুণালের চক্ষুর্দ্বয়ের বিনাশ হইবে জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ তাঁহার আগামী দুঃখের উদ্ধারের জন্য কুমারকে বলিলেন। ১২।

তোমার এই বিভবাসক্ত চিত্ত, কন্দর্পের সহায়ভূত নবযৌবন এবং চন্দ্রের দর্পহারী সুন্দর দেহ, এইগুলি সবই তোমার পতনের নিমিত্ত হইয়াছে দেখিতেছি। ১৩।

চক্ষু স্বভাবতই চপল। জনগণ চক্ষুর্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিজ গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং স্পৃহারূপ মহাগর্ত্তে পতিত হয়। এই চক্ষুতে আস্থা ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায়। ১৪।

নীলোৎপলপত্রসদৃশ মনুষ্যগণের এই বিশাল নয়নই অনুরাগরূপ সর্পের বাসস্থান বিশাল ছিদ্রস্বরূপ। এই ছিদ্র দিয়াই সকল ইন্দ্রিয় আশু পরিস্রুত হয়। ১৫।

যাঁহাদের সুশীলতা-প্রভাবে নয়নদ্বয় লাবণ্যামৃত পান করিয়া অত্যধিক তৃষ্ণায় বিঘূর্ণমান হয় না, তাঁহারাই ধন্য, সত্ত্বশালী ও ধীর বলিয়া গণ্য হন। ১৬।

রাজপুত্র কুণাল স্থবিরের এই সকল প্রশমযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মনোমধ্যে তাহা ধারণা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ স্থানে গমন করিলেন। ১৭।

অতঃপর ভৃঙ্গগণের গুন্ গুন্ ধ্বনিতে মনোরম, সিন্দূরপূরসদৃশ কিংশুক পুষ্পে শোভমান, পুন্নাগপুষ্প-সৌরভে আমোদিত এবং মানিনীগণের মানভঙ্গকারী বসন্তকাল উপস্থিত হইল। ১৮।

উদ্যান-লতার সমস্ত পত্রই বিরহিণীগণের দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে শুষ্ক হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এখন সহসা বসন্ত-সমাগমে একযোগে বহুতর রাগরঞ্জিত নবপল্লবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৯।

বায়ুদ্বারা কম্পিত চম্পকপুষ্পের পত্ররেখার সহিত কন্দর্প মিত্রতা প্রকাশ করায় উহা বসন্তের একটি প্রধান ধৈর্য্যনাশক মহাস্ত্রস্বরূপ চতুর্দ্দিকে প্রথিত হইল। ২০।

নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেও সহকার-মঞ্জরীতেই বহুলভাবে ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ ধ্বনিদ্বারা বসন্তবন্ধু কন্দর্পের যশোগান করায় সহকারই বসন্তের অধিক উপকারক হইল। ২১।

এইরূপ বসন্তোৎসবকালেও রাজকুমার কুণাল বিজনে বসিয়া স্থবিরের উপদেশ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিষ্যরক্ষা নাম্নী রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ২২।

যুবতী বিমাতা তিষ্যরক্ষা প্রেমরসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, আয়ত-লোচন, পীনস্কন্ধ ও আজানুলম্বিতবাহু কুমারের নিকটে আসিয়া বলিল। ২৩।

কুমার! সংসারের সারভূত তোমার নয়নকান্তি এখন প্রস্ফুটিত পুষ্পগণমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কাহার না ধৈর্য্য হরণ করে? বিশেষতঃ তোমার এই সুন্দর বেশ অত্যন্ত ধৈর্য্যহারী হইতেছে। ২৪।

তিষ্যরক্ষা এই কথা বলিয়া লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক সহসা ভুজদ্বয়দ্বারা কুমারকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল। তখন কম্পবশতঃ মুখরিত আভরণের শব্দ হওয়ায় বোধ হইতেছিল যে, তাহার নিজ আভরণগুলিও তাহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবারণ করিতেছিল। ২৫।

ইনি বিমাতা হইলেও নিজ মাতার ন্যায় সতত বাৎসল্য প্রকাশ করেন, এই ভাবিয়া কুণাল নিঃশঙ্কচিত্তে বিমাতার পদপ্রান্তে নতশির হইলেন। ২৬।

মদমত্ত ও কন্দর্প-বিকারে ক্ষুব্ধ অঙ্গনাগণের যখন মোহ উদয় হয়, তখন নদীর ন্যায় উহাদেরও গর্ত্তে পতনের কোনরূপে নিরোধ করা যায় না। ২৭।

মদনাভিভূতা তিষ্যরক্ষা মানসিক আবেগবশতঃ বিশৃঙ্খলবৎ হইয়া কুমারকে বলিল। তখন শুচিশীলতা যেন পাপকার্য্যে কলঙ্ক-ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। ২৮।

কুমার! তুমি আমার সমবয়স্ক ও প্রিয়পাত্র। আমি তোমার বিমাতা, মাতা নহি। তোমার আলিঙ্গনের যোগ্য আমার এই তনু অদ্য সৌভাগ্যরূপ ভোগ্য বস্তু লাভ করুক। ২৯।

নারীগণকেই সকলে প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি স্বয়ং তোমাকে প্রার্থনা করায় অত্যন্ত নির্লজ্জতা প্রকাশ হইয়াছে। কি করি, বহু দিন হইতেই আমার হৃদয়ে তোমার সঙ্গমাশা উদিত হইয়াছে। তুমি এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৩০।

হার-শোভিত স্ত্রীগণের স্তনদ্বয় এবং রসনাযুক্ত নিতম্বস্থল নখোল্লেখ-রহিত হইলে উহার সৌন্দর্য্যাভিমান থাকে না। ৩১।

স্ত্রীগণের চিত্ত স্বভাবতঃ নূতন বস্তুর অভিলাষী এবং কুতূহলময় হয় এবং উহাদের নয়নও স্বভাবতঃ লাবণ্যলুব্ধ হইয়া থাকে। ৩২।

কম্পিতাঙ্গী তিষ্যরক্ষা এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগদ্বারা অধর-পল্লবের কান্তি ম্লান করিয়া এবং স্বেদজলবিন্দুদ্বারা তিলক ধৌত করিয়া স্পষ্টভাবে কাম-ভাব প্রকাশ করিল। ৩৩।

কুণাল, তপ্ত সূচীসদৃশ কর্ণ-বিদারণকারী বিমাতার এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে ভূমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হইল যেন, নিজ চক্ষুঃসংলগ্ন পাপ তিনি ভূমিতে প্রক্ষেপ করিলেন। ৩৪।

তিনি বিষাদ ও লজ্জায় বিশুষ্কবদন হইলেন এবং বিমাতার মুখ চন্দ্রসদৃশ হইলেও পাপমলে মলিন হওয়ায় তিনি উহা দেখিতে পারিলেন না। ৩৫।

মহাপাপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর্ণদ্বয় কম্পিত হইল। এজন্য কুণ্ডল-দ্বয় আন্দোলিত হওয়ায় কুণ্ডলস্থ রত্নের কান্তিও বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। তাহাতে বোধ হইল যেন, তাঁহার কর্ণদ্বয় পাপশুদ্ধির জন্য রত্নকান্তিরূপ বহ্নিশিখামধ্যে প্রবেশ করিল। ৩৬।

কুণাল হস্তদ্বারা কর্ণযুগল আচ্ছাদিত করিয়া দন্তকান্তি দ্বারা ধবলিত বাক্য উচ্চারণ করিলেন। গঙ্গাপ্রবাহসদৃশ তদীয় দন্তকান্তি যেন তাঁহার অঙ্গলগ্ন বিমাতার আলিঙ্গনদোষ ক্ষালন করিয়া দিল। ৩৭।

কুণাল বলিলেন,— মা! তোমার এ কথা বলা উচিত নহে। সৎপথে গমন কর, বাক্য সংযত কর। তুমি এইমাত্র শীল ত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে সে বিচলিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে, উহাকে আশ্বাসিত কর। ৩৮।

দর্প, প্রমাদ, পরধনেচ্ছা ও পাপযুক্ত বিষয়বাসনা, এইগুলি সকলই লোকের পতনকালে বিনাশের নিরর্গল দ্বারস্বরূপ হয়। ৩৯।

যাহারা দানপরাঙ্মুখ, তাহাদের ধনে প্রয়োজন কি? যাহারা বিদ্বেষপরায়ণ, তাহাদের শাস্ত্রাধ্যয়নে ফল কি? যাহারা সদ্গুণবর্জ্জিত, তাহাদের সৌন্দর্য্য বিফল। যাহারা শীলবর্জ্জিত, তাহাদের কুলমর্য্যাদা বৃথা। ৪০।

মা! তুমি চঞ্চলতা ত্যাগ কর। পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহর যশ রক্ষা কর। সুশীলতা ত্যাগ করিও না। নিজ বংশমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পাপকার্য্যে মতি করিও না। পাপকারীদিগকে পরলোকে অত্যন্ত ক্লেশকর স্থানে থাকিতে হয়। সেখানে নারকীয় অগ্নির অত্যন্ত উত্তাপে বিকল পাপকারী প্রেতগণের উৎকট প্রলাপ সতত শুনিতে পাওয়া যায়। ৪১।

তিষ্যরক্ষা কুমারের এই কথা শুনিয়াও তীব্র অনুরাগ ও আগ্রহ ত্যাগ করিতে পারিল না। মোহান্ধ জনের অন্ধকূপসদৃশ অন্তঃকরণে ধর্ম্মোপদেশরূপ সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। ৪২।

সে দুর্দ্দান্ত কন্দর্পরাজ কর্ত্তৃক বিশেষরূপ ব্যথিত হইয়া চোরীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ সহ অসঙ্গতভাবে প্রলাপ করিতে লাগিল। ৪৩।

সে বলিল,— তুমি সুস্থ জনকে যেরূপ উপদেশ করে, সেরূপ উপদেশ করিতেছ; কিন্তু আমি কামপীড়িত, উহা কিছুই শুনিতেছি না। বিশাল শিখাযুক্ত প্রবল কামাগ্নি বাক্যদ্বারা উপশান্ত হয় না। ৪৪।

নির্ঝরজলপ্রপাতে শীতল দেশেও উত্তপ্ত মরুভূমি হইয়া থাকে। যাহারা কামাতুর, তাহাদের পক্ষে সূর্য্যোদয়কালেও চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হয়। ৪৫।

তুমি দয়ালু। সন্তাপপ্রাপ্ত অবলাকে রক্ষা করিয়া যদি তোমার ধর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে সাধুগণ যে ধর্ম্মের গৌরব করেন, তাহার অভাবেও কেন অধর্ম্ম হইবে? ৪৬।

যাহারা সুস্থ ও শীতল, তাহাদের পক্ষে তোমার কথিত এইরূপ স্থির ধর্ম্ম সুখকর হয়। যাহারা সন্তাপিত ও বিপদাপন্ন, তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ কার্য্যেও কোন বিচার নাই। ৪৭।

আমিই প্রথমে পাপ গ্রহণ করিয়াছি। আমায় রক্ষা করিলে তোমার ধর্ম্ম হইবে। চন্দ্রসদৃশ শীতল ত্বদীয় অঙ্গস্পর্শদ্বারা আমার সন্তাপক্লেশ নির্ব্বাপিত কর। ৪৮।

চন্দ্র লোকের সন্তাপ হরণ করেন, সূর্য্য ঘোর অন্ধকার নষ্ট করেন এবং অগ্নি দিবারাত্রি লোকের শীত-ক্লেশ শান্তি করেন। ইহাঁরা সকলেই পরোপকারী। ইহাঁদের কি কোনরূপ পাপ হইতে পারে? তুমি সমস্ত শাস্ত্রার্থ অবগত আছ, তুমিই সত্য কথা বল। বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা অপেক্ষা অন্য সৎকার্য্য ও ধর্ম্ম কি আছে? ৪৯।

এখানে রহস্য-প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। এ স্থান জনবর্জ্জিত ও সুসংবৃত। স্বেচ্ছায় প্রণয়াকাঙ্ক্ষাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গ ভাগ্যবানেরই ঘটিয়া থাকে। ৫০।

রতিদ্বারা তোষিত নিতম্বিনীগণের দশনক্ষতদ্বারা ক্লিষ্টাধর, স্তব্ধ অলক-শোভিত ও স্বেদবিন্দুদ্বারা আর্দ্র অঙ্গরাগযুক্ত মুখপদ্ম ধন্য জনই দেখিতে পায়। ৫১।

স্ত্রীলোকের জন্য কত লোক করবালরূপ লোলজিহ্বাযুক্ত যুদ্ধরূপ কালের মুখ-মধ্যে প্রবেশ করে এবং কত লোক স্ত্রীলোকের জন্য ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ সমুদ্রমধ্যেও প্রবেশ করে। ৫২।

লোকসকল বহুদিন ধরিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রযত্ন করে। ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্যই অর্থের আবশ্যক। কামই ধর্ম্মের মুখ্য ফল বলিয়া কথিত হয়। ৫৩।

তিষ্যরক্ষা এইরূপ ব্যাকুলভাবে নানাপ্রকার বাক্য বলিতে লাগিল। পরে কুমার তাহাকে বলিলেন,— মাতঃ! ধর্ম্মই ত্রিবর্গের মূল ও প্রধান ফল। ধর্ম্মই কুশলের আশ্রয়। ৫৪।

নির্জ্জন বলিয়া পাপ কখনও গুপ্ত থাকে না। দেবগণ অন্তর্হিত হইয়া সাক্ষি-স্বরূপ রহিয়াছেন। ছায়া জায়ার ন্যায় সর্ব্বদাই সঙ্গে আছে, সে লোকের সকল কথাই জানে। ৫৫।

নির্জ্জনে কৃত কর্ম্মেরও অবশ্যই ফললাভ হয়। কর্ম্মফল কখনও নষ্ট হয় না। নির্জ্জনে অন্ধকারমধ্যে বিষ পান করিলে তাহাদ্বারা কি প্রাণ নাশ হয় না? ৫৬।

স্ত্রীলোক স্বভাবতই পাপপ্রযোজক হয়। তাহার উপর পরদারসঙ্গ অতি ভীষণ। নিজ পত্নীকেও যদি কলহকালে মোহবশতঃ মাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে জীবনান্তেও লোকে তাহাকে আর স্পর্শ করে না। ৫৭।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

তিষ্যরক্ষা এইরূপে নিজের প্রার্থনাভঙ্গ হওয়ায় তিরস্কৃতা ও অত্যন্ত সন্তপ্তা হইল। পরে পাপিষ্ঠা বলিল যে, আমি অবশ্যই তোমার চক্ষুর দর্প হরণ করিব। এই বলিয়া সে নিজ স্থানে চলিয়া গেল। ৫৮।

তৎপরে রাজা অশোক রাজা কুঞ্জরকর্ণের তক্ষশিলানাম্নী রাজধানী জয় করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ কুমারকে পাঠাইলেন। কুমারের যাত্রাকালে সৈন্যোত্থাপিত ধূলি দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া গেল। ৫৯।

কুমার তক্ষশিলা নগরীতে গিয়া গজযূথরূপ অন্ধকার দ্বারা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারিত করিয়া নগরীকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। বায়ুক্ষুব্ধ সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় ঘোর সৈন্যগণ ও গজগণের নিনাদে ত্রিভুবন যেন বিদীর্ণ হইল। ৬০।

তৎপরে ধীমান্ তক্ষশিলাধিপতি রাজকুমারের পদপ্রান্তে মস্তক নত করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া এবং গজ, অশ্ব ও রত্নদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন। ৬১।

রাজকুমার তথায় রাজা কর্ত্তৃক আদরপূর্ব্বক নানা উপচারে পূজিত হইয়া মেঘোদয়বশতঃ মলিন বর্ষাকালের কয়েক দিন বাস করিলেন। ৬২।

ইত্যবসরে রাজা অশোক পুত্র-মুখ সন্দর্শন জন্য উৎকণ্ঠিতমানস হওয়ায় অত্যধিক চিন্তাবশতঃ তাঁহার উদরমধ্যে মূত্র বদ্ধ হইয়া কঠিন ব্যাধি হইল। ৬৩।

অন্তঃপুরমধ্যে নানাপ্রকার ঔষধের নির্ণয়কার্য্যে অবহিতচিত্ত বৈদ্যগণ রাজাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। অসাধ্য রোগ জানিতে পারিয়া বৈদ্যগণের মুখে খেদ-ভাব প্রকাশ হইল। ৬৪।

বধূগণ চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দনেত্রে রাজাকে বিলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাঞ্চীকলাপ যেন উদ্বেগভয়ে নিঃশব্দ হইল। ৬৫।

আসন্নবর্ত্তিনী কান্তার করপল্লবস্থিত, মন্দ মন্দ সঞ্চালিত, শুভ্রবর্ণ চামরদ্বারা রাজাকে বীজন করা হইতে লাগিল। চামরটিও যেন শোকবশতঃ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। ৬৬।

রাজা শীতল জলের ভৃঙ্গারে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং কষায় ঔষধ-পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিদ্রা না হওয়ায় তিনি সতত কুপিত হইতেন এবং পথ্যের কথায় বিষাদ প্রকাশ করিতেন। ৬৭।

তিনি নিন্দনীয় রোগের যন্ত্রণায় নিজ দেহেতেও বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া পত্নীর ক্রোড়ে নিজ মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে বলিলেন। ৬৮।

এখন আর বৈদ্যগণের আবশ্যক কি? তাঁহাদের যত দূর বিদ্যা ছিল, তাহা ত চেষ্টা করা হইল। কষ্টকর মিথ্যা পথ্য দিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা নিজ অশুভ কর্ম্মফলে পীড়িত হয়, তাহাদের জন্য ধর্ম্মোপদেশই প্রধান চিকিৎসা এবং তাহাই আত্মীয় জনের প্রণয়ের লক্ষণ। ৬৯।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

এই দেহ এখন বিনাশোন্মুখ হইয়াছে। ভোগ্য বস্তু-সকল এখন শল্যবৎ বোধ হইতেছে। অন্ধ জনের লাবণ্যবতী কান্তা যেরূপ ভোগবৰ্জ্জিত হয়, তদ্রূপ ভোগ- বৰ্জ্জিত এই রাজসম্পৎ আমার পক্ষে এখন প্রবল শাপবৎ বোধ হইতেছে। ৭০।

আমি অত্যন্ত মন্দাগ্নি হইয়াও প্রবৃদ্ধ শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। শরীরের জড়তা অত্যধিক রহিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণাও অত্যন্ত বাড়িয়াছে। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যুই সুখকর বোধ হইতেছে। ৭১।

অন্তৰ্ব্বৰ্ত্তী প্রচ্ছন্ন পাপ, কলহানুবন্ধী নীচ জনের অবমাননা এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী নিন্দিত ব্যাধি, এই তিনটিই প্রদীপ্ত অগ্নিতাপে উপশান্ত হয়। অন্য কোন প্রতীকার নাই। ৭২।

দরিদ্র লোকদিগের রোগ-কষ্ট না থাকিলেও দারিদ্র্য-কষ্ট সদাই আছে এবং ধনবান্‌দিগের দারিদ্র্য-ক্লেশ না থাকিলেও সৰ্ব্বদা রোগজন্য ক্লেশ থাকে। এই দুইটি ক্লেশই দুই জাতীয় লোকের কুকর্ম্মের বিচিত্ররূপ পরিণামের ফল। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর। ৭৩।

মনুষ্যজন্মে যদি বিচার-বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সে জন্মই বৃথা। শাস্ত্র-জ্ঞানদ্বারা যদি বুদ্ধিকে অলঙ্কৃত করা না হয়, তাহা হইলে সে বুদ্ধিকে ধিক্! যে ব্যক্তি বিস্তর শাস্ত্র পাঠ করিয়াও দৈন্যভাব ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার সে শাস্ত্রপাঠ বৃথা। যে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া সম্পৎ ভোগ করিতে সমর্থ হয় না, তাহার সে সম্পদ্‌ও বৃথা। ৭৪।

প্রজাগণপ্রিয় রাজকুমার তক্ষশিলা-জয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছে; তাহাকে সত্বর আনয়ন কর। আমি অদ্যই সেই নির্ম্মলস্বভাব ও সচ্চরিত্র রাজ-কুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে চাই। ৭৫।

আমি স্বেচ্ছায় কুমারকে রাজচ্ছত্র ও মুকুট প্রদান করিলে পুরবাসী প্রজাগণ আমাকেই পুণ্যরসায়নদ্বারা তরুণ-ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিবে। ৭৬।

রাজপত্নী তিষ্যরক্ষা রাজার এই কথা শুনিয়া যুগপৎ ভয়, শোক, দীনতা, মাৎসর্য্য ও মোহে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল। ৭৭।

মহারাজ! আমি আপনাকে নিরাময় করিতেছি। আমার বিশেষ ক্ষমতা আপনি দেখুন। এই সকল অশিক্ষিত ও লোকের ধন-প্রাণ-নাশক কুবৈদ্যগণের কোন আবশ্যক নাই। ইহারা চলিয়া যাউক। ৭৮।

বৈদ্যগণ নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান জন্য গৰ্ব্ব প্রকাশ করিয়া পরস্পর বিবাদ করে এবং মূর্খের ন্যায় পরস্পরের নিন্দা করে। ইহারা সতত রোগীকে বিনাশ করিতেই উদ্যত। ইহারা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া রোগীকে মারে। ৭৯।

হে রাজন্! নিজ পুত্রকেও রাজ্য দান করা উচিত নহে। সকল বস্তুই পরাধীন হইলে স্পৃহাজনক হয়। লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিলে অল্প দিনেই সহস্র বিপদ্রূপ বহ্নির তাপে অনুতপ্ত হইতে হইবে। ৮০।

পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট আরোপিত করিলে তখনই রাজার প্রভুতা ও গৌরব বিলুপ্ত হয়। যাহারা রাজাজ্ঞা নতশিরে গ্রহণ করিত, তাহারা তখন রাজাজ্ঞা তৃণজ্ঞান করে' আর আজ্ঞা পালন করে না। ৮১।

তিষ্যরক্ষা এইরূপে রাজার ধৈর্য্য বিধান করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং অন্বেষণ করাইয়া রাজার তুল্য-রোগাক্রান্ত একটি আভীরকে একান্তে আনয়ন করাইল। ৮২।

ক্রূরাশয়া তিষ্যরক্ষা ক্রূরবুদ্ধি একটি দাসীদ্বারা আভীরকে হত্যা করিয়া তাহার নাভিকোষটি উৎপাটন করিল। তৎপরে তাহার অন্ত্রে সংলগ্ন ও কঠিনভাবে দংশনকারী একটি বিকৃত কৃমি দেখিতে পাইল। ৮৩।

তিষ্যরক্ষা দেখিল যে, কৃমিটা বেগে ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে চলাচল করিতেছে এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে। তৎপরে পিপ্পলী, হিঙ্গু ও বিড়ঙ্গযুক্ত ঔষধ কৃমির উপর নিক্ষেপ করিল। ৮৪।

সেই সেই ক্ষার দ্রব্য ও বিষাক্ত কতকগুলি দ্রব্য দিয়াও কৃমিটা মরিল না। পরে পলাণ্ডু-রস স্পর্শমাত্রেই কৃমি মরিয়া গেল। ৮৫।

তিষ্যরক্ষা এই উপায়টি জানিতে পাইয়া অত্যন্ত হর্ষসহকারে রাজার নিকট গেল এবং প্রচ্ছন্নভাবে পলাণ্ডু-রস সেবনদ্বারা ক্ষণকালমধ্যেই রাজাকে সুস্থ করিল। ৮৬।

যেখানে বিষের কোন শক্তি নাই, যেখানে অস্ত্র-সকল কুণ্ঠিত হয় এবং যেখানে হুতাশন উৎসাহহীন হইয়া পরাঙ্মুখ হন, সেখানেও যুবতী স্ত্রীগণের ক্ষমতা অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ হয়। ৮৭।

তৎপরে কৃতজ্ঞ রাজা জীবন-লাভ-হর্ষে এবং তিষ্যরক্ষার প্রতি প্রেমবশতঃ তাহার প্রার্থনানুসারে সাত দিনের জন্য রাজার কর্তৃত্বভাররূপ বর তিষ্যরক্ষাকে প্রদান করিলেন। ৮৮।

তিষ্যরক্ষা রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সমস্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিল। সে তক্ষশিলাধিপতির নিকট উত্তম রত্ন উপঢৌকন সহ একটি রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্র প্রেরণ করিল। ৮৯।

তৎপরে তক্ষশিলাধিপতি বিনয়-নম্র হইয়া রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্রটি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং স্পষ্টাক্ষর ও স্পষ্টার্থ পত্রটি পাঠ করিলেন। ৯০।

"স্বস্তি, পাটলিপুত্র নগর হইতে, যাঁহার অনুপম সমর-সাহসদ্বারা চতুঃসাগর-সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্রুত বিমল যশোরূপ শুভ্রবস্ত্রাবৃতা বসুধাবধূর সৌভাগ্য-গর্ব্বে প্রবল রিপুগণের প্রতাপ খর্ব্বীকৃত হইয়াছে, যিনি অরাতিবধূগণের বিলাসিতার শাপস্বরূপ, যাঁহার মণিময় নির্ম্মল পাদপীঠে শত শত প্রণত সামন্ত-রাজার মুখপদ্ম প্রতিবিম্বিত হয়, যিনি বন্ধুগণরূপ কমলের বিকাশ-বিষয়ে সূর্য্য-সদৃশ এবং যিনি পরাক্রমে বিখ্যাত মৌর্য্যবংশের সিংহস্বরূপ, সেই মহারাজ শ্রীমান্ অশোক-দেব তক্ষশিলাধিপতি শ্রীমান্ কুঞ্জরকর্ণকে সম্বোধন করিতেছেন ; যথা,

—নির্লজ্জ, কুচরিত্র-প্রিয়, চরিত্রভ্রষ্ট, পুত্ররূপী শত্রু, অপবিত্র ও শাস্ত্র-বিদ্বেষী কুণাল পিতৃকলত্র অভিলাষ করিয়াছে এবং উহার রূপ, যৌবন, উৎসাহ ও সাহস সবই পাপের অনুরূপ। এ জন্য আমি প্রণয়সহকারে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, কুণালের নয়ন-মণি উৎপাটিত করিয়া এবং উহাকে উলঙ্গ করিয়া নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর। ইহাই আমার সপ্রণয় প্রার্থনা।"

রাজা কুঞ্জরকর্ণ এইরূপ উগ্রতর পত্রার্থ অবগত হইয়া কৃপাবশতঃ এরূপ কার্য্য করিতে পারিলেন না। তিনি কুমারের প্রতি প্রীতিবশতঃ এবং রাজা অশোকের ভয়ে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া দোলায়মান হইতে লাগিলেন। ৯১।

কুণাল সেখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি রাজাকে অধোবদন ও সজল-নয়ন দেখিয়া হঠাৎ ভাবান্তর-দর্শনে সন্দেহবশতঃ পত্রখানি লইয়া স্বয়ং তাহা দেখিলেন। ৯২।

কুণাল বুঝিতে পারিলেন যে, পিতা মিথ্যা সন্দেহবশতঃ আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া এরূপ দুঃসহ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ অসহ্য বিপৎকালেও তিনি ধৈর্য্যগুণে চিত্ত স্থির করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৯৩।

প্রথমতঃ পিতার এ ইচ্ছা পূরণ করিতে হইবে। ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। রাজা কুঞ্জরকর্ণকেও পিতার কোপ-ভয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যদিও পিতা মিথ্যা অপরাধে কুপিত হইয়াছেন, তথাপি শুষ্ক কথাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না। ৯৪।

আমি নিজ নেত্রদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া পিতার কোপানলজন্য তাপের শান্তি করিব। ইহাতে রাজা কুঞ্জরকর্ণেরও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করার জন্য কোন বিপদ্ হইবে না। ৯৫।

এই বিনশ্বর ক্লেদময় দেহমধ্যে চক্ষুটি জলবিকারস্বরূপ। তৃণপ্রদীপতুল্য ক্ষণিক-প্রকাশ এই চক্ষুতে কি গুণে আস্থা করিব? ৯৬।

লোকে যে রূপের দর্শন-লাভের জন্য প্রযত্নপূর্ব্বক চক্ষুকে রক্ষা করে, সেই রূপই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রজাল ও স্বপ্নাবলীসদৃশ। ইহা আকাশস্থ চিত্রবৎ মিথ্যা। ৯৭।

রাজপুত্র কুণাল বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং রাজা কুঞ্জরকর্ণ এরূপ কঠোর কার্য্য করিতে অনিচ্ছাবশতঃ বিমুখ হইলেও এবং জনগণ সজলনয়নে নিবারণ করিলেও তিনি চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট করিলেন। ৯৮।

কুণাল প্রচুর সুবর্ণ দিবেন বলায় একজন ক্রূরস্বভাব লুব্ধ ব্যক্তি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিল। তখন দুর্দ্দান্ত হস্তীদ্বারা পদ্মাকরের পদ্মগুলি বিনষ্ট হইলে যেরূপ হয়, কুণালেরও সেইরূপ দশা হইল। ৯৯।

কুণাল যখন বিজয়-যাত্রা করেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত প্রেমপাত্র কাঞ্চনমালিকাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া কুণালকে তদবস্থ দেখিয়াই মোহ-বশতঃ ভূমিতলে পতিতা হইলেন। ১০০।

কুণালের চক্ষুর লাবণ্যমুগ্ধা কাঞ্চনমালিকা ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ধীরস্বভাব কুণাল অনিত্যতা চিন্তাদ্বারা সত্য দর্শন করিয়া ও স্রোতঃপ্রাপ্তিফল লাভদ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া কাঞ্চনমালিকাকে বলিলেন। ১০১।

মুগ্ধে! ধৈর্য্য অবলম্বন কর। মোহ ও দৈন্যে বিহ্বল হইয়া কাতর হইও না। হে ভীরু! মনুষ্যের নিজ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়। ১০২।

এখন আমি অন্ধ হইয়াছি। আমি বিজনে গমন করি। তুমি ক্লেশ সহ্য করিতে পার না, তুমি বন্ধুজন-গৃহ আশ্রয় কর। শোক করিও না। সৌভাগ্য-ভোগের বিয়োগই সার। সংসারের ইহাই স্বভাব। ১০৩।

কুণাল এই কথা বলিলে বিয়োগভীতা জায়া কম্পিতাঙ্গী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। তখন তাঁহার কজ্জলযুক্ত চক্ষুর জল কুচদ্বয়ে নিপতিত হওয়ায় যেন তিনি নিজ চিত্ত দুঃখের নিকট বিক্রীত বলিয়া লিখিলেন। ১০৪।

হে আর্য্যপুত্র! আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। ইহা অঙ্গনাগণের কুলোচিত নিয়ম নহে। পতি নারীর বিভূষণ। আপৎকালে পতি বিরূপ হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না। ১০৫।

বেশ্যাগণও ধনবান্‌দিগের প্রীতির জন্য যত্নপূর্ব্বক সতীব্রত দেখাইয়া থাকে। বিপদাপন্ন প্রার্থী যেরূপ মহাপুরুষের অধিক প্রিয় হয়, তদ্রূপ বিপন্ন পতিও সতীর অধিক প্রিয় হয়। ১০৬।

পুরুষ নয়নহীন হইলে জায়াই তাহার প্রকৃষ্ট যষ্টিস্বরূপ। বিপত্তাপে ও পরিশ্রমে জায়া ছায়াস্বরূপ হয়। বিষম দশায় পদচ্যুত পুরুষগণের পক্ষে জায়ার তুল্য অন্য সহায় নাই। ১০৭।

কুণালপত্নী পাদপতিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করায় রাজকুমার কুণাল জীর্ণ বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া ধৈর্য্যসহ পত্নীর সহিত ধীরে ধীরে গমন করিলেন। ১০৮।

বীণাবাদনপটু ও সুগায়ক কুণাল পথে যাইতে যাইতেই জীবিকাবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কলাবিদ্যার তুল্য মনুষ্যগণের অন্য বিদ্যা নাই। ইহা বিপৎকালে পণ্যস্বরূপ এবং বিভবাবস্থায় বিলাসস্বরূপ হয়। ১০৯।

মদমত্ত ভ্রমর-পংক্তির ধ্বনিসদৃশ শ্রবণসুখকর বীণাস্বন দ্বারা লোককে মুগ্ধ করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া জায়াসহ কুণাল গৃহস্থগণের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গান করিতেন। ১১০।

যাঁহাদের প্রভাব-সূর্য্য গুরু জনের কোপরূপ রাহু কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সুচরিতরূপ চন্দ্র মিথ্যাপবাদরূপ কৃষ্ণপক্ষদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সদ্-গুণরূপ রত্নের প্রভা গুণিগণের দোষমধ্যে পতিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়াছে, যাঁহাদের নয়ন-প্রদীপ বহুতর দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলরূপ ঝটিকাঘাতে নির্ব্বাণ হইয়াছে এবং যাঁহারা সংসাররূপ বিপুল মেঘের বিদ্যুতের ন্যায় তরল সম্পদের জ্যোতির্বিহীন

হইয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যবলে পুনর্ব্বার ধর্ম্মস্মরণরূপ নূতন আলোক উদিত হয়। ১১১-১১৩।

কলাবিদ্যা-নিপুণ, বিবেকচক্ষু কুণাল গান করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, যষ্টিস্বরূপ প্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া পিতার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরেই গেলেন। ১১৪।

অত্যন্ত ক্লেশে ও পথশ্রমে ক্ষীণদেহ, শীতে ও রৌদ্রে বিবর্ণ-বদন কান্তাসহ কুণালকে দেখিয়া লোকে শাপভ্রষ্ট মন্মথ বলিয়া বুঝিল। ১১৫।

ক্রমে তিনি বিশ্রামার্থী হইয়া রাজার উপবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন উদ্যানপালগণ অমঙ্গল-দর্শন জন্য কটুবাক্যে তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। ১১৬।

আশ্রয়হীন কুণাল আশ্রয়ার্থী হইয়া রাজার হস্তিশালায় প্রবেশ করিলেন। হস্তিপালক বীণাবাদনে আদর ও কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে স্থান দান করিল। ১১৭।

তত্রস্থ গজরাজ অন্ধ কুণালকে চিনিতে পারিয়া মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে বিলোকনপূর্ব্বক যেন তাঁহাকে স্বাগত-বাক্য বলিবার জন্য উচ্চস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং ক্রীড়া-ময়ূরগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ১১৮।

হস্তিপালগণ গজেন্দ্র-গর্জ্জনে নিশ্চল ও নির্ভয় কুণালকে দেখিয়া বলিল,— ইনি কোনও সত্ত্বসাগর নির্ভয় সুক্ষত্রিয় হইবেন। ১১৯।

কাঞ্চনমালিকা পতির চরণ-সেবা করিতেছিলেন। তিনি হস্তীটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সজলনয়নে বিভব ও অভিমানের কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন। ১২০।

তোমার সম্মুখে যে সকল ময়ূরগণ গজেন্দ্র-গর্জ্জনে মেঘভ্রমে নৃত্য করিতেছে, ইহারা কার্ত্তিকবাহন ময়ূরের বংশ-সম্ভূত। গজানন গণেশের গর্জ্জনকালেও ইহাদের কোনরূপ বিকার হয় না। ১২১।

তৎপরে সরাগা ( অর্থাৎ সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিতা ), চপলা ( অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িনী ), দোষোন্মুখী ( অর্থাৎ রাত্রির আহ্বানকারণী ) সন্ধ্যা অনুরাগবতী চঞ্চলস্বভাবা ও দুষ্কর্ম্মাভিলাষিণী বিদ্বেষবতী নারীর ন্যায় সহসা উপস্থিত হইয়া লোচনের জীবন-স্বরূপ সূর্য্যকে হরণ করিয়া জনগণের অন্ধতা বিধান করিল। ১২২।

ভ্রমরাবলী লক্ষ্মীর বিরহে ম্লান ও সঙ্কুচিত মুখপদ্ম পদ্মাকরককে দেখিয়া শোকে যেন ভবিতব্যতার স্বভাব গান করিতে লাগিল। ১২৩।

বিশ্বপ্রকাশের একমাত্র মণিপ্রদীপস্বরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলে লক্ষ লক্ষ দীপালোকদ্বারা দিবালোকের লেশমাত্রও হইল না। মহাজনের তেজ সর্ব্বাতিশায়ী হইয়া থাকে। ১২৪।

মণিময় ও সুবর্ণময় প্রাসাদময়ী সেই রাজধানী অন্ধকারমধ্যে প্রভায় প্রকাশমানা হইয়া কষ্টকালে ভক্তিপূর্ব্বক পতির উপকারকারিণী শীলবতী সতীর ন্যায় শোভিত হইল। ১২৫।

তিমিররাশি উদ্গত হইয়া সর্ব্বস্থানে অধিকারপূর্ব্বক ত্রিভুবন আলোকহীন করিল এবং ক্রমে যেন চন্দ্রোদয়-ভয়ে অভিভূত হইয়া কোথায় লুক্কায়িত হইল। ১২৬।

অতঃপর শ্যামল কলঙ্ক-রেখাস্বরূপ সন্দেশ-লিপিধারী, কুমুদ্বতীর হর্ষকর ও পদ্মাকরের শোভাহারী চন্দ্র উদিত হইল। ১২৭।

সুন্দর মৃণাল-লতার নবাঙ্কুর সদৃশ ময়ূখ-লেখাবান্ শুভ্রবর্ণ চন্দ্র দুগ্ধবৎ শুভ্র কান্তিরূপ শুভ্র বস্ত্রদ্বারা যেন যশঃ দ্বারা বিশ্ব পূর্ণ করিল। ১২৮।

তৎপরে রাত্রির যৌবনকাল অতীত হইলে এবং চন্দ্র আকাশে লম্বমান হইলে হস্তিপালগণ জাগরিত হইয়া নিদ্রিত কুণালকে জাগরিত করিয়া বলিল। ১২৯।

হে গায়ক! উঠ।

কলধ্বনিকারিণী ও নখঘাতাভিলাষিণী কান্তাসদৃশী বীণাটি ক্রোড়ে করিয়া একটি গান কর। ১৩০।

পথশ্রান্তিবশতঃ নিদ্রাভিভূত কুণাল হস্তিপালগণের এইরূপ উদ্ধত বাক্যদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেন ও নীচজন-বাক্যে দুঃখিত হইয়া নির্ম্মল বীণাটি ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। ১৩১।

অহো! রক্তপায়ী, নির্দ্দয় ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও লোক জীবিত থাকে, কিন্তু অভদ্র, কটুভাষী, পেটমোটা রাজভৃত্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে লোকের জীবন থাকে না। ১৩২।

নীচসেবাসদৃশ অসহ্য নির্ব্বেদজনক শোক আর নাই। ইহা মনের হানি করে, লজ্জা উৎপাদন করে, সুখের উচ্ছেদ করে ও তাপজনক হয়। ১৩৩।

কুণাল হৃদয়লীন অবমানজনিত দুঃখা।গ-সন্তপ্ত হইয়া এইরূপ নীচ বাক্যের বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক কাল অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধীরে ধীরে বীণাবাদন পূর্ব্বক গান করিলেন। ১৩৪।

হায়! এই সংসার খল জনের দ্বারা কতপ্রকার ক্রীড়া করিতেছে। কাহারও মানহানি করিতেছে, কাহারও বিভবভ্রংশ হেতু তাহাকে অবহেলা ও উপহাস করিতেছে, কাহারও বা মর্ম্মস্পর্শী শল্যসদৃশ অপবাদযুক্ত বিপৎক্লেশ দ্বারা মর্য্যাদা নাশ করিয়া চরিত উৎপাটিত করিতেছে। ১৩৫।

. প্রবহমান বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত লতার পত্রাগ্রের ন্যায় চঞ্চল সংসার-বিভ্রম জনগণের স্থায়ী মহামোহ উৎপাদন করে। তাহাতে আবার জনগণরূপ সজল মেঘে সমুদিত বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় দৃশ্যমান এই সকল সম্পদ্ আরও অধিক চঞ্চল। ১৩৬।

যদি পুরুষগণের সমস্ত বিপদে রক্ষারত্নস্বরূপ বিমল স্বভাব কিছুমাত্র খণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে সে বিভব-নাশজন্য ক্লিষ্ট হইলে এবং নয়নহীন, পঙ্গু ও মূক হইয়া দুঃখ-গর্ত্তে পতিত হইলেও শোভিত হয়। ১৩৭।

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

আমি যষ্টিদ্বারা জল ও স্থল বুঝিতে পারি। স্পর্শ ও গন্ধদ্বারা খাদ্য দ্রব্য জানিতে পারি এবং বুদ্ধিদ্বারা সবই বুঝিতে পারি। দুর্গম পথ শুনিলে অন্য দিকে যাই। অন্ধ জন প্রতি নিশ্বাসক্ষেপে ঘোর নরক-ক্লেশ দেখিতে পায় না। মোহান্ধ মুগ্ধ জন বহুতর বিষয়ে বিড়ম্বিত হয়। নয়নহীন তত হয় না। ১৩৮।

কুণাল এইরূপে নিজ বৃত্তান্তানুরূপ গান উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন। তখন রাত্রিশেষে রাজাও সহসা জাগরিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৩৯।

আমি সর্ব্বদাই দুঃস্বপ্ন দেখি এবং নানা শঙ্কায় আকুল হই। তক্ষশিলাবাসী কুমার কুণাল আজও কোন পত্র পাঠাইল না কেন? ১৪০।

আমি সর্ব্বদাই তাহাকে স্মরণ করি। সে কি আসন্ন সুখে বিভোর হইয়া আমাদের ভুলিয়া গিয়াছে? বহুদিন প্রবাসে থাকিলে লোকের স্নেহ-মমতা নিশ্চয়ই শিথিল হয়। ১৪১।

বীণা মূর্চ্ছনার মধুর স্বরযুক্ত এই যে গীতধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, ইহা অতি শ্রুতিমধুর, যেন গন্ধর্ব্বলোক হইতে গীতধ্বনি আসিতেছে। ইহা ঠিক কুণালের গীতধ্বনিসদৃশ। ১৪২।

ইহা নিশ্চয়ই তাহারই মৃদু গীতধ্বনি। কি জন্য সে গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, জানি না। রাজা ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রধান অমাত্যকে পাঠাইয়া তদ্দ্বারা পুত্রকে ডাকিয়া আনাইলেন। ১৪৩।

রাজা দূর হইতে উৎপাটিতনেত্র শ্রীহীন কুমারকে আসিতে দেখিয়া এবং বধূসহ পুত্রকে চিনিতে পারিয়া মোহবশতঃ ভূমিতে নিপতিত হইলেন। ১৪৪।

পরে হিমশীকরযুক্ত জলসেক দ্বারা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সমীপাগত কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বহুক্ষণ শোক-প্রকাশ করিলেন। ১৪৫।

হা জীবলোকের নয়নানন্দদায়ক পুত্র! কি জন্য তুমি এরূপ দুঃখদশা প্রাপ্ত হইয়াছ? সুরসুন্দরীগণের লোভজনক তোমার নয়ন-পদ্ম দুইটি কোথায় গেল? ১৪৬।

হে গাম্ভীর্য্যাধার! হে গুণ-রত্নের নিধি! হে সরস্বতী-বল্লভ! হে সত্ত্ব-রাশি! হিমাহত পদ্মবন হইতে যেমন শোভা অপগত হয়, তদ্রূপ তোমার সেই সৌন্দর্য্য কোথায় গেল? ১৪৭।

তোমার সেই সৌন্দর্য্য কোথায়, আর এই অসহ্য অন্ধদশা কোথায়; সেই অতুল বৈভব কোথায়, আর এরূপ দুর্দ্দশা বা কোথায়! অর্থাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন অসম্ভব বোধ হইতেছে। কি জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, তাহা জানি না। কে ইহাকে বজ্রবৎ কঠিন করিল? ১৪৮।

বিভবকালে যাহারা তোমার অনুসরণ করিত, তাহারা কোথায় গেল? তোমার পরিবারমধ্যে একমাত্র এই পত্নীই তোমার কুলের অনুরূপ। কষ্টাবস্থায় সাধুজনের ধৈর্য্যবৃত্তি যেরূপ নিশ্চলভাবে থাকে, তদ্রূপ ইনিই তোমার এ অবস্থায় নিশ্চলা আছেন। ১৪৯।

কুমার বিলাপকারী রাজার এইরূপ অশ্রুবেগে অস্পষ্টোচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর তদীয় ক্রোড় হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন। ১৫০।

হে পৃথিবীন্দ্র! শোক পরিত্যাগ কর। ধীরগণ কখন শোকাভিভূত হন না। ভবিতব্যতার স্বভাবই এইরূপ। উন্নতেরই পতন হইয়া থাকে। ১৫১।

নরগণের আশ্চর্য্য সুখযুক্ত ঐশ্বর্য্য ও লাবণ্য-শোভাযুক্ত বপু ক্ষণমধ্যে কৃতান্তের ক্রীড়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। ১৫২।

শূন্যময় এই সংসারে যদি পদার্থ-সকল সত্য হইত, তাহা হইলে এই সকল মুনিগণ ভোগ ত্যাগ করিয়া কেন বিজনে বাস করিবেন? ১৫৩।

কুমার এই কথা বলিলে রাজা তাঁহার বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পত্র প্রেরণের কথা ও নেত্র-নাশের বৃত্তান্ত বলিলেন। ১৫৪।

রাজা সেই কঠোর ও নৃশংস বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুঠারদ্বারা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। ১৫৫।

রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিষ্যরক্ষার সেই কুটিল আচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার নিগ্রহের জন্য স্ত্রীবধ-পাতক গ্রহণ করিতেও উদ্যত হইলেন। ১৫৬।

রাজা সেই ক্রূরতর মহাপকারের প্রতীকারে উদ্যত হইলে কুমার নিজ কর্ম্মফলে এরূপ দুঃসহ দুঃখ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া রাজাকে নিবারণ করিলেন। ১৫৭।

ব্যথিত রাজা শোক ও কোপে দহ্যমান হইয়া কুণালকে বলিলেন,— কি জন্য তুমি মোহবশতঃ শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ক্রূরস্বভাবা অনার্য্যাকে রক্ষা করিতেছ? ১৫৮।

যাহার মন বিদ্বেষী ও স্নেহবান্ ব্যক্তির প্রতি তুল্যভাব থাকে, সে নগণ্য মনুষ্য। যাহার অপকারীর প্রতি ক্রোধলেশও হয় না, তাহার উপকারেও প্রসন্নতা হইবে কেন? ১৫৯।

দুঃখিত রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক এই কথা বলিলে পর কুমার পিতাকে বলিলেন,— হে রাজন্! এই তীব্র অপকারেও আমার কোনরূপ দুঃখ বা ক্রোধ-লেশও হয় নাই। ১৬০।

যদি আমার জননীর প্রতি এবং যে ব্যক্তি নিজ হস্তে আমার নেত্র উৎপাটিত করিয়াছে, তাহার প্রতি আমার মন প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যবলে এখনই আমার নেত্রদ্বয় পূর্ব্ববৎ হউক। ১৬১।

এই কথা বলিবামাত্র রাজপুত্রের নয়ন-পদ্মদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লোক-সকল সত্যব্রতের প্রতি বিশ্বাসবান্ হইল এবং রাজলক্ষ্মী নয়নদ্বয়ে লুব্ধ হইলেন। ১৬২।

রাজা অশোক প্রজাগণের সুখ ও উৎসাহজনক, নেত্রদ্বয়ে শোভমান কুণালকে যৌবরাজ্য-গ্রহণে বিমুখ জানিতে পারিয়া তত্তুল্য গুণবান্ তদীয় পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১৬৩।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

অতঃপর রাজা পত্নী তিষ্যরক্ষার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়া, কুণালের এরূপ দুর্দ্দশা উপেক্ষা করার জন্য তক্ষশিলাধিপতির প্রতিও দুঃসহ ক্রোধানল প্রকাশ করিলেন। ১৬৪।

ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সঙ্ঘস্থবির বলিলেন,— এই রাজপুত্র পূর্ব্বজন্মে কাশীপুরে এক লুব্ধক ছিলেন। ১৬৫।

সেই লুব্ধক হিমালয়ের তটপ্রান্তে গুহায় প্রবিষ্ট পঞ্চশত মৃগকে চক্ষু উৎপাটন দ্বারা অন্ধ করিয়া আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে বধ করিয়াছিল। ১৬৬।

অন্য জন্মেও ইনি মুগ্ধ নামে একটি শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিলেন। সেই বালক শ্রেষ্ঠিতনয় মোহবশতঃ চৈত্যস্থ জিনপ্রতিমার মুখ-পদ্মটি শস্ত্রদ্বারা লোচনহীন করিয়াছিল। ১৬৭।

বালক পরে জ্ঞানোদয় হইলে ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা সেই প্রতিমার নয়নদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তৎপরে অন্য জন্মেও সে একটি জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার ও পূজা করিয়াছিল। ১৬৮।

বনে মৃগগণের নেত্র উৎপাটন করার জন্য এবং বাল্যকালে চৈত্য-প্রতিমার চক্ষু নাশ করার জন্য রাজপুত্র এই জন্মে নিজ চক্ষুদ্বয়ের বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৬৯।

প্রতিমার বিনষ্ট নেত্র পুনরায় রত্নদ্বারা নির্ম্মাণ করার জন্য ইনি বিনষ্ট দৃষ্টি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার করার জন্য প্রসাদগুণযুক্ত ও কান্তিমান্ হইয়াছেন। ১৭০।

ইনি স্রোতঃপ্রাপ্তিফললাভ দ্বারা বিমল আলোকপ্রাপ্ত হইয়া বৈরাগ্য দ্বারা সত্য-দর্শনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালক্রমে পুণ্যবলে ইনি সংবুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবেন। স্থবিরের এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। ১৭১।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# বেনের মেয়ে

৯

১৩৩০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে 'বেনের মেয়ে' সম্পর্কে মন্তব্য।

…শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী এখন কেবল এ-কেলে 'গণিকাতন্ত্রের' উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সে-কেলের সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদ্‌লাইয়া লউন না কেন?" তাঁহার "বেণের মেয়ে" উপন্যাস নহে, ইহা ইতিহাসের এসেন্স, শর্করা-মণ্ডিত গুটিকা, পাঠ করিবার সময় নীলমণি চক্রবর্ত্তী অথবা "আর ডি বন্দ্যো"র গলাতেও সময়ে সময়ে আট্‌কাইয়া যায়। সহজিয়া-বাদের এমন সুন্দর সুললিত ম্যানুয়েল আর নাই। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালা দশের পাঠিকা হয় তো ইহাকে মোটেই উপন্যাস বলিতে রাজী হইবেন না। এই গ্রন্থে একটি নায়িকা এবং একটি প্রচ্ছন্ন নায়ক আছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রেম জন্মিয়াছিল কি না, তাহা "ভাষা" পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ও "খণ্ডনাখণ্ডখাদ্যম্" না পড়িলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে না। আমি স্বয়ং এজাতীয় গ্রন্থ একখানিও পড়ি নাই, সুতরাং সে-কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। "বেণের মেয়ে" ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কীর্ত্তিস্তম্ভমালার অন্যতম। ইহাতে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ অমূল্যচরণের* সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বাগ্‌দী জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন; বোধ হয় সেই প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের রূপা বাগ্‌দী, রাজা রূপনারায়ণ সিংহ হইয়া উঠিয়াছিল। তবে ইহা সুবর্ণ-বণিক্ জাতির বল্লাল-চরিত ও পুড্যাগ্রামের ভট্টভট্টের দেববংশের মত ঐতিহাসিক বিদ্রূপ কিনা সাধারণের সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কিছু নাই।

* [ দ্র. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "বগধ জাতি", প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ। ]

১০

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায়
প্রকাশিত 'বেনের মেয়ে' বিষয়ে মন্তব্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' সেকালের বাঙ্গালার অতুলনীয় ছবি। সেকালের ইতিহাসই একালে উপন্যাসের মত। শাস্ত্রী মহাশয় নিপুণ তুলিকায় এই উপন্যাসে সে কালের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বে ইতিহাসে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সেই অভিজ্ঞান কল্পনায় প্রতিফলিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন, আশা করি, তাহা সম্পূর্ণ হইলে, ফরাসী সাহিত্যের 'সালাম্বো'র মত বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে গৌরবের স্থান অধিকার করিবে।

# অনুক্রমণী

'বাল্মীকির জয়', 'কাঞ্চনমালা' এবং 'বেনের মেয়ে'র শুধু প্রাসঙ্গিক তথ্য অংশের এবং অবশিষ্ট প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখগুলি রাখা হয়েছে।

| পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি | শুদ্ধ পাঠ |
|---|---|
| ৩৬/২৭ | গ্রহণ করিলেন, বীণা তাঁহার |
| ৫১/১৭ | সৃষ্টি আজি |
| ৫৫/৩ | শুদ্ধ |
| | ৫৬/৯, ৫৬/১৯, ৯০/২১, ৯০/২৪, ৯৬/২৬, ৯৭/৫, ২০৯/১৩. ২১৩/৭, ২৫০/৮, ২৭২/১, ৩৩৯/৩০. ৩৪১/৯ —এই পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তিগুলিতেও 'সুদ্ধ' শব্দটি 'শুদ্ধ' পড়তে হবে। |
| ২০৮/১ | গুরুর সঙ্গে একত্রে হাতিতে |
| ৩০০/২০ | বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং |
| ৩০৪/২৭ | প্রতিমা কথা কহিয়া |
| ৩৫৯/৩ | তবে শাস্ত্রে প্রবীণ লোক |
| ৩৫৯ ৬ | মানিতে পারি |
| ৩৮৪/৩০ | মাঝে' |
| ৩৯৭/১২* | 320-23 |
| ৪০১/১ | sanskritized form |
| ৪০১/৭ | Bābhan |
| ৪০১ ১২ | বাভনেরা |
| ৪০৩/২ | pp. cxi-xii |
| ৪৩৮/১১ | তার যে এখনো |
| ৪৪২/২৪ | লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন |
| ৪৪৬/২০ | এই অনুচ্ছেদ থেকে ৫ পরিচ্ছেদ শুরু হবে। |
| ৪৪৭/২০ | বাজনদারেরা চিরকাল |
| ৪৭২/৩০ | স্ত্রী ও স্বামী মনের মিল |
| ৪৭৪/৮ | সেইস্থানে উহায় |
| ৫৬০/৩১ | এখন বিশ্বামিত্র |
| ৫৬৮/২২ | We do not know of any |